সৃষ্টি হইয়া যায়। মাতাপিতারা স্বাস্থ্যসম্পন্ন ও ব্যাধিমুক্ত হইবেন, এই হচ্ছে শিশুদের দাবী।

Good Health.

জগৎ জুড়িয়া শক্তিমান স্বাস্থ্যবান মানুষের জন্য আহ্বান আসিয়াছে; দেশে দেশে স্বাস্থ্যবান পুরুষ ও নারীরাই জগৎকে নূতন করিয়া গড়িতে সক্ষম হইবেন।

Health Culture.

আপনার স্বাস্থ্য বা অস্বাস্থ্য আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; আপনি রোগী হইতে পারেন, নির্জ্জীব নিস্তেজ হইতে পারেন, অথবা দেহ মনে প্রাণের প্রবাহে ভরা হইতে পারেন। আপনি মনে করিলেই আপনার পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারেন। স্বাস্থ্য লাভের জন্য সাধনা চাই।

Physical Culture.

জন্ম-মৃত্যুর তালিকা পাঠ বড় অপ্রিয়, নীরস; কিন্তু এই তালিকা নিষ্ঠুর সত্যি কথা বলে।

দেশ	বৎসর	প্রতি ১০০০ হাজার নব-জাত শিশুর মধ্যে প্রথম বৎসরে মৃত্যু-সংখ্যা।
নিউজিলাণ্ড	১৯১২	৫১
নরওয়ে	১৯১২	৬৮
সুইডেন	১৯১১	৭২
অষ্ট্রেলিয়া	১৯১৩	৭২
ফ্রান্স	১৯১২	৭৮
নেদারল্যাণ্ড	১৯১৩	৯১
সুইজারল্যাণ্ড	১৯১২	৯৪
ডেনমার্ক	১৯১৩	৯৪
আয়রল্যাণ্ড	১৯১৩	৯৭
ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্	১৯১৬	৯৮
স্কটল্যাণ্ড	১৯১৩	১১০
মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি	(১৯০২-১১)	১৯৯
বাঙ্গালা		২৭০
বেহার ও উড়িষ্যা		৩০৪
পাঞ্জাব		৩০৬
বোম্বাই		৩২০
বর্ম্মা		৩৩২
যুক্ত-প্রদেশ		৩৫২

Modern Review

DOUBLE COLOUR PAGE

স্বাস্থ্য-সমাচার

স্বাস্থ্য-বিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্র।

সম্পাদক

ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু, এম্-বি।

নবম বর্ষ

১৩২৭

কার্য্যালয়

৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য এক টাকা।

সূচী-পত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অজীর্ণতা	২০৭
অনিদ্রা	২১৭
আগমনী	১৪৫
আমিষ আহারের বিপদ	২২৪
আমেরিকার মদ্যবর্জ্জনের কারণ ...	৬
আলোচনা ১৯, ৪৫, ৬৮, ৯৩, ১১৮, ১৪২, ১৬৬, ১৯০, ২১২, ২৩৭, ২৬২	
একটী নূতন ধরণের রোগ	২৪৬
একখানি পত্র	২৮৮
এরারুট	১০৭
কলিকাতায় যক্ষ্মা রোগ	৭৩
কান্ত-দর্শনের মূল কোথায় ?	১৭৭
কুইনাইনের আত্মনিবেদন	৫৪
খাদ্য	২২৯
গর্ভাবস্থায় সতর্কতা	২০৪
গর্ভিনীর খাদ্য	৯
চায়ের কুলপরিচয়	৮৬
ছেলেদের দুষ্টামি ... ১৯০,	২২১
জল	৬১০
দন্ত সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তব্য	২০২
দীর্ঘজীবন	১২৯
দুগ্ধ ও ডিম্ব	২৪৮
দুগ্ধ জাল দিয়া খাইব কি না ? ...	২৫
দুগ্ধে রশুন-গন্ধ	১০৪
দৈনিক সহজ ব্যায়াম	৩৩
ধূমপানের অপকারিতা	১৬৯
নববর্ষের নিবেদন	১
পল্লীগ্রামের বিদ্যালয় ও ছাত্রগণের স্বাস্থ্য ...	৩১
পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্যোন্নতি	২৮১
পল্লী-প্রাণ কৃষকের বর্ত্তমান অবস্থা ...	২৪৩
পল্লী-সংস্কার	১৯৬
পল্লীস্বাস্থ্য ১৫, ৪০, ৬১, ৯২, ১১৪, ১৪০, ১৬৩, ২০৯, ২৩২, ২৬২	
পল্লীস্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা ও তাহার অন্তরায় ...	৬৩
পল্লী-স্বাস্থ্যের কথা	২১৫
পাঁউরুটী ... ১০৫,	১৮১
প্রশ্ন ও উত্তর	১৮৮
প্রাপ্ত পত্র	১৮৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রাপ্তি স্বীকার	২৪
ফুল ও ফল	১০৩
মাছির আত্মকথা	৮৪
মুখের যত্ন	৪৯
ম্যালেরিয়া ও তাহার প্রতিকার ...	১৭৩
ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্বন্ধে দুই একটী কথা ...	১৮৪
ম্যালেরিয়ায় আত্মরক্ষা	১৬০
যক্ষ্মা রোগ নিবারণের কয়েকটি সাধারণ উপায় ...	৩৭
যক্ষ্মা রোগীদের প্রতি ডাক্তার চার্লাস মাইনরের উপদেশ	২৪৬
বঙ্গে শিশু-মৃত্যু ও আমাদের দায়িত্ব ...	১৫৭
রামগৃহ	২৭৫
বায়ু	১৫৩
বায়ু	২৮৫
বিলাতে ভারতীয় চিকিৎসক	১২১
বিবিধ প্রসঙ্গ	১৬৫
বিশেষ দ্রষ্টব্য	২৪
ব্যায়ামের উপকারিতা	১২৬
শিক্ষারম্ভের কাল	২৪১
শিশুর খাদ্য	৮৯
শিশুর খেলাধূলা	৩
শিশু-শাসন	৮১
শিশু স্বাস্থ্যপাঠ	৭৯
শৈত্য প্রয়োগ	৫২
শ্রীহট্ট জেলার কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় ...	১৩
শ্রীহট্ট জেলার জন্মমৃত্যু বিবরণ ...	১৩৩
সঙ্কলন	১৫৫
সর্দ্দিজনিত পীড়া ও তাহার প্রতিষেধ ...	৫৭
সমালোচনা	২৪
স্থির-যৌবন	২৩১
স্নান	৩৫
স্বাস্থ্য ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার	১৮৫
স্বাস্থ্যতত্ত্ব	১০৫
স্বাস্থ্যরক্ষা ও লোকশিক্ষা	১৫৮
স্বাস্থ্যবিধি পঞ্চাশৎ	২৫২
হিন্দু ডুবিল ... ৬৭, ১৮৮, ১৭২,	১৯৮
হকওয়ার্ম	১১০

কে, সি, বসু দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত,

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ড্রাগ প্রেস,—৪৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৯ম বর্ষ | বৈশাখ, ১৩২৭ সাল | ১ম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

ভগবৎ-কৃপায় ও সহৃদয় গ্রাহক ও পাঠকগণের উৎসাহে স্বাস্থ্যসমাচার নবম বর্ষে পদার্পণ করিল। এই জন্য নববর্ষারম্ভে আমরা ভগবানের পদে নমস্কার করিতেছি ও গ্রাহক এবং পাঠক মহোদয়গণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

দ্বিতীয় বর্ষের নিবেদনে আমরা লিখিয়াছিলাম যে, এই মাসিক পত্রিকা পরিচালন করা আমাদের লক্ষ্য নহে। সাধারণে কি প্রকারে শরীর পালন, স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন এবং দীর্ঘ জীবন, সুখ ও স্বচ্ছন্দতা অনায়াসে লাভ করিতে পারে, আমরা তাহারই বার্ত্তা গৃহে গৃহে ঘোষণা করিবার জন্য ব্রতী হইয়াছি। আমাদের এই উদ্দেশ্য কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছে জানি না। তবে স্বাস্থ্যসমাচারের গ্রাহক সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া আমরা উৎসাহিত হইতেছি। মনে হয়, আধুনিক সভ্যতার কোলাহলের মধ্যে বাস করিয়াও আমরা নিজেদের স্বাস্থ্যের অবনতি বুঝিতে পারিতেছি। নিজের পরিবারের বা গ্রামের স্বাস্থ্যের প্রতি ক্রমশঃ লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। এই দিকে লোকের মনোযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইল বলিয়া মনে করিব।

কিন্তু দেশের প্রকৃত অবস্থা দেখিলে হৃদয়ে আশঙ্কার উদ্রেক হয়। ভয় হয়, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় সত্তা লোপ পাইবে। ম্যালেরিয়া রাক্ষসী গ্রামে গ্রামে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে এবং শত শত নরনারী তাহার রুধিরাক্ত খর্পরে খণ্ডীকৃত হইতেছে। কলেরা এবং বসন্তরোগে দেশ যেন ক্রমশঃ জনশূন্য হইতেছে। মফঃস্বলের সংবাদপত্র দেখিলে হৃদয় শিহরিয়া উঠে। যে বঙ্গ দেশের প্রতি গ্রাম পূর্ব্বে স্বাস্থ্য নিকেতন ছিল, অদ্য তাহা রোগের ক্রীড়াভূমি, দারুণ গ্রীষ্মে পানীয় জল নাই, বর্ষাকালে জল নির্গমনের ব্যবস্থা নাই। গ্রামের গরু ছাগল প্রভৃতি গৃহ পালিত পশু অস্থি কঙ্কালবিশিষ্ট; আর তাহাদের পালক কৃষকগণ শুষ্ক অস্থির উপরে চর্ম্মাবৃত। হৃদয়ে বল নাই, চোখে দীপ্তি নাই, মুখে আনন্দ নাই, সমস্ত বাঙ্গলা দেশ যেন আজ প্রেতপুরী। এই ত আমাদের দেশের অবস্থা। এই অবস্থাতেও আমরা আজ স্বায়ত্ত শাসন লাভের জন্য

মহা আন্দোলন করিতেছি। আধুনিক চিকিৎসাতত্ত্ববিৎগণ ইহা স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর অর্দ্ধেক পীড়াই চেষ্টা করিলে দূর করা যাইতে পারে। কাহারও মতে চারি ভাগের তিন ভাগ রোগ আরোগ্যক্ষম। চেষ্টা করিলে এবং পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিলে অনেক রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। আমাদের দেশে রোগ সম্বন্ধে অজ্ঞতা পীড়ার প্রাবল্যের একটি প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। অবশ্য দরিদ্রতা যে একটি প্রধান কারণ, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। তবে ইহাও ঠিক যে শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে লোক কার্য্যক্ষম হয় এবং দারিদ্র্য নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতে সমর্থ হয়। আধুনিক গবেষণার ফলে পাশ্চাত্য দেশ হইতে ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি রোগের প্রকোপ অনেকটা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সমস্ত উপায় সকল সময়ে যে ব্যয়সাধ্য তাহাও নহে। কিন্তু দেশের জন সাধারণ এই বিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারিতেছে না। শিশুমৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিলে কি দেখা যায়? শতকরা পঁচিশজন শিশু এই দেশে এক বৎসর বয়স না হইতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গত সরকারী বর্ষে কলিকাতায় ৫০,০০ শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। তাহার মধ্যে ১৭৯১ জন এক সপ্তাহ বয়স না হইতেই চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে। ধনুষ্টঙ্কারে ৪০০ ছেলের জীবন নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যেখানে জন্মের সময় উপযুক্ত রূপ সতর্কতা অবলম্বন করা যায়, তথায় এই রোগের প্রাবল্য দৃষ্ট হয় না। রোগের প্রকৃত ধর্ম্ম ও নিবারণের উপায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য সাধারণের নিকট এই সকল তথ্য প্রচার করা প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পত্রিকা দেশে নিতান্তই বিরল। দেশে জন্মের তালিকা দেখিয়া অনেকে মনে করিতেছেন যে, দেশে ত লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু কেহ কি ভাবিয়া দেখিতেছেন যে যত লোক জন্ম গ্রহণ করে, তাহার মধ্যে কত লোকের মৃত্যু হইতেছে—আর অবশিষ্টগণের মধ্যে কত জন সুস্থ ও সবল হইয়া জীবন সংগ্রামে প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইতেছে? যে সমস্ত শিশু শৈশবকাল অতিক্রম করে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই হীন, দুর্ব্বল ও নির্বীর্য্য। তার পর অনেকে পিতামাতার ক্ষয়, মেহ, উপদংশ শ্বাস প্রভৃতি নানাবিধ রোগের উত্তরাধিকারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এই সকল শিশু যখন আবার নিজের সন্তানের জন্ম দেয় তাহাদের শিশুরা আবার আরও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এইরূপে আমাদের জাতীয় জীবন ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। কোন পন্থা অবলম্বন করিলে এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করা যাইতে পারে তাহা নির্দ্দেশ করিবার কোনও উপায় নাই।

পাশ্চাত্য দেশে যে এই সকল রোগের প্রাবল্য নাই তাহা নহে। কিন্তু তথায় ইহার প্রতীকারের চেষ্টারও অভাব নাই। নানাপ্রকার সংবাদপত্র জন সাধারণকে এই বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেছে। হেল্‌থ্ অফিসারগণ গ্রামে গ্রামে যাইয়া গ্রামের সাধারণ গৃহস্থগণকে উপদেশ দিতেছেন। নানাপ্রকার সেবা সমিতি ও হাসপাতালের অভাব নাই। কিন্তু হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য দেশ। ইহার জন সাধারণের প্রতি তাকাইবার কেহই নাই।

বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলিয়া শিশুমৃত্যু ও যুবকগণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমরা ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি। যক্ষ্মা, কলেরা প্রভৃতি রোগের হস্ত হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে, এই বিষয়ে সহজ ভাষায় সাধারণের উপযোগী প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা আছে। বঙ্গদেশের প্রতি জিলার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সম্বন্ধেও আলোচনা করা আমাদের ইচ্ছা। সহৃদয় পাঠকগণ যদি কষ্ট স্বীকার করিয়া স্বীয় স্বীয় জিলার এক একটী বিবরণ প্রেরণ করেন, তবে বিশেষ

অনুগৃহীত হইব এবং এই সকল অভাব দূর করিবার জন্য প্রাণপণে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিকে নিযুক্ত করিব। এই বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের সহায়তা না পাইলে কিছু ফল লাভ হয় না। দেশের যুবকগণের বিশেষতঃ ছাত্রগণের মধ্যে মাদক দ্রব্য সেবন, ব্যায়ামের অভাব, চা পান, ফুট সেবন প্রভৃতি যে সকল কদভ্যাস প্রবেশ লাভ করিয়াছে তৎসম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করিব। ইহা ব্যতীত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা আমাদের স্বাভাবিক কর্ত্তব্য হইবে।

সর্ব্বশেষে আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে, এখনও সকলে স্বীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মনোযোগী হউন। নিজের পরিবারের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা করুন। যা শরীরের পক্ষে অমঙ্গলজনক তাহা শত রমণীয় হইলেও কাক-বিষ্ঠার ন্যায় দূরে পরিত্যাগ করা উচিত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, নিজেরা চেষ্টা করিলে অনেক রোগ নিবারণ করিতে পারি। শুধু নিজেদের পরিবার মধ্যে স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা করিলে হইবে না। গ্রামের এবং বিভাগের স্বাস্থ্য কিরূপে উন্নতি লাভ করে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রতি জিলায় স্বাস্থ্য সমিতি গঠন করিতে হইবে। বিশুদ্ধ পানীয় জল ও দুগ্ধের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সংক্রামক পীড়া হইবার প্রারম্ভে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, আর সর্ব্বোপরি দেশের আশার স্থল বালক ও যুবকগণ যাহাতে স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইয়া সুখ-সমৃদ্ধির অধিকারী হয়, তজ্জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। তাহাদিগকে স্বাস্থ্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলে ও এই বিষয়ে জ্ঞান লাভের সুযোগ দিলে প্রভূত উপকার সাধিত হইবে। সুখের বিষয় এই যে, এই বৎসর হইতে স্বাস্থ্য বিষয় (Hygiene) বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীগণের পাঠ্য বিষয়রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বিশেষ মনোযোগী হইয়া যাহাতে এই বিষয়ে ছাত্রগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য প্রাণ পণে চেষ্টা করিবেন। যুবকগণ যদি উদাসীনতা পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের ও দেশের জন সাধারণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যত্নবান হন, তবে সহজেই এই জটিল সমস্যার মীমাংসা হইবে।

শিশুর খেলা-ধূলা।

সুস্থ সবল শিশু। এখনও আঁতুড়-ঘরে। তাহার আহার সময় হইয়াছে, সে কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। মা তাহাকে মাই দিলেন। স্তন্য পান করিয়া শিশু তৃপ্ত হইল। জননী নিজের পার্শ্বে খোকার ছোট্ট বিছানাটিতে তাহাকে শোয়াইয়া দিলেন। শিশু হাত পা নাড়িয়া খেলা করিতে লাগিল। জননী একদৃষ্টে শিশুর মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। ছেলের খেলা দেখিয়া তাঁহার মন আনন্দে পূর্ণ হইতে লাগিল। শিশুর ক্রীড়ার ইহাই প্রথম সূচনা।

ক্রমে শিশুর বয়স তিনমাস হইল। তৃপ্তিপূর্ব্বক দুগ্ধ পানের পর শিশু তাহার নিজের বিছানায় শুইয়া চারিদিক দেখিতেছে, আনন্দে হাত পা নাড়িতেছে; আর মুখ দিয়া কত রকমের আওয়াজ বাহির করিতেছে। দেখিয়া দেখিয়া জননী আনন্দে অধীরা হইতেছেন। মাঝে মাঝে মুখ নিচু করিয়া শিশুর গালে চুম্বন করিতেছেন। শিশুও আনন্দে হাসিয়া উঠিতেছে। আরও নানা রকম আওয়াজ বাহির করিতেছে। জননী তাহার সহিত কথা কহিতেছেন। শিশুও তাহার জবাব দিতেছে। মায়ে-পোয়ে কথা হইতেছে। এ, দেবভাষা বুঝা অপর কাহারও সাধ্য নহে। মায়েরও না,—শিশুরও না। মা বুঝেন শিশুর কথা, শিশু বুঝে মায়ের কথা। জননী ও শিশুর এই কথোপকথনের কোন ভাষা নাই,

আছে কেবল শব্দ; ইহার কোন অর্থ নাই; ইহাতে আছে কেবল আনন্দ;—পবিত্র, স্বর্গীয়, অনাবিল আনন্দ। শিশুর ক্রীড়া-প্রবৃত্তির ক্রম-অভিব্যক্তির ইহা দ্বিতীয় স্তর।

বস্তুতঃ, ক্রীড়া করিবার প্রবৃত্তি জীব মাত্রেই স্বাভাবিক। যাঁহারা গৃহপালিত পশুপক্ষীর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার পরিচয় পাইয়াছেন। কুকুর, বিড়াল, ভেড়া, ছাগল, গোবৎস—কেবল গৃহপালিত পশুর শাবক নহে, বন্য জন্তুর—এমন কি, সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুরও শাবকগুলি এইরূপ ক্রীড়াপ্রবণ।

"Play is the highest phase of child-development."—*F. Froebel.*

"শিশুর ক্রমবিকাশের পক্ষে খেলাধূলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদান।"

প্রত্যেক পিতা-মাতা একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন,—তাঁহারা নিজেরা শৈশব কালে যে সকল খেলা খেলিয়াছেন, তাঁহাদের পুত্রকন্যারা সেই সকল খেলার কতক আয়ত্ত করিয়াছে, আর কতক নূতন খেলা তাহারা নিজেরাই আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার যেরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে, তদনুসারে,—তাহার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া শিশুরাও নিজেদের জন্য সেইরূপ নূতন নূতন ক্রীড়া কৌতুক আবিষ্কার করিয়া লইয়া থাকে।

এই ক্রীড়া-কৌতুক, এবং তাহাদের উপকরণগুলির দ্বারা শিশুর চরিত্র গঠিত হয়;—ভবিষ্যতে সে মানুষ হইবে কি পশু হইবে, তাহা স্থির হইয়া থাকে। সুতরাং শিশুর ক্রীড়া-কৌতুক এবং ক্রীড়নক পিতা মাতার উপেক্ষার বিষয় ত নহেই, বরং তাহার উপর তাঁহাদের খুবই লক্ষ্য রাখা উচিত। আর, সেই আঁতুড়-ঘর হইতেই জননীকে এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে অভ্যাস করিতে হইবে। শিশুর ক্রীড়া, শিশুর ক্রীড়নক হইতে তাহাকে কত প্রকার শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। এফ, ফ্রোয়েবেল নামক 'একজন শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ ভদ্রলোক শিশুর খেলাধূলা হইতে শিশুর চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া, খেলধূলার মধ্য দিয়া তাহাদের শিক্ষা বিধানের একটী নূতন শিক্ষা প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছেন; তাহাই আজকালকার বিশ্ববিখ্যাত কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী।

শিশু যে খেলা করে, যে জিনিস লইয়া খেলা করে, তাহাতে তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিকাশাভাষ দেখা যায়। এবং ইহা হইতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা শিশুর ভবিষ্য-জীবনের পরিচয় পূর্ব্বাহ্নেই পাইয়া থাকেন। নানা শ্রেণীর নানা প্রকার খেলানার একত্র সমাবেশ করিয়া, কিম্বা বিবিধ প্রকার খেলানা সাজানো আছে এমন এক দোকানে লইয়া গিয়া, কোন শিশুকে তাহার ভিতর হইতে একটী বা একাধিক খেলানা বাছিয়া লইতে বলা হইল। তাহাকে এই নির্ব্বাচন ব্যাপারে কোনরূপ সাহায্য করা হইবে না,—সে সম্পূর্ণ নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ পূর্ব্বক খেলানা নির্ব্বাচন করিবে। তদনুসারে, শিশু যে যে খেলানা নির্ব্বাচন করিয়া লইবে, তাহাতে তাহার প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে। তখন, সেই শিশুকে কি ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, কি ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহাও স্থির হইয়া যাইবে।

খেলা ও খেলানার অনেক প্রকার শ্রেণী ভেদ আছে। কোন খেলা একলা, কিম্বা দুইজনে, কিম্বা তিনজনে খেলিতে হয়; কিন্তু এই তিনজনেই স্বতন্ত্র ভাবে খেলা করিবে, দল বাঁধিয়া খেলা করিবে না। আবার কতক আছে, যাহা দল বাঁধিয়া খেলা করিতে হয়। দলের সকলেরই একই লক্ষ্য থাকে, এবং সকলেই কতকগুলি নিয়ম মানিয়া খেলিয়া থাকে। কতক খেলার উপকরণ আছে, কতক খেলার উপকরণ নাই। কতক খেলা ঘরে বসিয়া (indoor) খেলিতে হয়; কতক খেলা মুক্ত স্থানে (outdoor) খেলিতে হয়। কতক খেলা আনন্দ জনক; কতক খেলা বলব্যঞ্জক। বয়োভেদেও খেলা ও খেলানার তারতম্য হয়।

আমাদের দেশে বালিকাদের খেলানা এবং খেলিবার প্রণালীর গুণে তাহারা গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্মে নিপুণতা

লাভ করে, এবং সামাজিকতা শিক্ষা করে। তাহাদের হাঁড়ি-কুঁড়ি লইয়া খেলা miniature গৃহস্থালী মাত্র। তাহাদের পুতুলের বিয়ে সামাজিকতার মাত্রা ভেদ। অনেক জননী স্বীয় কন্যাগণের এইরূপ খেলায় উৎসাহ দিয়া থাকেন। তাহাদের পুতুলের সাজপোষাক, খাট-বিছানা, লেপ-বালিস তৈয়ার করাইয়া দেন; পুতুলের বিবাহে সত্যকারের ভোজের আয়োজন করিয়া বন্ধু-বান্ধবদের (কন্যার বন্ধুদের সঙ্গে নিজেদেরও!) নিমন্ত্রণ করিয়া অর্থব্যয়ও কিছু কিছু করিয়া থাকেন। মেয়েরা যখন তাহাদের গৃহস্থালীর সরঞ্জাম লইয়া খেলা করে, তখন তাহাদের জননীরা অনেক স্থলে তাহাদিগকে সত্যকারের চাল ডাল, ঘি ময়দা দিয়া যতটা সম্ভব খেলাকে সত্যের আভাষ দিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহাতে মেয়েদের গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম্মে নিপুণতা লাভে অনেকটা সহায়তা হইয়া থাকে। চড়াইভাতিও খেলাচ্ছলে এইরূপ শিক্ষাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ছেলেলেদের খেলাধূলার মধ্যে এরূপ ব্যবস্থার একান্তই অভাব দেখা যায়। সেই জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আমাদের ছেলেরা মেয়েদের মত অতটা নিপুণতা বা চতুরতা দেখাইতে পারে না। পুঁথিগত বিদ্যার সাহায্যে কোন রকমে তাহারা সংসারে টিঁকিয়া থাকে মাত্র। আমাদের ছেলেদের খেলার ভিতর শিক্ষার এই ত্রুটিটুকু আমাদের মা-জননীদেরই সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। কন্যার সম্বন্ধে 'তাঁহারা যেটুকু পক্ষপাত' করেন,—পুত্রের খেলার ব্যবস্থা করিবার ভার পুত্রের জনকের হাতে ছাড়িয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত হন, তাহাতে আর চলিবে না,—তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে একটু অবহিত হইতে হইবে।

এই বিশেষ বিষয়টি ছাড়া,—ছেলেমেয়েদের খেলা ও খেলানার ব্যবস্থা প্রায় সমান ভাবেই করিতে হয়,—অন্ততঃ যতদিন না ছেলে বুঝিতে পারে যে সে ছেলে, এবং মেয়ে বুঝিতে পারে যে সে মেয়ে। সেই আঁতুড়-ঘর হইতে কিছু দিন পর্য্যন্ত ছেলেমেয়ের পার্থক্য না করিয়া তাহাদিগকে সমান ভাবে খেলা দিতে হইবে।

এক মাস হইতে আট মাস বয়স পর্য্যন্ত তাহাদের দৃষ্টি, শ্রুতি ও স্পর্শ শক্তির বিকাশসূচক খেলা চাই। তাহারা হাত পা নাড়িয়া, চারিদিকে চাহিয়া, জিনিস-পত্র স্পর্শ করিয়া এবং ক্রমশঃ ধরিয়া খেলাচ্ছলে শিক্ষা লাভ করিবে। বুকে হাঁটিয়া শিশু যখন কোন দূর-স্থিত দ্রব্য ধরিতে চেষ্টা করে, তখন তাহার মুখ চোখের ভাব দেখিলেই বুঝা যায়, জিনিসটি ধরিবার জন্য তাহার মনে কত না আগ্রহ জন্মিয়াছে। একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স পর্য্যন্ত শিশুমাত্রেরই প্রকৃতি বর্ত্তমান কালের বোলশেভিকদিগের মত; অর্থাৎ যে কোন জিনিস তাহারা হাতের কাছে পাইবে, তাহাই ঠুকিয়া ঠুকিয়া ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিবে। টেবিল, চেয়ার, খাট, পালঙ্ক প্রভৃতি যে সব জিনিস নাড়িবার সামর্থ্য তাহাদের নাই, সেই সব জিনিসও ধরিয়া দু'চারবার নাড়া দিবার চেষ্টা করিবে; এবং না পারিলে হয় নিরস্ত হইবে, না হয় কান্না জুড়িয়া দিবে। জননী তখন তাহার মন বিষয়ান্তরে লইয়া গিয়া তাহাকে শান্ত করিবেন; কিন্তু কদাচ তাড়না, তিরস্কার বা প্রহার করিবেন না। আট মাস বয়স হইতে জননী শিশুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলিবেন, 'টু' দিবেন, শিশু যাহাতে তাঁহাকে খুঁজিবার চেষ্টা করে, এমন ভাবে তাহাকে অল্প দেখা দিয়া আবার লুকাইবেন। এই রূপে শিশুর সঙ্গে অন্য খেলানা লইয়া খেলা করিতে হইবে। ছেলে যখন মায়ের আঁচলের চাবির রিং ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিবে, তখন সেই চাবির থলো তাহাকে চুষিতে না দিয়া, রোগ বীজাণু উদরস্থ করিতে সহায়তা না করিয়া, তাহার ব্যবহার শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতে হইবে। একটা চাবি তাহাকে ধরাইয়া দিয়া সেই চাবিটা যে তালার বা কলের সেই তালা বা কলে চাবি পরাইতে দিবেন। ইহাতে খেলার সঙ্গে তাহার একটা শিক্ষা হইয়া যাইবে। এইরূপে শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার বুদ্ধির যতই বিকাশ ঘটিবে, তাহার ক্রীড়ারও তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি কোন শিশুর মনে দুষ্টবুদ্ধির বিকাশ দেখা যায়, তাহা হইলে, খেলানার সাহায্যে এই সময় হইতেই তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে।

আমেরিকার মদ্য বর্জ্জনের কারণ।

সকলেই এখন জানিতে পারিয়াছেন যে, আমেরিকানরা আর মদ্য পান করেন না। যুদ্ধ উপলক্ষে অন্য অনেক দেশ যেমন মদ্যপান ত্যাগ করিয়াছিল, আমেরিকাও সেইরূপ মদ্য বর্জ্জন করিয়াছিল। প্রথমে রুষিয়ায়, পরে ইংলণ্ডে, তার পর আমেরিকায়—যুদ্ধ উপলক্ষে এইরূপে অনেক দেশে মদ্য বর্জ্জিত হয়। আইন রচনা করিয়া লোককে মদ্যপানে বিরত করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধের পর কথা উঠে, মদ্যপান নিষেধ সূচক আইন আর প্রচলিত রাখা আবশ্যক কি না? অন্য সকল দেশে যুদ্ধের পর, সন্ধি স্থাপিত হইলে, মদ্যপান সম্বন্ধে আর কড়াকড়ি করা হয় নাই। কিন্তু আমেরিকার সেনেট সভায় যখন এই অস্থায়ী আইন তুলিয়া দিবার কথা উঠিল, তখন সকল সেনেটর একবাক্যে বলিলেন, না আইন তুলিয়া দেওয়া হইবে না, আইন প্রচলিত থাকিবে; বরং উহাকে পাকা করিয়া ফেলা হউক। তাহাই হইল। আমেরিকা চিরদিনের জন্য মদ্য বর্জ্জন করিল। এই সংবাদ পৃথিবীময় প্রচারিত হইয়া পড়িল; আমেরিকার নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। পৃথিবীর অন্য সব জাতি অপেক্ষা আমেরিকা অধিকতর সজীব জাতি; তাহার মানসিক দৃঢ়তা, চরিত্রবল অন্য সব জাতির অপেক্ষা অধিক। তাই, অন্য সকল দেশে প্রয়োজনের খাতিরে অস্থায়ী ভাবে যে পাপ বর্জ্জিত হইয়াছিল, সে প্রয়োজন সাধিত হইবামাত্র সে দৃঢ়তা আর কাহারও রহিল না; যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, এখন মদ খাও আর না খাও, তাহাতে কাহারও কিছু আসিয়া যায় না। ঐ সব দেশের লোকে যে সময়টা মদ ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা পোষাইয়া লইবার জন্য বরং যুদ্ধ শেষে আরও বেশী করিয়া মদ খাইতে আরম্ভ করিল। ইহারা পুরাতন জাতি। পুরাতন জাতির কোন বিষয়ে দৃঢ়তা স্বভাবতঃই কম; ইহাদের সঙ্কল্প বেশী দিন স্থায়ী হয় না। কিন্তু আমেরিকা নূতন জাতি; কর্ম্ম জীবনের পথে নূতন পথিক। আমেরিকা সতেজ, প্রাণবান জাতি। তাই তাহার দৃঢ়তা অন্য সকল জাতির অপেক্ষা অধিক। সেই কারণে আমেরিকা মদ্যপানরূপ মহাপাতককে চিরদিনের মত বর্জ্জন করিতে পারিয়াছে।

কিন্তু এই কাজটি সহজে হয় নাই। ইহার জন্য আমেরিকাকে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। প্রথমে দিন কতক লোককে জোর করিয়া মদ্য পানে বিরত থাকিতে বাধ্য করিতে হইয়াছে। সকলেই জানেন, সকল দেশে মদ্য ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে শুল্ক স্বরূপ সরকারের অনেক টাকা আয় হয়। আমেরিকান জাতি মদ্যপান চিরদিনের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়ায় মার্কিন সরকারের স্থায়ীভাবে অনেক টাকা রাজস্বের ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু পাপ দমনের জন্য আমেরিকা অম্লান বদনে এই ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। ইহাতে মার্কিন জাতি ও মার্কিন সরকারের যথেষ্ট মহত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

কোন পুরাতন প্রথা লোকে সহজে ত্যাগ করিতে চায় না। পুরাতনের প্রতি লোকের একটা সহজ ও স্বাভাবিক মমতা থাকে। প্রথাটা কুপ্রথা, কুসংস্কার-মূলক প্রথা হইলেও, তাহার প্রতি মায়াবশতঃ লোকে তাহা ত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করে,—ত্যাগ না করিতে হইলেই যেন আশ্বস্ত হয়।

অন্যান্য দেশের ন্যায় আমেরিকাতেও মদ্যপান প্রথা অনেক দিন ধরিয়া প্রচলিত ছিল। আমেরিকা যুদ্ধের প্রায় শেষ বরাবর যুদ্ধে যোগ দিবার পর যখন মদ্য বর্জ্জনের কথা উঠিল, তখন আইনে এই ব্যবস্থা হইল যে, যত দিন যুদ্ধ চলিবে তত দিন, এবং তাহার পর আরও দু'মাস ছ'মাস কেহ মদ্যপান করিবে না। লোকে তখন মনকে এই বলিয়া বুঝাইল যে, যুদ্ধ ত চিরদিন চলিবে না,—এক দিন না এক দিন শেষ হইবেই। তখন আবার প্রাণ ভরিয়া মদ খাওয়া যাইবে, এখন দরকার পড়িয়াছে,—দিন কতক নিরামিষ ভোজনই করা যাউক। তখন কেহই কল্পনাও করে নাই যে, আজ যাহা প্রয়োজন বলিয়া অস্থায়ী ভাবে বর্জ্জিত হইতেছে, একদিন তাহা পাপ বলিয়া স্থায়ী ভাবে বর্জ্জিত হইবে। কিন্তু জগতে কল্পনাতীত কত ব্যাপার নিত্য সংঘটিত হইতেছে। আজ এরোপ্লেনে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে,—কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে এরূপ অবস্থা কেহ কল্পনা করিতে পারিত কি? শত বৎসর পূর্ব্বে এরূপ কল্পনা কেহ মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিতে সাহস করিত না,—করিলে, লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিত। কিন্তু এখন আর তাহা কল্পনাও নয়, হাসির কথাও নয়—এখন ইহা জলন্ত সত্য।

আমেরিকাকে বেশী দিন যুদ্ধ করিতে হয় নাই। যুদ্ধ শেষ হইলে, মার্কিন সেনেটে মদ্যপান বর্জ্জন আইনের কথা উঠিবার পূর্ব্বে সাধারণের মধ্যে আইন রাখা না রাখার কথাটার খুব আলোচনা আরম্ভ হইল। তখনও আইনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইতে কিছু দিন বাকী ছিল। মদ্য বর্জ্জনের পক্ষপাতী ব্যক্তিরা যখন বলিতে লাগিলেন, আইন তুলিয়া দিয়া কাজ নাই; উহাকে পাকা আইনে পরিণত করিতে হইবে, তখন মদের ভক্তেরা চটিয়া গিয়া বলিতে লাগিল, এতদিন মদ না খাইয়া গলা শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া রহিয়াছে; এখনও যদিও কোনরূপে বাঁচিয়া আছি,—কিন্তু মদ একেবারে ছাড়িতে হইলে আর আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে না। তাহারা আশা করিতে লাগিল, আইন যখন যুদ্ধের দরুণ অস্থায়ী ভাবে কিছুকালের জন্য রচিত হইয়াছে, তখন, যুদ্ধ শেষ হওয়াতে, শীঘ্রই আইন তুলিয়া দেওয়া হইবে, এবং তাহারাও প্রাণ ভরিয়া মদ খাইয়া বাঁচিবে। কিন্তু তাহাদের আশা পূর্ণ হইল না। আইন উঠিয়া ত গেলই না, বরং পাকা হইয়া গেল,—তাহাদের মদ খাওয়ার আশা চির তরে ঘুচিয়া গেল। অথচ, তাহারা মরিল না, তাহাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হইল। সে বাঁচা আবার যেমন তেমন বাঁচা নয়,—পূর্ণতেজে, পূর্ণ স্বাস্থ্যে বাঁচিয়া থাকা!

অতি অল্প দিন মদ্য বর্জ্জন করিয়াই আমেরিকার বিবেচক সেনেটররা মদ্য বর্জ্জনের অসীম উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা আর সেই পুরাতন পাপে রত হইতে পারিলেন না। অভিজ্ঞতা তাঁহাদিগকে যে শিক্ষা দিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইল না। মদ্য বর্জ্জন কালের মধ্যে আমেরিকার সেনেটররা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, পথে ঘাটে মাতালের উপদ্রব এবং তাহার ফলে অশান্তি দূর হইয়াছে; মাতালদের পরিবারে সদাই অর্থাভাব দেখা যাইত; মদ্য বর্জ্জনের ফলে তাহাদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে; এই সকল পরিবারে অভাবজনিত অশান্তিও আর নাই। মাতালদের দ্বারা প্রায়ই অনেক দুর্ঘটনা ঘটিত; সে সকল দুর্ঘটনা আর ঘটে না; অপরাধের মাত্রা অনেকটা কমিয়াছে;—ফৌজদারী আদালতের কাজও ঢের কমিয়া গিয়াছে। এক মাত্র মদ্য বর্জ্জনের ফলে এই সব মহা উপকার ত হইয়াছেই; তাহার উপর আর একটা মস্ত উপকার হইয়াছে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া এবং তাহার ফলে বিকৃতাঙ্গ সন্তান প্রজননের মূলে মদ্য বর্ত্তমান। মদ্য বর্জ্জিত হওয়ায় জন্মমৃত্যুর ব্যাপারেও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে;—স্বাস্থ্য-সম্পন্ন শিশুর জন্মের হার অনেক বাড়িয়া গিয়াছে;—বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্মের পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, মদ্য বর্জ্জনে জাতীয় মহোপকারের কথা বিবেচনা করিয়া সেনেটররা একবাক্যে আইন পাকা করিবার কথায় সম্মতি প্রকাশ করেন।

মদ্য বর্জ্জন প্রসঙ্গে আরও একটা কথা এই উঠিয়াছিল যে, আইনটিকে স্থায়ী করিয়া দিলে লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইবে। কিন্তু এই আপত্তি টিঁকে নাই। কারণ, এই মত অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে আইন মাত্রেরই আর আবশ্যকতা থাকে না; কারণ, প্রত্যেক আইনেই কাহারও না কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন। চুরি করা আইন

অনুসারে নিষিদ্ধ। পেশাদার চোর বলিবে এই আইন থাকাতে আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। আমি ইচ্ছামত আমার ব্যবসায় চালাইতে পারিতেছি না;—আমার বৃত্তি লোপ হইতেছে; অতএব আইন তুলিয়া দাও। মোটর গাড়ীর গতিবেগ সংযত করিবার জন্য আইন আছে। প্রত্যেক মোটর-চালক বলিবে, এই আইন থাকাতে আমি স্বাধীন ভাবে ইচ্ছামত বেগে মোটর চালাইয়া মানুষ চাপা দিয়া দুর্ঘটনা ঘটাইতে পারিতেছি না। অতএব এই আইনে আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে; এ আইন চাই না। ইত্যাদি।

তা' ছাড়া, বিবেচক আমেরিকানরা দেখিলেন, জনসাধারণ অনেকটা অবোধ শিশুর মত, তাহারা নিজেদের হিতাহিত ভাল বুঝিতে পারে না। কোকেন যখন প্রথম বাজারে বাহির হয়, তখন অনেকে কোকেন সেবন করিতে আরম্ভ করে! কোকেন একটা নেশার জিনিস। কিন্তু ইহাতে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় বলিয়া সরকার ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। লোকে প্রথমে তাহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইল বলিয়া গোলমাল করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সরকার ইহা অবোধ শিশুর আপত্তি বিবেচনা করিয়া তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। মর্ফাইন সেবন নিবারণের সময়েও এইরূপ গোলমাল ঘটিয়াছিল। কিন্তু আইনানুসারে মরফাইন সেবনও নিষিদ্ধ হইয়াছে। মদ কি ইহাদের অপেক্ষা কম অনিষ্টকর? কাজেই মদ্যও নিষিদ্ধ পানীয় বলিয়া গণ্য হইল। একে ত সাধারণ মানুষ অবোধ শিশুর মত হিতাহিত জ্ঞানশূন্য; তাহার উপর কয়েক গ্লাস মদ পেটে পড়িলে তাহার বুদ্ধি আরও বিকৃত হইয়া যায়। মানব-মস্তিষ্কের উন্নতি সাধন করিতে সহস্র সহস্র বৎসর সময় লাগে। মদ্যপান করিতে অভ্যাস করিলে এই সহস্র সহস্র বৎসরের সাধনার ফল নষ্ট হইয়া যায়। আমেরিকা আর এই মনুষ্যত্বের সাধনাকে নষ্ট হইতে দিবেন না; তাই আমেরিকায় মদ্যপান নিষিদ্ধ হইয়াছে।

মাতালদের দ্বারা যে সকল অনিষ্ট হয়, সে জন্য মার্কিন জাতি নিজেদের দায়ী মনে করিয়াছেন; সেই জন্য তাঁহারা মদ্য বর্জ্জন করিয়াছেন।

মদ্য ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ আর একটা আপত্তি তুলিয়াছিলেন যে, আইনই কর, আর যাই কর,—মদ খাওয়া বন্ধ করিতে পারিবে না। আইনের নিষেধ না মানিয়া লোকে মদ খাইবেই। বলা বাহুল্য এরূপ ছেলেমানুষী আপত্তি কখনই টিঁকিতে পারে না; কোন ক্ষেত্রেও টিঁকে নাই। আইনের নিষেধ সত্ত্বেও দুই একজন বদ্ধ মাতাল মদ খাইতে পারে; কিন্তু তাহা বলিয়া কি আইন তুলিয়া দিতে হইবে? মোকটা তৈয়ার করিলে আইন অনুসারে দণ্ড হয়; তাই বলিয়া এই আইন তুলিয়া দিবার কথা কেহ বলে না; অথবা আইনের প্রয়োজনীয়তাও কেহ অস্বীকার করে না। চুরি, ডাকাতি, খুন প্রভৃতি নিবারণের জন্য আইন আছে; তথাপি চুরি, ডাকাতি, খুন চলিতেছে, বন্ধ হয় নাই; সে জন্য আইন অবশ্য তুলিয়া দেওয়া যায় না। আইন অনেক আছে; অথচ প্রায় সকল আইনই একটু আধটু লঙ্ঘিত হয়। তা বলিয়া আইন তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। আইনের দ্বারা পাপ সম্পূর্ণরূপে নিবারিত না হউক, তাহার মাত্রা অনেকটা কম হয়; এবং সকল আইনের প্রধান উদ্দেশ্যও তাই। আইন সত্ত্বেও যদি অপরাধ সংঘটিত হয়, সে জন্য অপরাধীই দায়ী; এবং সে তাহার ফল ভোগ করে; এ জন্য আইন-কর্ত্তারা বা জাতি দায়ী নহেন, আইন রচনা করিয়া দিয়াই তাঁহারা দায়িত্বে খালাস পান।

আমেরিকায় আইনের দ্বারা মদ্য পান নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু লোকের মদ্যপান প্রবৃত্তি এখনও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। বদ্ধ মাতালেরা আইনের ভয়ে প্রকাশ্যে না হউক, গোপনে একটু আধটু মদ্যপান করিবে। এবং এইরূপ অবস্থা আরও কিছুদিন চলিবে। তবে মার্কিন দেশহিতৈষী, সমাজ-হিতৈষীরা আশা করিতেছেন, কালে এই ভাবটুকু শোধরাইয়া যাইবে। সাধারণ ভাবে মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়ায় ভবিষ্যদ্বংশীয়দের মধ্যে মদ্যপান প্রবৃত্তি আর আদৌ থাকিবে না। তা ছাড়া, যখন মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল না, তখন যেরূপ মাতলামির বাড়াবাড়ি দেখা যাইত, এখন তাহা অনেক কমিবেই; কারণ লোকে আর প্রকাশ্যভাবে মদ খাইতে সাহসই করিবে না; কাজেই তাহাদিগকে কমে দুঃখ হইতেই হইবে। আইনের ইহা প্রত্যক্ষ ফল, সন্দেহ নাই।

গর্ভিণীর খাদ্য।

গর্ভবতী স্ত্রীলোককে দুইটী প্রাণীর খোরাক যোগাইতে হয়,—তাহার নিজের ও তাহার গর্ভস্থ শিশুর। মানব-জীবনে যদি এমন কোন সময় আসে, যখন তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তবে তাহা স্ত্রীলোকদের গর্ভাবস্থার কাল। কথাটি অতি সোজা এবং অতি সত্য। ইহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় না; অন্ততঃ হওয়া ত উচিত নহে।

যখন আহার করিয়া একজন মানুষকে দুইজন মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে হয়, তখন কি করা কর্ত্তব্য? সে কি একলা দুইজনের খোরাক খাইবে? তাহা অবশ্য নয়; কারণ, সে একলা যাহা খাইতে পারিবে, তাহা ত তাহার নিজেরই খোরাক। এক-জন মানুষ কখনও দুইজন মানুষের খাদ্য খাইতে পারে না। অথচ, একজনকে খাদ্য গ্রহণ করিয়াই দুইজনের খাদ্যাভাব মিটাইতে হইতেছে! অতএব এক্ষেত্রে কর্ত্তব্য কি? সে কর্ত্তব্য হচ্চে, খুব পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা। সে খাদ্য এমন পুষ্টিকর হইবে, যাহাতে দুইজনের শরীর পোষিত হইতে পারে। অতএব, গর্ভিণী স্ত্রীলোককে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য প্রদান করিতে হইবে। এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য অর্থে রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্য নহে;—সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর উপাদান যে খাদ্যে খুব বেশী পরিমাণে আছে, তাহাই গর্ভিণীর খাদ্য। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, গর্ভিণীর নিজের এবং তাঁহার প্রিয়জনের অজ্ঞতা, উপেক্ষা, অবহেলা, অথবা অর্থাভাববশতঃ অনেক গর্ভিণী তাঁহাদের উপযুক্ত খাদ্য প্রাপ্ত হন না। চিকিৎসকগণ প্রায় দেখিতে পান যে, শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ মহিলা কেবল উপযুক্ত খাদ্যাভাবে যথোচিত ভাবে সন্তান পালনের উপযুক্ততা লাভ করিতে পারেন না। গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরা, এবং নব প্রসূতিরা যে প্রায়ই পীড়াক্রান্ত হইয়া থাকেন, তাহার কারণ প্রধানতঃ উপযুক্ত খাদ্যাভাব। পাঠক পাঠিকাগণ এই 'উপযুক্ত' কথাটির উপর একটু লক্ষ্য রাখিবেন। অনেকে হয় ত প্রচুর পরিমাণে খাদ্য ভোজন করিতে পারেন; ধনীগণের পরিবারভুক্তা মহিলারা হয় ত সাধারণের পক্ষে দুর্লভ খুব মূল্যবান, দুষ্প্রাপ্য, মুখরোচক খাদ্য ভক্ষণ করিতে পারেন; কিন্তু খাদ্যদ্রব্য পরিমাণে প্রচুর, মূল্যবান, মুখরোচক এবং দুষ্প্রাপ্য হইলেই যে গর্ভিণীর 'উপযুক্ত' খাদ্য হইবে, তাহা নহে। গর্ভিণীর 'উপযুক্ত' খাদ্য তাহাকেই বলিব, যদ্দ্বারা গর্ভিণীর এবং তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানের দেহের সম্যক প্রকারে পুষ্টিসাধন হয়; তা সে খাদ্য সুলভই হউক, সহজ লভ্যই হউক এবং পরিমাণে যতই অল্প হউক। সুতরাং ইহা হইতে বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে, গর্ভিণীদিগের অধিকাংশ পীড়াই নিবার্য্য ব্যাধি। স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থার কাল তাঁহাদের জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট, পবিত্রতম কাল; অথচ, এই সময়েই তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন। গোড়াতে একটু সাবধান হইলে, খাদ্যাখাদ্যের একটু তদ্বির করিলে অধিকাংশ ব্যাধি হইতেই তাঁহারা নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন।

সভ্যতার খাতিরে, ব্যবসা-বাণিজ্যের কল্যাণে, স্বভাবজাত খাদ্যের অপ্রাচুর্য্যবশতঃ, এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কারণে সভ্য মানব সমাজে অধুনা কৃত্রিম খাদ্যের ব্যবহার অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং বলা বাহুল্য, গর্ভবতী স্ত্রীলোকগণকেও জীবন ধারণের জন্য এই কৃত্রিম খাদ্যের উপরই বেশী পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু গর্ভস্থ ভ্রূণ জননীর ভুক্ত কৃত্রিম খাদ্য হইতে নিজের শরীর পোষণোপযোগী যথেষ্ট উপাদান পায় না। তাহার ফলে এই দাঁড়ায় যে, আগাছা যেমন মূল বৃক্ষ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া নিজে

বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মূল বৃক্ষকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিতে থাকে, ভ্রূণও তদ্রূপ মাতৃদেহের tissue-সমূহ হইতে নিজের শরীর পোষণের উপাদান সংগ্রহ করে। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের খাদ্য কৃত্রিমতাবর্জ্জিত, স্বাভাবিক বলিয়া, তাহারা যখন গর্ভধারণ করে, তখন তাহাদের গর্ভস্থ শাবক জননীর দেহকে উত্তেজিত ও সতেজ অবস্থায় রাখিবার পক্ষে সহায়তা করে। মানব-জননীর সম্বন্ধেও স্বাভাবিক ভাবে এইরূপই ঘটিবার কথা; কিন্তু মানব বুদ্ধিমান ও সভ্য জীব বলিয়া তাহার সমস্ত ব্যবস্থাই কৃত্রিম হওয়ায় মানবী গর্ভধারণ করিলে, ভ্রূণ-শরীর পোষণার্থ জননীর দেহের সারভাগ ব্যয়িত হওয়ায়, জননী দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; অবশেষে নানা ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। ভ্রূণ প্রথম প্রথম মাতার শরীর শোষণ করিয়া নিজে পুষ্ট হয় বটে, কিন্তু জননী দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়িলে, ভ্রূণেরও শরীর-পোষণোপযোগী পদার্থের ক্রমশঃ অভাব হওয়ায়, সেও অবশেষে দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। অতএব, এরূপ বিসদৃশ অবস্থার প্রতিকারের একমাত্র উপায়,—শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পরেও—অর্থাৎ যতদিন সে জননীর স্তন্য পান করিয়া থাকে ততদিন—জননীর পক্ষে খুব বেশী পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য নিতান্তই অপরিহার্য্য। যে খাদ্যে জননীর দেহের tissueগুলি পুষ্টিলাভ করিয়া সতেজ থাকিবে,—যে tissue হইতে ভ্রূণ তাহার খাদ্য সংগ্রহ করিবে—জননীর খাদ্য সেই tissue-পোষক খনিজ লবণ ও ভাইটামাইন-বহুল হওয়া একান্ত আবশ্যক। অপর সকল প্রকার খাদ্যকে গর্ভিণীর পক্ষে অনুপযুক্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। আর, এইরূপ খাদ্য না পাইলে গর্ভিণী ও ভ্রূণ উভয়েরই অনিষ্ট ঘটিবে।

গর্ভিণী ও ভ্রূণের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য নির্ব্বাচনে অনভিজ্ঞতা যেরূপ মারাত্মক ব্যাপার, এমন আর কিছুই নহে। কারণ, ইহাতে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। কেবল গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর খাদ্যের তদারক করিলে চলিবে না। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর জননীর খাদ্যের উত্তমরূপ ব্যবস্থা থাকা চাই। যতদিন শিশু মাতৃস্তন্য পান করিবে, ততদিন জননীকেও পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হইবে। গর্ভস্থ ভ্রূণ জননীর tissue হইতে যে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বর্দ্ধিত হয়, ভূমিষ্ঠ হইবার পর স্তন্য হইতেও সেই উপাদান গ্রহণ করিয়া শিশু জীবিত থাকে ও পরিপুষ্ট হয়। জননী সন্তানপালনার্থ দুগ্ধ প্রদান করিবে আর পুষ্টিকর খাদ্য পাইবে না, তাহা হইলে তাহার স্তনে দুগ্ধ জমিবে কোথা হইতে? যেখানে আয় নাই শুধু খরচ আছে, সেখানকার অবস্থা যেরূপ এক্ষেত্রেও তদ্রূপই অবস্থা ঘটিবে; তাহা ছাড়া আর কিছুই ঘটিতে পারে না।

কলিকাতার স্বাস্থ্য-বিবরণীতে দেখা যায়, নারীদের মধ্যে যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক। এবং এই রোগে স্ত্রীলোকেরাই অধিক সংখ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহা বিচিত্র নহে। পর্দ্দা ইহার ততটা কারণ না হউক, গর্ভাবস্থায় স্বাভাবিক খাদ্যের অভাব, এবং কৃত্রিম খাদ্যের বাহুল্যবশতঃ সন্তান প্রসব করিতে করিতে মহিলারা ক্রমশঃ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্তা হইয়া থাকেন। কারণ, প্রায়ই দেখা যায়, দুই তিনটি সন্তান প্রসব করিয়াছেন, এমন মহিলাদিগের মধ্যেই যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত অধিক। সন্তানের জননী হইতে গেলে নারী দেহকে কি যে কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। যে নারী যত অধিক সংখ্যক সন্তান প্রসব করে, সে তত বেশী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এইরূপে দুর্ব্বল হইতে হইতে তাহার রোগকে বাধা দিবার শক্তি ক্রমশঃ কমিয়া আসে। এরূপ অবস্থায় সহরের বদ্ধ হাওয়ায় বাস করিয়া নারীরাই যে বেশী পরিমাণে যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু ইহাতে আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই; এরূপ যক্ষ্মারোগ নিবার্য্য; গর্ভাবস্থায় এবং সন্তান পালন কালে মহিলাদিগকে উপযুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করিলে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা একেবারে কমিয়া যাইতে পারে।

আসল কথা এই—গর্ভস্থ ভ্রূণ মাতৃ-রক্ত হইতে

ক্যালসিয়ম সল্ট নামক খনিজ লবণ গ্রহণ করে। জননীর রক্তে এই পদার্থের অভাব ঘটিলে নবপ্রসূতিরা প্রায় যক্ষ্মা রোগে আক্রান্তা হইয়া থাকে। যাঁহারা সৌখিন খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্তা, সৌখিন খাদ্য না হইলে যাঁহাদের খাওয়াই হয় না, "মোটা ভাত" যাঁহাদের রসনার তৃপ্তি সাধন করিতে পারে না, তাঁহারাই প্রায় এইরূপে স্বাস্থ্য ধনে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। কারণ, সৌখীন খাদ্যে এই স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসটির একান্ত অভাব। তাহার উপর যাঁহাদের স্তনে দুগ্ধ উৎপাদন করিয়া সন্তান পোষণার্থ সেই দুগ্ধ ব্যয় করিতে হয়, তাঁহাদের রক্তে স্বভাবতঃই ক্যালসিয়ম সল্টের অসদ্ভাব ঘটে। তাহার ফলে যক্ষ্মা বীজাণুর আবাসস্থলগুলির চূর্ণ সহযোগে কাঠিন্য প্রাপ্তি (calcification) ঘটে না; এদিকে যক্ষ্মা বীজাণুর জীবনের পক্ষে calcificationই প্রকৃতির সর্ব্বাপেক্ষা সোজা উপায়। কাজেই, স্বভাবকে তাহার কার্য্য সাধনে বাধা দিয়া নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারা হয়। এই রূপেই সন্তান প্রসবের পর প্রসূতির দেহ যক্ষ্মা বীজাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয়; এবং তাহার সন্তান সংখ্যা যতই বাড়িতে থাকে, যক্ষ্মা বীজাণুরও তদনুপাতে সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহাদের প্রায়ই তৃতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর মৃত্যু হইয়া থাকে।

সন্তান প্রসবের পর প্রসূতির দেহের যে রস-রক্ত ধাতু ক্ষয় হইয়া থাকে, ক্রমে ক্রমে তাহা পূরণ করিয়া লইতে হয়। এই ক্ষতি-পূরণ কার্য্য যতদিন ধরিয়া চলিতে থাকে, সেই সময়ের মধ্যে প্রসূতির খাদ্যে ঐরূপ লবণ, এবং স্বভাবজাত ভাইটামাইন নামক পদার্থের অসদ্ভাব বা অপ্রাচুর্য্য ঘটিলে, তাহার ক্ষতিপূরণ কার্য্যেই কেবল যে বিলম্ব ঘটিয়া থাকে, তাহা নহে; বরং রোগিনীর স্বাস্থ্যের অধিকতর ক্ষতি হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রসূতি যতটা সৌখিন খাদ্যের ভক্ত তাঁহার আরোগ্যলাভে তত বিলম্ব ঘটে। খুব বেশী রকম সৌখিন খাদ্যপ্রিয় হইলে তাঁহার উৎকট পীড়া জন্মিবারও সম্ভাবনা। বহু পরীক্ষার পর এই সত্যটি অবিসম্বাদিতরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

অন্ন আমাদের প্রধান খাদ্য। ধনী ও দরিদ্র ভেদে দুই প্রকারের অন্ন আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয়। দরিদ্রদের অন্নের নাম "মোটা ভাত", আর ধনী লোকেরা, এবং অবস্থার অতিরিক্ত হইলেও, ধনীদের অনুকরণে অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সরু চালের সাদা ধবধবে ভাত ভিন্ন খাইতে পারেন না। গরীব লোকেরা যে মোটা চাউল খায়, তাহা তত পালিস করা নহে। এই চাউলের দানার উপরে একটী সূক্ষ্ম আবরণ থাকে। এই আবরণটিতেই চাউলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান ভাইটামাইন ও লবণাদি থাকে। গরীব লোকেরা সুতরাং চাউলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ পাইয়া থাকে। কিন্তু ধনীদের ব্যবহৃত সরু, সাদা, মাজা চাউলে ঐ সূক্ষ্ম আবরণটি না থাকায়, তাঁহারা অন্নের সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর অংশ হইতে বঞ্চিত থাকেন। গরীবদের অপেক্ষা বেশী দাম দিয়া চাউল কিনিয়া খাইলেও তাঁহারা দেহকে একরূপ উপবাসী রাখেন বলিলেও হয়। অপর লোকের পক্ষে যাহাই হউক, গর্ভিণীদের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা যে অত্যন্ত ক্ষতিকর, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। আটার সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা চলে। গরীব লোকেরা যদি কখনও আটার রুটি খায়, তাহা হইলে যত কম দামের আটা বাজারে পাওয়া যায় তাহাই তাহারা সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই আটা তত পরিষ্কার নহে; অর্থাৎ ইহাতে কিছু ভুসি সূক্ষ্ম চূর্ণের আকারে মিশ্রিত থাকে। এই আটার রুটী প্রায় লালচে রঙের হয়। কিন্তু ইহাতে যতটা পুষ্টিকর পদার্থ থাকে, ধনী লোকের ব্যবহার্য্য পয়লা নম্বরের সাদা ধবধবে আটা ততটা পুষ্টিকর নহে। যাঁতায় ভাঙ্গা আটা, কিম্বা আজ কাল সহরের স্থানে স্থানে এক একটী ক্ষুদ্র ঘরে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে ছোট ছোট ময়দার কল চালাইয়া মাড়োয়ারীরা যে আটা প্রস্তুত করে, তাহা তত সূক্ষ্ম বা সাদা ধবধবে না হইলেও খুব পুষ্টিকর (অবশ্য, যদি তাহাতে ভেজাল মিশ্রিত না থাকে! কারণ, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত করিতে মাড়োয়ারীরা আজকাল অদ্বিতীয়!)। কিন্তু ধনী সম্প্রদায়ের ব্যবহার্য্য

সূক্ষ্ম সৌখিন [illegible] সকল গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া প্রায় সর্ব্বত্রই সমান ফল
তাহাকে [illegible] • প্রাপ্ত হইয়াছেন।
অভ্যাস [illegible] এই সকল বিবেচনা করিবার পর প্রশ্ন এই দাঁড়াইতেছে
[illegible] কোন্ কোন্ খাদ্য গর্ভিণী ও প্রসূতির পক্ষে প্রশস্ত।
[illegible] আমরা একে একে তাহার উল্লেখ করিতেছি। এক
[illegible] খাদ্যের মধ্যে প্রথম ও প্রধান খাদ্য দুগ্ধ। ইহাতে উহা
[illegible] খাদ্যের সকল প্রকার উপাদান প্রয়োজনীয় অনুপাতে
[illegible] বর্ত্তমান আছে। তার পর, শাক শব্জি, তরকারী, ফলমূল
[illegible] বিশেষতঃ কমলা লেবুর রস। সকাল বেলায় খালি
[illegible] পেটে এক গ্লাস মিষ্ট কমলা লেবুর রস গর্ভিণী
[illegible] জননীদের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য।

তার পর, গর্ভিণীদের প্রায় নানাপ্রকার খাদ্য খাইতে
'সাধ' যায়। এই 'সাধ' কেবল কৌতূহলের ফল বলিয়া
কেহ যেন মনে না করেন। প্রকৃতি দেবীই গর্ভিণীর
হৃদয়ে এইরূপ 'সাধে'র সৃষ্টি করিয়া থাকেন। গর্ভিণীর
যে সকল জিনিস খাইতে 'সাধ' যায়, সেগুলি তাঁহার
দেহ রক্ষার্থ, গর্ভস্থ সন্তানের পুষ্টিসাধনার্থ অবশ্য প্রয়োজনীয়
বলিয়া মনে করিতে হইবে। সুতরাং গর্ভিণীর অনিষ্ট
হইবে মনে করিয়া তাঁহাদিগকে এই সকল খাদ্য হইতে
বঞ্চিত রাখা ঠিক নয়; বরং যথাসম্ভব তাঁহাদের এই সকল
'সাধ' পূরণ করিবার ব্যবস্থা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

গর্ভিণী ও নবপ্রসূতির খাদ্য।

গর্ভিণী ও নবপ্রসূতির প্রধান খাদ্য হওয়া উচিত। তাহা না হইলে গর্ভিণী বা নবপ্রসূত সন্তানের স্বাস্থ্যের বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। গর্ভিণীর রক্ত ও হাড়গুলির দৈর্ঘ্য অধিকাংশ বাড়িয়া যায়। এই সময় শরীরের রক্ত নির্ব্বাচন কালে এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। Wellman, Little, Lumb, Foster Gourand, Starling প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনুষ্যদেহে এবং অশ্ব, গো, মূষিক, হনুমান, পক্ষী প্রভৃতি জীবজন্তুর দেহে খাদ্যের এই

যে খাদ্যে রুচি না হইবে, তাহা যত ভাল
যত মূল্যবান খাদ্যই হউক না কেন, কখনই খাইবেন

যাহা হজম করিতে পারিবেন না বলিয়া বুঝিবে
তাহা কখনও খাইবেন না।

আকণ্ঠ ভোজন করিবেন না। কম খাইলে
না শরীর অসুস্থ হয়, বেশী খাইলে শরীর তদপেক্ষা
অনেক বেশী অসুস্থ হয়।

শ্রীহট্ট জিলার কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়।

পরিমাণ	লোক সংখ্যা				প্রতি হাজারে শিক্ষিত		কুষ্ঠ নিবাস	অন্ধ বিদ্যালয়	মূকবধির বিদ্যালয়	আতুর আশ্রম	পাগলা গারদ	নৈশ বিদ্যালয়	শিল্প বিদ্যালয়	বয়ন বিদ্যালয়	ডাক্তারি স্কুল	আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়	সার্ভে স্কুল	শিক্ষকের ট্রেনিং স্কুল	অনাথ আশ্রম
	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য	মোট	পুরুষ	স্ত্রী													
৫৪৪৩ বর্গমাইল	১০৯৮৯৫০	১৩৬৪৭৩৯	৮৯৮২	২৪৭২৬৭১	৯৮	৬	১	নাই	নাই	নাই	নাই	১	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	১

শ্রীহট্টের সবডিভিসনগুলি সম্বন্ধে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয়।

সবডিভিসনের নাম।	থানা ও আউট পোষ্ট	গ্রাম	ডাক্তারখানা	সমবায় সমিতি ভাণ্ডার	প্রতি বর্গমাইলে লোক সংখ্যা	পরিমাণ (বর্গমাইল)
উত্তর শ্রীহট্ট ...	৯	২৪৭০	১১	৫০	৫০৬	৮৬৪
দক্ষিণ শ্রীহট্ট ...	৫	১৬৪৩	১০	৩৩	৪৭৫	১০৬৪
হবিগঞ্জ ...	৭	২৫২৫	৮	৩	৬০৪	৯৯৯
করিমগঞ্জ ...	৪	১৫৬৫	১২	২৬	৪৩৪	১০৬৬
সুনামগঞ্জ	৬	২৫৭৩	৮	১	৩৩৫	১৪৫০

গত পাঁচ বৎসরের কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয়।

সন	কত বর্গমাইলে এক চিকিৎসালয়	গড়ে কত লোকের জন্য এক চিকিৎসালয়	প্রত্যেক রোগীর জন্য ঔষধের ব্যয়	প্রত্যেক রোগীর জন্য মোট ব্যয়
১৯১৪ইং	১০০	৪৫৭৯০	৭½ পাই	৵২½ পাই
১৯১৫ইং	১১১	৫০৪৬২	৯ পাই	৵০ আনা
১৯১৬ইং	১১১	৫০৪৬২	৯ পাই	।০ আনা
১৯১৭ইং	১১১	৫০৪৬২	৮½ পাই	৵৩½ পাই
১৯১৮ইং	১১১	৫০৪৬২	৯৩ পাই	৵১ পাই

উপরের লিখিত তালিকা হইতে ঐ জিলার শোচনীয় অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ২৪৭২৬৭১ জন অধিবাসীর মধ্যে অন্ধ, মূক, বধির, আতুর ও পাগলদিগের জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা নাই। অবশ্য ইহা হইতে অনুমান করা যায় না যে, সে দেশে এই সমস্ত শ্রেণীর লোক নাই বা কম। বাস্তব পক্ষে অন্ধ, বধির

প্রভৃতি হতভাগ্যগণ অধিকাংশ স্থলে রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া দুর্ব্বিসহ জীবন যাপন করে। বঙ্গদেশে অন্ধ ও বধির লোকের সংখ্যা যেরূপ, তাহাতে প্রতি সহরে উহাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। ঐ সকল বিদ্যালয়ে তাহারা নিজের উপযোগী শিল্প ও বিদ্যা শিক্ষা করিয়া সমাজের হিতকর কার্য্যে যোগ দিতে পারে। সমস্ত বঙ্গদেশের মধ্যে একমাত্র কলিকাতায় ঐরূপ এক একটি স্কুল আছে। অপরাপর জেলার অন্ধ ও আতুরের কোনরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত নাই।

সমস্ত শ্রীহট্ট জেলার মধ্যে একটিও শিল্প বা বয়ন বিদ্যালয় নাই। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, তথাকার সাধারণ অধিবাসীগণ মজুরী দ্বারা দৈনন্দিন জীবন যাপন করে ও সাধারণ শিক্ষিত যুবকবৃন্দ কেরাণীগিরি ব্যতীত আর কোনও কার্য্যের সুবিধা করিতে পারে না। আসামের বেতের কার্য্য প্রসিদ্ধ;—তথাকার বেতের চেয়ার, ঝাঁপি, বাক্স প্রভৃতি দেখিলে সুন্দর কারুকার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উৎসাহের অভাবে ক্রমশঃ জনসাধারণ ঐ সমস্ত কায পরিত্যাগ করিতেছে। আমরা প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, ইহাকে লোকের নিকট আদৃত করিতে হইলে, প্রত্যেক জেলায় স্থানীয় শিল্পের চর্চ্চা করিতে হইবে। স্থানীয় শিল্পের চর্চ্চা ও উন্নতির জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত। আসামের এণ্ডি, মুগা ও রেশম প্রসিদ্ধ; কিন্তু তথায় একটিও বয়ন বিদ্যালয় নাই।

গত পাঁচ বৎসরের চিকিৎসালয়ের তালিকা দেখিলে তথাকার লোকের স্বাস্থ্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। ৫০০০০ লোকের জন্য একটি মাত্র বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা; ও প্রত্যেক রোগীর জন্য গড়ে মোট ৶১০ ব্যয় করা হয়। আবার ১৯১৫ হইতে ৪ বৎসর ঔষধালয়ের সংখ্যা আদৌ বৃদ্ধি করা হয় নাই। কিন্তু রোগের গতি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। সমস্ত শ্রীহট্ট জিলায় একটিও ডাক্তারি বা আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় নাই। পীড়া হইলে রোগীগণকে গ্রামের হাতুড়ে বৈদ্যের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। ইহার ফলে যাহা ঘটিতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু সমস্ত জিলায় ৩১টি থানা ও আউট পোষ্ট আছে। ঐ জেলায় কয়টি মদের বা তাড়ীর দোকান আছে, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। বোধ হয় উহার সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে।

ইহাই বঙ্গদেশের চিত্র। এই সহায়ে আমরা ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি। পৃথিবীর আর কোনও দেশে এইরূপ ব্যবস্থা আছে বলিয়া মনে হয় না। দেশের অধিবাসী ও কর্ত্তৃপক্ষের এ দিকে দৃষ্টি পড়িবে কি?

আমরা বঙ্গদেশের প্রতি জিলার এইরূপ তালিকা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। সহৃদয় পাঠকগণ যদি নিজ নিজ জেলার এইরূপ পরিচয় দিতে পারেন, তবে আমরা তাঁহাদের নিকটে কৃতজ্ঞ থাকিব। তাঁহারাও দেশের কল্যাণ সাধন করিবেন। এই তালিকার সহিত স্বীয় স্বীয় জিলায় কয়টি মদের বা তাড়ীর দোকান আছে ও প্রাথমিক এবং বালিকাবিদ্যালয়ের সংখ্যা কত, জানাইলে ভাল হয়।

নিম্নের তালিকা হইতে বিভিন্ন দেশের গড়পড়তা বার্ষিক আয় ও প্রতি ব্যক্তির শিক্ষার জন্য ব্যয় অনুমিত হইবে।

বিভিন্ন দেশে প্রতি বৎসর শিক্ষার জন্য বার্ষিক ব্যয়।

আমেরিকার যুক্ত প্রদেশ ১২৲। সুইজারলেণ্ড ১০৲। অষ্ট্রেলিয়া ৮৶। কানাডা ৭৷৶০। স্কটলণ্ড ৭৶১০। জার্ম্মেণী ৫৶০। আয়র্লণ্ড ৪৸৶০। ইংলণ্ড ৪৸১০। সুইডেন ৪৶০। বেলজিয়ম ৪৲। নরওয়ে ৩৬৶০। ফ্রান্স ৩৷৶০। অষ্ট্রীয়া ২৷৶১০। স্পেন ১৸৶০। ইটালী ১৶১০। সাইবেরিয়া ৸৶০০। জাপান ৸৶০। রুষিয়া ৶১০। ভারতবর্ষ ৶০।

বিভিন্ন দেশের গড়পড়তা প্রতি ব্যক্তির বার্ষিক আয়।

কানাডা ৭৫০৲। আমেরিকার যুক্ত প্রদেশ ৫৮৫৲। ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স ও আয়র্লণ্ড ৫৫৫৲। ফ্রান্স ৪১৭৲। অষ্ট্রেলেশী ৩৩৩৲। ভারতবর্ষ ৩০৲।

আদর্শ গ্রামে চাই (১) বিদ্যালয় (২) চিকিৎসালয় (৩) পানীয় জল (৪) গো গ্রাসের ভূমি (৫) সমবায় ঋণদান সমিতি (৬) সমবায় ভাণ্ডার (৭) ডাকঘর (৮) পল্লী-সমিতি। বাংলাদেশের কয়টা গ্রামে এই সমস্ত ব্যবস্থা আছে?

পল্লীস্বাস্থ্য।

জলবায়ু ও স্বাস্থ্য।—গত শুক্রবার এখানে ঝড় হইয়া গিয়াছে। অদ্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়াছে। যসন্তের প্রকোপ পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াছে। স্থানে স্থানে জ্বর দেখা দিয়াছে।

যশোহরের অন্যতম মহকুমা বনগ্রামে বসন্তও আছে, সঙ্গে সঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জাও আসিয়া জুটিয়াছে। বনগ্রামের সহযোগী পল্লীবার্ত্তায় প্রকাশ,—

"সম্প্রতি এ অঞ্চলে উত্তম রূপ বৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে চাষ কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। স্থানীয় স্বাস্থ্যের বিশেষ রূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে।

তবে, সঙ্গে সঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিকারের ব্যবস্থাও হইতেছে,—

বনগ্রাম ইউনিয়ন কমিটি কর্ত্তৃক কিছু পরিমাণ ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট আনান হইয়াছে। এই ট্যাবলেট সকলেরই ঘরে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। অসুখ হইলেই উহা খাইলে বিশেষ উপকার হইবে।

মফস্বলের স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে সহরবাসীরা উদাসীন এইরূপ অভিযোগ অনেকের মুখেই শুনিতে পাই। অভিযোগটা একেবারে মিথ্যা না হইতেও পারে; কিন্তু ক্রমে অবস্থা ফিরিতেছে,—সহরেও জাগরণের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। নব যুগের নূতন বাণী সকলেরই কর্ণে ধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাই সহরবাসীরা ঔদাসীন্য পরিহার করিয়া তাঁহাদের কলঙ্ক স্খালনে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদের মফস্বলবাসী ভ্রাতৃগণের স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্যোগ আয়োজনে ব্যাপৃত

শীঘ্রই নূতন শাসন ব্যবস্থা দেশে প্রবর্ত্তিত হইবে। নূতন ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাবর্গের প্রতিনিধিগণ নির্ব্বাচিত হইবেন। নির্ব্বাচনের নিয়মাবলী প্রস্তুত হইতেছে। ইতোমধ্যে অনেক স্থলে বহু নির্ব্বাচন প্রার্থী দাঁড়াইয়াছেন। তাহা লইয়া দেশময় আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছে। মফস্বলের সংবাদপত্রসমূহ এখন রাজনীতিক আন্দোলনে মাতিয়া উঠিতেছেন। সেই জন্য তাঁহাদের মধ্যে স্থানীয় স্বাস্থ্যের অবস্থার আলোচনার অবসর পাইতেছে না। এই কারণে এবার মফস্বলের সংবাদগুলিতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অভাব অভিযোগের সংবাদ কম পাইতেছি। তথাপি, ক্ষুদকুঁড়া যাহা পাইলাম, তাহাই সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

বসন্ত রোগের প্রকোপ এখনও সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই; কোন কোন স্থানে কিছু কিছু বসন্ত রোগ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। কুমিল্লার সহযোগী "ত্রিপুরা হিতৈষী" লিখিতেছেন,—

"সহরে বসন্ত—সহরে দুই এক স্থানে বসন্ত দেখা দিয়াছে। যাহাতে এই ভীষণ ব্যাধি সহরে বিস্তৃত হইতে না পারে এ নিমিত্ত এখন হইতেই বিশেষ প্রতীকার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। মিউনিসিপালিটী পূর্ব্বাহ্ণেই ইহার প্রতিষেধের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি না কি?

ডায়মনহারবারের স্বাস্থ্য ও আবহাওয়ার অবস্থা ভাল নয়। সহযোগী "ডায়মণ্ডহারবার-হিতৈষী" সংবাদ দিতেছেন,—

প্রভৃতি হতভাগ্যগণ অধিকাংশ স্থলে রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া দুর্ব্বিসহ জীবন যাপন করে। বঙ্গদেশে অন্ধ ও বধির লোকের সংখ্যা যেরূপ, তাহাতে প্রতি সহরে উহাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। ঐ সকল বিদ্যালয়ে তাহারা নিজের উপযোগী শিল্প ও বিদ্যা শিক্ষা করিয়া সমাজের হিতকর কার্য্যে যোগ দিতে পারে। সমস্ত বঙ্গদেশের মধ্যে একমাত্র কলিকাতায় ঐরূপ এক একটি স্কুল আছে। অপরাপর জেলার অন্ধ ও আতুরের কোনরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত নাই।

সমস্ত শ্রীহট্ট জেলার মধ্যে একটিও শিল্প বা বয়ন বিদ্যালয় নাই। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, তথাকার সাধারণ অধিবাসীগণ মজুরী দ্বারা দৈনন্দিন জীবন যাপন করে ও সাধারণ শিক্ষিত যুবকবৃন্দ কেরাণীগিরি ব্যতীত আর কোনও কার্য্যের সুবিধা করিতে পারে না। আসামের বেতের কার্য্য প্রসিদ্ধ;—তথাকার বেতের চেয়ার, ঝাঁপি, বাক্স প্রভৃতি দেখিলে সুন্দর কারুকার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উৎসাহের অভাবে ক্রমশঃ জনসাধারণ ঐ সমস্ত কায পরিত্যাগ করিতেছে। আমরা প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, ইহাকে লোকের নিকট আদৃত করিতে হইলে, প্রত্যেক জেলায় স্থানীয় শিল্পের চর্চ্চা করিতে হইবে। স্থানীয় শিল্পের চর্চ্চা ও উন্নতির জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত। আসামের এণ্ডি, মুগা ও রেশম প্রসিদ্ধ; কিন্তু তথায় একটিও বয়ন বিদ্যালয় নাই।

গত পাঁচ বৎসরের চিকিৎসালয়ের তালিকা দেখিলে তথাকার লোকের স্বাস্থ্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। ৫০০০০ লোকের জন্য একটি মাত্র বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা; ও প্রত্যেক রোগীর জন্য গড়ে মোট ৶১০ ব্যয় করা হয়। আবার ১৯১৫ হইতে ৪ বৎসর ঔষধালয়ের সংখ্যা আদৌ বৃদ্ধি করা হয় নাই। কিন্তু রোগের গতি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। সমস্ত শ্রীহট্ট জিলায় একটিও ডাক্তারি বা আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় নাই। পীড়া হইলে রোগীগণকে গ্রামের হাতুড়ে বৈদ্যের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। ইহার ফলে যাহা ঘটিতে পা তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু স জিলায় ৩১টি থানা ও আউট পোষ্ট আছে। ঐ কয়টি মদের বা তাড়ীর দোকান আছে, তাহা আ জানিতে পারি নাই। বোধ হয় উহার সংখ্যাও নি কম নহে।

ইহাই বঙ্গদেশের চিত্র। এই সহায়ে আ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি। পৃথি আর কোনও দেশে এইরূপ ব্যবস্থা আছে বি মনে হয় না। দেশের অধিবাসী ও কর্ত্তৃপক্ষের দিকে দৃষ্টি পড়িবে কি?

আমরা বঙ্গদেশের প্রতি জিলার এইরূপ তা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। সহৃদয় পাঠ যদি নিজ নিজ জেলার এইরূপ পরিচয় পারেন, তবে আমরা তাঁহাদের নিকটে থাকিব। তাঁহারাও দেশের কল্যাণ সাধন করি এই তালিকার সহিত স্বীয় স্বীয় জিলায় মদের বা তাড়ীর দোকান আছে ও প্রাথমিক বালিকাবিদ্যালয়ের সংখ্যা কত, জানাইলে ভাল হয়।

নিম্নের তালিকা হইতে বিভিন্ন দেশের গড়প বার্ষিক আয় ও প্রতি ব্যক্তির শিক্ষার জন্য অনুমিত হইবে।

বিভিন্ন দেশে প্রতি বৎসর শিক্ষার জন্য বার্ষিক ব্যয়।

আমেরিকার যুক্ত প্রদেশ ১২৲। সুইজারলেণ্ড ১ অষ্ট্রেলিয়া ৮৶। কানাডা ৭৷৶০। স্কটলণ্ড ৭৶ জার্ম্মেণী ৫৶০। আয়র্লণ্ড ৪৸০। ইংলণ্ড ৪৸ সুইডেন ৪৶০। বেলজিয়ম ৪৲। নরওয়ে ৩৸ ফ্রান্স ৩৷৶০। অষ্ট্রীয়া ২৷৶১০। স্পেন ১৸ ইটালী ১৶১০। সাইবেরিয়া ৸৵০০। জাপান ৵ রুষিয়া ৶১০। ভারতবর্ষ ৵০।

বিভিন্ন দেশের গড়পড়তা প্রতি ব্যক্তির বার্ষিক আয়।

কানাডা ৭৫০৲। আমেরিকার যুক্ত প্রদেশ ৫৮৫৲। ও, ওয়েল্‌স ও আয়র্লণ্ড ৫৫৫৲। ফ্রান্স ৪১৭৲। পী ৩৩৩৲। ভারতবর্ষ ৩০৲।

আদর্শ গ্রামে চাই (১) বিদ্যালয় (২) চিকিৎসালয় (৩) পানীয় জল (৪) গো গ্রাসের ভূমি (৫) সমবায় ঋণদান সমিতি (৬) সমবায় ভাণ্ডার (৭) ডাকঘর (৮) পল্লী-সমিতি। বাংলাদেশের কয়টা গ্রামে এই সমস্ত ব্যবস্থা আছে?

পল্লীস্বাস্থ্য।

জলবায়ু ও স্বাস্থ্য।—গত শুক্রবার এখানে ঝড় হইয়া গিয়াছে। অদ্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়াছে। বসন্তের প্রকোপ পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াছে। স্থানে স্থানে জ্বর দেখা দিয়াছে।

যশোহরের অন্যতম মহকুমা বনগ্রামে বসন্তও আছে, সঙ্গে সঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জাও আসিয়া জুটিয়াছে। বনগ্রামের সহযোগী পল্লীবার্ত্তায় প্রকাশ,—

"সম্প্রতি এ অঞ্চলে উত্তম রূপ বৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে চাষ কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। স্থানীয় স্বাস্থ্যের বিশেষ রূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে।

তবে, সঙ্গে সঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিকারের ব্যবস্থাও হইতেছে,—

বনগ্রাম ইউনিয়ন কমিটি কর্ত্তৃক কিছু পরিমাণ ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট আনান হইয়াছে। এই ট্যাবলেট সকলেরই ঘরে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। অসুখ হইলেই উহা খাইলে বিশেষ উপকার হইবে।

মফস্বলের স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে সহরবাসীরা উদাসীন এইরূপ অভিযোগ অনেকের মুখেই শুনিতে পাই। অভিযোগটা একেবারে মিথ্যা না হইতেও পারে; কিন্তু ক্রমে অবস্থা ফিরিতেছে,—সহরেও জাগরণের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। নব যুগের নূতন বাণী সকলেরই কর্ণে ধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাই সহরবাসীরা ঔদাসীন্য পরিহার করিয়া তাঁহাদের কলঙ্ক স্খালনে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদের মফস্বলবাসী ভ্রাতৃগণের স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্যোগ আয়োজনে ব্যাপৃত

শীঘ্রই নূতন শাসন ব্যবস্থা দেশে প্রবর্ত্তিত হইবে। ত ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাবর্গের প্রতিনিধিগণ াচিত হইবেন। নির্ব্বাচনের নিয়মাবলী প্রস্তুত তেছে। ইতোমধ্যে অনেক স্থলে বহু নির্ব্বাচন প্রার্থী ইয়াছেন। তাহা লইয়া দেশময় আন্দোলন পড়িয়া ছে। মফস্বলের সংবাদপত্রসমূহ এখন রাজনীতিক ন্দোলনে মাতিয়া উঠিতেছেন। সেই জন্য তাঁহাদের ন স্থানীয় স্বাস্থ্যের অবস্থার আলোচনার অবসর তেছে না। এই কারণে এবার মফস্বলের সংবাদগুলিতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অভাব অভিযোগের সংবাদ পাইতেছি। তথাপি, ক্ষুদকুঁড়া যাহা পাইলাম, তাহাই গ্রহ করিয়া দিলাম।

বসন্ত রোগের প্রকোপ এখনও সম্পূর্ণরূপে দূর হয় ; কোন কোন স্থানে কিছু কিছু বসন্ত রোগ এখনও ান রহিয়াছে। কুমিল্লার সহযোগী "ত্রিপুরা হিতৈষী" খিতেছেন,—

সহরে বসন্ত—সহরে দুই এক স্থানে বসন্ত দেখা দিয়াছে। তে এই ভীষণ ব্যাধি সহরে বিস্তৃত হইতে না পারে এ ন্য এখন হইতেই বিশেষ প্রতীকার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। নিসিপালিটী পূর্ব্বাহ্ণেই ইহার প্রতিষেধের ব্যবস্থা করিবেন আমরা আশা করিতে পারি না কি?

ডায়মনহারবারের স্বাস্থ্য ও আবহাওয়ার অবস্থা ন নয়। সহযোগী "ডায়মণ্ডহারবার-হিতৈষী" সংবাদ খিতেছেন,—

হইয়াছেন। কলিকাতার সহযোগী "নায়কে" এইরূপ একটী শুভ বার্ত্তা ঘোষিত হইয়াছে—

বঙ্গীয় স্বাস্থ্য রক্ষার বৈঠক।

বিগত ২০শে মার্চ্চ ৪ ঘটিকার সময় ভারত সভাগৃহে নিম্নলিখিত শক্তি সম্পন্ন সমিতি কয়েকটীর উদ্যোগে লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর সভাপতিত্বে বঙ্গের পল্লীগ্রাম সমূহের ম্যালেরিয়া প্রতিকার কল্পে এক সভা হইয়াছিল।

উদ্যোক্তা।

১। ভারত সভা।
২। বেঙ্গল ন্যাশান্যাল চেম্বার অব কমার্স
৩। বঙ্গীয় মহাজন সভা।
৪। বেঙ্গল ন্যাশান্যাল লিগ।
৫। মারোয়ারি সভা।
৬। সেন্ট্রাল মুসলমান সভা।

সভা কলিকাতার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় অনেক গণ্য মান্য সুধীমণ্ডলী কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান স্বাস্থ্যের ক্রমান্বয়ে যেরূপ অবনতি হইতেছে, বাঙ্গালীর জন্মের হার হ্রাস হইয়া ক্রমান্বয় মৃত্যু সংখ্যা যেরূপভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে বর্ত্তমানের এইরূপ বৈঠকের প্রয়োজন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই অনুধাবন করিবেন। সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে নিম্ন লিখিত প্রস্তাব ৩টি সভায় গৃহীত হয়।

১ম। বঙ্গদেশে বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যেরূপভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে অগৌণে সর্ব্বসাধারণের সমবায়ে ম্যালেরিয়া নিবারণ সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান কল্পে বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে হইবে।

২। বর্ত্তমান বৈঠক কলিকাতা মহানগরীতে ম্যালেরিয়া নিবারণ সমিতির একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য মিউনিসিপ্যাল কমিশনরগণ এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের সহায়তা গ্রহণ করিবেন।

(ক) সহরের প্রত্যেক বিভাগের অধিবাসীদের মধ্যে বর্ত্তমান সমস্যার গুরুত্ব এবং ইহা প্রতিবিধান কল্পে যথার্থ উপায় নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা হইবে।

(খ) ম্যালেরিয়া নিবারণ সমিতির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সহরের প্রত্যেক বিভাগ হইতে এককালীন সহস্র টাকা এবং মাসিক অন্ততঃ পক্ষে ২৫৲ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে।

৩। বর্ত্তমান বৈঠক বঙ্গদেশের প্রত্যেক জিলা মহকুমা এবং গ্রাম সমূহের সভা সমিতিতে উক্ত সমস্যার সমাধানকল্পে পল্লী অঞ্চলের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে যথার্থ উপায় নির্দ্ধারণের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছেন। বঙ্গের শান্তিপূর্ণ পল্লী সমূহে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ক্রমশঃ যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে বাঙ্গালী জাতির সমবেত শক্তি একত্রিত করিয়া ইহাকে সমূলে উৎপাটিত করিতে না পারিলে অচিরে বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব ধরা পৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইবে। মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র সি-আই-ই মহোদয় এবং রায় বাহাদুর ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান কল্পে যেরূপ অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে বাঙ্গালী জাতির গভীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন ভগবান তাঁহাদের এই সাধু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করুন ইহা আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। বলা বাহুল্য বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করিতে হইলে অন্ন, বস্ত্র, প্রাথমিক শিক্ষা প্রভৃতির সমাধান করিতে হইবে। বর্ত্তমান স্যানিটারি কমিশনার ডাক্তার বেণ্টলি এবং স্যানিটারি বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার সদস্যগণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে যক্ষ্মা জন্মের হার হ্রাস পাওয়ার কারণ নরনারী বৃন্দের শারীরিক দুর্ব্বলতা ও জীবন রক্ষার নিতান্ত প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব। মৃত্যুর হার বর্দ্ধিত হওয়ার কারণ অনাহার অর্দ্ধাহার। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গাত্রাবরণ বস্ত্রাদির অভাব ও তাহা ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক আরাম বিরামের সম্পূর্ণ অভাব। সুতরাং অন্ন বস্ত্র সমস্যার সমাধান ভিন্ন বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান সম্পূর্ণ অসম্ভব। বলা বাহুল্য প্রাথমিক শিক্ষা সাধারণের মধ্যে বিস্তারিত না হইলে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইবে না।

ব্যাধিগুলি যেন পরামর্শ করিয়া পালা করিয়া বাঙ্গলার পল্লীভূমি বিধ্বস্ত করিতেছে। এক এক রোগের প্রকোপ হ্রাস হইতে না হইতে অপর এক রোগ প্রবল ভাবে দেখা দিতেছে। এতদিন বসন্তের পালা গেল; সঙ্গে সঙ্গে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার পালা আসিল। দেশের লোকেও পালাই পালাই ডাক ছাড়িতেছে। সহযোগী "ঢাকা প্রকাশ" লিখিয়াছেন,—

কুমিল্লায় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা।—

কুমিল্লা সহরে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। গত এক সপ্তাহে এই রোগে ৮জন লোক মারা গিয়াছে। কোন কোন বাসায় সমস্ত লোকই এই ব্যাধিতে শয্যাগত হইয়াছেন।

শিক্ষার অভাবে যে কত না অনিষ্ট হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কার্ব্বনিক এসিড [illegible]

কি রকম মারাত্মক বিষ তাহা অনেকে জানেন বটে, কিন্তু অসংখ্য লোক তাহা জানেও না। সেই জন্য মধ্যে মধ্যে এই বিষে প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায়। সহযোগিনী "সম্মিলনী" এ রূপ একটী সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন,—

এক ঘরে আটটি মরা।—দ্বারভাঙ্গা জেলার মারতুল বাজার নামক স্থানে খুবলাল রাউতের বাড়ীতে একদিন ছয়টী স্ত্রীলোক দুইটী বালক একঘরে নিদ্রা যাইতেছিল। তাহারা ঘরে আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল, সকাল বেলা দেখা গেল আট জনের প্রাণহীন দেহ ঘরের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। ঘরে আগুন জ্বালাইয়া নিদ্রা যাইলে প্রায়ই এইরূপ হইয়া থাকে, ইহা বোধ হয় বেচারিদের জানা ছিল না।।

মেদিনীপুর, কাঁথির সহযোগী "নীহার" এবার বসন্তের ভীষণ প্রকোপের সংবাদ পত্রস্থ করিয়াছেন,—

বসন্তের প্রকোপ—কাঁথি সহরের উপর ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী [illegible]য়া, খাগড়াবনী ও ভগবানপুর প্রভৃতি গ্রামে সম্প্রতি বসন্তের [illegible]ণ প্রকোপ চলিয়াছে। বহুলোকে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত [illegible]য়া শয্যাগত রহিয়াছে এবং অনেকে মারা যাইতেছে। [illegible]তিমধ্যে ঐ সকল স্থানে অনেকগুলি লোক বসন্তে আক্রান্ত [illegible]য়া প্রাণ হারাইয়াছে এবং উহাতে লোকে মারা যাইতেছে। [illegible]ন্ত এরূপ মারাত্মকভাবে সংক্রামিত হওয়ায় পল্লীবাসীদের [illegible]ধ্যে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে।

আমরা পুনঃপুনঃ প্রকাশ করিয়া আসিতেছি যে টীকা লওয়ার [illegible]কারিতার বিষয় বুঝিতে পারায় এবং কাঁথি ইউনিয়ন কমিটী [illegible]তে সর্ব্বসাধারণকে বিনামূল্যে টীকা দিবার ব্যবস্থা হওয়ায় [illegible]লে টীকা লইবার জন্য এতদূর আগ্রহান্বিত হইয়াছে যে কমিটীর [illegible]ক্ত টীকাদার অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াও সকলকে টীকা [illegible]য়া উঠিতে পারিতেছেন না। কমিটী একজন টীকাদার নিযুক্ত [illegible]রিয়াছেন, তাঁহাকেই গ্রামে গ্রামে গিয়া টীকা দিতে হইতেছে। [illegible]রূপ ব্যবস্থায় এখন এখানে বহুলোকেরই টীকা হইয়া যাইতেছে [illegible]ট কিন্তু সর্ব্বত্রই যাহাতে এখন বিনামূল্যে সকলের টীকা [illegible]র ব্যবস্থা হয়, তাহার উপায় বিধান করিবার জন্য আমরা [illegible]মাদের জেলা-বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

গত ডিসেম্বর মাসে রাজসাহী সহরের স্বাস্থ্যের [illegible]বস্থা "হিন্দু রঞ্জিকা" হইতে জানা যাইতেছে —

রাজসাহী টাউনের লোক সংখ্যা ২৩৪০৬; তন্মধ্যে ১৩০৫৭ [illegible]ন পুরুষ ১০৩৪৯ জন স্ত্রীলোক। গত ডিসেম্বর মাসে ৪০ জন জ্বরে, ৪ জন কলেরা ও আমাশায়, এবং অন্যান্য কারণে ৯ জন একুনে ৫৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৫ জন পুরুষ ২৮ জন স্ত্রীলোক। পূর্ব্ব বৎসর ঐ মাসে ১২৮ জনের মৃত্যু হইয়াছিল; তন্মধ্যে ৬১ জন পুরুষ, ৬৭ জন স্ত্রী।

স্বাস্থ্যের বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে "হিন্দু রঞ্জিকা" স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থার কথাও প্রকাশ করিয়াছেন—

নওগাঁও টাউনে এক্ষণে যে স্থানে সরকারী ডাক্তারখানা আছে তথা হইতে উক্ত ডাক্তারখানা স্থানান্তরিত করিয়া নওগাঁ টাউনের উত্তরে মাইল খানেক ব্যবধানে বাঙ্গা বাড়ীতে স্থাপিত করা হইবে।

আবার

নওগাঁ টাউনের সন্নিকটে কীর্ত্তিপুরে একটি ডাক্তারখানা স্থাপিত হইতেছে। উক্ত ডাক্তারখানার জন্য পাকা বাড়ী প্রস্তুত হইবার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। নওগাঁ গাঁজা মহালের কৃষকদিগের কো-অপারাটিভ ক্রেডিট সোসাইটি হইতে ১০০০০ টাকা সাহায্য করা হইবে।

আমরা গত মাসে এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মাসে আভাষ দিয়াছিলাম যে, প্রতি বৎসর শীতের শেষে, এমন কি সময়ে সময়ে স্থল বিশেষে পূজার পরেই বাঙ্গলার পল্লীসমূহ হইতে জলকষ্টের নিদারুণ আর্ত্তনাদ উঠিতে আরম্ভ হয়। এখন হইতে আমাদিগকে পল্লীস্বাস্থ্যের অন্যান্য সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে জলকষ্টের সংবাদও পত্রস্থ করিতে হইবে। কারণ, অধিকাংশ রোগই বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব বশতঃ উৎপন্ন ও বিস্তৃত হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় জলাভাবজনিত আর্ত্তনাদ শুনিতে শুনিতে আমাদের কাণ ঝালাপালা হইয়া গেল। এখন পল্লীস্বাস্থ্যোন্নতির দিকে দেশের লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে; স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনের জন্য যে সকল ব্যবস্থা হইবে, তাহার সহিত জলাভাব দূর করিবারও যেন ব্যবস্থা হয়; নচেৎ অধিকাংশ ব্যবস্থাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সে যাহাই হউক, এখন হিন্দুরঞ্জিকা জলাভাবের উল্লেখ করিয়া একটী অভিযোগমূলক প্রবন্ধ পত্রস্থ করিয়াছেন। সে দীর্ঘ প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিবার স্থান আমাদের নাই। আমরা কেবল দুই একটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া প্রকৃত অবস্থাটা পাঠক-

পাঠিকা গণকে দেখাইয়া দিতে চাই। সহযোগী প্রবন্ধের একস্থলে লিখিয়াছেন—

নাটোর মহকুমার অন্তর্গত কোন গ্রামের জনৈক ভদ্রলোক তাঁহার বহুকালের পুষ্করিণীটি নিজে সংস্কার করিতে অক্ষম হইয়া এবং গ্রামে ভাল পানীয় জল না থাকায় উক্ত পুষ্করিণী জেলা বোর্ডকে দান করিতে চাহিয়াছিলেন। তদুত্তরে জেলা বোর্ড তাঁহাকে নাটোরের লোকাল বোর্ডের সহিত এ বিষয়ে লেখাপড়া করিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু পাঠকগণ শুনিলে বিস্মিত হইবেন যে, লোকাল বোর্ড উক্ত গ্রামের জল কষ্টের অস্তিত্বের কথাই একেবারেই অস্বীকার করেন। নাই বলিলে যখন সাপের বিষ থাকে না, তখন সে গ্রামের যে জলকষ্ট নাই, তাহা এইরূপে প্রমাণ হইয়া গেল। অতএব উক্ত পল্লীর দুর্ভাগ্য অধিবাসীগণের মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হওয়া ভিন্ন আর কি উপায় আছে?

কিন্তু, এই জলকষ্টের অভিযোগ ত আর শোনা যায় না। বাঙ্গলা দেশের লোকের এতই কি দুর্ভাগ্য যে, তাহারা এমন নদীমাতৃক দেশের অধিবাসী হইয়াও চিরকাল জলকষ্ট ভোগ করিবে, এবং ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে প্রাণ হারাইবে? ইহাতে তাহাদের দোষ নয়; তাহারা ত রীতিমত ট্যাক্স আদায় দিয়া থাকে। এবং ইহা গবর্ণমেণ্টেরও ত দোষ নয়; তাঁহারা জলকষ্ট নিবারণের জন্য যথেষ্ট অর্থ মঞ্জুর করিতেছেন! তবে কাহার দোষে প্রজা কষ্ট পায়? হিন্দুরঞ্জিকার ঐ প্রবন্ধের অপর এক অংশ হইতে পাঠকেরা তাহার পরিচয় পাইবেন—

এখন এই শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী কে? কাহার দোষে রাজসাহীর পল্লীসমূহ শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। গ্রামের জমিদারগণ অনেকটা দায়ী হইলেও আমরা জেলা বোর্ডকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়ী বলিয়া মনে করি। কোন পল্লী হইতে জল কষ্টের জন্য যদি অভিযোগ করা হয়, তবে তাঁহারা তাহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত হয়েন।

আবার—

সদাশয় গভর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর আমাদের জল কষ্ট প্রভৃতি নিবারণ কল্পে বহু অর্থ বাজেট করিয়া যাহাতে সদ্ভাবে ব্যয় হয় তজ্জন্য ঐ সমুদয় অর্থ আমাদের সুশিক্ষিত ভ্রাতৃবৃন্দের হস্তে অর্পণ করিয়া থাকেন অথচ এত সুযোগ সত্ত্বেও কেহ এক মাইল কেহ দুই মাইল দূরে অবস্থিত নদনদী হইতে জল আনাইয়া কোনরূপে নিজেরা মরুভূমির পথিক ন্যায় কার্পণ্য করিয়া জীবনধারণ করিতেছি।

জেলা মেদিনীপুর কাঁথি মহকুমায় প্রবল ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগ দেখা দিয়াছে। কাঁথির সহযোগী নীহারিকা অভিযোগ করিতেছেন যে,—

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ—দারিয়াপুর হইতে শ্রীযুক্ত শিবনাথ বাগুলি লিখিয়াছেন—দারিয়াপুর, দৌলতপুর বামুনিয়া, গোপীনাথ ও পার্শ্ববর্ত্তী আরও ৮।১০ খানি গ্রামে কিছু দিন হইল ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা এমন প্রকোপ চলিয়াছে যে অনেক গৃহে রোগীর ঔষধ ও যোগাইবার লোক পর্য্যন্ত মিলিতেছে না। এই গ্রামের পাঁচ শত লোক শয্যাগত রহিয়াছে এবং ৩০।৩২ জন গিয়াছে। চিকিৎসা করাইবার জন্য এখন লোকে চিকিৎসক খুঁজিয়া পাইতেছে না। এ অবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষ এ অঞ্চলে ডাক্তার প্রেরণ করিলে গরীব দুঃখী সাধারণের উপকার আশা করা যায়।

এদিকে বসন্তও সমভাবেই আছে—

বসন্তের টীকা—এতদঞ্চলের সহর ও মফস্বলে এবার বসন্তের সংক্রামক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বহুলোক আক্রান্ত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি যে, কাঁথি ইউনিয়ন কমিটীর কর্ত্তৃপক্ষ বিনামূল্যে সকলকে দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া অতি উত্তম কার্য্যই করিয়াছেন।

কিন্তু বিনামূল্যে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে হইবে? পল্লীবাসীর অশিক্ষিত অবস্থা এই ব্যবস্থা ফলপ্রদ হইবার পক্ষে প্রধান অন্তরায়। তাহার প্রমাণ

আমরা শুনিতে পাইতেছি যে কোন কোন গৃহস্থ বাড়ীতে লওয়ার উপযোগী বালক বালিকা রহিয়াছে। অথচ বিনা সকলের টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও তাহারা টীকা করাইয়া লইতে রাজী হইতেছে না।

কাঁথির ন্যায় ঢাকা সহরেও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা দিয়াছে। সহযোগী "ঢাকা প্রকাশে" প্রকাশ—

সহরে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগ দেখা দিয়াছে। কোন কোন এই ব্যাধির বিস্তৃতি খুবই বেশী। ঐ সকল পল্লীতে পরিবারের প্রায় সমস্ত লোকেই এই রোগে শয্যাশায়ী হয়। কোন কোন পল্লী হইতে জলবসন্তের সংবাদও পাওয়া গিয়াছে।

আলোচনা

বাঙ্গালার বাজেটে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা।—

বাঙ্গালা দেশের স্বাস্থ্যরক্ষা-কল্পে সরকার হইতে বার্ষিক যে ব্যয়ের বরাদ্ধ আছে, এবারকার বাজেটে তদতিরিক্ত আরও কিছু অতিরিক্ত ব্যয়—চিকিৎসা বিভাগে পৌনে দুই লক্ষ, এবং স্বাস্থ্য বিভাগে সওয়া লক্ষ—ধরা হইয়াছে। এই অতিরিক্ত অর্থে কতকগুলি নূতন ডিস্‌পেনসারী খোলা হইবে, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ নিবারণের জন্য অস্থায়ীভাবে কতকগুলি বিশেষ চিকিৎসকগণকে নিযুক্ত করিতে হইবে, বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে,—যুদ্ধের দরুণ ঔষধাদির মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে।—সেই অতিরিক্ত ব্যয় বাড়াইয়া লইতে হইবে, এবং সাধারণভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কলিকাতার উপকণ্ঠে ম্যালেরিয়া নিবারণ।—

বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় বাজেট বিতর্ক উপলক্ষে মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাদুর প্রস্তাব করেন যে কুইনাইন বিতরণের জন্য নির্দ্ধারিত ১০০০০০ টাকার মধ্য হইতে ২৫০০০ টাকা স্বতন্ত্র করিয়া কলিকাতার চারিদিকের ভূমি ম্যালেরিয়া-শূন্য করিবার উদ্দেশ্যে জরীপের ব্যবস্থা হউক। কলিকাতার উপকণ্ঠ-স্থলি ম্যালেরিয়া-মুক্ত হইলে সহরের লোকে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে, সহরের ঘন বসতির কতকটা প্রতিকার হইবে; বাড়ীভাড়া সমস্যারও সমাধান হইতে পারিবে। মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র সি-আই-ই প্রস্তাবটির সমর্থন এবং মাননীয় মৌলবী আবুল কাসেম ইহার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বলেন, এবার কুইনাইন বিতরণের জন্য যথেষ্ট বন্দোবস্ত করা হইয়াছে; অতএব প্রস্তাবটি রদ করা যাইতে পারে। তদনুসারে রায় বাহাদুরের প্রস্তাবটি সভায় গৃহীত হয়।—

ধাত্রীদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা।—

বাঙ্গালার দাইদিগের শিক্ষাবিধানের জন্য সরকারী বাজেটে ৬৫০০ টাকা ব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাদুর এই টাকার পরিমাণ কিছু বাড়াইয়া দিয়া ১৫০০০ টাকা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; এবং এই ১৫০০০ টাকার ভিতর হইতে ১০০০০ টাকা বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির কয়েকটি প্রধান জেলার জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সরকারের নির্দ্ধারিত টাকার উপর যে ৮৫০০ অতিরিক্ত টাকার প্রস্তাব হইয়াছিল, ঐ টাকাটা মেডিক্যাল কলেজের ভৃত্যদিগের বাসা নির্ম্মাণ করিবার জন্য নির্দ্ধারিত ৩০০০০ টাকা হইতে কাটিয়া লইতে রায় বাহাদুর সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ প্রস্তাব টিঁকে নাই। মাননীয় সার হেনরী হুইলার বলিয়াছেন, ঐ ৬৫০০ টাকাতেই যথেষ্ট হইবে। অগত্যা রায়বাহাদুর তাঁহার প্রস্তাবটির প্রত্যাহার করেন।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য ও গবর্ণমেণ্ট।—

এবারকার বাজেটের ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে সরকার বাহাদুর দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে একটু বেশী মনোযোগী হইয়াছেন। অন্য অন্য বারের অপেক্ষা এবার স্বাস্থ্যবিভাগে যেমন কিছু বেশী অর্থব্যয়ের প্রস্তাব হইয়াছে, সেইরূপ, দুই একটী নূতন বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিবার কল্পনা হইয়াছে। বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে চারিটী লেবরেটরী স্থাপিত হইবে, এবং তথায় জল ও খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ হইবে। আপাততঃ ঢাকায় একটী লেবরেটরী স্থাপনের জন্য বর্ত্তমান বর্ষের বাজেটে অর্থ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পীতজ্বর (Yellow Fever) যদি আসে, তবে তাহার সহিত লড়ায়ের উদ্যোগ আয়োজন করিবার জন্য কিছু অর্থ স্বতন্ত্র করিয়া

রাখা হইবে। কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরে এজন্য চৌকি বসিবে। এই উদ্দেশ্যে ২০০০০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। আর শিশুমঙ্গল কমিটি গঠন জন্য ৩০০০০ ব্যয় ধরা হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালার স্বাস্থ্যরক্ষা কল্পে সাড়ে নয় লাখ টাকা প্রদান করিবেন। বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট তদতিরিক্ত আরও প্রায় আড়াই লাখ টাকা খরচ করিবেন।

বেরিবেরি ও ভেজাল সরিষার তৈল।—

গত ৫ই মার্চ্চ মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে হাবড়া সহরে বেরিবেরির আক্রমণ হইয়াছে কি না; যদি হইয়া থাকে, তবে তাহা নিবারণের কোন উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে কি না; এই রোগের কারণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ অনুসন্ধান করিয়াছেন কি না; সরিষার তৈলে পাকড়া মিশানো হয়, পাকড়ায় হাইড্রোসিয়ানিক য়্যাসিড থাকে—ঐ পাকড়া মিশ্রিত সরিষার তৈল ব্যবহার করিয়া লোকে বেরিবেরি দ্বারা আক্রান্ত হয় কি না, এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ অনুসন্ধান করিয়াছেন কি? ইত্যাদি। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মাননীয় মিঃ ওমালী জবাব দেন যে, আপাততঃ হাবড়ার বেরিবেরির আক্রমণ হয় নাই। তবে এপিডেমিক ড্রপ্‌সি রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বটে; এবং সম্ভবতঃ মাননীয় সদস্য মহাশয় তাহারই কথা বলিতেছেন। এপিডেমিক ড্রপ্‌সির প্রকৃত কারণ কি তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। ইহার কারণানুসন্ধানের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একজন জীবাণুতত্ত্ববিদ চাওয়া হইয়াছে। একজন ডেপুটী স্যানিটারী কমিশনার হাবড়ায় এপিডেমিক ড্রপ্‌সির কারণানুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন। মিউনিসিপ্যাল হেল্‌থ অফিসার মহাশয় খাদ্য দ্রব্যাদির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। যে সকল লোকের এই রোগ হইতেছে, তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদের চিকিৎসার জন্য চারিজন অতিরিক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করা হইয়াছে; কিন্তু ভেজাল সরিষার তৈলই ইহার কারণ কি না, সে সম্বন্ধে মতভেদ ঘটিতেছে। হাবড়ায় এখন যে সংক্রামক রোগ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহা বেরি বেরিই হউক বা এপিডেমিক ড্রাপ্‌সিই হউক এবং ভেজাল সরিষার তৈল তাহার কারণ হউক আর নাই হউক —ভেজাল সরিষার তৈল যে স্বাস্থ্যকর খাদ্য নহে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। ভেজাল সরিষার তৈল ব্যবহার করিয়া উদরাময় ও অন্যান্য রোগ ত যথেষ্টই হইতেছে, তথাপি, কই ভেজাল ত বন্ধ হইতেছে না! আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল নিবারণের জন্য কঠোরতর বন্দোবস্ত করা অতীব আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের প্রাণ, তথা, স্বাস্থ্য ছেলেখেলা নহে। যাহারা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত তাহারা নরহন্তার অপেক্ষা কম অপরাধী নহে। অথচ দেশের আইনে ভেজালের প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা নাই বলিলেই হয়। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

কুষ্ঠরোগীদের আইন।—

গত ১১ই মার্চ্চ তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সার উইলিয়ম ভিনসেণ্ট ১৮৯০ অব্দের কুষ্ঠরোগ সংক্রান্ত আইনের সংশোধন কল্পে একটী নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপন করেন। ভারতে কুষ্ঠ রোগের বিস্তৃতি নিবারণই এই সংশোধিত আইনের উদ্দেশ্য। তাহা করিতে হইলে কুষ্ঠরোগী মাত্রকেই স্বতন্ত্র (Segregate) করিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান আইনে কেবল নিরাশ্রয় কুষ্ঠ রোগীদিগকেই স্বতন্ত্রীকরণের ব্যবস্থা আছে। চিকিৎসকগণের মত এই যে, সকল অবস্থার কুষ্ঠ রোগই সংক্রামক। এই কারণে দরিদ্রনির্ব্বিশেষে কুষ্ঠরোগী মাত্রকেই স্বতন্ত্র করিবার জন্য নূতন আইনে ব্যবস্থা হইতেছে। কুষ্ঠরোগী সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে একবার প্রকাশ করিয়াছি। প্রস্তাবিত আইনের আমরা সমর্থন করিতেছি। কিন্তু ভদ্র, সম্ভ্রান্ত, সম্প্রদায়-ভুক্ত কুষ্ঠ রোগীদের স্বতন্ত্র করিবার সময় তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনের মনে যাহাতে আঘাত না লাগে আইনে যেন এরূপ ব্যবস্থা থাকে। আমাদের প্রার্থনা।

যুক্ত প্রদেশের জেলালোর্ড।—

যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট একটী রেজোলিউসনের দ্বারা করিয়া তত্রত্য জেলাবোর্ডগুলির অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন। গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পাবলিক হেল্‌থ বোর্ড হইতে জেলা বোর্ড সকলকে যে অর্থ সাহায্য করা হয়, বোর্ড তাহা খরচ করিবার সুবিধা পান না, সে টাকা তহবিলে জমিতেছে; এদিকে দেশের লোক নানা রোগে পটাপট মরিতেছে। পাবলিক হেল্‌থ বোর্ড সেই টাকা কিরূপে খরচ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে বহুবার উপদেশ দিয়াছেন; তথাপি, সে উপদেশ বোর্ড গ্রাহ্য করেন নাই। যুক্ত প্রদেশের ছোটলাট বাহাদুর সেজন্য বলিয়াছেন যে, ১৯১৯ অব্দের ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সে বৎসরে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে যুক্ত প্রদেশের জেলাবোর্ডগুলির কার্য্য অতি নিন্দনীয় হইয়াছে। ইহা কেবল বোর্ড এবং তাহাদের চেয়ারম্যানগণের ঔদাসীন্য বশতঃ ঘটিয়াছে। ছোটলাট বাহাদুর বিবেচনা করেন, গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। অতএব তিনি আশা করেন, তদুপর জেলাবোর্ড সমূহ এবিষয়ে অবহিত হইয়া কার্য্য করিবেন। ভারতে কুষ্ঠ রোগের বিস্তার কারণ দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবেন। দেশের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার কথা কাহারও অবিদিত সরকারী বাৎসরিক স্বাস্থ্যবিবরণীতে বিবিধ অসংখ্য লোকের মৃত্যু সংবাদ পাঠ করিলেই কথা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। সংবাদপত্র সমূহ এ বিষয়ে ঘোর আন্দোলন করিয়া থাকেন; এবং গবর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে তেমন কিছু চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া প্রায়ই অভিযোগ করিয়া থাকেন। অথচ, গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে টাকা মঞ্জুর করিতেছেন, জেলা বোর্ডগুলি সে টাকা খরচ করিবার সুযোগ পান না! ইহাতে যদি তাঁহাদের নিন্দা হয় তাহা ত অন্যায় নিন্দা নহে! জেলাবোর্ড সকল স্বায়ত্ত শাসনের অন্যতম কেন্দ্র। কিন্তু যাঁহারা স্বায়ত্ত শাসনের ভার পাইয়াছেন, তাঁহারা কি এই রূপেই কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন? কোথায়, স্বাস্থ্য-

রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট যাহা দিতেছেন, তাহা খরচ করিয়া আরও দাও, আরও দাও বলিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আরও টাকা লইতে হইবে,-তা নয় গবর্ণমেণ্ট যাহা দিতেছেন, তাহাই জেলাবোর্ডগুলি খরচ করিয়া উঠিতে পারেন না! ইহার পর গবর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যথেষ্ট টাকা দেন না,-এমন কথা ত আর বলা চলিবে না!

ঢাকায় সোসিয়াল সার্ব্বিস একজিবিসন।—

ঢাকায় একটী সোসিয়াল সার্ব্বিস একজিবিসন বসাইবার কল্পনা হইয়াছে; এবং এতদর্থে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। ঢাকার শিশু মৃত্যুর হার অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯০৮ অব্দে ঢাকায় হাজার করা ১৮২টি শিশুর মৃত্যু হইত; ইদানীং ৩০৭টি শিশু মারা যাইতেছে। ঢাকায় শিশু মৃত্যুর বার্ষিক গড় হাজারকরা ২৫০ অর্থাৎ প্রত্যেক চারিটি শিশুর মধ্যে একটী জন্মের এক বৎসরের মধ্যেই মারা যাইতেছে। এই মৃত্যুর হার আবার বালিকা দিগের অপেক্ষা বালকদিগের মধ্যেই বেশী অর্থাৎ চারিটী বালকের মধ্যে একটী, এবং পাঁচটি বালিকার মধ্যে একটী জন্মের এক বৎসরের মধ্যেই মারা পড়ে। ১৯১৮ অব্দের জন্মমৃত্যুর তালিকা হইতে জানা যায় যে, জন্মের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই অধিকাংশ শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করিতে হয়, রোগ অপেক্ষা শিশুর অযত্ন এবং শিশুর পিতা-মাতা ও ধাত্রীগণের অনভিজ্ঞতা, শিক্ষার অভাব শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ। ইংলণ্ডে বড় বড় নগরে আগে শিশু মৃত্যুর হার খুব বেশী ছিল। কিন্তু শিক্ষার বিস্তৃতি সাধিত হওয়ায়, এবং সতর্কতা অবলম্বনের ফলে ঐ সকল স্থানে শিশুমৃত্যুর হার অনেক কমিয়া গিয়াছে। অন্যত্র যাহা সম্ভবপর, বাঙ্গলায় তাহা কেন না সম্ভব হইবে! আমরা ঢাকার এই প্রচেষ্টা অন্তরের সহিত সমর্থন করিতেছি।

নূতন রোগ।—

ইয়োরোপে অষ্ট্রিয়া দেশের রাজধানী ভিয়েনা

নগরে এক প্রকার নূতন রোগ আবির্ভূত হইয়াছে। তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে Brain Influenza বা মস্তিষ্কের ইনফ্লুয়েঞ্জা। প্রকাশ যে, ইহার প্রকৃতি অনেকটা letharic encephatitiesএর মত। এই রোগে ভিয়েনা নগর প্রায় উজাড় করিয়া ফেলিল। এক মাত্র ভিয়েনা নগরেই ৩০০ লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। কেবল ভিয়েনা নয়, এই নূতন রোগ অতি দ্রুত বেগে সমগ্র অষ্ট্রীয়া দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। প্রথমে মাথা ধরে, পরে অনিদ্রা উপস্থিত হয়; তারপর উদরাধ্মান—ঠিক appendicitis এর মত। অবশেষে রোগীর বিকার উপস্থিত হয়। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে ধীরে ধীরে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এখন, জাহাজে চড়িয়া এই রোগ ভারতে না আসিলে বাঁচি।

শিশু-মঙ্গল প্রদর্শনী।—গত ২৭শে মার্চ্চ শনিবার হইতে টাউন হলে শিশু মঙ্গল প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। বাঙ্গালার লাট বাহাদুর প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বাঙ্গালার স্বাস্থ্যহীনতা, শিশু-মৃত্যু এবং স্বাস্থ্যোন্নতির প্রয়োজনীয়তার কথার আলোচনা করেন। ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালার আর কোন লাট বা ছোটলাট ব্যক্তিগত ভাবে বাঙ্গালার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এতটা মনোযোগ দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এ যাবৎ বাঙ্গালার স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপার সরকারী সনাতন নিয়মানুসারে নির্ব্বাহ হইতেছিল। বাঙ্গালার বর্ত্তমান লাট লর্ড রোণাল্ডশে বাহাদুর গদিতে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই বাঙ্গালার অস্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রতি তাঁহার শুভদৃষ্টি পতিত হয়। প্রথমে তিনি হুক ওয়ার্ম রোগের প্রতিকারে মনোনিবেশ করেন। তৎপরে, ম্যালেরিয়া নিবারণে উদ্যোগী হ'ন। এই সকল কারণে বঙ্গবাসী ইঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ। বর্ত্তমান প্রদর্শনীও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্য বাঙ্গালার অধিবাসীদিগের গোচর করিয়াছে। বড়লাট মহিষী লেডী চেমসফোর্ড সাহেবার সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে বাঙ্গালা দেশে এই যে প্রদর্শনীর সূত্রপাত হইল, ইহার ফল ভালই হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতবর্ষে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এরূপ প্রদর্শনী সম্পূর্ণ নূতন। সুতরাং প্রথমেই যে ইহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে তাহা আশা করা যায় না। ক্রমে ক্রমে ইহার উন্নতি এবং কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তৃতি সাধিত হইতে পারিবে। টাউন হলের প্রদর্শনীতে যে সকল জিনিষ্ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা, প্রকৃতি এবং বৈচিত্র্য ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে। তবে জনসাধারণ ইহার কতটা মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে, ইহা হইতে কতটা শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে তাহা বিবেচনার কথা। সর্ব্বশ্রেণীর লোক যাহাতে এই প্রদর্শনীতে আসিয়া, সকল জিনিষ ও ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া এবং স্বকর্ণে শুনিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া ইহা হইতে উপকার লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। শুধু কলিকাতার টাউন হলে একটী মাত্র এইরূপ প্রদর্শনী বসাইয়া [illegible] হইলে চলিবে না। বাঙ্গালার মফঃস্বলের প্রত্যেক সহরে এরূপ প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হওয়া কর্ত্তব্য; এবং দেশীয় ভাষায় সর্ব্বসাধারণের নিকট ইহার উদ্দেশ্য বিবৃত করা, প্রদর্শিত দ্রব্যাদির অর্থ, ব্যবহার, প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। কলিকাতার প্রদর্শনী শেষ হইলেই এই সকল জিনিষ্ ঢাকা [illegible] পাঠাইয়া দিয়া তথায় এইরূপ একটী প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিতে হইবে। আমাদের মনে হয় শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী আরও একটু বিস্তৃত ভাবে হইলে পারিত। টাউন হলের ন্যায় সংকীর্ণ স্থানে এ প্রদর্শনী না বসাইয়া কোন খোলা জায়গায় আর বিস্তৃতভাবে প্রদর্শনী বসাইলে আরও বেশী পদার্থের সন্নিবেশ করা যাইতে পারিত। সে হউক, আমরা আশা করিতেছি দ্বিতীয় বার আবার এইরূপ প্রদর্শনী বসিবে, তখন আরও পদার্থের সংগ্রহ করিয়া বিস্তৃত বন্দোবস্ত করা হইবে। আর একটী কথা, এরূপ প্রদর্শনীতে দর্শকগণের নিকট হইতে দর্শনী (তা সে যত কমই হউক) আদায় [illegible] ঠিক নহে। এই ধরণের সাধারণের হিতকর [illegible]

সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অবারিত দ্বার হওয়া উচিত। এবং ইহার সর্ব্বপ্রকার ব্যয়, হয় সরকার হইতে, না হয়, সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া নির্ব্বাহ করা উচিত। তাহা হইলে প্রদর্শনীর প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয়, প্রদর্শনীও সার্থক হয়।

প্রদর্শনীতে লাট সাহেবের বক্তৃতা।

গত ২৭শে মার্চ্চ শনিবার টাউনহলে শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী খুলিবার সময়ে লর্ড রোণাল্ডশে বাহাদুর যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া বুঝা যায়, তিনি বাঙ্গালার স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। তিনি দেশের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার খবর রাখেন, পীড়িত আর্ত্ত প্রজাগণের প্রতি হৃদয়ে সহানুভূতির ভাব পোষণ করেন, এইরূপ অবস্থার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করেন এবং সদুপায় আবিষ্কৃত হইলে তাহা অবলম্বন করিতে ইচ্ছুকও আছেন। বাঙ্গালাদেশের এমন অস্বাস্থ্যকর অবস্থা ঘটিবার ত কথা নয়;—ইহা কেবল দারিদ্রতাও লোকের অজ্ঞতার দরুণই ঘটিতেছে। দেশেত দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। লোকে পেটের দায়ে অস্থির। দুইবেলা পেট ভরিয়া অন্ন অনেকের ভাগ্যেই জুটে না। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের রোগ সম্বন্ধে অজ্ঞতাকেও অস্বীকার করিলে চলিবে না। কি কারণে রোগোৎপত্তি ঘটে, এবং অনেক রোগ নিবারণের যে সকল সহজ ও সরল উপায় আছে তাহা জানা থাকিলে, সহজে আর রোগ হইতে পায় না। বাঙ্গালীরা সাধারণতঃ যে সকল রোগে মারা যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিবার্য্য ব্যাধি। এই সব রোগের কারণ অজ্ঞাত নয়, এবং তাহাদের নিবারণের উপায়ও চিকিৎসকেরা আবিষ্কার করিয়াছেন। এখন দেশের লোককে এই সকল বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন,—গত বৎসর বাঙ্গালা দেশে ১৬৪১১১১ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কলেরায় কতক লোক মরিয়াছে। কিন্তু একটু সাবধান হইলে, কলেরা রোগের প্রতিষেধক উপায়গুলি জানা থাকিলে ইহার মধ্যে অনেকগুলি মানুষের প্রাণ রক্ষা পাইতে পারিত। ঐ বৎসরে নিউমোনিয়া যক্ষ্মা প্রভৃতি ঘটিত রোগে সাড়ে বারো লক্ষের অধিক লোক মারা গিয়াছে। পূর্ব্বাহ্নে সাবধান হইলে, এক্ষেত্রেও এত লোক মরিত না। লাট সাহেব বাঙ্গালা দেশে শিশু মৃত্যুর আধিক্য দেখিয়া একটু বিশেষ চিন্তিত হইয়াছেন (গত বর্ষে বাঙ্গালা দেশে যে ৩৬৪১১১১ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তন্মধ্যে ১০ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর সংখ্যা ৬২৬।৫৫ এবং ইহাদের মধ্যে আবার ২৭৮৩৭০টি অর্থাৎ গত বৎসর যত শিশু জন্মিয়াছে তাহাদের প্রতি হাজারে ২২৬টি শিশু এক বৎসরের মধ্যেই মারা গিয়াছে। একমাত্র কলিকাতা সহরেই প্রত্যহ গড়ে ১৬টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে।

যশোহরে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

যশোহরে একটী আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে যশোহরের জেলা বোর্ড এই ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছেন। সরকারী এলোপ্যাথিক ঔষধালয়ে যে সকল নিয়ম অনুসৃত হয়, (কয়েকটি বাদে) সে সকল নিয়ম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় সম্বন্ধে খাটিবে না। এই ঔষধালয় পরিচালনের জন্য একটী ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হইবে। কিন্তু স্থানীয় সিবিল সার্জ্জন বা কোন মহকুমার হাকিম এই ঔষধালয় কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন না। জেলা বোর্ডই কমিটির নিয়োগ করিবেন; তবে কেবল বিভাগীয় কমিশনারের অনুমতি লইতে হইবে। কমিটির গঠন সম্বন্ধে কমিশনারের মতামত প্রাধান্য লাভ করিবে। গবর্ণমেণ্ট একজন চিকিৎসক (যিনি রেজিষ্টার্ড নহেন) এই ঔষধালয়ে নিয়োগের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন। এই ঔষধালয় স্থাপনের ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে। যাহার যেরূপ চিকিৎসার বিশ্বাস আছে, তাহাকে সেইরূপ চিকিৎসা প্রণালীর সাহায্য লাভের সুযোগ দেওয়া খুব ভাল প্রস্তাব। আমরা আশা করি, গবর্ণমেণ্ট যশোহরের ন্যায় অন্যান্য জেলাতেও জেলা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে একটী করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় স্থাপনের অনুমতি দিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমরা কয়েক মাস হইতে গ্রাহকগণের নিকট হইতে স্বাস্থ্যসমাচার না পাওয়ার অভিযোগ প্রাপ্ত হইতেছি। এমন কি ১৩২৫ সালের পত্রিকা পান নাই বলিয়া অনেকে অভিযোগ করিয়াছেন। পুরাতন পত্রিকা বিনামূল্যে দিতে হইলে আমাদিগকে বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। স্বাস্থ্য সমাচার পত্রিকার নামমাত্র ১৲ বার্ষিক মূল্যে গ্রাহকগণের নিকট হইতে আমরা আদায় করি। বলা বাহুল্য ইহাতে আমাদের ক্ষতি ভিন্ন লাভ কিছুই থাকেনা।

আমরা যথাসম্ভব সাবধানতার সহিত প্রতি মাসে কাগজ পোষ্ট আফিসে প্রেরণ করি অনেক সময় পোষ্ট আফিসে কাগজ হারাইয়া যায়। আমরা এ বর্ষ হইতে এরূপ নিয়ম করিলাম যে কোনও মাসে কাগজ অপ্রাপ্তি সংবাদ যদি সেই মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে না পাই তবে আমরা তাহার জন্য দায়ী থাকি না। ২০শে তারীখের মধ্যে এই বিষয় আমরা অবগত না হইলে কোনও কাগজ পাঠাইতে পারিব না। ইতি

শ্রীদীনেশচন্দ্র দাস গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

প্রাপ্তি স্বীকার—চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত পশ্চিম শালপুরা দারগা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুত যামিনী রঞ্জন দাস মহাশয়ের নিকট হইতে ছাত্র গণের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাইয়াছি। লেখক পুষ্টিকর খাদ্য বিশুদ্ধ বায়ু ও নির্ম্মল জল প্রভৃতি সেবনের উপকারীতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সংক্রামক ব্যাধির প্রারম্ভে যে সকল সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত তদ্বিষয়েও কিছু আলোচনা আছে। অতি ভোজন, পচা গন্ধ, গৃহের নিকট আবর্জ্জনা, দিবা নিদ্রা, দুশ্চিন্তা, অধিক রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি অনিষ্টকর কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

সমালোচন—ডঃ এ, সি, মজুমদার এল্ এম্ এস্ সম্পাদিত 'প্রচারক' নামক হোমিওপ্যাথিক মাসিক পত্রের জানুয়ারী সংখ্যা সমালোচনার জন্য পাইয়া প্রথম প্রবন্ধে ডাঃ সুজলারের ঔষধ সম্বন্ধে লি হইয়াছে। শিশু-পালন বিষয়ক প্রবন্ধটি বেশ হইয়াছে। শিশুদিগের পরিচর্য্য বিষয়ে কয়েকটি সার উপদেশ আছে। কিন্তু কয়েকটি প্রবন্ধে এলোপ্যা ঔষধের প্রতি বিদ্বেষ ভাব দেখিয়া দুঃখিত হইয়া হিংসা ও দ্বেষ দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য সাধিত না। পরের দোষ অনুসন্ধান না করিয়াও দেশের উপকার করা যায়। স্বাস্থ্য বিষয়ে উপদেশ পারে এইরূপ কাগজের দেশে একান্ত অভাব। উপর যে ২।১ খানা কাগজ আছে তাহাতে যদি প্রকৃত কল্যাণ কর বিষয় না লিখিয়া অপরের লিখিতে হয় তবে ইহাকে বাস্তবিকই দুঃখের বলিতে হইবে।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৯ম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ সাল | ২য় সংখ্যা

দুগ্ধ জ্বাল দিয়া খাইব কি না?

আমরা বাঙ্গালী দুধ খাই জ্বাল দিয়া; সাহেবেরা কাঁচা। দুধ জ্বাল দিয়া খাইলে দুগ্ধের গুণের কিছু হয় ঘটে। দুধ কাঁচা খাইলে অনেক রোগবীজাণু দুধের দেহে প্রবেশ করিবার সুবিধা পায়। সুতরাং দুগ্ধ জ্বাল দিয়া খাওয়া না খাওয়া একটা সমস্যা বটে। Bedrock নামক একখানি সাময়িক পত্রে ডাক্তার এরিক প্রিচার্ড এই সমস্যার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার মতামতের মর্ম্ম আমাদের পাঠকপাঠিকাগণকে জানাইয়া দিতেছি।

সাহেবেরা দুধ জ্বাল দিয়া খান বটে, কিন্তু তাহাতে রোগ-জীবাণু-সমাগম ঘটে বলিয়া, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে আজকাল জ্বাল দেওয়া দুধ খাইবার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন। সেই জন্যই এই সমস্যাটির উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্যার ঠিকমত সমাধান করিতে গেলে এমন অনেক বিষয় আসিয়া পড়ে, যেগুলা নিজেই এক একটা স্বতন্ত্র সমস্যা। সে গুলারও সমাধান না হইলে মূল সমস্যার সমাধানের আশা অল্প।

যাঁহারা দুগ্ধ জ্বাল দিয়া খাইবার পক্ষপাতী, তাঁহারা নিজ নিজ মতের সমর্থনের জন্য যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দিক হইতে দেখিতে গেলে, সে যুক্তিগুলা খুবই ঠিক বলিয়া বোধ হয়। আবার যাঁহারা যুক্তি প্রয়োগ করিয়া দুধ কাঁচা খাইবার পরামর্শ দেন, তাঁহারাও বেঠিক কথা বলেন না। সমস্যা এই খানেই। উভয় পক্ষেরই যুক্তিগুলা এমন প্রবল এবং এমনই অকাট্য যে, সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরাও কোন একপক্ষে জোর করিয়া মত দিতে পারেন না। দিতে গেলে, অপর পক্ষের যুক্তিগুলা আসিয়া তাঁহাদিগকে এমন বাধা দেয় যে, তাঁহারা একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়েন। চিকিৎসকগণের অবস্থাই যখন এইরূপ, তখন সাধারণের পক্ষে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া আরও কত কঠিন, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই দুগ্ধ সমস্যার ভিতর রাসায়নিক, ফিজিওলজিক্যাল এবং জীবাণুঘটিত প্রশ্ন রহিয়াছে। ইহারা সকলেই এক একটা স্বতন্ত্র সমস্যা। ইহাদের সমাধান আগে করিতে হইবে। তবে দুগ্ধ জ্বাল দেওয়া-না-দেওয়ার সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে।

ডাক্তার প্রিচার্ড তাঁহার আলোচ্য বিষয়টিকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন। প্রথমতঃ, দুগ্ধ জ্বাল দিলে তাহার কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাই আলোচিত হইয়াছে। তৎপরে, ঐ পরিবর্ত্তনের ফলে দুধ হজম হয় কি না, এবং তদ্দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন হয় কি না, তাহার বিচার করা হইয়াছে। সর্ব্বশেষে, দুধ জ্বাল দিবার পর, সংক্রামক রোগ নিবারণে তাহা কতখানি সহায়তা করে, তৎবিষয় বিবেচিত হইয়াছে।

টাট্‌কা দোহন করা দুগ্ধ জীবশরীরের সজীব কোষসমূহের বিচ্ছিন্ন অংশগুলির একত্র সমাবেশ। দুগ্ধে যে সকল জীবনী-কোষ থাকে সেগুলি যদি প্রকৃত পক্ষে জীবিত নাও হয়, তথাপি, তাহাদের অবস্থা জীবিতের কাছাকাছি বটে। বস্তুতঃ, দুগ্ধে, জীবদেহের ক্ষয়-প্রাপ্ত টিসুসমূহের পুনর্গঠনোপযোগী সমুদায় উপাদান ঠিক নিয়মিত অনুপাতে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান আছে। সুতরাং যে সকল কোষ হইতে এই উপাদানগুলি গঠিত, তাহাদের মধ্যে জীবনের পরিমাণ যতখানি, সেই পরিমাণে দুগ্ধপোষ্য জীব,—তা, সে মানব-শিশুই হউক, গোবৎসই হউক অথবা বিড়াল-শাবকই হউক, দুগ্ধের উপাদানভূত কোষগুলিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে গ্রহণ পূর্ব্বক নিজদেহের জীবনীকোষগুলিকে পুনর্গঠিত করিয়া লইতে পারে।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের কোনরূপ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। কারণ, প্রত্যেক জীবেরই নিজের নিজের এক একটী বিশেষত্ব আছে; সেই বিশেষত্বের উপর নির্ভর করিয়া, সে তাহার দেহের কোষসমূহ সংগ্রহ করিয়া,—স্থপতিরা যেরূপে অট্টালিকা, প্রাসাদ বা মন্দির গঠন করে, ঠিক সেই প্রণালীতে—নিজের দেহ গঠন করে। সুতরাং তাহার শরীর গঠনের মালমসলা আকারে যত ক্ষুদ্রতম হইবে, তাহার গঠনকার্য্য তত সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইবে। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে, দুগ্ধ বা অপর কোন স্বভাবজাত খাদ্য যে ভাবে এবং যে আকারে আমরা ভোজন করিয়া থাকি, ঠিক সেই আকারে, সেই ভাবে তাহা শরীরে শোষিত হয় না। তাহাকে [illegible] কাঁচা দুগ্ধের প্রধান উপাদানগুলি এই——শালিক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া তবে তদ্দ্বারা শরীর [illegible]য় উপাদান, স্নেহজাতীয় উপাদান, আমিষ জাতীয় করিতে হয়। ইহারই নাম হজম ক্রিয়া। এই [illegible]ান, লবণ জাতীয় উপাদান, extractives, বিভক্ত অণুগুলির পুনরায় সমাবেশ দ্বারা বিভি[illegible]cipitins, agglutinins, ferments, এবং অপর ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার শারীরিক অবস্থার উপযো[illegible]কটি পদার্থ যাহাদের স্বরূপ এখনও সঠিকরূপে ভাবে তাহার শরীর গঠিত হয়। এই কারণে, এ[illegible]রিত হয় নাই। অথচ, এই শেষোক্ত উপাদানগুলিও জিনিস সকলে ঠিক সমান ভাবে হজম করিতে[illegible]রীর গঠনের জন্য অপরিহার্য্য। তাপ প্রয়োগে ইহাদের পারে না; একই জিনিসে সকলের দেহের উপযো[illegible]কাংশেরই প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে। অর্থাৎ, তাপের পুষ্টিকর পদার্থ সমভাবে পাওয়া যায় না। সুতরাং [illegible]া তাহাদের অণুগুলি এমন ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় কোন খাদ্যে কোন্ ব্যক্তি বিশেষের দেহের বিশে[illegible], তাহাদের আকৃতিপ্রকৃতির নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাহাদের অবস্থার উপযোগী কোন একটী বিশেষ উপাদানে[illegible]নিয়া লওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে।

অ[illegible]াব থাকিলে, তাহার দেহ গঠন কার্য্য অসম্পূ[illegible] যে তাপে জল ফুটিয়া উঠে, দুগ্ধে সেই পরিমাণ তাপ থাকিয়া যায়। অর্থাৎ একই পদার্থ সকলের প[illegible]য়োগ করিলে, দুধের উপর সর পড়ে। তাপ প্রয়োগের সমান পুষ্টিকর নহে। এই সত্যটির উপরে, খাদ্যে[illegible]ল দুগ্ধের প্রধান প্রোটীন অংশ অর্থাৎ কেসিনোজেন হিসাবে, জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ এবং কাঁচা দুগ্ধের ম[illegible](caseinogen) শুষ্ক হইয়া যাওয়াতেই সর পড়িয়া পার্থক্য নির্ভর করিতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে[illegible]কে। ঠিক এই প্রণালীতেই পনীরের (cheese) দুগ্ধে জীবশরীর গঠনোপযোগী সমস্ত উপাদান [illegible]র খোসার সৃষ্টি হয়। ইহা নিবারণ করা যাইতে উপযুক্ত অনুপাতে বর্ত্তমান আছে। দুগ্ধ জ্বাল দি[illegible]রে;—আবদ্ধ পাত্রে দুধ জ্বাল দিলে, দুধে হাওয়া যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহার ফলে দুগ্ধে ঐ সক[illegible]গিতে না দিলে, দুধে সর পড়ে না। এই সরের উপাদানের কোন কোনটির অভাব হইয়া থা[illegible]য়ই coagulated lactalbumins বা দধিঘটিত অতএব, কাঁচা দুধ খাইলে শরীরের যে পরিমাণে [illegible]াটিনও থাকিয়া যায়। ১৬০ ডিগ্রি ফারেনহীট তাপ সাধন হয়, জ্বাল দেওয়া দুধে ততটা হয় না। অ[illegible]য়োগ করিলেই এই উপাদানগুলি কঠিন হইয়া যায়। জ্বাল দেওয়া দুগ্ধে যে উপাদানগুলির অভাব [illegible]ই সর বা ছালের মধ্যেই কিছু স্নেহজাতীয় পদার্থও সে গুলির পূরণ করা একেবারে অসম্ভব না হইলে[illegible]টকাইয়া থাকে। দুগ্ধের মধ্যে যে কার্ব্বনিক এসিড কঠিন ত বটেই। কিন্তু ঐ পরিবর্ত্তনের এক[illegible]স দ্রব অবস্থায়, কিম্বা অন্য পদার্থের সহিত সামান্য সুবিধাও আছে। কাঁচা অবস্থায় দুগ্ধের উপাদ[illegible]বে রাসায়নিক মিলনে মিলিত থাকে, তাহাও তাপ সমূহ সংহত ভাবে থাকে। দুগ্ধ শরীরে শোষিত হই[illegible]য়োগের ফলে মুক্তিলাভ করিয়া বাহির হইয়া যায়। হইলে—যে কোন রকমেই হউক—উহার ঐ সা[illegible]স বাহির হইয়া যাইবার পর, দুগ্ধের ক্যালসিয়াম ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার অণুগুলিকে পরস্পর হই[illegible]ণ জাতীয় উপাদান এবং ম্যাগনেসিয়াম-ঘটিত বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। দুগ্ধ পাকস্থলীতে হজম হ[illegible]ণগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া কিছু পরিমাণে তলায় গিয়া উহার এই অবস্থা ঘটে; আবার জ্বাল দিয়া ল[illegible]তাইয়া পড়ে। তাপের দরুণ দুগ্ধের caramelises বাহিরেই কতকটা পরিমাণে দুগ্ধের এই অবস্থা ঘ[illegible]র্থাৎ দুগ্ধ-শর্করা বা lactose পুড়িয়া যায়। যায়। সুতরাং দুধ জ্বাল দেওয়ায় হজমের কার্য্য কত[illegible] কম তাপ অর্থাৎ ১৬০ ডিগ্রি ফারেনহীট—যে অগ্রসর হইয়া থাকে। [illegible]াপে দুগ্ধের pasteurisation ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়—তাপে উহারা পুড়ে না, অবিকৃত থাকে। এই চিনি পুড়িয়া যাওয়াতেই জ্বাল দেওয়া দুধের স্বাদের এবং বর্ণের বৈলক্ষণ্য ঘটে।

তাপের দরুণ lecithin ঘটিত যৌগিক পদার্থগুলি, এবং nucleins পুড়িয়া যায় আর ফসফরাস বাহির হইয়া উড়িয়া যায়। ১৬০ ডিগ্রি ফারেনহীট তাপ প্রয়োগে ferments, agglutinins এবং precipitins প্রভৃতিও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

এখন দেখিতে হইবে, দুধ জ্বাল দেওয়ার ফলে সমগ্র দুগ্ধ বা তাহার কোন উপাদান হজম করিবার পক্ষে কোনরূপ সুবিধা বা অসুবিধা ঘটে কি না। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, এমন অনেক লোক আছে, যে দুগ্ধ কাঁচা অবস্থায় বেশ হজম করিতে পারে; কিন্তু সেই দুধই তাহাকে জ্বাল দিয়া খাইতে দিলে, তাহার হয় গা-বমি-বমি করিবে, না হয় ত সত্য সত্যই অসুখ হইয়া পড়িবে। কাঁচা দুগ্ধ পানে অভ্যস্ত ব্যক্তির জ্বাল দেওয়া দুগ্ধে এই যে অরুচির ভাব, ইহা কেবল মানসিক ভাব-বৈলক্ষণ্য মাত্র; বাঙ্গলায় ইহাকে রুচি বা প্রবৃত্তির অভাব বলা হয়। কিন্তু তাহা হইলেও, কোন চিকিৎসকই ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। খাদ্য যতই উপাদেয় হউক না কেন, তাহাতে কাহারও রুচি না হইলে জোর করিয়া সে খাদ্য তাহাকে খাওয়ান উচিত হয় না। খাওয়াইলে তাহা হজম হইবে না কিম্বা সহ্য হইবে না, অথবা অসুখ করিবে। কি শিশু, কি বয়স্ক ব্যক্তি—সকলেরই, খাদ্যে রুচির উপর তাহাদের হজম করিবার শক্তি নির্ভর করিয়া থাকে। রুচির কথা ছাড়িয়া দিলে কিন্তু জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ সহজেই হজম হয়। অর্থাৎ কাঁচা বা জ্বাল দেওয়া কোন দুগ্ধেই যাহার অরুচি নাই, তাহার পাকস্থলীতেও কাঁচা অপেক্ষা জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ সহজে হজম হইয়া থাকে। কারণ, সিদ্ধ করাতে হজম করার কাজ অর্দ্ধেক সারা হইয়া থাকে। দুগ্ধের উপাদানগুলির মধ্যে caseinogenটি হজম করা একটু কঠিন। দুগ্ধ যখন উদরের মধ্যে

প্রবেশ করে, তখন তাহা চাপ বাঁধিয়া দধিবৎ হইয়া যায়। এই ভাবে দুগ্ধ হঠাৎ চাপ বাঁধিয়া যাওয়ায় পাকস্থলীর কিছু কষ্ট উপস্থিত হয়। কিন্তু যদি দুগ্ধের সহিত অল্প পরিমাণে সাইট্রেট অব সোডা মিশাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার চাপ বাঁধিতে দেরী হয়; তখন তাহা অপেক্ষাকৃত সহজে হজম হয়; অন্ততঃ পাকস্থলীর পক্ষে পীড়াদায়ক হয় না। দুগ্ধের অন্যতম উপাদান ক্যালসিয়াম সল্টের দরুণ দুগ্ধ চাপ বাঁধিয়া থাকে। দুগ্ধ পান করিবার পূর্ব্বে যদি এই জিনিসটি দুধ হইতে বাদ দেওয়া যায়, কিম্বা তাহাকে থিতাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেও দুধ চাপ বাঁধিতে পারে না। দুধ জ্বাল দিলে এইটি খুব সহজে ঘটিয়া থাকে। দুধ যতই জ্বাল দেওয়া হইবে, ক্যালসিয়াম সল্ট ততই থিতাইয়া যাইবে। দুধ জ্বাল দিতে দিতে উহা ঘন হইয়া যখন কন্‌ডেন্সট মিল্‌কে পরিণত হয়, তখন উহা সাধারণ দুগ্ধ অপেক্ষা অধিকতর সুপাচ্য হইয়া উঠে। যে সকল শিশুর হজম শক্তি কম, তাহাদিগকে ঘন দুগ্ধ খাওয়ানো হয়। ইহাতে তাহাদের পাকস্থলীতে দুগ্ধ সহজেই পরিপাক হয়। দুগ্ধ জ্বাল দিয়া লইলে অন্য রকমেও দুগ্ধের সুপাচ্যতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মোট কথা, দুগ্ধ যত বেশী সময় বা বেশী উত্তাপে জ্বাল দেওয়া হইবে, দুগ্ধ ততই সুপাচ্য হইবে।

কিন্তু হজম হওয়া এক জিনিস, আর শরীরে শোষিত হইয়া তাহার পুষ্টিসাধন করা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। খাদ্য দ্রব্য হজম হইবার কালে যে সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণুতে বিভক্ত হইয়া যায়, তাঁহাদের স্বাভাবিক উপাদানভূত গঠনের উপর ঐ খাদ্যের পুষ্টিকারিতা নির্ভর করে। জ্বাল দেওয়া দুধ এবং কাঁচা দুধ পাকস্থলীতে পরিপাক প্রাপ্ত হইবার পর তাহাদের অণুগুলির উপাদান (একটী বাদে অন্য সকলগুলির) একই প্রকার। ঐ স্বতন্ত্র পদার্থটির নাম দেওয়া যাক, antiscorbutic element। যে কোন কারণেই হউক, কাঁচা দুধের এই পদার্থটি জ্বাল দিবার সময়ে এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয় যে, যে সকল লোকের খাদ্য হইতে তাহাদের দেহের ... পুনর্গঠন করিয়া লইবার শক্তি সীমাবদ্ধ,—তা... পাকস্থলীতে উহারা আর পুনর্মিলিত হইতে পারে... খাদ্য হইতে দেহের উপাদান গঠন করিয়া লইবার শ... সকলের সমান নহে। কতক শিশুর এই শক্তি অ... কম; আবার কতক শিশুর এই শক্তিটি এত বে... খুব বিরুদ্ধ অবস্থাতেও তাহাদের দেহের পুষ্টি লাভে... ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না। কোন খাদ্যে antiscorbu... elementএর অভাব হইলে, ঐ খাদ্যভোজী শি... দেহে scurvy রোগ প্রকাশ পায়। শিশুদের শ... গঠন-কার্য্য যখন চলিতে থাকে, তখন মধ্যে মধ্যে... রোগ হইতে দেখা যায়। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের... রোগ কদাচিৎ হইয়া থাকে। কারণ তাহাদিগকে... দেহ গঠন করিতে হয় না, কেবল সুগঠিত দেহের... নিবারণ করিতে পারিলেই তাহাদের খাদ্য গ্রহ... উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু এই scurvy রোগ অনি... ব্যাধি নহে। চিকিৎসার দ্বারা উহা আরাম করা ... এবং রোগ নিবারণেরও ব্যবস্থা করা যায়। কেবল... খাদ্যে antiscorbutic elementএর অভাব, তাহা... ঐ পদার্থ মিশ্রিত করিয়া লইলেই যথেষ্ট হয়। ... খাদ্যের সহিত কিছু টাটকা ফলের রস, যথা কমলা... কিম্বা আঙ্গুর, ভোজন করিলেই হইল।

যাহারা জ্বাল দেওয়া দুধ খায়, এমন শি... পশুর হজমী-শক্তির যে কোন ক্ষতি হয় না, ... সত্যটুকুর যে প্রমাণ আমরা পাইয়াছি, এ... তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক। জ্বাল দেওয়া দু... সহিত antiscorbutic element গ্রহণ না করি... প্যারী, নিউইয়র্ক, বার্লিন, লণ্ডন এবং অন্যান্য ... সহস্র সহস্র শিশু পালিত হইয়া থাকে। দুগ্ধ ... দিয়া খাওয়াইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে শি... দিগের মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা যেরূপ ছিল, তাহার ... তুলনায়, জ্বাল দেওয়া দুধ খাইতে আরম্ভ করিবার ... শিশুদিগের মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা বেশী ত হয়ই নাই, ... কমিয়া গিয়াছে। আমার নিজের জানা ...

... কথা আমি বলিতে পারি। গত দ্বাদশ ... সহরের মধ্যে সেণ্ট মেরিলিবোনের শিশুদের মৃত্যু ... সংখ্যা শতকরা প্রায় ১০০ হিসাবে কমিয়া গিয়াছে। ... লণ্ডনের 'বরো' (borough) সমূহের মধ্যে যাহাদের ... মৃত্যুর সংখ্যা খুব কম, সেণ্ট মেরিলিবোন তন্মধ্যে অন্যতম। মেরিলিবোনে সকলেই প্রায় দুধ জ্বাল দিয়া খায়; কিন্তু ১৮ বৎসর পূর্ব্বে দুধ জ্বাল দেওয়ার প্রথা তথায় প্রচলিত হয় নাই। তাহারা বলে যে, সুস্থদেহ শিশুদের জ্বাল দেওয়া দুধ খাওয়াইয়া ঠিকমত পালন করা যায় না, তাহা কথা সত্য নহে। বরং এ কথা বলা যায় যে, দোষ জ্বাল দেওয়া দুধের নহে;—তাহাদের সন্তান পালন প্রণালীর দোষ। পক্ষান্তরে, জ্বাল দেওয়া দুগ্ধের বিরুদ্ধে যাহাদের মনে কোন কুসংস্কার নাই, তাহাদিগকে কখনও এরূপ অভিযোগ করিতে দেখা যায় না। অতএব জ্বাল দেওয়া দুধের সম্বন্ধে, anti-corbutic elementএর অভাব ছাড়া অন্য কোন অভিযোগ যদি না থাকে, তাহা হইলে বলিতে হয়, টাটকা দুধ সংগ্রহ করিবার জন্য কষ্ট স্বীকার করা অনাবশ্যক। গোয়ালা বাড়ীতে অথবা dairy farmএ দুধ ঘন করিয়া শুকাইয়া লইয়া স্থানান্তরে চালান দিবার ব্যবস্থা করিলে ইহাতে নানান দিকে নানান সুবিধা। ইহাতে চালানী খরচ কম পড়ে; টীনের কিম্বা বোতলের ভিতর উত্তমরূপে প্যাক করিয়া চালান দেওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বে এরূপ 'মৃত' (বাসী) খাদ্যের ... আমার ঘোর বিতৃষ্ণা ছিল। কিন্তু আমার নিজের এবং আমার বন্ধু ডাক্তার নেইসের অভিজ্ঞতার ফলে আমার ধারণা বদলাইয়া গিয়াছে। আমার সম্পূর্ণ সন্তোষজনকরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, টাটকা জ্বাল দেওয়া দুধ খাইয়া যে সব শিশু মানুষ হয়, তাহাদের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সবল ও সুপুষ্ট, সেই সকল শিশুর তুলনায় কেবল মাত্র শুষ্ক দুগ্ধ-পোষা শিশু কোন অংশে হীন নহে। তবে, যে সকল শিশুকে কেবল শুষ্ক দুগ্ধ খাওয়ানো হইবে, তাহাদের জন্য দুগ্ধের সহিত কোনরূপ antiscorbutic element-যুক্ত খাদ্যের বন্দোবস্ত করিলে ভাল হয়। কিন্তু আমার বোধ হয়, টাটকা জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ-ভোজী শিশুদের পক্ষেও পদার্থটি কম দরকারী নহে। দুগ্ধের সহিত antiscorbutic element-যুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া আমি অন্য উপায় অপেক্ষা অধিকতর উত্তম ফল পাইয়াছি। অতএব শুষ্ক দুগ্ধের ব্যবহারই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। পূর্ব্বে আমেরিকানরা দুগ্ধ জ্বাল না দিয়া অন্য উপায়ে তাহার গুণের উৎকর্ষ সাধনার্থ, তাহাকে নিরাপদ এবং রোগবীজাণুশূন্য করিবার উপায় নির্দ্ধারণার্থ, অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছিল। কিন্তু সেই সকল আমেরিকানের মধ্যে অধিকাংশই আজকাল দুধ জ্বাল দিয়া খাইবার ঘোর পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছে।

এ কথা অবশ্য কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, দুধ যত টাটকা ও বিশুদ্ধ হইবে, তাহা ততই উত্তম। পক্ষান্তরে, পচা দুধকে যতই জ্বাল দেওয়া হউক না কেন, তাহা আর মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। কিন্তু দুগ্ধ অতি সহজেই দূষিত হয়,—যক্ষ্মা রোগের এবং অন্যান্য প্রকারের বীজাণু অতি সহজেই দুগ্ধকে আশ্রয় করিতে পারে। এই কারণে সুবিজ্ঞ বহুদর্শী ব্যক্তিরা বিবেচনা করেন যে, গোদুগ্ধ যতই বিশুদ্ধ ও নির্দ্দোষ হউক না কেন, সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হইবার জন্য সমস্ত দুধই আগে উত্তমরূপে জ্বাল দিয়া তবে শিশুদের খাওয়ানো যাইতে পারে।

গোদুগ্ধের সম্বন্ধে যতই সাবধান হওয়া যাউক, তাহার প্রতি ঘন সেণ্টিমিটারে নিদেন পক্ষে ৫০০০ ব্যাক্টেরিয়া থাকিবেই থাকিবে। ইহাই হইল আমেরিকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দুগ্ধ। অর্থাৎ এরূপ দুগ্ধ শিশুকে নিরাপদে দেওয়া যাইতে পারে বলিয়া মার্কিন দুগ্ধ পরীক্ষকেরা সার্টিফিকেট দিয়া থাকেন। আর, আমেরিকার দ্বিতীয় শ্রেণীর দুগ্ধের প্রতি ঘন সেণ্টিমিটারে ব্যাক্টেরিয়ার পরিমাণ ১০০০০০ এর কম নয়। কিন্তু লণ্ডনের বাজারে সাধারণতঃ প্রতি

ঘন সেণ্টিমিটার দুধে ৩৩৭০০০০ জীবাণু থাকে। গ্রীষ্মকাল হইলে, জীবাণুর পরিমাণ ৯৮০০০০০ পর্য্যন্ত হইতে পারে।

দুগ্ধে যে সব জীবাণু থাকে, তাহাদের অধিকাংশই নিরীহ। তবে অবশ্য সেগুলা দুগ্ধে বর্ত্তমান থাকাতে দুগ্ধের পুষ্টিকারিতা গুণ বাড়ে না। আবার ইহাদের মধ্যে বিষাক্ত জীবাণু থাকাও খুব সম্ভব। দুগ্ধে রোগ-উৎপাদক জীবাণু আদৌ নাই এমন কথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না। যক্ষ্মা জীবাণু ত অধিকাংশ দুগ্ধেই থাকে। লীষ্টার ইনষ্টিটিউটে একবার বহু সংখ্যক দুগ্ধের নমুনা পরীক্ষা করিয়া শতকরা ১১ টিতে যক্ষ্মা জীবাণু পাওয়া গিয়াছিল। অতএব, যক্ষ্মা জীবাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন হইতে হইলে দুধ জ্বাল দিয়া খাওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

সাধারণতঃ দুগ্ধে একপ্রকার জীবাণু থাকে, যাহার কার্য্য প্রধানতঃ দুগ্ধকে টকাইয়া দেওয়া। এই জীবাণুর নাম ব্যাসিলাস ল্যাসিডি ল্যাকটিসি, এবং ষ্ট্রেপটোকক্কাস ল্যাক্টিকাস। ইহাদের এত দ্রুত বংশবৃদ্ধি হয় যে, ইহাদের প্রভাবে প্রোটিওলিটিক ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি অন্য শ্রেণীর বীজাণুর বংশবৃদ্ধিতে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। এই শেষোক্ত শ্রেণীর বীজাণু মানুষের পক্ষে অনিষ্টকর। কিন্তু দুধ টকাইবার ব্যাসিলাসগুলা বড় ক্ষীণজীবী—অল্প তাপেই মরিয়া যায়। সুতরাং অল্প তাপে দুধ জ্বাল দিয়া লইলে টকো দুধের ব্যাসিলাসগুলি মরিয়া গিয়া প্রোটিওলিটিক ব্যাসিলাসগুলির বংশবৃদ্ধির পথ খোলসা করিয়া দেয়। অতএব দুগ্ধকে ঠিকমত নিরাপদ করিতে হইলে খুব বেশী উত্তাপে দুধ জ্বাল দেওয়া কর্ত্তব্য।

সকল বীজাণুর তাপ সহ্য করিবার ক্ষমতা সমান নহে। কোন বীজাণু কি পরিমাণ তাপ কতক্ষণ সহ্য করিতে পারে, নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে।

কত তাপে যক্ষ্মা বীজাণু মরে তাহা স্থির করা যায় না। তবে এইটুকু জানা আছে, ১৭০ ডিগ্রি ফারেনহীট তাপে ১০ মিনিটে অথবা ফুটন্ত [illegible] মিনিটে যক্ষ্মা বীজাণু মরিয়া যায়।

কোন শ্রেণীর বীজাণু।	কত তাপ		কতক্ষ
	সেণ্টগ্রেড	ফারেনহীট	
১। ব্যাসিলাস ডিপথেরিয়াই।	৫৬	১৩৬	১০ মি
২। ব্যাসিলাস টাইকোরাস।	৫৬	১৩৬	"
৩। নিউমোকোকাস।	৫২	১২৫	"
৪। ব্যাসিলাস কোলিকমিউনিস।	৬০	১৪০	"
৫। ব্যাসিলাস য়্যাসিডিল্যাকটিসি	৫৬	১৩৩	"
৬। ষ্ট্যাফিলোকোকাস পায়োজেনেস আমিয়াস	৫৮	১৮৬	"
৭। ষ্ট্যাফিলোকোকাস পায়োজেনেস আলবু	৬২	১৪৪	"

দুধ pasteurize করিয়া লইলে নিরাপদ হয় বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু ইহাতে আপত্তির কারণ এই যে, ইহার দ্বারা কোন কোন রোগ বীজাণু মরে না। পক্ষান্তরে দুধ টকাইবার বীজাণু মরিয়া যাওয়ায় অন্য বীজাণুর বংশবৃদ্ধির সুযোগ উপস্থিত হয়। আর জ্বাল দেওয়া দুগ্ধের বিরুদ্ধে আপত্তির কারণ এই যে, উহাতে দুগ্ধের স্বাদের বৈলক্ষণ্য ঘটে। যাহারা কাঁচা দুধ খাইতে অভ্যস্ত, তাহাদের পক্ষে জ্বাল দেওয়া দুধ বমনোদ্রেক করে। হজম হইবার পক্ষে কাঁচা দুধের অপেক্ষা জ্বাল দেওয়া দুধ ভাল। পুষ্টিকারিতার হিসাবে জ্বাল দেওয়া দুধে antiscorbutic element অভাব আপত্তিকর। তবে টাটকা ফলের রস খাইবার ব্যবস্থা করিলে এই দোষ পরিহার করা যায়।

পল্লীগ্রামের বিদ্যালয় ও ছাত্রগণের স্বাস্থ্য।

লেখক—শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রগণের স্বাস্থ্য কোন [illegible]রেই ভাল থাকিতে পারে না। তাহার কারণগুলির [illegible]কে একে বর্ণনা করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা [illegible]রিতেছি। বিদ্যালয়ে নিয়মের অভাব ও বিশৃঙ্খলার [illegible]ই ছাত্রদিগকে অনেক শারীরিক কষ্ট ভোগ করিতে [illegible]।

(১) পল্লীগ্রামের অধিকাংশ বিদ্যালয়ই উন্মুক্ত [illegible]ন্তরে অবস্থিত। বিদ্যালয়-মন্দিরের নিকটে কোনও [illegible]ছপালা নাই। গ্রামস্থ বিদ্যালয়গুলি সকলই টিনের [illegible]। ইহার চতুর্দ্দিকে গাছপালা না থাকাতে অত্যন্ত [illegible]ম বোধ হয়। গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে তপনদেব এই [illegible]ল গৃহের উপর স্বীয় প্রখর কিরণজাল বিস্তার করিতে [illegible]ন সুযোগ পাইয়া থাকেন। গৃহের চারিদিকে [illegible]াদি থাকিলে এত উষ্ণতা বোধ হয় না। ছাত্রগণের [illegible]ক এই প্রকার গৃহে ৬।৭ ঘণ্টা বসিয়া থাকা, আর সেই [illegible]পরিচিত অন্ধকূপ কক্ষে বসিয়া থাকা সমান কথা।

(২) বিদ্যালয়-ঘরগুলি অনেকটা পাটের গুদামের [illegible]ণে তৈয়ারী। ঘরগুলিতে জানালার সংখ্যা খুবই [illegible]। ইহাতে বায়ু প্রবেশের অত্যন্ত ব্যাঘাত হইয়া [illegible]ক। অনেক ঘরের বেড়াও এত অমজবুত যে, সূর্য্য [illegible]অনায়াসে গৃহে প্রবেশ করিতে পারে। প্রত্যেক টিনের [illegible]র চালের নিম্নভাগেই খড়ের বা বাঁশের ceiling [illegible] আবরণ থাকা নিতান্ত দরকার; অনেক গৃহে ইহা [illegible]ই। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে যারপরনাই অনিষ্টজনক। [illegible]তাপে টিন গরম হইয়া সেই তাপ ছাত্রগণের শরীরে [illegible]সিয়া লাগে। গ্রামের স্কুলে পাখারও ব্যবস্থা নাই। [illegible]জেই ছাত্রদিগকে বাধ্য হইয়া এই উষ্ণতা ভোগ [illegible]তে হয়। গ্রীষ্মকালে শিক্ষকগণ হয় ত তাল পত্রের পাখা ব্যবহার করেন; কিন্তু হতভাগ্য ছাত্রগণ এই তাল পত্রের পাখা হইতেও বঞ্চিত।

(৩) বর্ষাকালে গৃহ এবং প্রাঙ্গণে জল উঠিয়া থাকে এবং অতিবৃষ্টিবশতঃ ঘরের মেজে সেঁতসেঁতে (damp) হইয়া যায়। ছাত্রগণ এই ভিজা মেজের উপর পদ স্থাপন করিয়া বসিয়া থাকে। ইহাও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিজনক সন্দেহ নাই। কর্ত্তৃপক্ষের অমনোযোগিতাই এই সকল অভাবের একমাত্র কারণ বলিয়া মনে হয়।

(৪) শৃঙ্খলার অভাবে স্বাস্থ্যহানিকর অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কোনও কোনও ক্লাশ কক্ষে Black Boardগুলি এমন স্থানে রাখা হয়, যাহার উপর সূর্য্যালোক পতিত হয় এবং ঐ সময় বোর্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। অনেক স্থলে এই অসুবিধাগুলি সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(৫) ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের আর একটি প্রধান অন্তরায় প্রত্যহ জলকাদা ভাঙ্গিয়া স্কুলে যাওয়া। পল্লীগ্রামে পাকা রাস্তাঘাট নাই; বৃষ্টি হইলেই পথে অত্যন্ত জল কাদা হয়, আর প্রতিদিন ছেলেরা দুবেলা জল কাদা ভাঙ্গিয়া বিদ্যালয়ে যাতায়াত করে। এমন কি বর্ষার প্রারম্ভে জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন জোয়ারের জল আসিতে আরম্ভ হয় তখনও অনেক স্কুল বন্ধ হয় না। যখন আর যাতায়াতের সাধ্য থাকে না, তখন ঐ সকল বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হয়। ইহা নামে গ্রীষ্মাবকাশ,—কার্য্যতঃ জলের বন্ধ। কারণ চৈত্র বৈশাখ মাসের দারুণ গ্রীষ্মতাপ ছাত্রগণ বিদ্যালয় কারাগারে বসিয়া ভোগ করে; আর জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস বাড়ী বসিয়া অবকাশ উপভোগ করে।

(৬) পল্লীগ্রামে স্কুলসমূহে পানীয় জলের কোনও

বন্দোবস্ত দেখা যায় না। তবে কোন কোন বিদ্যালয়ে থাকিলেও থাকিতে পারে; তাহাদের কথা এখানে বলা হইতেছে না। গ্রীষ্মকালে জল তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটিয়া গেলেও এক বিন্দু বিশুদ্ধ জল পাইবার আশা নাই। ছেলেরা বাধ্য হইয়া স্কুলের নিকটবর্ত্তী 'পানা পচা খানা ডোবার জল' পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে। এই সকল অত্যাচারে নানা প্রকার মহামারী আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রতি বৎসর অনেক ছাত্র এই প্রকার অমনোযোগিতার দরুণ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পানীয় জলের অভাবে ছাত্রগণ যে কি কষ্ট পায়, ভাষায় তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব।

(৭) ছাত্রগণের বসিবার যে সমস্ত বেঞ্চ, হাই বেঞ্চ, ডেস্ক প্রভৃতি আছে, তাহা অধিকাংশই স্বাস্থ্য-হানির সহায়তা করে। কোনও কোনও দীর্ঘকায় ছাত্র নীচু ডেস্কের উপর কাগজ রাখিয়া মেরুদণ্ড বক্র করিয়া নোয়াইয়া লিখে, আবার ছোট ছেলেরা হয় ত অত্যধিক উচু ডেস্কে কাগজ রাখিয়া (যাহা তাহাদের পক্ষে নাগাল ধরা কষ্টকর) বাঁকা হইয়া লিখিতে থাকে। ইহা ছাত্রগণের স্বাস্থ্যহানিকর; এই প্রকার অভ্যাসে তাহাদের স্মরণশক্তি লোপ পায় ও ইহাতে চক্ষুর পীড়া জন্মিবার বিশেষ আশঙ্কা জন্মে।

এই সকল অনিয়মে যে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? এই সকল অসুবিধা দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত ছাত্রগণের স্বাস্থ্য ভাল হইতে পারে না। এখন যাহারা বালক তাহাদের [illegible] ভবিষ্যতের আশা করা যায়; কিন্তু এখন হইতেই [illegible] মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতের [illegible] আশা কোথায়? বর্ত্তমানে ছেলেদের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিলে, ভবিষ্যতের সমস্ত আশা ভরসা ব্যর্থ হইবে সন্দেহ নাই। স্বাস্থ্য-সমাচারে ইতিপূর্বে 'ছাত্রগণের স্বাস্থ্য' 'স্কুলের স্বাস্থ্যরক্ষা' সম্বন্ধে অনেকবার আলোচনা হইয়াছে। এখন এই সকল কার্য্যে পরিণত হইলেই আমাদের শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ছাত্রগণের স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পরীক্ষাও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক স্কুলে স্বাস্থ্যতত্ত্ব Compulsory Paper হওয়া আবশ্যক। কারণ, স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া অগাধ বিদ্যার অধিকারী হইলেও সুখ নাই। স্বাস্থ্যই একমাত্র সুখ। বিদ্যালয়ে যেমন পড়ার নিয়ম (Routine) আছে, ছেলেদের স্বাস্থ্যরক্ষার্থও তদনুরূপ নিয়ম (Routine) থাকা আবশ্যক। বর্ত্তমান ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের প্রতি দেশবাসী সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত। যে সকল বিদ্যালয়ে উল্লিখিত স্বাস্থ্যহানিকর নিয়ম ও অসুবিধা দৃষ্ট হয়, আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে ঐ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সুব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করি; এবং ছাত্রগণকে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা দেওয়া সমীচীন মনে করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এদিকে কৃপাদৃষ্টি পাত করুন ইহাই প্রার্থনা।

মধ্যে মধ্যে উপবাস দিলে শরীর খুব সুস্থ থাকে। ডাক্তার ও ঔষধের বিল অনেক কমিয়া যায়।

যিনি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম শিক্ষা করেন নাই, তিনি যত বড়ই পণ্ডিত হউন না কেন, মূর্খের সহিত তাঁহার বেশী প্রভেদ নাই। শরীর সুস্থ রাখিতে শিক্ষা না করিলে অন্য বিদ্যা কেবল ভার স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

প্রত্যূষে মুক্তস্থানে কিছুক্ষণ ব্যায়াম করার অভ্যাস রাখা খুব ভাল। ইহাতে আয়ু বর্দ্ধিত হয়।

সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয়ে সংযম অভ্যাস করিবেন। [illegible] রক্ষার পক্ষে সংযমের অপেক্ষা হিতকর আর [illegible] নাই।

রিপু দমনের অভ্যাস রাখা খুব ভাল। [illegible] উত্তেজনা কেবল যে নৈতিক হিসাবে অহিতকর তাহা নহে, উহা স্বাস্থ্যের পক্ষেও অনিষ্টকর। ক্রোধ [illegible] সংযত করিতে না পারিলে মস্তিষ্ক বিকার যে [illegible] তাহা ত নিত্যই প্রত্যক্ষ করা যায়।

দৈনিক সহজ ব্যায়াম।

লেখক—শ্রীভৈরবচন্দ্র সেন।

আজকাল বালক-বালিকা যুবক-যুবতী প্রভৃতির স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সকল দেশেই নানাপ্রকার আলোচনা চলিতেছে। ব্যায়াম যে শরীর রক্ষা ও গঠন বিষয়ে বিশেষ উপকারী তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তবে সকল প্রকার ব্যায়াম সকলের পক্ষে সমান উপযোগী নহে। কতকগুলি ব্যায়াম বালকগণের উপযোগী এবং বাল্যাবস্থায় করা যাইতে পারে; কিন্তু যৌবনাবস্থায় যুবকগণের পক্ষে তাহা উপযোগী নহে।

সহজ ব্যায়ামের মধ্যে সন্তরণ ও ভ্রমণাদি আছে। কিন্তু সন্তরণ বেশি অভ্যাস করিলে উপকারের অপেক্ষা অপকারই বেশি হয়। ভ্রমণ প্রাতে ও সন্ধ্যায় বেশ উপকারী। কিন্তু ইহাতে বিদ্যার্থীশিক্ষার্থী বালক, ব্যক্তিবিশেষের (ব্যবসাদার) পক্ষে ও চাকুরে লোকের পক্ষে সময়াভাব হয়। আজকাল প্রাইমারী হইতে প্রবেশিকা কিংবা তদূর্দ্ধ পর্য্যন্ত পাঠার্থীদের পাঠ্য পুস্তকের পীড়নে বালক ও যুবকগণ সারাদিন পাঠাভ্যাসে গৃহে ও বিদ্যালয়ে আবদ্ধ থাকে। ফলে ইহাদের ব্যায়াম কার্য্যে সময়াভাব। কিন্তু মানসিক পরিশ্রম যে পরিমাণে করা হয় তদুপযুক্ত শারীরিক পরিশ্রমেরও প্রয়োজন। নতুবা কেবল মানসিক পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন হইয়া নানাবিধ পীড়ার আকর হইয়া পড়ে। অনেকে এইরূপ দেহ লইয়া সারাজীবন কষ্টে কালাতিপাত করেন; অথবা অকালে কাল-কবলে নিপতিত হন। তাঁহাদের পাঠ্য জীবনের সকল আশা ভরসা চিরদিনের জন্য কাল-সাগরের অতল জলে ডুবিয়া যায়। প্রায় অনেক পিতা মাতা বালক-বালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে যেরূপ চেষ্টা ও যত্ন করেন, সন্তানগণের শরীর রক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাদৃশ যত্ন করেন না। যাঁহাদের অবস্থা ভাল আছে, তাঁহারা বালক-বালিকাগণের শিক্ষার জন্য গৃহ-শিক্ষক উচ্চ বেতনে নিযুক্ত করেন। সেই শিক্ষক পরদিনের পাঠোপযোগী পাঠ শিক্ষা দিয়া যান। কিন্তু শুধু পাঠশিক্ষা দ্বারা ছেলের সম্পূর্ণ শিক্ষা হয় না, তাহার আর একটী মহৎ শিক্ষা চির জীবনের জন্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। পাঠ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আর নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা ও শরীর রক্ষা বা স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করাও প্রয়োজন। অনেকে হয় ত স্কুল পাঠশালার দৈনিক পাঠের ওজর দিতে পারেন। কিন্তু রবিবার ও অন্যান্য ছুটীর দিনে ব্যায়াম চর্চ্চার জন্য বালক বালিকাগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইহাতে বালক-বালিকারা যেমন একদিকে মানসিক শিক্ষালাভ করিবে, অন্যদিকে তেমনই শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে শিক্ষা করিবে। আজকাল অর্থোপার্জ্জনই সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে। কিন্তু শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষা না হইলে, সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সাধিত হয় না। একদিকে যেমন অর্থোপার্জ্জন হয়, অন্যদিকে পীড়ার আকর স্বরূপ দেহখানি হইতে এক একটী পীড়া উৎপন্ন হইয়া অর্থোপার্জ্জনের ক্ষতি করে। এমন কি সময়ে সময়ে শয্যাশায়ী হইতে হয়। তখন চিকিৎসক ও ঔষধ প্রভৃতিতে অজস্র অর্থব্যয় হইয়া পড়ে। অনেকে ভাবেন না বা দেখেন না যে, শারীরিক পরিশ্রমের অভাবেই এই সকল রোগ জন্মিয়াছে। মানসিক ও দৈহিক বল এ জগতে সমান প্রয়োজনীয়। এবং এই উভয়বিধ বল দ্বারা আত্ম', দেশ, ও সমাজ রক্ষা করা হয়।

এক্ষণে বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগের ব্যায়াম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বালক ও পুরুষগণের ন্যায় বালিকা ও স্ত্রীলোকগণের পক্ষে ব্যায়াম কম প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগের

ব্যায়াম, বালক ও যুবকগণের ব্যায়ামের ন্যায় কোন কঠিন ব্যায়াম হইতে পারে না। কারণ, পুরুষের দেহ যে ধাতুতে গঠিত স্ত্রীলোকের দেহ সে ধাতুতে গঠিত নহে। সুতরাং ব্যায়াম সম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষ উভয়ের সমান ব্যবস্থা হইতে পারে না। পূর্ব্বে এতদ্দেশে বালিকা ও স্ত্রীলোকগণ স্বহস্তে নিজ নিজ সংসারের অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু আজকাল অনেক বালিকা ও স্ত্রীলোক স্বহস্তে সেই সমস্ত গৃহকর্ম্ম করা দাসীর কর্ম্ম বা নীচকর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। এমন কি অনেকের সামর্থ্য থাকিতেও স্বহস্তে রন্ধন করিয়া নিজ নিজ স্বামী ও সন্তানগণকে বা পরিবারের অন্যান্যকে খাওয়াইয়া বিমল আনন্দ লাভে বঞ্চিত থাকেন। এই স্বহস্তে রন্ধন ও পরিবেশন দ্বারা একদিকে মনে আনন্দ ও অন্যদিকে শারীরিক ব্যায়াম ও গৃহস্থের অর্থরক্ষা হয়। এখনকার অনেক স্ত্রীলোক রন্ধন ও সাংসারিক পরিশ্রমের দায় এড়াইবার জন্য পৃথক হইবার মতলবে নানা অছিলার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং অনেক পুরুষও তৎপরামর্শ অনুযায়ী কার্য্য করেন। এইরূপে উক্ত স্ত্রীলোকগণ শুধু যে নিজেরা অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া নানাবিধ পীড়াক্রান্ত হয়েন তাহা নহে; তাঁহারা সংসারের সকলকেই অসুখী করিয়া থাকেন।

এ কথা তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তাঁহাদের গর্ভজাত বালক বালিকাগণ মাতার অলসতার জন্য পীড়াযুক্ত হয়। এক্ষণে বাঙ্গালী যুবক ও যুবতীগণ বিলাসিতায় বিভোর হইয়া এইরূপে সোণার সংসার উৎসন্ন করিতেছেন এবং আপনারাও উৎসন্নের পথে অগ্রসর হইতেছেন। পরিবারের স্ত্রীলোকগণের কার্য্যে অবহেলার জন্য পাচক পাচিকা ও দাস দাসী নিযুক্ত হইতেছে। ইহাতে সংসারে একদিকে অর্থব্যয় ও অন্যদিকে স্ত্রীলোকদিগের পীড়ার বৃদ্ধি হইতেছে। বাল্যকাল হইতে বালিকাগণ পরিশ্রম করিতে অনভ্যাস হেতু গর্ভ ধারণের শক্তির হ্রাস জন্য মৃত বা রুগ্ন সন্তান প্রসব করিতেছেন। ইহা শুধু মৃতবৎসা দোষ নহে। বিনা পরিশ্রমে রজোদোষ স্ত্রীলোকগণের স্বভাবতই জন্মে। হিন্দুরা বলে "মেয়েরাই গৃহলক্ষ্মী"। সংসারের কার্য্য হইতে রক্ষা পাইলেই যে রক্ষা হইল তাহা নহে, ইহাতে বালিকা ও স্ত্রীলোকগণের শরীরও পীড়ার আকর হয়। বাল্যাবস্থা হইতে স্ত্রীলোকগণের গৃহকার্য্য অভ্যাস দ্বারা সংসার রক্ষা ও স্বাস্থ্য রক্ষা, শরীর রক্ষা বিশেষ প্রয়োজন। ইহাতে শারীরিক ব্যায়াম বেশ সুন্দর হয়। বিলাসিতায় মানবকে যে জড় ও অকর্ম্মণ্য করে তাহা বিগত ইয়োরোপীয় যুদ্ধে ইয়োরোপীয় নরনারী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। অতএব মানবমাত্রেরই শারীরিক ব্যায়াম পৃথক ভাবে বা গৃহ কর্ম্ম উপলক্ষে যে প্রকারে হউক দৈনিক করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে দৈনিক সহজ ব্যায়ামের উপায় নিম্নে তিন প্রকার লিখিতেছি। ইহা সহজ সাধ্য ও সকলের পক্ষে উপযোগী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

রাত্রে নিদ্রাবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়া যায়। নিদ্রাভঙ্গের পর পুনরায় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল ইন্দ্রিয় ক্রমে ক্রমে সতেজ হয়। অতএব সেই সব শিথিল ইন্দ্রিয়কে সতেজ ও কর্ম্মক্ষম করা প্রয়োজন। বিশেষতঃ নিদ্রাবস্থায় আমাদের হৃদ্‌যন্ত্র বা ফুস্ ফুস্ সঙ্কুচিত থাকে, তজ্জন্য জড়তা উৎপাদন করায় শরীর ভার ভার বোধ হয়।

(ক) প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া বিছানায় সোজাভাবে চিৎ হইয়া শুইতে হইবে। তৎপরে হাত ২টী মাথার দিকে সোজা ভাবে তুলিয়া লম্বালম্বি দুই পার্শ্বে পায়ের দিকে নামাইতে হইবে, পুনরায় ঐরূপ ভাবে ক্রমান্বয়ে করিতে হইবে। এইরূপ প্রথম দিনে ৫ বার, দ্বিতীয় দিনে ১০ বার ইত্যাদিরূপে বৃদ্ধি করিতে পারেন।

(খ) পূর্ব্বের মত চিৎ অবস্থায় থাকিয়া দুইটী হাত পার্শ্ব দিকে লম্বালম্বি বিস্তৃত করিয়া বক্ষঃস্থলে করিতে হইবে। পুনরায় ঐরূপ হাত বিস্তার করিয়া বুকের উপর আনিতে হইবে। এইরূপ প্রথম দিনে দ্বিতীয় দিনে ১০ বার এইরূপ মাত্রায় বৃদ্ধি করিতে পারেন।

(গ) শয্যায় পূর্ব্ববৎ চিৎ হইয়া সোজাসুজি শুইয়া পা উর্দ্ধদিকে অর্দ্ধ উচ্চ রাখিয়া পায়ের গোড়ালি ২ টী নিতম্ব প্রদেশে অর্থাৎ পাছা স্পর্শ করিয়া পুনরায় বিস্তৃত করিয়া ঐরূপ ভাবে নিতম্ব স্পর্শ করিতে হইবে। ইহাও উপরি উক্ত প্রকারে দৈনিক ৫ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। ইহা দ্বারা উদরের বায়ু সঞ্চালিত হইবে।

উল্লিখিত ব্যায়াম ২ টী (ক ও খ চিহ্নিত) দ্বারা ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া বৃদ্ধি হইয়া বক্ষঃস্থল প্রশস্ত হইবে; এবং তৎসঙ্গে রক্তসঞ্চালনের ক্রিয়া সুন্দর ভাবে হইবে। অভ্যাস মত তিনপ্রকার দৈনিক সহজ ব্যায়াম এক সঙ্গে করিতে পারেন। ইহা প্রত্যহ প্রাতঃকালে বিছানায় থাকিয়া সহজে হইবে। ইহা বালক, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই করিতে পারিবেন। ইহাতে রৌদ্র বৃষ্টি শীত ইত্যাদির ব্যতিক্রম ঘটিবে না। অন্তঃপুরচারিণী ও সহরবাসিনীগণ ছাতে খোলা বাতাসে বেড়াইলেও ফল পাওয়া যাইতে পারে।

স্নান

স্নানের প্রয়োজনীয়তা এক প্রকার সকলেই অবগত আছেন। শরীরের ভিতরের এবং বাহিরের ময়লা দূরীকরণই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। সকলেই জানেন আমাদের চর্ম্ম বহু-ছিদ্রযুক্ত। এই সকল ছিদ্র দিয়া ঘর্ম্ম প্রভৃতির আকারে ময়লা বাহির হইয়া যায়। এই ময়লার জলীয় অংশ বাষ্পের আকারে উড়িয়া গেলে আঠাল অংশ ছিদ্রমুখে থাকিয়া যায়। এই আঠাল অংশ আবার বাহিরের ধূলিকণার সহিত মিশ্রিত হইয়া চর্ম্মের উপর এক স্তর পড়িয়া যায়। এই ময়লার স্তর দূরীভূত করিয়া শরীরকে চাকচিক্যশালী ও পবিত্র করিবার জন্যই স্নানের প্রয়োজন। স্নান করিলে খোস পাঁচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগ জন্মে না। ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন:—

পবিত্রং বৃষ্যমায়ুষ্যং শ্রমস্বেদমলাপহম্।
শরীর বলসন্ধানং স্নানমোজস্করং পরম্॥

শরীর শুচি করিবার জন্য ও দেবারাধনার জন্যও হিন্দুগণ স্নান করিয়া থাকেন। মুসলমানেরাও নমাজ করিবার পূর্ব্বে হাত পা ধুইয়া থাকেন। সুস্থ শরীরে ঠাণ্ডা জলে স্নান করাই বিধেয়। নদীতে বা পুষ্করিণীতে অবগাহন স্নান করাই উচিত। কিন্তু খুব বেশীক্ষণ জলে থাকা কখনই উচিত নহে। গ্রীষ্মকালে দেখিতে পাওয়া যায় যে অনেকেই অধিক ক্ষণ জলে থাকিয়া শরীর ঠাণ্ডা করিবার বৃথা চেষ্টা করেন। শরীরের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় (oxidation) যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় তাহাই শরীরকে গরম রাখে। অধিকক্ষণ জলে থাকিলে ঐ তাপক্ষয় হইয়া শরীরের মহা অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। আবার অধিক ঠাণ্ডা জলে স্নান করাও উচিত নয়। দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে অল্প গরম জলে গা ধুইয়া ফেলিয়া মাথায় ঠাণ্ডা জল দেওয়া কর্ত্তব্য। সুশ্রুতে দেখিতে পাওয়া যায়:—

উষ্ণেন শিরসঃ স্নানমহিতং চক্ষুষঃ সদা
শীতেন শিরসঃ স্নানং চক্ষুষ্যমিতি নির্দ্দিশেৎ॥

মস্তকে গরম জল দেওয়া উচিত নয়। উহাতে চক্ষুর দোষ ঘটে। কিন্তু বাতশ্লেষ্মাগ্রস্ত রোগীর পক্ষে মস্তকে গরম জল দেওয়াই হিতকর। সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে ঠাণ্ডা জলে স্নান করা যেমন হিতকর, সেইরূপ তাহাতে শরীরের অবসাদও দূর হয়। শীতকালে খুব ঠাণ্ডা জলে স্নান করা যেমন খারাপ, গ্রীষ্মকালে সেইরূপ

গরম জলে স্নান করাও অনিষ্টকর। ইহাতে রক্তপিত্তাদির বিকার ঘটিতে পারে। স্নানের সময় শরীরের উত্তাপ অনেক পরিমাণে ক্ষয় হয়। অতএব বেশীক্ষণ জলে থাকা যেমন খারাপ, ভিজা কাপড়ে বেশীক্ষণ থাকাও সেইরূপ অসঙ্গত। স্নান করিয়াই ভিজা কাপড় ছাড়িয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করা কর্ত্তব্য। যাঁহাদিগের বাটী হইতে দূরে স্নান করিতে যাইতে হয়, তাঁহাদিগের পক্ষে শুষ্ক বস্ত্র সঙ্গে লইয়া যাওয়া উচিত। ইহাতে শরীরের উত্তাপ রক্ষিত হয় এবং সর্দ্দি কাশি লাগিয়া শরীর খারাপ হইবারও সম্ভবনা থাকে না। বাহিরে স্নান করা অপেক্ষা ঘরের ভিতর স্নান করাই হিতকর। কিন্তু এদেশে তাহা সম্ভব নয় বলিয়া স্নানের পরক্ষণেই শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করা উচিত। হিন্দু মহিলাদিগের অনেকেরই 'শুচিবাই' থাকিতে দেখা যায়। প্রতিবার মলমূত্রাদি ত্যাগ করিয়া ইঁহারা স্নান করিয়া থাকেন। সুস্থ শরীরে ইহা চলিতে পারে; কিন্তু অসুস্থ শরীরে ইহা করা সমীচীন নহে।

স্নানের পূর্ব্বে অনেকেই হাতে করিয়া জল লইয়া মস্তকের উপরিভাগে ছিটাইয়া দেন। যে উদ্দেশ্যে সমস্ত শরীর জলে ডুবাইবার আগে মাথায় জল দিবার ব্যবস্থা আছে, সে উদ্দেশ্য ইহাতে সাধিত হয় না। সর্ব্বাগ্রে শরীরে ঠাণ্ডা জল লাগিয়া সর্দ্দি কাসি হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই আগে মাথায় জল দিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সামান্য জল মাথার উপর ছিটাইয়া দেওয়াতে সে দোষ নিরাকৃত হয় না। মস্তক আগে উত্তমরূপে জল দিয়া ধুইয়া ফেলিয়া তৎপরে অবগাহন করা উচিত। যাঁহারা বাড়ীতে তোলা জলে স্নান করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে মাথায় জল ঢালিয়া দেওয়া উচিত। গর্ভিণীদিগের হঠাৎ ঠাণ্ডা জলে নাবা বা খুব ঠাণ্ডা জল গায়ে দেওয়া সর্ব্বতোভাবে পরিহর্ত্তব্য।

শীতকালে ঠাণ্ডার ভয়ে অনেকে স্নানটী একেবারেই পরিত্যাগ করেন। শীতকালে স্নান না করিলে শৈত্য-ভাব দূর না হইয়া বরং বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে। স্নান করিয়া তৎক্ষণাৎ গায়ে জামা দিলে অল্পক্ষণ [illegible] শরীর বেশ গরম হইয়া উঠে। অনেকে [illegible] শীতকালে ঈষদুষ্ণ গরম জলে স্নান করিয়া থাকে [illegible] তদ্ভিন্ন প্রত্যহ গরম জলে স্নান করিলে স্নায়বি [illegible] দৌর্ব্বল্য ঘটে এবং শরীরের মাংস চর্ম্ম শিথি [illegible] হইয়া পড়ে। সুতরাং শীতকাল ভিন্ন গরম জ [illegible] স্নান করা সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য। দুর্ব্বল কিং [illegible] রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে ঠাণ্ডা জল ব্যবহার না কর [illegible] সঙ্গত। শরীর অসুস্থ হইলে স্নান করা উচিত নয় [illegible] তবে সর্দ্দি হইলে ঘরের মধ্যে ঈষদুষ্ণ জলে স্ন [illegible] করিয়া গরম জামা গায়ে দিলে সর্দ্দির অনেক উপক [illegible] হয়।

এতদ্দেশে আহারের পূর্ব্বে স্নানের নিয়ম রহিয়াছে এবং তাহাই স্বাস্থ্য-বিধিসম্মত। আহারের পরে স্ন [illegible] করিতে হইলে অন্ততঃ পক্ষে তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করি [illegible] স্নান করা সঙ্গত; নতুবা পরিপাক ক্রিয়ার বাধা হ [illegible] অনেকে আহার করিয়া গাত্র ধৌত করেন, ইহা [illegible] স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর।

অত্যন্ত পরিশ্রমের পর কিংবা রৌদ্রে অনেকক্ষ [illegible] ভ্রমণের পরই স্নান করা উচিত নয়। পরিশ্রম করি [illegible] শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে, সে অবস্থায় স্নান করিলে কি [illegible] রৌদ্রতপ্ত দেহে হঠাৎ ঠাণ্ডা জল দিলে সর্দ্দি ও [illegible] হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। ঘর্ম্মাক্ত শরীরে শীতল জ [illegible] দিলে ঘর্ম্মাবরোধ হেতু হঠাৎ মৃত্যু সংঘটিত হওয়াও অস [illegible] নহে। স্নানের সর্ব্বপ্রধান আনুষঙ্গিক কার্য্য সর্ব্বশরী [illegible] ও মাথায় তেল দেওয়া। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে স [illegible] সাবানের সমধিক প্রসারের জন্যই হউক কিংবা আল [illegible] বশতঃই হউক, গাত্রে তৈল মর্দ্দন ব্যবস্থা এদে [illegible] লুপ্তপ্রায়। তৈলে শরীরের ময়লা দূর হয়; তৈল চর্ম্ম ম [illegible] করিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। সাবান ব্যবহার করি [illegible] শরীরের ময়লা দূরীভূত হয় কিন্তু তাহাতে চর্ম্ম রুক্ষ [illegible] তেলে জামা কাপড় ময়লা হইবার ভয়ে অনেকে তৈ [illegible] মাখেন না। ভাল করিয়া শরীরে তৈল বসাইয়া [illegible] এবং স্নানের সময় গামছা দ্বারা ভাল করিয়া শরীর ঘ [illegible] ভয় থাকে না। ভিজা গামছা দ্বারা শরীর [illegible] লেও তৈল সম্পূর্ণভাবে ছাড়ে না; এজন্য স্নানের [illegible] শুষ্ক তোয়ালে দ্বারা গা মুছিয়া ফেলা উচিত। তৈলের উপকার সম্বন্ধে চরক বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি তৈল দ্বারা সর্ব্বদা মস্তক আর্দ্র রাখে, তাঁহার শিরঃশূল, [illegible] কেশের অকাল পক্কতা ও চুলউঠা নিবারিত হয়। [illegible] স্থিরতার বল বৃদ্ধি হয়, কেশ সকল দৃঢ়মূল ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। [illegible] দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলের প্রসন্নতা, ত্বকের সৌন্দর্য্য ও [illegible] সাধিত হয়, এবং সুনিদ্রা হয়। চক্রের ধুরায় [illegible] তৈল দিলে তাহা যেমন দৃঢ় হয় শরীরে তেল দিলে [illegible] তেমনি দৃঢ় ও সুত্বক থাকে। অভ্যঙ্গসেবীর [illegible] জরাভাব অল্প হইয়া থাকে।"

তৈলে যে চর্ম্ম মসৃণ করে ও চুলের অকাল-পক্কতা [illegible] হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। [illegible] কথায় বলে "তেলে জলেই বাঙ্গালীর শ্রী"। [illegible] মিত তৈল ব্যবহারে মস্তিষ্ক শীতল থাকে, কেশের

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। তবে যাঁহারা রুক্ষ কেশের পক্ষপাতী তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

মাথায় মাখিবার পক্ষে সরিসার তেল অপেক্ষা তিলের তেল কিংবা নারিকেল তেলই সমধিক প্রশস্ত। সরিসার তেলে ঝাঁজ বেশী, বিশেষতঃ খাঁটী সরিসার তেল অধিকাংশ স্থলেই দুষ্প্রাপ্য বলিয়া ভেজাল তেল মাখিয়া চুলে আটা ধরিয়া যায়। এদেশের স্ত্রীলোকেরা বেশীর ভাগই নারিকেল তেল মাথায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। নারিকেল তেলে অনেক সময় মাথায় দুর্গন্ধ হয়। ইহার সহিত কিছু সুগন্ধিদ্রব্য মিশাইয়া লইলে সে দোষ দূর হয়। মাথায় মাখিবার পক্ষে তিল তেলই অনেকে বেশী উপকারী মনে করেন। বায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে তিলের তেল মাখিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে। তবে তিলের তেলে চুলে কিছু আটা হয়; সেজন্য উহা স্ত্রীলোকদের ব্যবহারের পক্ষে তত উপযোগী নহে।

যক্ষ্মা রোগ নিবারণের কয়েকটি সাধারণ উপায়।

উদুরি বাদুরি আর যক্ষ্মা

এই তিন রোগ যার তার নাই রক্ষা।

যক্ষ্মা রোগ কঠিন ব্যাধি, ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু চেষ্টা করিলে ও বিশেষরূপে সতর্কতা অবলম্বন করিলে, এই রোগের আক্রমণের পরও রোগী অতি সহজে কাবু হয় না। স্বাস্থ্য বিষয়ে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম পালন করিলে সহজে এই রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। আমেরিকা ও নিউজিল্যাণ্ডে পূর্ব্বে এই রোগে বহু লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইত; কিন্তু তথায় বিশেষরূপে সতর্কতা

[illegible] দেশে যক্ষ্মা রোগের প্রভাব বিস্তার দেখিয়া আজকাল [illegible] লেই আশঙ্কিত হইতেছেন। যক্ষ্মা রোগেই অধিকাংশ [illegible] র মৃত্যু হয়। বাংলা দেশের সহরগুলিতে, বিশেষতঃ [illegible] কীর্ণ স্থানে এই রোগের বিশেষ প্রভাব দেখা [illegible] তেছে। পল্লীগ্রামে, যেখানে লোক খোলা যায়গায় [illegible] করিতে ও নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে পারে, [illegible] য় এই রোগ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে না। [illegible] মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে শান্ত গ্রামগুলিও এই [illegible] রোগের কবল হইতে রক্ষা পাইবে না। সাধারণের [illegible] যে, যক্ষ্মা রোগ হইলে রোগীর নিস্তার নাই। [illegible] রণ লোকে বলে,

অবলম্বন করাতে এই রোগের প্রকোপ অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে।

প্রত্যেক মানুষ কিছু পরিমাণে অন্তর্নিহিত শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই জীবনী-শক্তিই মানুষের বৃদ্ধির কারণ; এই শক্তির প্রভাবেই মানুষ রোগের বীজাণুর সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। যদি কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনা না ঘটে তবে সেই শক্তির প্রভাবে মানুষ নির্দ্দিষ্ট উন্নতির সীমা পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারে। রোগের কারণ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে মনে হয়, অনেক সময়ে এই শক্তি কমিয়া যায় বলিয়া লোকে ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়। জীবনী-শক্তি নিঃশেষ হইয়া গেলে কিম্বা কমিয়া গেলে, লোকে আর ব্যাধির আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে না। শৈশব ও বাল্য, বাল্য ও যৌবনের সন্ধি স্থলে যখন শরীরের বৃদ্ধি অতি মাত্রায় চলিতে থাকে তখন অনেককে কঠিন রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু চেষ্টা করিলে এই শক্তি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। অতএব সকলের প্রধান কর্ত্তব্য, এই শক্তির ক্ষয় হইতে না দেওয়া। স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রথম হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিলে লোকের জীবনী-শক্তি সহজে নষ্ট হইয়া যায় না। কিন্তু শরীরের যত্ন না করিলে শীঘ্রই উহা রোগের আধার হইয়া পড়ে। স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে অধিকাংশ স্থলেই শরীরের অযত্ন ও অবহেলার হেতু আমরা যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হই। বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে প্রকার ক্ষীণজীবী হইয়া জন্মগ্রহণ করি এবং চতুর্দ্দিকে ক্ষয় রোগের যেরূপভাবে বীজাণু বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাতে আমরা যে কেহ কেহ এই রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়।

যে সমস্ত শিশু পিতামাতার দুর্ব্বলতার অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সহজেই এই রোগে আক্রান্ত হয়। কিন্তু তাহাদিগকে বদ্ধ গৃহে না রাখিয়া উন্মুক্ত স্থানে লালন পালন করিলে যক্ষ্মা রোগের আশঙ্কা খুবই কম দেখা যায়। অতি বাল্য বয়স হইতেই এই রোগের সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এবং নিয়মিত ... ও ক্লেদ সহজে বাহির হইয়া যায়। নচেৎ রূপে চেষ্টা করিলে অনেক স্থলে সুফল পাওয়া যায়। ... রোগ উৎপন্ন হয়। মদ, তাড়ী, গাঁজা, চা, কাফি

নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ বায়ু এই রোগের প্র... প্রভৃতি মাদকদ্রব্য বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রতিষেধক। দিবা রাত্রি সকল সময়ে ইহা সেবন ... তাতে পরিপাক শক্তির বিশেষ বাধা জন্মে; ইহারা উচিত। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে আহা... শয়, যকৃত প্রভৃতি অংশকে দুর্ব্বল করে এবং বাত অভাবে মানুষ বরং কিছু দিন বাঁচিতে পারে, ... প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি করে। আমরা যাহা আহার্য্যরূপে বিশুদ্ধ বায়ু না হইলে জীবন ধারণ করা অসম্ভব ... গ্রহণ করি তাহাতে শরীরের ধ্বংস না হইয়া যেন পুষ্টি রাত্রিকালে দরজা জানালা খুলিয়া নিদ্রা যাওয়া উচিত ... লাভ হয় এই বিষয়ে সকলের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। কোনও কোনও লোকের এমনই বদ অভ্যাস আছে ... নিয়মিত রূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় কি না সকলের এই তাহারা রাত্রে সর্দ্দি লাগিবার ভয়ে দরজা জানালা ... কে মনোযোগী হইতে হইবে। নিয়মিত রূপে পরিশ্রম করিয়া নিদ্রা যান; ইহা শরীরের পক্ষে বিশেষ হানিক... করিলে সহজে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় না। অকারণে, অনর্থক ঘরের মধ্যে সকল সময়ে অবাধে বায়ুর চলাচল ক... লাপ লওয়া উচিত নহে। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের দেওয়া উচিত। বদ্ধ বায়ু জীবনী-শক্তিকে খর্ব্ব ক... ব্যবহিত পরে এবং রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার অব্যবহিত ঘরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আলোর ব্যবস্থা করি... র্ব্বে জল পান করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। প্রতিদিন যে বাতাস একবার মাত্রও সেবন করা হইয়াছে, ... া জলে উত্তমরূপে শরীর মার্জ্জনা করিয়া স্নান তীব্র বিষাক্ত। যে সমস্ত শিশুকে বদ্ধ গৃহে বাস ক... রিবে। প্রত্যূষে এবং সন্ধ্যায় প্রতিদিন ৩।৪ মাইল হয়, তাহারা কখনও নীরোগ হইয়া জীবন ধারণ ক... ণ করিবে, অথবা উপযুক্ত রূপে ব্যায়াম করিবে। পারে না এবং তাহাদের শরীর কখনও বৃদ্ধি পা... লা জায়গায় ব্যায়াম করা উচিত। যে সকল পারে না। যে মানুষ যত বেশী বাহিরে খোলা স্থানে ... লককে ৫।৬ ঘণ্টা বিদ্যালয়-গৃহে আবদ্ধ থাকিতে করে, সে তত বেশী রোগের সহিত সংগ্রাম ক... য়, যথাসম্ভব অবশিষ্ট সময় তাহাদিগের খোলা স্থানে সমর্থ হয়। অনেক সময়ে দেখা যায়, সাধারণ ... কা দরকার। বিদ্যালয়ে পাঠের সময় কিছু কমাইলে যে সমস্ত দিন মাঠে কাজ করে, যত সহজে রো... বিদ্যাশিক্ষার গুরু চাপ কিছু পরিমাণে হ্রাস করিতে আক্রমণ নিবারণ করিতে পারে, অপরে ... রিলে, বালকগণের মধ্যে যক্ষ্মার প্রকোপ কমান যাইতে পারে না। আশ্রয় লাভের জন্যই বাসস্থানের ... রে। প্রত্যেক বালককে নিজ নিজ শরীরের মাংস-সারাজীবন কারা-যন্ত্রণা ভোগ করা বাসস্থান নি... পেশী সবল করিতে হইবে। অনেক পিতামাতা বা শিক্ষক করিবার উদ্দেশ্য নহে। রক্তই মানুষের জীবন। বি... ন করেন যে, যে সময় ছাত্র ব্যায়ামে অতিবাহিত বায়ুর সাহায্যেই রক্ত শোধিত হয়। পল্লীগ্রামের গৃহ... রে, তাহা তাহার পক্ষে অপব্যয় হয়। কিন্তু ইহা অতি বিশুদ্ধ বায়ু-চলাচলের উপযুক্ত নহে। তাহার ... রাত্মক ভুল ধারণা। প্রতি দিন সকালে ১৫ মিনিট সংস্কার করা উচিত। ... াল ব্যায়াম করিলে মনে যে স্ফূর্ত্তি হয় তাহাতে সমস্ত

তার পর খাদ্যের উপরে আমাদের বিশেষ ... বস প্রফুল্ল চিত্তে কার্য্য করিতে পারা যায়। ক্রমাগত রাখা দরকার। উপযুক্ত আহার্য্য না পাইলে শারী... র বৎসর ব্যায়াম করিলে বাকী সমস্ত জীবনটাতেই ও মানসিক সকল প্রকার পরিশ্রমই ব্যর্থ হইয়া ... াহার ফলভোগ করা যায় এমন কি বৃদ্ধ বয়সেও সহজে প্রচুর পরিমাণে শীতল জল পান করা উচিত। ... া আক্রমণ করিতে পারে না। পরিমাণে জল পান করিলে শরীরের মূধ্যস্থ অনা... উপযুক্ত সময়ে সকলের শয়ন করা উচিত। মধ্য-রাত্রি পর্য্যন্ত আলো জ্বালিয়া পাঠাভ্যাস বা কোনও কার্য্য করিলে তাহাতে শরীরের বিশেষ ক্ষতি হয়। এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিলে, সহজে জীবনী-শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং রোগের হস্ত হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে। যৌবন কালে পাঁচ কি দশবৎসর লোকে শরীরের উপরে নানারূপ অত্যাচার করিতে পারে, তাহা তখন সহ্যও হয়। কাজেই উহার অনিষ্টকারিতা তখন লোকে বুঝিতে পারে না। কিন্তু যৌবন কাহারও চিরকাল থাকে না। ৩০ বৎসর বয়স না হইতেই কার্য্যে আর উৎসাহ থাকে না। ৪০।৪৫ বৎসরের পর লোকে আজ-কাল এক প্রকার বৃদ্ধ হইয়া যায়। ইহা যৌবন কালে শক্তির অপব্যহারের ফল। দুর্ব্বল শরীরকে সবল করিতে চেষ্টা করা উচিত। আর যদি শরীর সুস্থ ও সবল হয়, তাহা হইলেও তাহারও ক্ষমতার সীমা আছে। শরীর সবল হইলেও সকল প্রকার অত্যাচার সহ্য করিতে পারে না।

সকল সময়ে মনকে প্রফুল্ল রাখা উচিত। সুসংসর্গে থাকিলে মনে আনন্দ থাকে। আর কুসংসর্গে বৃথা আমোদ প্রমোদ করিয়া লোকে সুখ ও স্বাস্থ্য উভয়ই নষ্ট করে। নৈতিক নিয়মগুলি পালন করিলে সহজে শরীরে রোগ প্রবেশ করিতে পারে না। আমাদের শাস্ত্রে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত বিধি ব্যবস্থা আছে, তাহা পালন করিলে লোকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়। কিন্তু আমরা ঐ সমস্ত নিয়ম পালনে অবহেলা করি বলিয়াই চিরকাল শারীরিক পীড়ায় কষ্ট পাই।

উপরে যে সমস্ত নিয়ম বর্ণিত হইল, উহা পালন করিলে যে কেবল রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় তাহা নহে; রোগের অবস্থায়ও এই সকল নিয়ম পালন করিলে উহা বিস্তার লাভ করিতে পারে না। অবশ্য যক্ষ্মা রোগের বীজাণু এক-বার শরীরে প্রবেশ করিলে উহাকে সহজে দূর করা যায় না। কিন্তু এই সকল নিয়ম পালন করিলে রোগের অনেক উপশম হয়।

যে কোনও স্থানের স্বাস্থ্যের হিসাব লইলে দেখা যায় যে, সেখানকার এক-দশমাংশ লোক সকল সময়েই কোন না কোনও পীড়ায় আক্রান্ত আছে। এবং ইহাদের মধ্যে শতকরা ২৫ জন ক্ষয় রোগাক্রান্ত। ইহা হইতে যক্ষ্মা রোগের গুরুত্ব অনুভূত হয়। বোধ হয় পৃথিবীর অর্দ্ধেক পীড়াই আরোগ্যক্ষম। কেহ কেহ বলেন, চেষ্টা করিলে চারি ভাগের তিনভাগ পীড়ার হাত হইতে আরোগ্য লাভ করা যায়। ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, সাবধানতা অবলম্বন করিলে লোকে তাহাদের সাধারণ আয়ুষ্কালের উপর গড়ে পরে আরও পনর বৎসর কার্য্যক্ষম থাকিতে পারে। এই ১৫ বৎসরের অর্দ্ধেকের অধিক কাল—যক্ষ্মা, জ্বর ও আর পাঁচটা রোগের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিলে—লাভ করা যাইতে পারে। কেবল মাত্র বিশুদ্ধ বাতাস, নির্ম্মল জল ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য দ্বারা এই রোগসমূহের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে। এই অতিরিক্ত পনর বৎসর ব্যাপী কার্য্যকরী জীবন দেশের সুখ ও ... বৃদ্ধির পক্ষে কত সহায়তা করে তাহা সহজেই ... করা যাইতে পারে।

স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা আমরা সকলেই ... করি। জীবনের অন্য সকল সম্পদ স্বাস্থ্য সম্পদের নিকট তুচ্ছ। কে দুঃখে ও কষ্টে এই জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করে? সুতরাং যাহা শরীরের পক্ষে, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ড, স্নায়ুও পাকস্থলীর পক্ষে অনিষ্টকর, তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করা উচিত। নিজে সতর্কতা অবলম্বন করিলে চিকিৎসক ও চিকিৎসালয় হইতে দূরে থাকা যায়। একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক বলিয়াছিলেন ... আমরা মানুষের অজ্ঞতা নিবন্ধনই জীবন যাপন করিতেছি (We live upon the ignorance of others)। সর্ব্বসাধারণকে স্বাস্থ্য বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জনে সাহায্য করিতে হইবে। ক্ষয় রোগ শরীরে বিস্তার লাভ করিবার পূর্ব্বেই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। বিদ্যালয়ে এই বিষয়ে ছেলেদিগকে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য।

পল্লীস্বাস্থ্য

এবার প্রথমে জলের কথা কহিতে হইবে। গত তিন চারি মাস ধরিয়া আমরা যাহার প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছি, সেই জলাভাবজনিত আর্ত্তনাদ এখন হইতে মফস্বলের চারিদিক হইতে উত্থিত হইতে থাকিবে। গৃহস্থ লোকের পানীয় জলের অভাব খুব কষ্টকর হইলেও, তাহা বরং সহ্য হয়; কিন্তু এই দারুণ গ্রীষ্মে বিদ্যালয়ের কচি কচি বালক-বালিকাদের পানীয় জলের অভাব হইলে, সে কষ্ট অসহ্য। সহযোগী "মেদিনীপুর-হিতৈষী-" এইরূপ একটী বিদ্যালয়ে জলাভাবের সংবাদ পত্রস্থ করিয়াছেন—

বাঘাগেড়্যা স্কুলে জলাভাব।

বাঘাগেড়্যা স্কুলের ছাত্রগণ দারুণ গ্রীষ্মের দিনে পানীয় জলের অভাবে বড়ই কষ্ট পায়। গ্রামে সেক্রেটারী মহাশয়ের যে একটী পুকুর আছে, তাহার জল একেবারেই অপেয় ... উপস্থিত জল সামান্যই আছে, তাহার উপর জল ঘোলা ... শ্লোকায় পরিপূর্ণ। যদিও দোলাদী নদী আছে বটে, ... স্কুল হইতে প্রায় একমাইল দূরে। মধ্যে সেক্রেটারী মহাশয় একটী পাতকূয়া কাটাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা একেবারে ধসিয়া গিয়াছে। স্থানীয় স্কুল সবইন্সপেক্টার বাবু কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, "আমি এখান ... কূয়ার জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডকে অনুরোধ করিব।" তাহা এ পর্য্যন্ত ফলপ্রসূ হয় নাই। শুনিলাম, জনপ্রিয় স্বাস্থ্য হিতৈষী ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বাহাদুর মফস্বলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেক পল্লীর জলাভাব মোচন করিতেছেন; যদি দয়া করিয়া একবার এ অঞ্চলে আসিতেন, তবে অনেক গ্রামের জলকষ্ট নিবারিত হইত। আশা করি, গরীব ... বালিকাগণের পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে সাহেব ... বিস্মৃত হইবেন না।

এ মাসে আমরা পাঠক-পাঠিকাগণকে একটী ... সংবাদ দিতে পারিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি। সহযোগী রাঢ়দীপিকা লিখিয়াছেন—

আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

বাংলা গবর্ণমেণ্ট যশোহর জেলা বোর্ডকে একটী আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়াছেন এবং অনরেজিষ্টার্ড (সরকারী তালিকাভুক্ত নহে) একজন চিকিৎসক নিয়োগও মঞ্জুর করিয়াছেন। এই চিকিৎসালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য জেলা বোর্ড একটি কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি প্রতিষ্ঠিত করিবেন, সিভিল সার্জ্জন বা মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট ইহার সদস্য হইতে পারিবেন। স্বনামধন্য শ্রীযদুনাথ মজুমদার মশোহর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান। তিনি এই সুবিধায় যে আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়টীকে পূর্ণ সিদ্ধি সম্পন্ন করিতে পারিবেন সে বিষয়ে আমরা শেষ ভরসা করি। আশা করি বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণাল্ডসে ... সকল জেলাতেই এইরূপ এক একটী ঔষধালয় প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়া আর্ত্ত প্রজার অমোঘ আশীস্ লাভ করিবেন।

যে সংখ্যার দীপিকা হইতে সংবাদটী সঙ্কলিত হইল, সেই সংখ্যাতেই ঐ ধরণের আর ও একটী সুসংবাদ দিয়া সহযোগিনী আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন,—

রামপুরহাট দাতব্য ঔষধালয়।

রামপুরহাট দাতব্য ঔষধালয় স্থানীয় জনসাধারণের প্রদত্ত মাসিক চাঁদার উপর প্রধানতঃ এবং জেলা বোর্ডের সাহায্যের উপর সামান্যতঃ নির্ভর করিয়া কায়ক্লেশে কোনও প্রকারে নিজ অস্তিত্ব বজাই রাখিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি ইহার গৃহ সংস্কার ও অন্যান্য সরঞ্জাম বাবৎ বড়ই অর্থাভাব ঘটিয়াছিল। রামপুর-হাট মুন্সেফী আদালতের সিনিয়র মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র ... ঘোষ এম-এ, বি-এল. মহোদয় উক্ত অভাবগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানটীর সেক্রেটারী হইয়া অবধি ভিক্ষাভাণ্ড হস্তে জনসাধারণের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। সুখের বিষয় দরিদ্রনারায়ণের সেবাব্রতে মুন্সেফ বাবুর অকৃত্রিম অনুরাগ থাকায় তাঁহার এই পুণ্যানুষ্ঠানের আয়োজন ও সাধনা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এই জেলার ও পার্শ্ববর্ত্তী জেলার দানশীল বহু জমিদার সেক্রেটারী মহাশয়ের কাতর প্রার্থনায় সাড়া দিয়া প্রায় সকলেই কিছু কিছু দান করিয়াছেন। স্থানীয় ভদ্র লোকগণ তাঁহাদের বহু কালের বাকী চাঁদা একবারে মিটাইয়া দিয়া ঋণমুক্ত হইয়াছেন। আমাদের সুযোগ্য সবডিবি-

সানাল অফিসার শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ মুস্তফী মহোদয় সেক্রেটারী মহাশয়ের সহায় হইয়া আতুরত্রাণ প্রতিষ্ঠানের মহান উপকার সাধন করিতেছেন। আমরা ইতি পূর্ব্বেই আনন্দের সহিত জানাইয়াছি যে স্থানীয় ফৌজদারী আদালতের দরিদ্র ভাণ্ডার (Poor Fund) হইতে এই ঔষধালয়ের সাহায্য কল্পে মুস্তফী সাহেব মাসিক ২৫৲ টাকা করিয়া দিতে পারিতেছেন। তাহার উপর এক কালীন দান সংগ্রহেও কতক কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ফল কথা, স্থানীয় শাসন ও বিচার বিভাগের মধুর সহযোগিতায় এবং জনসাধারণের উদ্বোধনে ঔষধালয়টীর প্রায় সকল অভাবই দূর হইতে চলিয়াছে। শুনিয়া সুখী হইলাম যে ইহার অবস্থা বর্ত্তমানে ঋণমুক্ত। তবে কোষও অর্থ-শূন্য। কর্ত্তৃপক্ষের যেরূপ কঠোর ও অক্লান্ত চেষ্টায় ঔষধালয়টীর অভাব অভিযোগের পূরণ হইয়াছে, ইহার অবস্থা স্বচ্ছল রাখিতে হইলে এখনও এস্থানের লোকের প্রবৃত্তির মূলে যেরূপ উত্তেজনার ভাব জাগ্রত রাখা আবশ্যক তাহাতে মনে হয় ইহার অর্থভাগ্য এখনও অনিশ্চিত। একটী আশার বিষয় এই যে এখন জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান এই জেলারই একজন কৃতী ও হৃদয়বান সুসন্তান। রামপুরহাট বীরভূম জেলা বোর্ডের তৃতীয়াংশ আয় সংস্থান করিয়া থাকে। সেই রামপুরহাটের সদরের দাতব্য ঔষধালয় জেলা বোর্ডের নিকট হইতে যে অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে তাহা আদৌ উল্লেখযোগ্য নহে। আমরা আশা করি জেলা বোর্ডের বেসরকারী চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর রামপুরহাটের এই ঔষধালয়টীকে নিজের একাইক পোষ্য মনে করিয়া ইহার কর্ত্তৃত্বভার নিজহস্তে লইয়া ইহার অভাব অভিযোগের ইতিহাস চিরতরে পুরাতত্ত্বে পর্য্যবসিত করিবেন।

এই সঙ্গে কিন্তু একটী অপ্রিয় সংবাদও রাঢ়দীপিকা হইতে উদ্ধৃত করিতে হইল—

বিহারে প্লেগ।

শ্রীশ্রী৺গায়ধামে ভয়ানক প্লেগ হইতেছে। ত্রিহুত, দারভাঙ্গা ও লাহিরিয়া সরায়েও প্লেগ হইতেছে। বহু লোক সহর ছাড়িয়া দূর ফাঁকা জায়গায় বাস করিতেছে। যাত্রীগণের এ সময় গয়াতীর্থে না যাওয়াই ভাল।

ফরিদপুরের স্বাস্থ্য এখন কেমন যাইতেছে, সহযোগী সঞ্জয় তাহার বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন। পাঠকেরা তাঁহার নিজ মুখেই সংবাদটা শ্রবণ করুণ—

সহরের স্বাস্থ্য। এখনও ফরিদপুর সহরে ও উপকণ্ঠস্থিত গ্রামে বসন্তরোগ আছে। সতর্কতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই

রোগ যদিও এতদঞ্চলে প্রকট মূর্ত্তিতে দেখা দেয় নাই, তথাপি লোকের হৃদয়ে রোগভীতি এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। আজকাল দিনে বেশ গরম পড়িতেছে; রাত্রিতে ঠাণ্ডাও মন্দ পড়ে না। এ ঋতু-পরিবর্ত্তন রোগের পূর্ব্বলক্ষণ। দিনের অসহ্য সূর্য্যোত্তাপে পথ ধূলিময় হইয়াছে।—পথ চলা দায় হইয়াছে। বাজারের খাবারের দোকানগুলি কি বেওয়ারিশ মাল? দোকানীরা মিঠাই ইত্যাদি রাস্তার ধারে উন্মুক্ত অবস্থায় পাত্রে বিক্রয়ার্থ রাখিয়া দেন। ফলে রাস্তার বায়ুতাড়িত ধূলিরাশি মিঠাইর সহিত মিশিয়া উহাকে অখাদ্য করিয়া তুলিতেছে। সেই অখাদ্য মিঠাই খাইয়া যে কত লোক রোগগ্রস্ত হইতেছে, কে তাহার নির্ণয় করে? এখন সময় বড় খারাপ। কোনরূপে বাজারের বিক্রেয় খাদ্যাদি দূষিত না হয়, তৎপ্রতি ফরিদপুর মিউনিসিপালিটীর সুযোগ্য চেয়ারম্যান মহোদয়ের খরদৃষ্টি পতিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আশাকরি, তাঁহার ব্যবস্থায় আমরা শীঘ্রই বাজারের মিঠাই দ্রব্যাদি কাঁচের আধারে রক্ষিত হইতে দেখিব।

মফস্বলের অভাব অভিযোগ সকলের মধ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব একটী প্রধান অভাব। সুখের বিষয় মফস্বলের সহর গুলিতে ক্রমে ক্রমে জলের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়া পানীয় জলের অভাব দূর হইতেছে। সহযোগী ত্রিপুরা হিতৈষী কুমিল্লা সহরে জলের কল প্রতিষ্ঠার শুভ সংবাদ দিতে গিয়া উৎফুল্ল হইয়া লিখিয়াছেন—

জলের কল—এই সহরে জলের কল স্থাপন সম্বন্ধে যে কল্পনা জল্পনা চলিতেছিল তাহা এতদিনে কার্য্যে পরিণত হইবে বলিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি। মাঝে গভর্ণমেণ্ট এষ্টিমেটের তিন লক্ষ নব্বই হাজার টাকা দ্বারা জলের কল স্থাপন এই ক্ষুদ্র দরিদ্র সহরের পক্ষে একরূপ অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল; যাহা হউক এখনকার মিউনিসিপালিটির চেয়ারমেন উপেন্দ্র মোহন মিত্র ও রঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মান্যবর শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত মহোদয়গণ প্রাদেশিক এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য বর্দ্ধমানের মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এবিষয়ে একটা মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। এ নিমিত্ত ত্রিপুরাবাসী সকলেই ইহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবে।

এখন স্থির হইয়াছে জলকল স্থাপনের প্রয়োজনীয় টাকার এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ দুলক্ষ ষাট হাজার টাকা গভর্ণমেণ্ট সরবরাহ করিবেন। পঞ্চাশ হাজার ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড হইতে প্রদত্ত হইবে। হাউজ কলেক্‌সন স্থানীয় চাঁদা দ্বারা বাকী অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে।

এনিমিত্ত বিগত রবিবার স্থানীয় টাউনহলে মেজিষ্ট্রেট বাহা[দুর] সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হয়। চাঁদা সংগ্রহ অন্যান্য কার্য্যের জন্য এক কমিটি গঠিত হইয়াছে, শীঘ্রই ডিপটেশন মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। আমরা আশা করি এবার মহারাজ বাহাদুর যথোপযুক্ত অর্থ দানে কুমিল্লাতে একটী জলের কল প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিবেন। এসম্বন্ধে মহারাজকে অধিক বলা নিষ্প্রোয়াজন। যাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণে খনিত দীঘি ও পুষ্করিণী অদ্যাপি ত্রিপুরা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের জলাভাব দূর করিতেছে, স্বধর্ম্মে আস্থাবান যাঁহার নিকট জলদানের চেয়ে শ্রেষ্ঠদান আর কিছু হইতে পারে তাঁহার নিকট এই সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

ঢাকার স্বাস্থ্য এখন ভাল যাইতেছে না। সহযোগী ঢাকা প্রকাশ একসঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া এবং ওলাউঠার সংবাদ পত্রস্থ করিয়াছেন—

সহরের স্বাস্থ্য।

সহরের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল নহে। বিগত দুইসপ্তাহ যাবৎ এসহরে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ দেখা দিয়াছে। ইনফ্লুয়েঞ্জার সঙ্গে সঙ্গে নিউমোনিয়ার আক্রমণও বেশ আছে। সহরতলী ফরিদাবাদ অঞ্চলে ওলাউঠাও প্রকট হইয়াছে।

বিক্রমপুরের স্বাস্থ্য।

সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ যে, বিক্রমপুরের অনেক স্থানে ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ আছে। লৌহজঙ্গ অঞ্চলে বসন্ত দেখা দিয়াছে। শ্রীনগরের নিকটবর্ত্তী কুশারীপাড়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামের বসন্তের প্রকোপ একটু হ্রাস পাইয়াছে।

রাজসাহীর হিন্দুরঞ্জিকা প্রায় প্রতি সপ্তাহেই স্থানীয় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংবাদ পত্রস্থ করিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। এজন্য 'আমরা' অত্যন্ত সুখী। এ সপ্তাহে হিন্দু রঞ্জিকা ককেকটী সুসংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন—

মোহনপুর থানার এলাকায় একটি সরকারী ডাক্তারখানা স্থাপন করিবার জন্য আয়োজন হইতেছে। স্থানীয় সাহায্যে যদি ৫০০৲ পাঁচশত টাকা সংগ্রহ হয় তবে রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড তথায় ডাক্তারখানা স্থাপন করিতে পারেন।

রাজসাহী টাউনের মাড়োয়াড়ী মহাজন জ্ঞানিরাম বাবুর পৈতৃক বাসস্থান জয়পুর রাজ্যে। তথায় তিনি একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার জন্য এককালীন ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

[illegible]র থানার সন্নিকটে গোল্লাপাড়ার হাটে একটি পাকা [illegible] দিয়া দিবার জন্য লোকাল বোর্ডে দরখাস্ত করা [illegible]াছে।

[illegible]ক সহযোগিনী সম্মিলনীও এইরূপ একটী শুভ সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন—

দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা।—মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরের নিকটবর্ত্তী মণ্ডলপুর গ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ঐ গ্রামের ভূত পূর্ব্ব একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ ঘোষাল মহাশয় জেলা বোর্ডের হস্তে ১৪ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন।

মেদিনীপুর সহর ও মেদিনীপুর জেলার অস্বাস্থ্যকর অবস্থার উল্লেখ করিয়া সহযোগী মেদিনীপুর হিতৈষী মেদিনীপুরে একটী মেডিক্যাল স্কুলের দাবী করিয়াছেন। এ দাবী অসঙ্গত নহে, এবং আমরা ইহার সমর্থন না করিয়াও পারিলাম না—

মহামান্য গবর্ণর বাহাদুর নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছেন যে প্রতিবৎসর বাঙ্গালার প্রায় ৫ পাঁচ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ার কবলে নীত হইয়া কাল গ্রাসে পতিত হয়। মেদিনীপুরও তাহার বহির্ভূত নহে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, বসন্ত কলেরা প্রভৃতি ছাড়িয়া দিলেও একমাত্র ম্যালেরিয়া বিষে মেদিনীপুরের পল্লীগ্রাম সমূহ জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ পল্লীগ্রামে চিকিৎসার অভাবে বিনা চিকিৎসায় কত লোকের যে জীবন-নাশ হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ঢাকা প্রভৃতির ন্যায় এই জেলার সদরে একটি মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করিয়া চিকিৎসা বিদ্যার বহুল প্রচার করা অতীব কর্ত্তব্য। আশা করি সম্মিলনীর সদস্য মহোদয়গণ এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইবেন।

রাজসাহী জেলা হইতে বসন্ত রোগ এখনও অন্তর্হিত হইল না। কি দুঃখের কথা! হিন্দুরঞ্জিকায় দেখিতেছি—

মহাদেবপুর থানার এলাকায় বহু গ্রামে বসন্ত সংক্রামক ভাবে দেখা দিয়াছে। জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই থানার এলাকায় ৯১৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে। মহকুমার অন্যান্য স্থানেও বসন্ত আছে।

কাটোয়ার প্রসূন সেখানকার আবহাওয়ায় দুর্লক্ষণের আভাষ পাইয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন—

দিনে বেশ গরম—রাত্রিতে ও প্রাতে একটু একটু শীত অনুভব করা যাইতেছে। বৈশাখ মাস পড়িল, কিন্তু এখনও শীতের ভাব কাটে না ইহাই আশ্চর্য্য। সবই লক্ষণ মন্দ। স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল নহে।

ঋতু-পরিবর্ত্তনের কাল সংক্রামক রোগ বিস্তারের একটা সন্ধিক্ষণ। এবার বাঙ্গলার আবহাওয়া বড় গোলমালে এবং এলোমেলো দেখিতেছি। দুই এক মাসের মধ্যে বাঙ্গলায় প্রায় ষড় ঋতুর প্রাদুর্ভাব দেখা গেল। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত—তিনটি ঋতু প্রায় একাদিক্রমে অনুভূত হইতেছে। অথচ বসন্ত কালে বসন্ত ঋতু কবে কোন দিক দিয়া আসিল এবং কবেই বা গেল তাহা ভাল করিয়া বুঝিতেই পারা গেল না। ঋতুর এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে স্বভাবতঃ সতর্ক হওয়া উচিত। কিন্তু ত্রিপুরা হিতৈষী এ বিষয়ে কুমিল্লা মিউনিসিপ্যালিটির নামে কিরূপ অভিযোগ করিতেছেন দেখুন—

মিউনিসিপালিটীর দৃষ্টি।—বেশ গরম পড়িতেছে, এখন সহরে যে সকল মৎস্য আমদানী হয় তাহার অধিকাংশই একেবারে পচা ও দুর্গন্ধময়। এই সকল মৎস্য যে রোগের আকর তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মিউনিসিপালিটীর সতর্ক দৃষ্টির অভাবে সে সকল মাছের অধিকাংশই বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে এবং হোটেলওয়ালাগণ সস্তায় সেই সকল মাছ ক্রয় করিয়া রোগ বিস্তারের সহায়তা করিয়া থাকে। আমরা ভুক্তভোগীদের নিকট হইতে এইরূপ অভিযোগ শুনিতে পাইতেছি। তাই বলি সহরে ঘন ঘন যেরূপ রোগের প্রাদুর্ভাব হইতেছে তাহাতে মিউনিসিপালিটীর এ বিষয়ে আরো কড়া দৃষ্টির প্রয়োজন। মৎস্য বিক্রেতাদিগের অনুরোধ যেন এ ক্ষেত্রে মিউনিসিপালিটীর কর্ম্মচারীদিগকে কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত না করে এবং হোটেল-ওয়ালাগণ যাহাতে পচা মাছ দ্বারা রোগ সৃষ্টি করিতে না পারে সেদিকে বিশেষ সতর্কতা বাঞ্ছনীয়।

একজনের কর্ত্তব্য ত্রুটির পরিচয় যেমন পাওয়া গেল, তেমনি আর একজনের পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠানের পরিচয়ও ত্রিপুরা হিতৈষীর ঐ সংখ্যাতেই পাওয়া যাইতেছে—

হাসপাতালে দান—আশুগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী জগন্নাথ মদনগোপাল মাড়োয়ারী ব্রাহ্মণবাড়িয়া হাসপাতালের উন্নতির জন্য এককালীন বিশ হাজার টাকা দান ও বার্ষিক ব্যয়

নির্ব্বাহের নিমিত্ত প্রতিবৎসর একহাজার টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। রোগজর্জ্জরিত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সবডিভিসনের নিমিত্ত এরূপ দান সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হাসপাতালে অস্ত্র-চিকিৎসাগার ও স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ওয়ার্ড প্রভৃতির অভাব বহুদিন যাবৎ অনুভূত হইতেছিল। এখন এই মহানুভব ব্যক্তির দানে হাসপাতালটীর প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া সকলেই আশ্বস্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হাসপাতাল কমিটি উক্ত দাতার নামানুসারে হাসপাতালের নামকরণ করিবেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদ উক্ত দানশীল মহাত্মার উপর বর্ষিত হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

বহরমপুরের "প্রতিকারের" মুখে একটী সংবাদ শুনিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। ব্যাপারটা কি, তাহা পাঠকেরা প্রতিকারের নিজের মুখেই শুনুন—

বহরমপুর দাতব্য চিকিৎসালয়!

বহরমপুর সদরে একটী প্রকাণ্ড দাতব্য চিকিৎসালয় আছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। ইহা সাধারণতঃ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়েই পরিচালিত। কীর্ত্তিমান্ লালগোলার রাজা বাহাদুর, বহু মুদ্রা ব্যয় করিয়া, রোগীগণের থাকিবার নিমিত্ত এখানে একটী সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণও করিয়া দিয়াছেন। আজ কাল জনরবে এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের সম্বন্ধে যেরূপ ব্যাপার শুনা যাইতেছে, তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। দাতব্য চিকিৎসালয়ে ঔষধ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সাধারণতঃ নিঃস্ব রোগীগণই গমন করিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে, এই দাতব্য চিকিৎসালয়েও দরিদ্ররোগীগণকে কৌশল করিয়া কষ্ট দিবার চেষ্টা করা হয়। রোগী ডাক্তারের নিকট হইতে প্রেস্‌ক্রিপসন লইয়া ঔষধ গ্রহণ করিবার ঘরে গমন করিলেই, হয় ত তাহাদিগকে বলা হয়, "এ অতি মূল্যবান্ ঔষধ, ইহা আমাদের এখানে নাই, বা ইহা তোমাকে অন্যত্র সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। ইত্যাদি।" কিন্তু দাতব্য চিকিৎসালয়ের [illegible] মহোদয়গণ নিজের পরিচিত যে সমস্ত রোগীর চিকিৎসা [illegible] তাহাদের প্রয়োজনের নিমিত্ত এমন কোন মূল্যবান্ ঔষধই [illegible] পাওয়া যায় না, যাহা চিকিৎসালয়ে পাওয়া যায় না। সুতরাং এও একটা কলিকালের মন্দ আচরণ নয়। এ ব্যাপার বাস্তবিক যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা চিকিৎসালয়ের এই সমস্ত নিষ্ঠুর কর্ম্মচারীগণকে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে লোকে ধর্ম্মার্থে করিবার নিমিত্ত দয়াপরবশ হইয়া, আপন ব্যয়ে কত দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিতেছেন; আর ইঁহারা সদাশয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যথেষ্ট বেতন পাওয়া সত্ত্বেও ঈদৃশ নির্দ্দয়ভাবে আপন কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতে চেষ্টা করিয়া কি কখনও [illegible] হইতে পারিবেন? যে সমস্ত অসহায় রোগী অসহনীয় [illegible] যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া দাতব্য চিকিৎসালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রোগ মুক্ত হইবার অভিলাষী হয়, তাহাদিগকে যদি এরূপভাবে চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে সেই সমস্ত রোগী বহু যন্ত্রণাজনিত দীর্ঘনিশ্বাসে যে শীঘ্রই অধঃপাতে যাইতে হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। চিকিৎসালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণেরও বিষয়ের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার যথাযথ ব্যবস্থা করিবেন বোধ হয় ভাল হয়।

এ অভিযোগ অতি গুরুতর,—কোন ক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে। একে ত দেশের সকল স্থানেই সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নাই; তাহার উপর, যে সকল স্থলে অল্প মাত্রায় আছে, সেখানে যদি সাধারণের অতি প্রয়োজনীয় এরূপ অনুষ্ঠানের অপব্যবহার হয়, তাহা হইলে গরীব লোকেরা যায় কোথায়? আমরা আশা করি, কর্ত্তৃপক্ষ অচিরে এই কলঙ্ক ক্ষালনে যত্নবান হইবেন।

প্রত্যহ কিছু না কিছু ফল ভক্ষণ করিবেন। এক একটী ফলের এক এক প্রকার গুণ। ঠিক মত নির্ব্বাচন করিতে পারিলে ফল শরীরের সামঞ্জস্য (equilibrium) রক্ষার সহায়তা করিয়া থাকে।

দিবানিদ্রা সর্ব্বদা পরিহার্য্য। ইহাতে শরীর ম্যাজ ম্যাজ করে; কোন কাজে উৎসাহ থাকে না।

পীড়িত লোকে সহজেই একটু খিট্‌খিটে আবদেরে খামখেয়ালি মেজাজের হইয়া থাকে। তাহার মেজাজের খিটখিটে বলিয়া কেহ যেন রাগ না করেন। তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর না হইলে, তাহার আবদার ও খেয়াল যথাসম্ভব পূরণ করা কর্ত্তব্য। তাহাতে তাহার আরোগ্য লাভের পক্ষে বরং সহায়তাই করা হয়।

আলোচনা

কলিকাতায় গ্রীষ্মচর্য্যা।—

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী সহরে যে পরিশ্রুত জল (filtered water) সরবরাহ করেন, সহরবাসীর [illegible]য়োজনের তুলনায় তাহা যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয় [illegible]। এই কারণে, সহরবাসীর মুখে প্রায়ই জলাভাবের [illegible]ভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়; সংবাদপত্রেও প্রায়ই [illegible] সম্বন্ধে আন্দোলন হইয়া থাকে। এদিকে মিউনিসি-[illegible]ালিটীও সহরবাসীর নামে অভিযোগ করিয়া থাকেন [illegible], জলের অনেক অপচয় ঘটিয়া থাকে। আমরা [illegible]ান এক পক্ষকে দোষী করিতে চাহি না, কাহারও [illegible]ভিযোগ অসঙ্গত বলিয়া মনে করি না। গ্রীষ্মপ্রধান [illegible]শের লোকের জল একটু বেশী পরিমাণেই দরকার [illegible]া থাকে; সে জন্য সহরবাসী যে জলাভাবের [illegible]ভিযোগ করিবেন, তাহা স্বাভাবিক। আর, এত একটা সহরে জল সরবরাহ করাও সহজ কথা [illegible]। ইহা বহু ব্যয়সাধ্য বিরাট ব্যাপার। সুতরাং [illegible]লের যদি বাস্তবিক অপচয় ঘটে, তাহা হইলে মিউ-[illegible]সিপ্যালিটীর অভিযোগও অন্যায় হয় না। যাহা [illegible], একটা মধ্য পন্থা আবিষ্কার করিয়া উভয় [illegible]র অভিযোগের একটা সুমীমাংসা করিবার চেষ্টা [illegible] কর্ত্তব্য। মিউনিসিপ্যালিটী সহরবাসীকে যে [illegible]রিমাণে জল দিতে চাহেন, এবং দেন, তাহাতে [illegible]াকের না কুলাইলে, তাহারা যায় কোথায়? সহরে [illegible]টীও পুকুর নাই যে, লোকে পুকুরের জল ব্যবহার [illegible]রিতে পারিবে। আবার, মিউনিসিপ্যালিটীর শক্তিও [illegible]াবদ্ধ। সেই শক্তির পরিমাণ বুঝিয়া এবং [illegible]রের লোকসংখ্যার হিসাব করিয়া মিউনিসি-[illegible]ালিটী বাঁধা নিয়মে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণেই জল দিতে [illegible], তাহার বেশী কোথা হইতে দিবেন? সহর-[illegible]াসীকে পরিশ্রুত জল গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্মের জন্যই [illegible]হার করিতে হয়। সেই কাজকর্ম্মের প্রকৃতি এইরূপ, যথা, স্নান, রন্ধন, পান, বাসনমাজা, ঘরদোর ধোওয়া ইত্যাদি। এই কয়টি বিষয়ের মধ্যে স্নান, রন্ধন, ও পানার্থ পরিশ্রুত জল না হইলে চলিতে পারে না। বাসন মাজা, ঘরদোর ধোওয়া প্রভৃতি কাজের জন্যও জল চাই বটে, কিন্তু এই জল পরিশ্রুত না হইলেও যে চলিবে না, এমন কিছু কথা নাই। এই শ্রেণীর কাজের জন্য unfiltered water কিছু পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারা যায়; তাহাতে কোন ক্ষতি হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। বাসনগুলি প্রথমে unfiltered water দিয়া ছাই-টাই প্রভৃতি ধুইয়া ফেলিয়া পরে একবার filtered water দিয়া ধুইয়া লইলে চলিতে পারে। আর ঘর দোর ধোওয়া, drain flush করা প্রভৃতি কাজ unfiltered waterএই স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। এখন গৃহস্থের জল ব্যবহার সংক্রান্ত সমস্ত কাজেই filtered water ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু, বন্দোবস্ত একটু বদলাইয়া দিয়া, শেষের কয়টি কাজের জন্য যদি মিউনিসিপ্যালিটী সহরবাসীকে unfiltered water ব্যবহার করিতে দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের filtered waterএর ব্যবহার নিশ্চয়ই অনেকটা কমিয়া যাইবে। চলতি ব্যবস্থার এই একটু পরিবর্ত্তন করিতে কোন পক্ষেরই বিশেষ কিছু অসুবিধা নাই। আজকাল সহরের প্রায় বাড়ীগুলিতেই drainএর পায়খানা হইয়াছে। তার সঙ্গে সঙ্গে unfiltered waterএর ট্যাঙ্কও বসিয়াছে। এই ট্যাঙ্কের জল গৃহস্থকে ব্যবহার করিবার অনুমতি দিলেই যথেষ্ট হইল। নচেৎ, filtered waterএর ব্যবহার বেশী থাকিবেই থাকিবে; সুতরাং উভয় পক্ষের অভিযোগেরও কোন প্রতিকার হইবে না। গৃহস্থকে ঘর দোর ধুইতে বা ড্রেণ ধুইতে নিবারণ করা যাইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে সহরের স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ

ক্ষতি হইবে। আর এই কাজের জন্য জলও চাই। তবে, সে জল যখন unfiltered water হইলেও চলিতে পারে, তখন সহরবাসীকে unfiltered water ব্যবহার করিবার অনুমতি দিতে মিউনিসিপ্যালিটীর কৃপণতা করিবার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না।

কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ।

গত ৬ই এপ্রেল অপরাহ্ণ কালে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন একটী নূতন হাসপাতাল নির্ম্মাণ কল্পে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এবং দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক চ্যারিটেবল ডিসপেনসারীর দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব হইয়া গিয়াছে। লর্ড রোণাল্ডসে বাহাদুর এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা কিছু আশ্বস্ত হইয়াছি। লাট বাহাদুর বলিয়াছেন, "that the Government of Bengal are genuinely anxious to see facilities for medical education in Bengal increased as rapidly as circumstances will allow, and that in the provision of such facilities we welcome most heartily the valuable co operation of the non-official members of the medical profession." অর্থাৎ, বাঙ্গলা দেশে চিকিৎসা বিদ্যার বিস্তার করিতে গবর্ণমেণ্ট যথার্থই ইচ্ছুক। অবস্থায় যতটা কুলাইয়া উঠে, ততটা শীঘ্রই তাঁহারা ইহা করিতে চাহেন; এবং এই কার্য্যে তাঁহারা বাঙ্গলার বেসরকারী চিকিৎসকগণের সহযোগিতা অন্তরের সহিত কামনা করেন। গবর্ণমেণ্টের এই শুভ ইচ্ছার প্রমাণ স্বরূপ লাট বাহাদুর বলিয়াছেন, কারমাইকেল কলেজের সাহায্য কল্পে গবর্ণমেণ্ট ৯৩৮০০০ টাকা দান করিয়াছেন। আশা করি, আমাদের পাঠকেরাও এই সংবাদে আশ্বস্ত হইবেন। আমরা বিবেচনা করি, দেশের লোকে উদ্যোগী হইয়া অর্থ সংগ্রহ করিলে গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় অল্পদিনের মধ্যে বাঙ্গলার [illegible] প্রধান নগরগুলিতে এক একটী করিয়া মেডি[illegible] কলেজ, অন্ততঃ মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হইতে পা[illegible] এবং দেশে সুচিকিৎসকের অভাবও কতকটা [illegible] হইতে পারে।

নিখিল ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদিক কনফারেন্স।

গত ৩১শে মার্চ্চ হইতে ৩রা এপ্রেল প[illegible] দিবস চতুষ্টয় হোলকারের রাজধানী ইন্দোর ন[illegible] নিখিল ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদিক কনফারেন্সের অধিবে[illegible] হইয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ [illegible] গণনাথ সেন, সরস্বতী, এম-এ, এল-এম-এস [illegible] কনফারেন্সে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। সভাপতি ম[illegible] তাঁহার অভিভাষণে অনেক সার কথা বলিয়াছি[illegible] তিনি সকল আয়ুর্ব্বেদিক স্কুল, কলেজ ও প্রতিষ্ঠা[illegible] অলইণ্ডিয়া বোর্ড অব আয়ুর্ব্বেদিক এডুকেশন [illegible] প্রবর্ত্তিত নব্য তন্ত্রের আয়ুর্ব্বেদের অনুসরণ ক[illegible] পরামর্শ দেন; এবং এলাহাবাদে যে আয়ুর্ব্বেদ [illegible] বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে, তাহার স[illegible] কল্পে সকলকে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন। তা[illegible] প্রত্যেক প্রদেশে এক একটী করিয়া বড় র[illegible] আয়ুর্ব্বেদিক কলেজ স্থাপন করিবার প্রস্তাব চলিতে[illegible] ইহাদের মধ্যে যুক্তপ্রদেশে যে কলেজ বসিবে তা[illegible] সাহায্যার্থ যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট দেড় লক্ষ [illegible] দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সভাপতি [illegible] তাঁহার বক্তৃতায় এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া[illegible] প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার ক[illegible]

এই কনফারেন্সের সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদ সংশ্লিষ্ট [illegible] রাসায়নিক পদার্থ, পুস্তক, যন্ত্র তন্ত্র প্রভৃতির [illegible] প্রদর্শনীও বসিয়াছিল। সভার ২য়, ৩য় ও ৪র্থ [illegible] অধিবেশনে সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহোদয়গণ [illegible] কয়েকটি সুলিখিত প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। [illegible] পণ্ডিতা লক্ষ্মীবাই দেবী নাম্নী একটী মহারা[illegible] মহিলা কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত একটী [illegible] উল্লেখযোগ্য। এই কনফারেন্সে দশটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

শিশুদিগের "অফথ্যালমিয়া"।—

বোম্বাই নগর একটী সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছেন। তত্রত্য অন্ধত্ব নিবারক সমিতি শিশুদিগের মধ্যে "অফথ্যালমিয়া" রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাসের জন্য চেষ্টা পড়িয়া লাগিয়াছেন। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে এই রোগই পরিণামে অন্ধত্বের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই সমিতি একখানি পুস্তিকার প্রচার করিয়াছেন। এই পুস্তিকে, উক্ত রোগ নিবারণ কল্পে তৎপরতা অবলম্বনের জন্য, শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরেই কতকগুলি অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় স্বাস্থ্য সমিতি, স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং শিশুমঙ্গল কমিটি যাহাতে জনসাধারণকে এ বিষয়ে সাহায্য করেন তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি, জনসাধারণের মঙ্গলকর কার্য্যে বোম্বাই নগর অন্যান্য নগরকে ছাড়াইয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী কলিকাতা এ সকল উন্নতিকর বিষয়ে অনেকটা পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা ত ভাল কথা নয়! সাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে লোকশিক্ষার জন্য আমরা কোন ত্রুটি করিতেছি না; কিন্তু ফল কি তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না,—ইহাই বিপদ।—

টাঙ্গাইলে ম্যালেরিয়া।—

টাঙ্গাইলের সোসিয়াল সার্ব্বিস লীগ একটী জনসাধারণের হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় বহু লোকের স্বাক্ষর যুক্ত একখানি আবেদন পত্র মৈমনসিংহের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে দাখিল করা হইয়াছে। তাহাতে প্রার্থনা করা হইয়াছে যে,

কত রকম রোগের বীজ যে এই রকমে এক দেশ হইতে দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়ে, সকল সময়ে তাহার সন্ধানও পাওয়া যায় না। এই জাপানী বুরুষের মধ্যবর্ত্তিতায় জাপান হইতে য়্যানথ্রাক্স রোগের বীজ এদেশে আমদানী হওয়ার কথা কিছু দিন আগেই প্রকাশ পাইয়াছিল। তখন এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে আন্দোলন হওয়ায় মনে করিয়াছিলাম, ইহার প্রতিকার হইবে। কিন্তু দেখিতেছি তাহা হয় নাই। এই বুরুষের আমদানী এবং বিক্রয় বন্ধ হয় নাই, ইহা শোধনেরও কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ডুয়ার্স প্ল্যাণ্টর্স এসোসিয়েসনের ১৪ই এপ্রেল তারিখের বৈঠকের কার্য্য বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, আসাম প্রদেশের একজন বৃটিশ অধিবাসী এই রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার যিনি চিকিৎসা করিয়াছিলেন, সেই লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল কোসেক্স প্রমাণ করিয়াছেন যে, স্থানীয় বাজারে ক্রীত জাপানী কামাইবার বুরুষ ব্যবহার করিয়াই ঐ ভদ্রলোকটী উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। জনসাধারণকে এই রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে পত্র লেখা হইয়াছে। এই জাপানী বুরুষ ইংলণ্ডেও রপ্তানী হয়। তথায় ইহার রাসায়নিক পরীক্ষা হয় এবং বুরুষগুলি য়্যানথ্রাক্স রোগের বীজদুষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় অনেক বুরুষ নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে। আমরা আশা করি, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট জাপানী কনসাল জেনারেলের সঙ্গে এইরূপ বন্দোবস্ত করিবেন যে, বুরুষগুলি শোধন না করিয়া যেন এদেশে আমদানী করা না হয়।

টাদাইল মহকুমার স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালীগুলির মুখ খুলিয়া দেওয়া হউক। এই মহকুমায় অনেক খাল-বিল আছে। সেইগুলিই জল বাহির হইয়া যাইবার স্বাভাবিক প্রণালী। ইহাদের মধ্যে কতক-গুলি ভরাট হইয়া গিয়াছে; বাকীগুলিও ভরাট হইতে দেরী নাই। বর্ষাকালে এই পথে বৃষ্টির জল বাহির হইয়া যায় এবং এইগুলির উপর দিয়া নৌকা চলাচল করে। কিন্তু ভরাট হইয়া যাওয়াতে ইহাদের কার্য্যকরী শক্তি কমিয়া আসিয়াছে। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কর্ত্তৃক উঁচু রাস্তা নির্ম্মিত হওয়ায় এবং অন্যান্য কারণেও এই সকল খাল-বিল ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া যাইতেছে। ফলে রীতিমত জল নিকাশে ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। আর জল বন্ধ হইয়া থাকাতেই ম্যালেরিয়ায় দেশ একেবারে উজাড় হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। জলনিকাশের পথ খোলা থাকিলে আর এরূপ ঘটিতে পারে না। এখন এই সকল খাল, বিলের সংস্কার করিয়া জল নিকাশের পথ খোলসা করিয়া দেওয়া,—প্রয়োজন হইলে নূতন খাল খনন করানো, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কর্ত্তব্য। এই সকল কার্য্যের জন্য অবশ্য প্রচুর অর্থ আবশ্যক। সেই অর্থ সংগ্রহ করাও কঠিন হইবে না। প্রথমতঃ নূতন খাল খনন ও পুরাতন খালের সংস্কার করিয়া জল নিকাশের ব্যবস্থা করিলে দেশের স্বাস্থ্য ত ভাল হইবেই; তাহার উপর অন্যান্য সুবিধাও আছে। খাল খোলা থাকিলে নৌকা পথে যাতায়াতের সুবিধা হইবে; জলের অভাব দূর হইবে; কৃষি ক্ষেত্রে জল সেচনের সুবিধা হইবে। যাহারা প্রত্যক্ষ ভাবে [illegible] দ্বারা উপকৃত হইবে, তাহারা বোধ হয় তৎপরি[illegible] সামান্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। যাহা[illegible] ক্ষেত্রে সেচনের জন্য খাল হইতে জল লইবে, তাহা[illegible] কিছু কিছু ফী নিশ্চয়ই দিতে পারিবে। খাল দিয়া যে[illegible] সকল নৌকা যাতায়াত করিবে, তাহারাও সামা[illegible] কিছু করিয়া যে দিতে না পারিবে এমন নহে। সুতরাং এই কার্য্যের জন্য অর্থের একেবারে অসদ্ভা[illegible] হইবে না বলিয়াই বোধ হয়। একটু সুবিবেচনা পূর্ব্ব[illegible] কাজ করিলে আরও সুবিধায় কার্য্য সম্পন্ন কর[illegible] যাইতে পারে। খাল খনন ও সংস্কার করাইবা[illegible] সময় যে মাটী উঠিবে তদ্দ্বারা জেলা বোর্ড রা[illegible] তৈয়ার করাইতে এবং মেরামত করাইতে পারিবেন। অথবা রাস্তা মেরামতের জন্য যে মাটীর দরক[illegible] হইবে তাহা খাল খনন করিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবে[illegible] যে দিক দিয়াই হউক এক ঢিলে দুই পাখী মারি[illegible] যথেষ্ট সুযোগ আছে—সেই সুযোগের সদ্ব্যব[illegible] করিবার চেষ্টা করা উচিত। রাস্তা ও খাল সকল[illegible] পরস্পর সাপেক্ষ করিয়া লইলে খরচের পক্ষে য[illegible] সুবিধা হইতে পারিবে। আরও একটা কথা আ[illegible] এইরূপ খাল বিলেই প্রধানতঃ পাট পচাইয়া ইহা[illegible] জল নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। তাহাতে ম্যালেরি[illegible] কলেরা প্রভৃতি রোগের বিস্তার ঘটে। এইটী [illegible] বন্ধ করা চাই। পাট পচাইবার জন্য স্রোত[illegible] নদীর সুবিধা না হইলে গ্রাম হইতে সুদূরে ই[illegible] জন্য স্বতন্ত্র পুকুর কাঁটাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

শরীর অসুস্থ বোধ করিলে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করিবেন; ইহাকে কখনও উপেক্ষা করিবেন না। 'শরীর অসুস্থ বোধ করা' রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ মাত্র।

গুরু ভোজন ত বর্জ্জন করিবেনই, অধিকন্তু [illegible] ঘন খাইবেন না। পাকস্থলীকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দে[illegible] কর্ত্তব্য। বরং কিছুক্ষণ ক্ষুধা সহ্য করা ভাল, তথা[illegible] ঘন ঘন খাওয়া ভাল নয়।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৯ম বর্ষ | আষাঢ়, ১৩২৭ সাল | ৩য় সংখ্যা

মুখের যত্ন

চিকিৎসকগণের মতে শতকরা পঁচাত্তর প্রকারের [illegible]ধির জীবাণু মুখের ভিতর বাস করে; অথবা [illegible]খের মধ্য দিয়া শরীরের মধ্যে সংক্রামিত হয়। [illegible]কজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক বলেন যে, মুখে ক্ষত [illegible]কিলে উহা মদ্যপান হইতেও অধিকতর অনিষ্ট [illegible]ধন করে। আমরা ইহা সচরাচর দেখিতে পাই [illegible], প্রতি চারিজন প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে তিন-[illegible]নেরই কোনও না কোনও সময়ে দাঁতে পূঁয বা [illegible] পড়া ব্যাধি আছে। অপরিষ্কার দাঁত বা মুখের [illegible]ন্ধ বন্ধু-বান্ধবের বৈঠকে এবং ব্যবসায়ী মহলে খারাপ [illegible]ণা উৎপাদন করে। দাঁত বা মুখ পরিষ্কার [illegible]খিলে যে কেবল সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায় তাহা [illegible]হে; শরীরের স্বাস্থ্যের উপরও ইহার প্রভাব লক্ষিত [illegible]। টাকা পয়সা থাকিলে মূল্যবান খাদ্য দ্রব্য আহার [illegible]রিতে পারা যায়; কিন্তু যদি ভুক্ত খাদ্য দ্রব্য [illegible]ভরূপে চর্ব্বিত না হয়, তাহা হইলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য, [illegible]হজম প্রভৃতি নানাবিধ রোগে আমাদিগকে আক্রান্ত [illegible]হইতে হয়। অতএব চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি [illegible]পাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য খাইলেই শরীরের উপকার [illegible]না; খাদ্য দ্রব্যের পুষ্টিকার্য্য হজমের উপর নির্ভর করে। কিন্তু উত্তমরূপে চর্ব্বিত না হইলে কোনও ভুক্ত পদার্থই সহজে হজম হয় না। খাদ্য দ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বিত না হইলে উহা নানাবিধ ব্যাধির বাহন হয় এবং উহাতে আমাদের জীবনী শক্তি হ্রাস পায়। সমস্ত খাবার জিনিস মুখেই চিবাইতে হইবে; কারণ, পাকস্থলীর ভিতর কোনও দাঁত নাই যে তথায় উহা চর্ব্বিত হইতে পারে। আমরা উত্তমরূপে খাদ্য দ্রব্য না চিবাইয়া খাওয়াতে নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হই। কিন্তু রোগের মূল কারণ সংশোধনে সচেষ্ট না হইয়া উহা দূর করিবার জন্য ঔষধ ব্যবহার করি। ইহাপেক্ষা আর বাতুলতা কি হইতে পারে? আবার মুখে ঘা থাকিলে উহা সকল সময়ে বিষাক্ত হয়। আমরা সেই বিষ গলাধঃকরণ করিয়া থাকি। কাজেই শরীর ও মস্তিষ্কের উপযুক্ত পুষ্টি সাধন হয় না এবং আমাদিগকে শারীরিক ও স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগে ভুগিতে হয়।

ডিপথিরিয়া, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগের বীজাণু অপরিষ্কৃত মুখের ভিতর জন্মে। অপরিষ্কৃত মুখ শরীরের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা কদর্য্য অঙ্গ। কেবল নিজের স্বাস্থ্যের জন্যই যে মুখ পরিষ্কৃত রাখিতে হইবে তাহা

নহে; কথা বলিবার সময় বা হাঁচি ও কাসির সহিত আমাদের থুতু ও দুষ্ট বীজাণু নিকটবর্ত্তী লোকের শরীরে পতিত হয়; অথবা বাতাসের ধূলিকণার সহিত অপরের শরীরে প্রবেশ করে। ইহা নিবারণ করিবার জন্যও আমাদের মুখের যত্ন লওয়া উচিত। অপরিষ্কার মুখের প্রথম লক্ষণ দাঁতের উপর একটা সাদা Tartar * এর দাগ পড়া। মুখ নিয়মিতভাবে পরিষ্কার না রাখিলে খাদ্য দ্রব্যের কণাগুলি শ্লেষ্মার সহিত মিশিয়া এই জিনিস উৎপাদন করে। ইহাতে দাঁতের মাড়ী ফুলিয়া যায় এবং দাঁতের নিকট ছোট ছোট গর্ত্তের মত হয়। এই সকল গর্ত্তের মধ্যে খাদ্য দ্রব্যের কণাগুলি সংগৃহীত হয়। এবং তথায় ঐ কণাগুলি পচিয়া নানাবিধ রোগ-বীজাণুর বৃদ্ধির সাহায্য করে। এই বীজাণু হইতে পুঁয জন্মে এবং দাঁতের মাড়ী হইতে সকল সময় পুঁয বহির্গত হয়। আমরা সকল সময়েই বিষাক্ত পুঁয গিলিতেছি। দাঁতের পুঁজ পড়া ব্যারাম অধিকাংশ লোকের ভিতরই দেখা যায়। প্রথম হইতে যত্ন করিলে দাঁত পরিষ্কার করিলে ও ভুক্ত খাদ্য দাঁতের গোড়ায় সঞ্চিত হইতে না দিলে এই পুঁজ পড়া ব্যাধি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। পুঁজ পড়া যে কি কষ্টদায়ক পীড়া তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত আছেন। সকল সময়ে দাঁতের গোড়া কন্ কন্ করে, আহারে অরুচি জন্মে ও ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হয় না।

দাঁতের পোকা (carries) আজকাল বালকগণের মধ্যে সর্ব্বদা দেখা যায়। যুবকগণও ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে না। দাঁতের পোকার ন্যায় কষ্টদায়ক পীড়া বোধ হয় আর নাই। কিন্তু আমাদের অসাবধানতা ও অবহেলাতেই এই রোগের উৎপত্তি হয়। আহারের পর মুখ ভাল করিয়া না ধুইলে দাঁতের উপর বা দুই দাঁতের ফাঁকের মধ্যে উহার অণুপরিমাণ অংশগুলি সঞ্চিত হয়। নিয়মিতরূপে খাওয়ার পর দাঁত পরিষ্কার না করিলে এই কণাগুলি পচিয়া তাহা হইতে ল্যাক্‌টিক্ এসিড্ উৎপন্ন হয়। ল্যাক্‌টিক্ এসিডের সংস্পর্শে দাঁতের উপরের এনামেলের ভাগ আস্তে আস্তে ক্ষয় হয়। ইহা ব্যতীত মুখের অভ্যন্তরস্থ রোগের বীজাণু এই এসিডের সহিত মিলিত হইয়া দাঁতের ক্ষয় কার্য্য দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করে। ক্রমে এনামেল অংশ ক্ষয় হইয়া দাঁতের ভিতরের নরম স্নায়ুযুক্ত পদার্থ আক্রান্ত হয়। এই সময় দাঁতে অত্যন্ত বেদনা হয়। আস্তে আস্তে দাঁতের এই নরম অংশ ক্ষয় হইয়া দাঁতের গোড়ায় ল্যাক্‌টিক্ এসিড্ প্রবেশ করে। তখন তথায় ছোট বিস্ফোটক হইতে দেখা যায়। এই অবস্থায় দাঁতের পীড়া প্রায় দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। নিয়মিতরূপে দাঁত পরিষ্কার রাখাই এই ব্যারামের এক মাত্র প্রতিষেধক। দাঁতের গোড়ায় ছোট গর্ত্ত হইলেই কোন দন্ত চিকিৎসককে উহা দেখান উচিত। এবং তৎক্ষণাৎ ঔষধ দ্বারা উহার প্রশমন করা উচিত। নচেৎ দাঁত উঠান ভিন্ন আর উপায়ান্তর থাকে না।

অনেক পিতামাতা ছেলেদের দাঁতের কোন যত্ন করেন না। তাঁহারা মনে করেন দুধে দাঁত বদলাগের নিয়মানুসারে দিন পরেই পড়িয়া যাইবে। সুতরাং উহাদের নেওয়ার দরকার কি? কিন্তু এই ধারণা সত্য নহে। দুধে দাঁতের যত্নের উপর ছেলেদের স্বাস্থ্য অনেকাংশে পরিমাণে নির্ভর করে। ছোট ছেলের দাঁত উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয় নাই। শিশু বয়সে খাদ্য চিবাইবার ঐ দাঁতই একমাত্র উপায়। সাধারণতঃ ১২বৎসরের মধ্যে স্থায়ী দাঁত দেখা যায়। সময় পর্য্যন্ত বালকগণকে দুধে দাঁতের উপর করিতে হয়। যদি পোকা ধরিয়া ছেলেদের দাঁত নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহারা উত্তমরূপে খাদ্য দ্রব্য চিবাইতে পারে না। দাঁতের প্রতি শিশুগণের পীড়া প্রাবল্যের প্রধানতম দ্বিতীয়তঃ অযত্ন হেতু বালকগণের প্রায়ই গোড়া পাকে ও তথা হইতে সর্ব্বদা পুঁয ও রক্ত হয়, খাদ্যের সঙ্গে সেই সকল পুঁয ও রক্ত পাকস্থলীর ভিতর প্রবেশ করিয়া নানাবিধ

* নিয়মিত দাঁত না মাজিলে দাঁতের উপর যে একটী আবরণ পরে তাহাকে Tartar বলে। ছেলেদের দাঁতের উপর সাধারণতঃ উহা দেখা যায়।

পীড়া উৎপাদন করে। আমাদের দেশে শতকরা ৯জনের অধিক ছেলে দাঁতের পীড়ায় কষ্ট পায়। দাঁতের অসহ্য বেদনা যে কি প্রকার মর্ম্মন্তুদ, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই বোঝেন। এই ভীষণ বেদনার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ও বালকগণের দাঁতের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ভাল স্থায়ী দাঁত পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের দুধে দাঁতের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। দুধে দাঁতের দ্বারা স্থায়ী দাঁতের আকার নিয়মিত হয়। মুখ ও নাকের অস্থির গঠন দাঁতের উপর নির্ভর করে। মুখের সুশ্রী গঠনও দাঁতের উপর নির্ভর করে।

জাতির জীবনী সত্ত্বা ও উন্নতি সুস্থদেহ বালকগণের উপর নির্ভর করে। যে দেশের শিশুগণ দুর্ব্বল-দেহ ও নিস্তেজ, সেই দেশ বর্ত্তমান জীবন সংগ্রামে কখনও বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। বিগত ইয়োরোপীয় যুদ্ধের সৈন্য সংগ্রহের সময়ে দেখা গিয়াছে শতকরা ৭৫জন লোক অকর্ম্মণ্য এবং সৈনিক বিভাগের নিয়মানুসারে সৈন্য হইবার অনুপযুক্ত। ইয়োরোপের সেনা বিভাগের চিকিৎসকগণ ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, অনুপযুক্ত সৈন্যের অধিকাংশই বাল্যকালে ও শিশুকালে আরোগ্যক্ষম কোন পীড়ায় ভুগিতেছিল। সেই পীড়াই তাহাদের অনুপযুক্ততার কারণ। পূর্ব্বেই ইহা লেখা হইয়াছে শতকরা ৭৫ প্রকারের পীড়াই মুখের হেতু হইয়া থাকে। এই কারণেই ইয়োরোপে ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া জার্ম্মাণীতে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে দাঁতের চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইয়াছে। ঐ সকল চিকিৎসালয়ে ছাত্রেরা বিনা ব্যয়ে ঔষধ ও ব্যবস্থা পাইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও মুখ পরিষ্কার রাখার সম্বন্ধে বালকগণকে উপদেশ দিয়া থাকেন। এই বন্দোবস্তে আশ্চর্য্য ফল পরিদৃষ্ট হওয়াতে এই নিয়ম ক্রমশঃ জার্ম্মাণীর সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতেছে। ইংলণ্ডেও বিদ্যালয়ে দাঁতের চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের প্রত্যেক প্রধান সহরে দাঁতের চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে। বোষ্টন ও রচেষ্টার নগরের দাতব্য দন্ত চিকিৎসালয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমাদের দেশে আহারের পর পান খাওয়ার প্রথা প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত। পানের উপকারিতা বা অপকারিতা সম্বন্ধে অনেক মত ভেদ আছে। তবে আমাদের মনে হয়, খদির ও চুণ সংযোগে পান খাইলে উহাতে মুখের অনিষ্ট হয়। দুইবেলা ভাত খাওয়ার পর দুইটি পান চিবাইয়া তৎক্ষণাৎ মুখ ধুইয়া ফেলিলে ততটা ক্ষতি না হইতে পারে। কিন্তু সমস্ত দিন ধরিয়া মুখ লাল করিয়া পান চিবান কখনও উপকারী নহে। কোন কোন চিকিৎসকের মতে ভারতবর্ষে শতকরা ৯৮ জন প্রাপ্তবয়স্ক লোক দাঁতের পুঁয ও রক্ত পড়া পীড়ায় ভুগিয়া থাকে। অত্যধিক পরিমাণে পান চিবান যে এই রোগের অন্যতম কারণ তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পান পরিত্যাগ করা একেবারে অসম্ভব মনে হইলে উহার সহিত লবঙ্গ ও দারুচিনি ব্যবহার করা বিধেয়।

জিব ছোলানি দ্বারা প্রতিদিন জিহ্বা পরিষ্কার রাখা উচিত। আহারের পর উত্তমরূপে দাঁত মাজিয়া মুখ ধুইয়া ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য যাহাতে দাঁতের মধ্যে না লাগিয়া থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাত্রি কালে মুখে অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মা থাকে না। খাওয়ার পর ভালরূপে মুখ না ধুইলে সকালে মুখের ভিতর দুর্গন্ধ হয়। প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া উত্তম রূপে দাঁত ও জিহ্বা পরিষ্কার করা উচিত। মুখ না ধুইয়া কিছু খাওয়া উচিত নহে। বালক ও শিশুগণের অল্প বয়স হইতে সকালে মুখ ধোওয়া অভ্যাস করান উচিত। যাহারা ব্রুস ব্যবহার করেন তাঁহাদের দুই বেলা আহারের পর ব্রুস দিয়া দাঁত মাজা উচিত। ইহাতে মুখে দুর্গন্ধ হইতে পারে না ও দাঁত পরিষ্কার থাকে। রাত্রে ঘুমাইবার পূর্ব্বে দাঁত পরিষ্কার রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। দাঁতে পোকা হইলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিবে।

শিশুগণের স্বাস্থ্যের বিষয়ে পিতামাতার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য বিধায় দুই এক কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। সকল পিতামাতাই জানেন যে স্বাস্থ্য ভিন্ন জীবনে কোনও কার্য্য করা যায় না। সমস্ত জীবনের স্বাস্থ্য শিশু-কালের উপর অনেকটা নির্ভর করে। আবার শিশুগণের স্বাস্থ্য পিতামাতার উপর প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর করে। খাওয়া, পরা ও বিদ্যাশিক্ষা দিয়াই পিতা মাতার কর্ত্তব্য সমাধান হয় না। কেবল মাত্র উপাদেয় বস্তু আহারের জন্য সংগ্রহ করিয়া পিতা মাতার কর্ত্তব্য শেষ হয় না; কিম্বা উহা উত্তমরূপে রান্না হইলেই শিশুগণের পক্ষে পুষ্টিকর হয় না। কিরূপে খাইলে আহার্য্য বস্তু শরীরের পুষ্টি সাধন করে শিশুগণকে [illegible] করিলে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর দৈহিক শিক্ষা দেওয়া পিতামাতার কর্ত্তব্য। দাঁত ভাল না থাকি[illegible] ১০৬ হইতে ১০১ তাপাংশে, অথবা আরও খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চিবান যায় না। ভালরূপে চিবা[illegible] নামিয়া পড়ে।

না খাইলে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হয় না। পরিপা[illegible] কেহ কেহ মনে করেন, জ্বরের অবস্থায় এইরূপ না হইলে শরীরের পুষ্টি হয় না। মুখ পরিষ্কা[illegible]তল স্নানের (Cold Bath) ব্যবস্থা করিলে রাখা স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের প্রথম উপদেশ। প্রত্যে[illegible]রোগীর নিউমোনিয়া বা ব্রন্‌কাইটীস রোগ জন্মিতে মাতারই শিশুগণকে বাল্যবয়স হইতে মুখ ও দাঁতে[illegible]পারে; কিন্তু সে রূপ ঘটনা নিতান্ত বিরল।

যত্ন করিতে শিক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। কি[illegible] শৈত্য প্রদাহ নষ্ট করে। এজন্য বিবিধ বাহ্য আমাদের দেশে কয়জন পিতামাতা স্বয়ং এই বি[illegible]দাহে শীতল জলের পটী অথবা বরফ প্রয়োগ বুঝেন বা নিজেদের দাঁত পরিষ্কার রাখেন!

[illegible]রিলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। ডাক্তার [illegible]র্ণট্ এইরূপে প্রদাহিত স্থানে শৈত্য প্রয়োগ করিয়া [illegible]ত শত রোগীকে নিরাময় করিয়াছেন। তবে হাম, [illegible]ন্ত প্রভৃতি কতকগুলি রোগের বিষ প্রদাহরূপে [illegible]পথে বাহির হয়। সে সকল স্থলে চর্ম্মে শৈত্য [illegible]য়োগ নিষিদ্ধ; কারণ, চর্ম্মের প্রদাহ হঠাৎ নিবারিত [illegible]লে রোগ-বিষ দেহের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদিতে প্রবিষ্ট [illegible]য়া অধিকতর অনিষ্ট সাধন করিতে পারে।

[illegible] আভ্যন্তরিক যন্ত্রের মধ্যে বক্ষঃ ও উদরগহ্বরস্থ [illegible]াদির প্রদাহে শৈত্য প্রয়োগ কখনই বিধেয় নহে। মস্তিষ্ক প্রদাহে মস্তকে শীতল জল-ধারা প্রদান [illegible]রিলে অথবা বরফ রাখিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। পাকাশয় প্রদাহে বরফ খাইলে অথবা বরফ [illegible]শ্রিত জল পান করিলে যন্ত্রণার লাঘব হয় এবং [illegible] সঙ্গে প্রদাহও কমিয়া যায়।

[illegible] তাপ প্রদানে যেরূপ ভৌতিক পদার্থের কলেবর [illegible]ারিত হয়, শৈত্য সংলগ্নেও সেইরূপ সঙ্কুচিত [illegible]য়া যায়। শৈত্য স্থানীয় পরমাণু সকলের নৈকট্য [illegible]দ্ধি করে ও রক্তকে সংযত করে। এজন্য অস্ত্র [illegible]কিৎসকগণ অস্ত্রোপচারের পর রক্ত রোধার্থ শীতল [illegible] বা বরফ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

[illegible]দন্তমূল বা মুখাভ্যন্তর হইতে রক্তস্রাব হইলে [illegible]-খণ্ড মুখে রাখিলে রক্ত বন্ধ হয়।

[illegible] নাসিকা হইতে রক্তপাতে শীতল জলের নস্য [illegible]রণে সুফল দর্শে।

রক্তবমন রোগে বরফ খাইলে উপকার হয়।

প্রসবান্তে অত্যন্ত রক্তস্রাব হইলে যথেষ্ট বরফ খাইতে দিলে এবং নিম্নোদরে শীতল জল-ধারা প্রদান করিলে জরায়ু সঙ্কুচিত হইয়া রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

প্রসবে বিলম্ব ঘটিলে, প্রসবের পর ফুল নির্গত না হইলে, অথবা অকালে প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়া গর্ভপাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, যথেষ্ট বরফ খাওয়াইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

রক্তাধিক্য রোগেও শৈত্য মহোপকারক। ইহার সঙ্কোচক গুণ থাকায় রক্তাধিক্য নিবারিত হয়।

শিশুদিগের আক্ষেপ (Convulsion) রোগে মস্তকে বরফ দিলে বা তদভাবে শীতল জল প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য উপকার পাওয়া যায়।

উন্মাদ রোগীর মস্তকে বরফ পূর্ণ থলি (Icebag) রাখিলে রোগীর দৌরাত্ম্য ও অস্থিরতা শীঘ্রই নিবারিত হইয়া সুনিদ্রা উপস্থিত হয়।

শৈত্য দ্বারা স্পর্শশক্তির লোপ করিয়া বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্ত্র চিকিৎসা করা হয়। শৈত্য প্রয়োগ করিয়া অস্ত্র করিলে অস্ত্রের ক্লেশ তাদৃশ অনুভূত হয় না; রক্তপাতও অল্প হয়! নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা অতি সহজেই স্থানীয় স্পর্শশক্তির লোপ করা যাইতে পারে;—

বরফ চূর্ণ ২ভাগ, সৈন্ধব লবণ ১ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া বস্ত্র মধ্যে পুটলি করতঃ শরীরের যে কোন স্থানে লাগাইলে শীঘ্রই ঐ স্থানের স্পর্শশক্তি বিলুপ্ত হয়। যদি ঐ স্থানে প্রদাহ থাকে তবে ৮-১০ মিনিট কাল সময় লাগে; কিন্তু প্রদাহ না থাকিলে ২মিনিটের মধ্যেই স্পর্শশক্তি লুপ্ত হইয়া থাকে। ডাক্তার জেমস্ আর্ণট সর্ব্বপ্রথমে এই প্রকরণের আবিষ্কার করেন। স্পর্শশক্তির লোপ হইলে আর অধিক কাল ঐ স্থানে শৈত্য প্রদান করা উচিত নহে। অত্যধিক সময় ও অত্যধিক পরিমাণে শৈত্য প্রয়োগ করিলে ঐ স্থানের টিসু সকলের মৃত্যু হয়; অর্থাৎ ঐ স্থান একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

শৈত্যের বলকারক গুণও বিলক্ষণ আছে। শীতল

শৈত্য প্রয়োগ।

লেখক—ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সাহিত্য-বিশারদ

(Application of cold)

ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে শৈত্য প্রয়োগ করিয়া ডাক্তারেরা অনেক রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন। টাইফাস্, টাইফয়েড্, হাম প্রভৃতি জ্বরে যখন শরীরের তাপ এত বৃদ্ধি হয় যে, রোগীর জীবনাশা থাকে না তখন উত্তাপাধিক্যের হ্রাস করিতে শৈত্য প্রয়োগই সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট চিকিৎসা। এই শৈত্য প্রয়োগের সাধারণতঃ চারি প্রকার ব্যবস্থা করা হয়।

(১) শীতল জলে সম্পূর্ণ স্নান।

(২) শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে শীতল জল সেচন।

(৩) শীতল জলে বস্ত্র ভিজাইয়া তদ্দ্বারা শরীর আচ্ছাদন।

(৪) শীতল জলে গামছা ভিজাইয়া উহা দ্বারা গাত্রমার্জ্জন।

সুবিখ্যাত ডাক্তার রিংগার বলেন, দৈহিক উত্তাপ কমাইবার পক্ষে নিম্নের প্রক্রিয়াটি বিশেষ ফলপ্রদ।

" Dip four napkins or small towels into iced water and wring them nearly dry, so that they may not drip and wet the bed, then apply them one below the other from the chest downwards. As soon as the four cloths are disposed over the chest and abdomen re-dip and re-wring the uppermost, then the second, third and fourth, seriatim, then the first again and so on continuously."

প্রথমে ৪ খানি গামছা বরফ জলে ভিজাইয়া অল্প নিংড়াইয়া লইবে। পরে ঐ গামছা দ্বারা হস্ত, পদ, বক্ষঃ, উদর প্রভৃতি অঙ্গ সকল আবৃত করিবে। অল্পক্ষণ এই ভাবে রাখিয়া গামছাগুলি বরফ-জলে ভিজাইয়া, অল্প নিংড়াইয়া আবার যথাস্থানে স্থাপিত করিবে। বারম্বার

জলে স্নান করিলে শরীর সবল হয়। অবগাহন স্নান কালে দেহ পবিত্র ও মন প্রফুল্ল বোধ করিলেই আর জলে থাকা উচিত নহে। হস্তপদাদির চর্ম্ম কুঞ্চিত হইবার পূর্ব্বেই জল হইতে উঠিয়া আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। নিয়মিত ভাবে শীতল জলে স্নান করিলে শীঘ্রই শরীরের ভার বৃদ্ধি হয়, দেহের লাবণ্য ও বর্ণ পরিষ্কৃত এবং মাংসপেশী সুদৃঢ় হয়।

অতি শিশু, অতি বৃদ্ধ ও অতি দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে শীতল জলে স্নান হিতকর নহে। তাহাদের পক্ষে শীতল জলে গামছা ভিজাইয়া তদ্দ্বারা গাত্র মার্জ্জন (cold sponging) বিশেষ উপকারী।

অল্প কালের জন্য দেহে শৈত্য প্রয়োগ করিলে প্রথমেই অবসাদক ক্রিয়া প্রকাশ পায়; কিন্তু পর-ক্ষণেই—শৈত্য প্রয়োগ অপসৃত হইলেই—পুনরায় শরীর উত্তেজিত হইয়া উঠে। ইংরাজীতে ইহার নাম "Reaction" অবস্থা।

অনেক সময় সংজ্ঞাহীন রোগীর মুখে শীতল [illegible] ছাট্ দিলে রোগী শীঘ্রই চৈতন্য লাভ করে।

মাতাল বা অহিফেনাদি বিষ ভোজীর অচৈতন্যাবস্থা এইরূপে দূর করা যাইতে পারে।

নবজাত শিশুর শ্বাসরোধে শৈত্য প্রয়োগ [illegible] বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। একটি পাত্রে গরম জল এবং অপর একটিতে শীতল জল রাখিয়া শিশুকে অল্পক্ষণের জন্য উষ্ণ জলে আকণ্ঠ ডুবাইতে হয় এবং তাহার অব্যবহিত পরেই আবার শীতল জলে ঐ [illegible] ভাবে নিমজ্জিত করিতে হয়। এই প্রক্রিয়া পুনঃ পুনঃ করিলে শিশু হাঁপাইয়া উঠে ও শ্বাস গ্রহণ করিতে থাকে। শৈত্য প্রয়োগই এই চিকিৎসার উদ্দেশ্য। কিছুক্ষণ পরে জলের শৈত্য কমিয়া যায়, এই [illegible] গরম জলের আবশ্যকতা; নতুবা এস্থলে উহার [illegible] উপকারিতা নাই।

কুইনাইনের আত্ম-নিবেদন।

লেখক—শ্রীহিমাংশুশেখর বসু।

আমার নাম কুইনাইন, তোমাদের সকলেরই আমি পরিচিত। হেরিং ও হাওয়ার্ডের শিশির মধ্যে অথবা বরোজ ওয়েল্‌কামের চিনির চাকৃতির মধ্যে বাসকরত আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত হই। ডাকঘরেও আমায় দেখিতে পাইবে। "কুইনাইন-বিবর্জ্জিত" জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র এবং জ্বরের পেটেণ্ট "বিশুদ্ধ গাছড়ায় প্রস্তুত" পাচনের মধ্যেও অলক্ষিতভাবে আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত হই।

আমেরিকা দেশে আমার মাতুলালয় ছিল। সেখান-কার রক্তমূর্ত্তি আদিমবাসীর জঙ্গলী জ্বরে আমার জননী সিঙ্কোনার বড়ই আদর ছিল। এক সময়ে সেখানকার সিঙ্কন নামে এক স্থানের জমীদারের স্ত্রী সেই জ্বরে আক্রান্ত হইলেন, সকল চিকিৎসকের চেষ্টা যখন বিফল হইল তখন আমার জননীর কৃপায় তিনি নীরোগ হইলেন। সেই জন্য তাঁহার নাম হইল সিঙ্কোনা। তাঁহার পর ইয়োরোপ ও আমেরিকার চিকিৎসকগণের নিকট সিঙ্কোনার বিশিষ্টরূপ প্রতিপত্তি হইয়া উঠিল; মূল্য এত অধিক হইল যে দরিদ্র লোক তাহা ব্যবহার করিতে পারিত না। আজ তিনি ও তাঁহার সন্তানেরা আমি গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছি।

ম্যালেরিয়া জ্বরে আমি অব্যর্থ ফলপ্রদ বলিয়া তোমাদের দেশের শাসনকর্ত্তৃগণ সাদরে আমায় নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া রাখিয়াছেন। তাই ডাকঘরে বলিতে পাইবে। আমি ম্যালেরিয়া-পীড়িত গ্রামে গ্রামে [illegible] নিবারণ করিতেছি। তোমাদের মধ্যে অনেকেই [illegible] আমার এই গুণটির বিষয়ই জান, আর কিছুই [illegible]না। আমার ইহা ব্যতীত অনেক গুণ আছে। [illegible]কে একে সে সকল কথা তোমাদিগকে বলিব, শুনিলে [illegible]মাদের লাভ ব্যতীত ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

আমি অনেক জীবাণুর যম। আমি পচন নিবারণ [illegible]রিয়া থাকি। কিন্তু আমার অপেক্ষা সুলভ অনেক [illegible]বাণুনাশক ও পচন নিবারক ঔষধ আছে বলিয়া [illegible]ণের জন্য আমার খ্যাতি নাই। আমার আস্বাদ [illegible] বলিয়া অনেকে আমায় ভালবাসে না। কিন্তু [illegible] বলিয়াই আমি তোমাদের অনেক উপকার [illegible]তে পারি। তোমরা ত চিরেতা ব্যবহার করিয়া [illegible]; ইহাতে অরুচি দূর হইয়া অগ্নিবৃদ্ধি হয়। [illegible]জনের পূর্ব্বে তোমরা নিমপাতাভাজা, পল্‌তাভাজা, [illegible]তার ঝোল, হিংচাশাক ভাজা প্রভৃতি খাইয়া থাক। [illegible]খের পর দৌর্ব্বল্যে এ সকল পথ্য বিশেষ উপকারী। [illegible]মরা ঔষধরূপে কোয়াসিয়া, কলম্বা প্রভৃতিও এ [illegible]স্থায় ব্যবহার কর; সে সকলই তিক্ত এবং তিক্ত [illegible]য়াই তাহারা এই গুণসম্পন্ন। আমারও ঐ গুণ [illegible]ছে। ইষ্টনের সিরাপ ত ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হইতেছে, [illegible]র মধ্যে আমি বিরাজিত। জ্বর নিবারণের জন্য [illegible] তোমরা আমার শরণ লও, তখন আমাকে [illegible]বার পূর্ব্বে যদি একটু হরিতকী চিবাইয়া লও তাহা [illegible] আমার তিক্তস্বাদ চলিয়া যায়। আজ কাল অধস্ত্বাচ [illegible]য়োগে (Hypodermic Injection) এই অসুবিধা [illegible]।

চর্ম্মরোগে বিশেষতঃ খোস পাচড়া প্রভৃতি রোগে [illegible]মি অতি উপকারী। তোমরা যেরূপ নীমের তৈল [illegible]হার কর, সেইরূপ সর্ষপ তৈলের সহিত আমি মিশ্রিত [illegible] এই রোগে ব্যবহৃত হই। নীমের তৈলের [illegible]ত আমাকে মিশ্রিত করিলে ইহার শক্তির বৃদ্ধি হয়। [illegible] পুঁয জননের উপর আমার প্রভাব তোমরা সহজেই [illegible]তে পাইবে। প্রদাহযুক্ত স্থলে, ক্ষতস্থলে কৈশিক [illegible]সকলের (Capillaries) মধ্য হইতে রক্তের

শ্বেতকণিকা সকল যখন বহির্গত হয়, তাহারাই মৃত পূয়রূপে বহির্গত হইয়া থাকে। আমি এই কণিকা সকলের গতি রোধ করি। তোমরা পূঁযযুক্ত ক্ষতস্থলে, খোস পাঁচড়ায়, দন্তমূলে পূঁযসঞ্চার (Pyorhroea) প্রভৃতি রোগে আমার প্রভাব পরীক্ষা করিও।

কেশ বৃদ্ধি করিয়া থাকি বলিয়া সুন্দরীগণের প্রসাধন কার্য্যে আমার যথেষ্ট আদর আছে। জীবাণুর উপদ্রবে যখন মস্তক শ্রীহীন হয়, তখন আমি পূর্ব্বশ্রী ফিরাইয়া আনি। তোমাদের স্ত্রী কন্যাকে আমার গুণ পরীক্ষা করিতে বলিও।

দরিদ্র পরিবারে সন্তান বৃদ্ধি নিবারণের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বিত হয়। এ বিষয়ে আমার আদর অল্প নহে। শুনিয়াছি নীমের বীজের তৈলও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

আসন্ন প্রসবা জননীর আমি পরমসহায়। জরায়ুর সঙ্কোচন যখন স্বভাবতঃ আরব্ধ হইয়াছে, তখন আমি তাহার বৃদ্ধি করি। গর্ভপাতের আশঙ্কায় অন্তঃসত্ত্বার জ্বররোগে চিকিৎসকগণ আমার সাহায্য গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু এ অবস্থায় আমি উপকার ব্যতীত অপকার করি না; কারণ, শুধু প্রসবের সময়ে আমি জরায়ুর সঙ্কোচন করিয়া থাকি, তাহার পূর্ব্বে আমার এ ক্রিয়া থাকে না; কিন্তু সকল সময়ে জ্বররোগে আমার শক্তি অপ্রতিহত। সেইজন্য গর্ভবতীর জ্বররোগে আমার সাহায্য লইলে মঙ্গলই হইয়া থাকে। কারণ জ্বরনিবারণ না করিলে জ্বরের প্রাবল্যে স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনায় গর্ভস্রাব হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু জরায়ুর রোগবশতঃ যে সকল জননীর অকালে সন্তান নাশ হয় তাঁহাদের জ্বরে অতি সন্তর্পণে আমার সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। অন্যান্য বিবিধ রোগে সময়ে সময়ে চিকিৎসকগণ আমার সাহায্য গ্রহণ করেন; কিন্তু সে সকল ক্ষেত্রে আমার শক্তির বিশেষত্ব নাই।

এই ত গেল আমার গুণের কথা; এইবার আমি আমার দোষগুলির কথা কহিব। আমার দোষও অনেক-

গুলি ; কারণ "অতীত্য হি গুনান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মুর্দ্ধি বর্ত্ততে" আপনারা সকলেই জানেন যে, দোষগুলি বদ্ধ-মূল হইলে তাহার সংশোধন অসম্ভব; কারণ—"যঃস্বভাবো হি যস্য স্যাৎ তস্যাসৌ দুরতিক্রমঃ। শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা স কিং নাশ্নাত্যুপানহম্।" সুতরাং আপনারা আমাকে হাইড্রোব্রোমিক এসিড্, পটাশিয়াম ব্রোমাইড প্রভৃতির সহিত ব্যবহার করিলেও আমার দোষ যায় না। তবে চিনির চাকৃতির মধ্যে আমাকে খাইলে আমার তিক্তত্ব চলিয়া যায়। অনেকের কর্ণে আমি গুঞ্জন শব্দ করি, নিদ্রা তাহাদিগের নিকট হইতে কিছুদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করে। মস্তকে একরূপ যন্ত্রণা অনুভূত হয়, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা উপস্থিত হয়। ম্যালেরিয়া-প্লাবিত বঙ্গদেশে আমার এই দোষগুলি সকলের নিকট পরিচিত। শুনিয়াছি, তোমরা এই জন্য আমার উদ্দেশ্যে কটুভাষণ করিয়া থাক। আমি নীরবে সে সকল সহ্য করি। আমার মনে হয়, আমার দোষ অপেক্ষা তোমাদের দোষ অধিক। তোমরা চক্ষুকর্ণ বুজিয়া আমার নিকট আসিয়া থাক আবার আমাকে কটুকথা বলিয়া থাক। ইহা কি তোমাদের দোষ নহে? তোমাদের দেশেই ত অনেক উৎকৃষ্ট জ্বরঘ্ন ঔষধ আছে। শুনিয়াছি, তোমাদের সপ্তপর্ণ বা ছাতিম আমার অপেক্ষাও প্রবল জ্বরনাশক। আবার কুচিলার মত বলকারক শক্তিও ইহার আছে। ক্ষেৎপাপড়া গুলঞ্চ প্রভৃতির শক্তিও ত অল্প নহে। তোমাদের অধিকাংশ লোকই এসকলের দিকে দৃষ্টিপাত করে না কেন? বিদেশের পণ্ডিতগণ তোমাদের জিনিষ লইয়া মস্তক আলোড়িত করিয়াছেন, তোমাদের সকলে তোমাদের ঘরের কথা না জানিলে লজ্জার বিষয় হইবে। শুধু আমার মত নহে, আমার ভাইবন্ধুর মত অনেক গুণী তোমাদের বনে জঙ্গলে আছে। তোমরা সকলে তাহা জানিয়াও জান না—ভয় এই যে, লোকে তোমাদিগকে হাতুড়ে বলিবে। কিন্তু বড় লোকে মুড়ি খাইলে ত লোকে নিন্দা [illegible] না। তোমরা যদি প্রকৃত পণ্ডিত হইয়া গবেষ[illegible] (Pharmacological research) দ্বারা এসব অনাদৃত গুণীর গুণ বিজ্ঞানের আলোকে দেখ[illegible] বিদেশের পণ্ডিতদের সম্মুখে ধরিতে পার তবে [illegible] আর তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিবে না। এ চেষ্টা অনে[illegible] ইয়োরোপীয়ান পণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন, দেশীয় লোকে[illegible] মধ্যে যে এ চেষ্টা একেবারে নাই তাহা নহে। [illegible] দিন এক সাধকের সাধনার ফলে ডিজিটেলিস্ [illegible] অর্জ্জুনের তুলনায় অর্জ্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইল। [illegible] একজন পরীক্ষা করিয়া জুনিপার ও গোক্ষুরের তুল[illegible] গোক্ষুরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

এ উদ্যমে যিনি সকলের অগ্রগণ্য হইয়াছি[illegible] স্বাস্থ্য সমাচারের পাঠকের নিকট তাঁহার [illegible] পরিচিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমা[illegible] দেশের লোকের অপেক্ষা জার্ম্মানি প্রভৃতি দে[illegible] লোকের এ বিষয়ে আগ্রহ অধিক। শুনিয়াছি জা[illegible] দেশে যমানি, অশ্বগন্ধা, অশোক, কালমেঘ, ওলট্[illegible] জামের বীজ, কুড়্চি, অর্জ্জুন, ক্ষেৎপাপড়া, ছা[illegible] চিরেতা, গুলঞ্চ, গোক্ষুর প্রভৃতির গুণ প্রচা[illegible] হইয়াছে। সেইরূপ আরও শত সহস্র ফলপ্রদ ঔষ[illegible] গুণাবলী জানিবার ও জানাইবার জন্য তোমা[illegible] উৎসাহ কোথায়?

ধান ভানিতে অনেকটা শিবের গীত গাহিলা[illegible] তোমরা আমাকে মার্জ্জনা করিও। কারণ আমি নি[illegible] সরল, অকপট ভাবে কথা কহিয়াছি। আজ, কুইনাই[illegible] অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত [illegible] কয়েকটি কথা বলিলাম। আমার কথা যদি তোমা[illegible] ভাল লাগে তবে অন্যবেশে তোমাদের নিকট উপ[illegible] হইয়া আবার আত্ম-নিবেদন করিব।

সর্দ্দিজনিত পীড়া ও তাহার প্রতিষেধ।

ঋণশেষোঽগ্নিশেষশ্চ ব্যাধিশেষস্তথৈবচ
পুনশ্চ বর্দ্ধতে যস্মাৎ তস্মাৎ শেষাৎ, নকারয়ে ইতি।

আমাদের দেশে একটী প্রবচন প্রচলিত আছে, "ঋণের শেষ, ব্যাধির শেষ ও অগ্নির শেষ রাখিতে নাই।" অর্থাৎ, ঋণ সম্পূর্ণরূপে শোধ না করিলে, ব্যাধিকে সম্পূর্ণরূপে বধ না করিলে, অগ্নির শেষ স্ফুলিঙ্গ পর্য্যন্ত নির্ব্বাপিত করিয়া না ফেলিলে, ক্রমে তাহারা আবার বৃদ্ধি পাইয়া মহা অনিষ্ট ঘটাইতে পারে। ঋণ শোধ করিতে যদি কিছু বাকী থাকে, তবে তাহা সুদে আসলে আবার বৃদ্ধি পাইয়া বৃহদাকার ধারণ করিতে পারে। ব্যাধিকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া না ফেলিলে সে ক্রমে আবার বলসঞ্চয় করিয়া প্রবল হইয়া বিপদ ঘটাইতে পারে। অগ্নিকেও একেবারে নির্ব্বাপিত না করিলে, তাহারও পুনরায় প্রবল হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহার পরিণামও কখনও মঙ্গলজনক হইতে পারে না। আমরা এই প্রবচনটির সহিত আরও একটী কথা যোগ করিতে চাই; যথা, রোগের শেষ রাখিতে নাই। তাহা হইলে প্রবচনটি এইরূপ দাঁড়ায়,—ঋণের শেষ, শত্রুর শেষ, অগ্নির শেষ এবং রোগের শেষ রাখিতে নাই। এই প্রবচনটির মর্ম্ম এই যে, সামান্য বলিয়া কাহাকেও উপেক্ষা করিতে নাই। সর্দ্দি ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা অন্য কোন কারণে সর্দ্দি হইলে, লোকে এতটা কাতর হইয়া পড়ে না, যাহাতে তাহাকে সমস্ত কাজ কর্ম্ম বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে হয় (যদিচ, হিসাবমত, তাহাই করা উচিত)। সর্দ্দি হইলে, যাঁহার হয় তিনিও, এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনও, মনে করিয়া থাকেন, এবং বলিয়াও থাকেন, ও সামান্য সর্দ্দি,—আপনিই সারিয়া যাইবে, উহার দরুন ব্যস্ত-উদ্বিগ্ন হইবার দরকার নাই। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? সর্দ্দি কি এমনই উপেক্ষণীয় রোগ, যে সর্দ্দি হইলেই সাবধান হইতে হইবে না,—বিশ্রাম করিতে হইবে না,—চিকিৎসা করাইতে হইবে না? বস্তুতঃ তাহা নয়। সর্দ্দি রোগকে উপেক্ষা অবহেলা করিলে তাহা হইতে কি কি কঠিন রোগ হইতে পারে দেখুন। (১) ক্যাটারা (Catarrh বা মস্তিষ্কের প্রদাহ); (২) ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা; (৩) নিউমোনিয়া। এই তিনটির কোনটিই সহজ ব্যাধি নহে। ক্যাটারা হইলে মাথার ভিতর যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, মাথা ভার হয়, কোন কাযে উৎসাহ থাকে না। রাত দিন নাক দিয়া জল ঝরে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা কিরূপ ভয়ানক রোগ তাহা জানিতে এখন আর বোধ হয় কাহারও, বাকী নাই। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাতে যদিও সদ্যঃ প্রাণনাশের আশঙ্কা নাই, তথাপি অসাবধান হইলে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ক্রমে নিউমোনিয়ায় পরিণত হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটাইতে পারে এবং ঘটাইয়াও থাকে। আর, সর্দ্দির ফলে নিউমোনিয়া হইলে ত কথাই নাই,—তাহা সদ্য প্রাণ-হর ব্যাধি।

সর্দ্দি রোগের কারণ কি? সাধারণ লোকে মনে করে, ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হয়। ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হয় বটে, কিন্তু ঠাণ্ডাই সর্দ্দির প্রত্যক্ষ কারণ নহে। সর্দ্দি এক প্রকার জীবাণু (Germs) হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঠাণ্ডা লাগিলে এই জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ও বিস্তৃতি সাধনে সহায়তা হইয়া থাকে। জীবাণুতত্ত্ববিদ্‌গণের অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই জীবাণু ধরা পড়িয়াছে; তাহাদের আকৃতি, প্রকৃতি ও জাতিভেদ নির্ণীত হইয়াছে। সকল জাতীয় সর্দ্দি-জীবাণুর অনিষ্ট করিবার শক্তি সমান নহে। কোনটি মৃদু, কোনটি প্রবল; কোনটি নিরীহ, কোনটি বিষাক্ত। মানুষের নাসিকা ও কণ্ঠ-নালীতে ইহারা বাস করে; ঠাণ্ডা লাগিলে, অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ইহারা প্রবল হয়, এবং সর্দ্দি রোগ উৎপাদন করে। মানুষের শরীরের দৃঢ়তা, সবলতা, রোগ-প্রতিষেধের শক্তি অনুসারে ইহারা রোগীকে কাবু করিতে সমর্থ হয়। দুর্ব্বল-দেহ লোকে সহজেই সর্দ্দি পীড়ায় কাতর

হইয়া পড়ে। সর্দ্দি কোন্ কোন রোগের পূর্ব্বলক্ষণ। দীর্ঘকাল পীড়া ভোগ করিবার পর, সুস্থ হইয়া উঠিলেও লোকে অল্পেই সর্দ্দি রোগে আক্রান্ত হইতে পারে; এবং তাহার ফলে, তাহার পুরাতন রোগ পুনরায় প্রবল হইতে পারে, অথবা সর্দ্দিই খুব প্রবল হইয়া নূতন রোগের সৃষ্টি হইয়া পড়ে।

সর্দ্দি রোগ সংক্রামক। কোন কোন লোকের নাসিকা ও মুখে কিম্বা গলায় এই জীবাণু জন্মগ্রহণ ও বংশবৃদ্ধি করিলেও সেই লোকটির শরীর যদি খুব দৃঢ় ও সবল হয়, তাহা হইলে তাহার সর্দ্দি রোগ হয় না বটে, কিন্তু সেই লোকের সংস্পর্শে আসিলে, অন্য দুর্ব্বল লোকের নাসিকা ও মুখে সর্দ্দি-জীবাণু সংক্রামিত হইয়া রোগ উৎপাদন করিতে পারে। নিঃশ্বাস, থুথু প্রভৃতির মধ্যস্থতায় এইরূপে সর্দ্দি-জীবাণু এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রামিত হয়। অতএব থুথু, গয়ের, সিক্‌নি—এ সব হইতে সাবধান থাকিতে হইবে। যেখানে সেখানে থুথু ফেলা বা নাক ঝাড়িয়া সিক্‌নি মোছা উচিত নয়। আর একজনের পরিত্যক্ত প্রশ্বাসবায়ু অপরের [illegible] মুখে লাগা ভাল নয়। কথা কহিবার সময়ে যাহাদের মুখ দিয়া থুথুর কণা বাহির হয়, তাহাদের ঐ থুথু অন্য লোকের নাকে মুখে লাগিয়া সর্দ্দি-জীবাণুর এক দেহ হইতে দেহান্তরে আশ্রয় লওয়া বিচিত্র নয়। এই সকল বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। অনেকের এমন কদভ্যাস আছে যে, তিনি যেখানে বসিয়া থাকেন সেইখানেই সিক্‌নি গয়ের ইত্যাদি ফেলিয়া থাকেন। অনেকে আলস্য বশতঃ এরূপ করিয়া থাকেন। বড় লোকেরা বাহিরে থুথু ফেলিবার জন্য আসন হইতে উঠিতে নারাজ; ইহাতে তাঁহাদের পদমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে! এরূপ ব্যক্তিরা যেখানে বসেন, তাহার কাছে যদি একটা ডাবর বা পিকদানী লইয়া বসেন, এবং ঐ ডাবর বা পিকদানীতে থুথু ইত্যাদি ফেলেন, তাহা হইলে সর্দ্দি-জীবাণুর সংক্রামকতা অনেকটা কম হইতে পারে। সর্দ্দি-জীবাণু-আক্রান্ত ব্যক্তি যে রুমাল, তোয়ালে বা গামছা ব্যবহার করেন, তাহা [illegible] রোগ সংক্রামিত হইতে পারে। অতএব তাঁ[illegible] ব্যবহৃত গামছা, তোয়ালে, রুমাল অপর [illegible] ব্যবহার করা উচিত নয়। সর্দ্দি যাহাদের [illegible] তাহারা যে বালিসে মাথা রাখিয়া শয়ন করে, [illegible] বালিস আশ্রয় করিয়াও সর্দ্দি-জীবাণু অপর [illegible] সংক্রামিত হয়—এরূপও দেখা গিয়া থাকে। [illegible] একটা কথা আছে। প্রথমেই বলিয়াছি, সর্দ্দি [illegible] সাধারণতঃ সামান্য পীড়া বলিয়া উপেক্ষা করা হ[illegible] এই কারণে, যাঁহার সর্দ্দি হয়, তিনি রীতিমত চিকি[illegible] করান না; এবং সামান্য রোগ বলিয়া অন্য লো[illegible] ইহা হইতে সতর্কতা অবলম্বন করেন না। এই [illegible] সর্দ্দি রোগ সহজেই লোককে আক্রমণ করে [illegible] অনায়াসেই বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে।

সর্দ্দি হইলে সাবধান হওয়া উচিত এবং অবি[illegible] চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। সামান্য [illegible] ইহাকে কখনও উপেক্ষা বা অবহেলা করা বুদ্ধিমা[illegible] কাজ হইবে না। অনেক রোগের জীবাণুর ন্যায় স[illegible] জীবাণুও সূর্য্যের আলোক বা তাপ সহ্য করিতে [illegible] না। ভিজে স্যাঁতসেঁতে যায়গা ইহাদের প্রিয় [illegible] স্থান; শুষ্ক স্থানে ইহারা বেশীক্ষণ জীবিত থা[illegible] পারে না। গায়ে ময়লা থাকিলে তাহা আশ্রয় ক[illegible] ইহারা বেশ পুষ্টি লাভ করিতে পারে; [illegible] জায়গাতেও ইহাদের বংশবৃদ্ধি হয়। অতএব [illegible] ও বাসস্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ইহাদিগকে [illegible] রাখিবার খুব সহজ উপায়। এইরূপ প্রতিকূল অব[illegible] সর্দ্দির জীবাণুর পরমায়ু কখনও দুই চারি মি[illegible] বেশী হয় না; কখনও বা দুই ঘণ্টার মধ্যেই [illegible] লীলা সম্বরণ করিয়া থাকে। কিন্তু অনুকূল অব[illegible] অর্থাৎ ভিজা স্যাঁত সেঁতে যায়গায়, অপরিষ্কার [illegible] এবং অন্ধকারে ইহারা বহুকাল জীবিত থাকিয়া [illegible] হইতে পারে। যে ঘরে রীতিমত বায়ু চ[illegible] করে, প্রত্যহ রোদ আসে, যে ঘর শুক্‌নো [illegible] যে ঘরের মেঝে বিলাতী মাটী বা পাথ[illegible]

[illegible] এবং সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা হয়, সে ঘরে [illegible] জীবাণুর বৃদ্ধি নিষিদ্ধ। যিনি প্রত্যহ কিছুক্ষণ [illegible] করেন, নিত্য মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করেন, [illegible] সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন, ময়লা কাপড় [illegible] পরেন না, ময়লা স্থানে থাকেন না, ময়লা [illegible] শয়ন করেন না,—সর্দ্দির জীবাণুর সহিত [illegible] চির বিরোধ;—এই জীবাণু তাঁহার ত্রিসীমানায়ও [illegible] পারে না। যে বাড়ীর ঘর-দ্বারের মেঝে, [illegible] প্রত্যহ ধৌত করিয়া, শুষ্ক ন্যাতার দ্বারা মুছিয়া [illegible] হয়, যে বাড়ীতে সমস্ত ঘরে উঠানে হাওয়া [illegible] রোদ আসে—সে বাড়ীতে সর্দ্দির স্থান নাই। [illegible] বাড়ীর গৃহিণী সুগৃহিণী,—যিনি প্রত্যহ গৃহস্থের [illegible] দ্রব্যাদি—বাসন কোসন ধৌত করান, ঝাড়িয়া [illegible] পরিষ্কার রাখান, বিছানাপত্র প্রত্যহ রৌদ্রে [illegible] দেওয়ান,—তাঁহার বাড়ীর কাহাকেও সর্দ্দি পীড়ায় কষ্ট [illegible] পাইতে হয় না;' ছেলে পুলেদের নাক দিয়া দিবানিশি [illegible] সর্দ্দি ঝর ঝর করিয়া ঝরে না, সে বাড়ীর লোকদের [illegible] দিবানিশি সর্দ্দিজনিত মুখ ভার (sorry figure) [illegible] কাহারও বিরক্তি উৎপাদন করে না। সে [illegible] চির আনন্দময়; সে বাড়ীর অধিবাসীদের মুখ [illegible] হাস্য-প্রফুল্ল থাকে। সর্দ্দি কেবল যে সিকনি [illegible] য়েরই থাকে, তাহা নয়; মুখামৃত সর্দ্দির জীবাণুর [illegible] একটা আশ্রয়স্থল। সুতরাং সর্দ্দি পীড়িত ব্যক্তি যে [illegible] ভাত খায়, যে গেলাসে জল খায়, যে বাটীতে [illegible] খায়—এই সব বাসন তাহার মুখস্পৃষ্ট হইয়া [illegible] জীবাণুর দ্বারা দূষিত হইতে পারে, এবং [illegible] থাকে। এইরূপে সর্দ্দি-পীড়িত লোকে আহার [illegible] উঠিয়া যাইবার পর তাহার কোন স্নেহ-পাত্র [illegible] পাতে ভাত খাইলে তাহারও সর্দ্দি হইতে পারে; [illegible] খুবই সম্ভাবনা আছে। এরূপ স্থলে পাত্রগুলি [illegible] না মাজিয়া লইয়া পুনরায় ব্যবহার করা [illegible] ক্রমেই উচিত নহে; এ রকম এঁটো পাতে [illegible] —তা' যিনি খাইয়া উঠিয়া গেলেন, তিনি যত [illegible] হউন, এবং যিনি খাইবেন, তিনি যত বড় স্নেহের পাত্রই হউন,—একেবারে বর্জ্জন করিতে হইবে। বাসন মাজিবার পর একবার ফুটন্ত গরম জলে ধুইয়া লইতে পারিলে, সর্দ্দির জীবাণুর দ্বারা সংক্রামিত হইবার আশঙ্কা অনেকটা কমিয়া যায়।

অপরিষ্কার বায়ু সর্দ্দির জীবাণুর একটা বাহন। যে বায়ু ধূলিতে পূর্ণ থাকে, সে বায়ু নানা রোগের জীবাণু দ্বারাও পূর্ণ হয়। যেখানে সর্দ্দি বা অপর কোন পীড়াক্রান্ত ব্যক্তি বাস করে, সেখানে সে কথোপকথন কালে, নাক ঝাড়িবার সময়ে, থুথু ফেলিবার সময়ে এবং অন্যান্য রূপেও তাহার দেহের রোগ-বীজাণু সকল সেই স্থানের বায়ুতে মিশাইয়া দিয়া থাকে। এই কারণে বদ্ধ বায়ুতে যে পরিমাণে রোগ-বীজাণু থাকিতে পারে, মুক্ত স্রোত-বিশিষ্ট বায়ু তদপেক্ষা অনেকটা নিরাপদ বটে।

সর্দ্দি পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা যেখানে শ্লেষ্মা নিক্ষেপ করে, সেই স্থান তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার না করিয়া ফেলিলে, ঐ শ্লেষ্মা শুষ্ক হইয়া ধূলিবৎ হইয়া যায়; তার পর জোর হাওয়া দিলে সেই শ্লেষ্মা-জীবাণু-পূর্ণ ধূলি বায়ুর সহিত মিশিয়া গিয়া বায়ুকে দূষিত করিয়া ফেলে। বাঙ্গলা দেশের অনেক স্থানের লোক প্রায় সর্দ্দি পীড়ায় ভুগিয়া থাকে। সাধারণতঃ লোকে মনে করে যে, বাঙ্গলা দেশের জল বায়ু, মাটী বড় ভিজা, স্যাঁতসেঁতে। এমন কি, বাঙ্গলা দেশের এই দুর্নাম চীনদেশীয় ভ্রমণকারী এবং মুসলমান ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে বলিয়া শুনিতে পাই। কিন্তু আমাদের মনে হয়, দেশের জলবায়ুর ততটা দোষ থাক আর নাই থাক, আমাদের দেশের লোকের আচার ব্যবহার এই দুর্নামের জন্য অনেকটা দায়ী। হইতে পারে, বাঙ্গলা দেশ নদীমাতৃক দেশ বলিয়া এখানকার জলবায়ু কিছু ভিজা, স্যাঁতসেঁতে। কিন্তু, তাই বলিয়া দেশশুদ্ধ লোকের এত বেশী সর্দ্দি পীড়ায় কাতর হইবার কারণ দেখা যায় না। প্রথমতঃ, বাঙ্গলা দেশের সমুদ্রের তীরবর্ত্তী ভূভাগ লোনা; ইহার ফলে, বায়ুর জলীয় অংশ প্রায়ই লবণের দ্বারা

আকৃষ্ট হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত, বাঙ্গলা দেশের উপর দিয়া বার মাস বায়ু (শীতকালে উত্তুরে বাতাস এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণা বা মলয় বাতাস) প্রবাহিত হয়; বাঙ্গলা দেশ সূর্য্য কিরণ হইতেও বঞ্চিত নহে। মুক্ত, প্রবহমান বায়ু এবং সূর্য্য কিরণ—এই দুইটী বস্তুই সর্দ্দি-জীবাণুর পরম শত্রু। সুতরাং আমাদের এই সর্দ্দি বিনাশে প্রকৃতি দেবী কিছু মাত্র কৃপণতা করেন না। তবে লোকে এত সর্দ্দি ভোগ করে কেন? ইহার একমাত্র উত্তর—আমাদের আচার ব্যবহার। আমাদের প্রথম এবং প্রধান ভুল এই যে, সর্দ্দি হইলেই আমরা মনে করি, ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইয়াছে; অতএব যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে, তাহার ব্যবস্থা করা যাউক। সে ব্যবস্থা কি? না, প্রথমতঃ রোগীর দেহের উপর নানা প্রকার বস্ত্রাবরণের ভার চাপানো হয়। যাহাতে তাঁহার দেহে এক বিন্দু হাওয়া না লাগে, তাহার ব্যবস্থা করা হয়। তার পর, তাঁহাকে একটী ঘরে আবদ্ধ করিয়া ঘরের দ্বার জানালা উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া ফেলা হয়, যাহাতে সে ঘরে বিন্দু মাত্র বায়ু সঞ্চালন করিতে না পারে। অর্থাৎ, সর্দ্দির প্রতিষেধক যে সকল ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য,—যাহা চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা—তাহা না করিয়া, ঠিক তাহার উল্টা ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই সর্দ্দিও অনুকূল অবস্থায় রোগীকে পাইয়া বসে, কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। মানুষের নিজের এই ভুলের দরুণ বাঙ্গলা দেশের জলবায়ু পৃথিবীর কাছে অপরাধী হইয়া রহিয়াছে। ইহা বাঙ্গলা দেশের দুর্ভাগ্য।

সর্দ্দি যাহাতে সংক্রামক না হইতে পারে, সে জন্য, যাঁহার সর্দ্দি হয়, তাঁহারই সর্ব্বাগ্রে সতর্ক হওয়া উচিত। সর্দ্দি হইলে প্রায়ই নাক ঝাড়িতে হয়। নাক ঝাড়িবার সময়, সর্দ্দি জীবাণুপূর্ণ শ্লেষ্মা হাতে লাগিয়া যায়। নাক ঝাড়িয়া বার বার হাত ধোওয়া রোগী কষ্টকর বিবেচনা করিয়া থাকে এবং সেই নোংরা হাতে সকল কাজই করে। কিন্তু ইহা ভারী অন্যায়। সর্দ্দি হইলে হাত, মুখ, নাক সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা উচিত। তা না করিলে, সর্দ্দি সংক্রামক হইবেই হইবে।

এখন সর্দ্দি সম্বন্ধে মোটামুটি এই কথাগুলি [illegible] রাখিতে হইবে। সর্দ্দিতে নাক বুজিয়া রাখিতে হইবে। সর্দ্দি ঠিক ঠাণ্ডা হইতে জন্মে না, [illegible] চিকিৎসা করাইতে হইবে। রোগ এক প্রকার জীবাণুজাত। ঐ জীবাণু ঠাণ্ডায়, আবার বলি, সর্দ্দিকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা, ভিজা স্যাঁতসেঁতে অবস্থায় বর্দ্ধিত ও বিস্তৃত [illegible] তাহার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে অবহেলা করা মানুষের শরীরের অবস্থা অনুসারে ইহা মৃদু [illegible] মস্ত ভুল। কোন রোগই সামান্য বলিয়া প্রকাশ পায় অথবা প্রবল ভাব ধারণ করিয়া মারাত্মক হইয়া উঠে। সর্দ্দির জীবাণু থুথু, সিকনি, গয়ের প্রভৃতির সাহায্যে স্থানান্তরিত, দেহান্তরিত বা সংক্রামিত হয়। সামান্য রোগ বলিয়া সর্দ্দি প্রথম প্রথম প্রায় উপেক্ষিত হইয়া থাকে। এই কারণে সর্দ্দির জীবাণু মানুষকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া ক্রমে এমন দুর্ব্বল ও রোগ-অসহিষ্ণু করিয়া ফেলে, যে, শেষকালে জীবন। তাহার দেহ নানা রোগের আকর হইয়া দাঁড়ায়, ক্রমশঃ যে কোন রোগই তাহার দেহে মারাত্মক সময়ে উদাসীন। গ্রামের পুকুরগুলির অবস্থা হইয়া পড়ে। সর্দ্দির প্রথম আক্রমণ সামান্য ভাবে [illegible] ইহা প্রতীয়মান হয়। অনেক সময়ে শুনিতে বলিয়া, তাহার সুচিকিৎসা না হওয়ায়, দ্বিতীয় আক্রমণ, আমরা শাস্ত্র-বিশ্বাসী জাতি। কিন্তু আমরা প্রথম আক্রমণের অপেক্ষা প্রবলতর হইয়া থাকে। [illegible] পাই ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। মনুসংহিতা এইরূপে যত বেশী বার আক্রমণ হয়, রোগও [illegible] শাস্ত্র। মনুর আদেশ পালনীয়। আমরা কিন্তু বেশী প্রবল হইতে হইতে, শেষ কালে ইনফ্লুয়েঞ্জা [illegible] আদেশ অনেক সময়ে পালন করি না। জলের নিউমোনিয়া প্রভৃতি সর্দ্দিজনিত রোগ ঐ ব্যক্তি [illegible] ব্যবহার সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন,—

সহজে আক্রমণ করিয়া সাংঘাতিক হইয়া উঠিতে পারে। সর্দ্দির সংক্রামকতা নিবারণ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে হইবে, বাসগৃহ, পোষাক পরিচ্ছদ, গামছা, তোয়ালে পরিষ্কার রাখিতে হইবে, এবং বিছানাপত্র রৌদ্রে দিতে হইবে ও বাসন কোসন গরম জলে ধুইয়া লইবে। করিতে হইবে। সর্দ্দি পীড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির নিঃশ্বাসাদি হইতে অন্ততঃ দুই তিন হাত তফাতে থাকিয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে হইবে।

পীড়িত ব্যক্তিকে সাবধান হইতে হইবে। সকাল এবং রাত্রিতে একবার করিয়া বুরুষ দিয়া দাঁত মাজিতে হইবে; জিবছোলা দিয়া জিহ্বা পরিষ্কার করিতে পারে। কিন্তু সকল সহরে জলের কল হইবে। গলা পর্য্যন্ত কুলকুচা (gargle) করিবে, পুকুর আছে; এবং গ্রামের অবস্থা অতীব পরিষ্কার রাখা উচিত। নাক ঝাড়িয়া [illegible]

"নাপ্সু মূত্রং পুরীষং বা ষ্ঠীবনং বা সমুৎসৃজেৎ।
আমধ্য লিপ্তমন্যদ্বা লোহিতং বা বিষাণি বা"

৪।৫৬ শ্লোক

অর্থাৎ জলে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না, অথবা থুতু ফেলিবে না। আমধ্যলিপ্ত অর্থাৎ বিষ্ঠা-মূত্রাদি-লিপ্ত করিতে হইবে। সর্দ্দি পীড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির নিঃশ্বাসাদি ক্ষালন করিবে না। কিংবা রক্ত বা বিষ নিক্ষেপ করিবে না।

এ বিষয়ে আমরা মনুর আদেশ কিরূপে পালন করি, তাহা প্রত্যেক গ্রামে গেলেই দেখিতে পাই। অনেক জলের কল হওয়াতে, জল এরূপ ভাবে বিদূষিত হইতে পারে না। কিন্তু সকল সহরে জলের কল নাই। গ্রামের অবস্থা অতীব শোচনীয়।

উপেক্ষণীয় নহে। ঋণ, অগ্নি, শত্রুর মত রোগেরও শেষ রাখিতে নাই। এই কথাটি ভাল করিয়া মনে রাখিতে পারিলে আমরা অনেক সময়ে মারাত্মক ব্যাধির হাত হইতেও তথা মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি।

জল।

লেখক—নবামী প্রজ্ঞানানন্দ স্বরস্বতী।

জল আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য। জল আমাদের শরীর-রক্ষার উপযোগী জিনিসের মধ্যে জল আমাদের পবিত্রতা-বিধান সম্বন্ধে অনেক সময়ে উদাসীন। গ্রামের পুকুরগুলির অবস্থা দেখিলেই ইহা প্রতীয়মান হয়। অনেক সময়ে শুনিতে পাই, আমরা শাস্ত্র-বিশ্বাসী জাতি। কিন্তু আমরা শাস্ত্রের আদেশ অনেক সময়ে পালন করি না। জলের ব্যবহার সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন,—

সহরে অনেক ক্ষেত্রে পানীয় জলের পৃথক্ পুকুর থাকায়, রোগ হইতে সহরবাসী লোক উদ্ধার পায়। কিন্তু গ্রামের অবস্থা বর্ণনাতীত। ওলাউঠায় দেশ উচ্ছন্ন যাইতেছে। তথাপি এই জল সম্বন্ধে আমরা কোনও বন্দোবস্ত করিতেছি না।

আমরা পুকুরে মলমূত্র ধৌত করি; থুতু ফেলি; রক্ত-পূয়াদি ধৌত করি। সেই জলই আবার পান করি ও পাকের জন্য ব্যবহার করি। আমাদের মত শাস্ত্র-বিশ্বাসী দুর্লভ! অপবিত্র ও দূষিত জল ব্যবহারে আমরা রোগগ্রস্ত হইয়া অকালমৃত্যু বরণ করিতেছি; তথাপি আমাদের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হইতেছে না। আমরা জাগিয়া ঘুমাইতেছি। এ ঘুম ভাঙ্গান কঠিন। দূষিত জল ব্যবহারের জন্য চর্ম্মরোগ, চক্ষুরোগ, টাইফয়েড্ জ্বর, কলেরা ও উদরাময়, প্রভৃতি নানাবিধ রোগের সঞ্চার হয়। দূষিত জল ব্যবহারের অপকারিতা সম্বন্ধে সুশ্রুত বলিয়াছেন।

"কীট-মূত্র পুরীষাণ্ড-শবকোথ-প্রদূষিতং
তৃণ-পর্ণোৎ করযুতং কলুষং বিষ সংযুতং
যোঽবগাহেত বর্ষাসু পিবেদ্বাপি নবং জলম্।
সবাহাভ্যন্তরান্ রোগান্ প্রাপ্নুয়াৎ ক্ষিপ্রমেবতু" ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কীট, মূত্র, পুরীষ, অণ্ড, শব, অথবা বিষ-দূষিত কিংবা তৃণ-পত্র আবর্জ্জনা প্রভৃতি দ্বারা কলুষিত জলে অবগাহন করে, বা সেই জল পান করে, অথবা যে ব্যক্তি বর্ষাকালে নূতন জল অবগাহনার্থ

রা পানার্থ ব্যবহার করে, তাহার শীঘ্রই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক নানাবিধ রোগ জন্মে।

দূষিত জল ব্যবহারে রোগ জন্মে, ইহা জানিয়াও আমরা জল পরিষ্কার করা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। গ্রামে পুকুরের জলে শৌচ ক্রিয়া, এবং কোনও কোনও স্থানে পুকুরের তীরে মল-মূত্রাদি ত্যাগের ব্যবস্থাও আছে। এইরূপে আমরা রোগ ডাকিয়া আনিয়া মৃত্যুর পথ পরিষ্কৃত করিতেছি। আত্মহত্যায় যদি পাপ থাকে, তাহা হইলে আমরা সেই পাপে পাপী। প্রাচীন ভারতে জলের বিশুদ্ধি সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল, তাহা মহাভারতে দেখিতে পাই। অভিমন্যুর মৃত্যু হইলে পুত্র-শোকাতুর অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—"ভগবান্ আমি ত কখনও জলে থুতু ফেলি নাই,—আমার পুত্র অকালে মরিল কেন?" প্রাচীন কালে জলে থুতু ফেলিলে কিরূপ পাপ-ভয় ছিল, তাহা অর্জ্জুনের এই বাক্য হইতে প্রতিভাত হয়। আর আমরা শুধু থুতু ফেলা কেন, অনেক সময়ে জলে মল-মূত্রও ত্যাগ করি,—রক্ত-পুয ধৌত করা সম্বন্ধে কোনও বাধাই নাই। আমরা শাস্ত্রীয় বিধান মানি না; স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মেও অবহেলা করি।

এইরূপে দেশে মৃত্যু-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে জলাশয় খনন ও উৎসর্গ ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইত। দেশের অবস্থাপন্ন লোক জলাশয় খনন করাইয়া সাধারণের ব্যবহারের জন্য উৎসর্গ করিত। পুষ্করিণী উৎসর্গের সার্থকতা সাধারণের ব্যবহারে। যে জলাশয় উৎসর্গীকৃত না হইত, তাহার জলে সন্ধ্যা বন্দনাদি করা নিষিদ্ধ ছিল। সাধারণের ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই বিধি বিহিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে জলাশয় উৎসর্গ করার প্রথা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। জলাভাবে দেশে হাহাকার উঠিয়াছে। তাহার উপরে জলের সদ্ব্যবহার না থাকায়, দেশ মরুভূমিতে পরিণত হইতেছে। পুকুরের নিকটে বৃক্ষ রোপণ করিতে গিয়া আমরা বাঁশ প্রভৃতি গাছও রোপণ করি। আম, বাঁশ প্রভৃতি গাছের পাতা পড়িয়া পুকুরের যে দুরবস্থা হইতেছে তাহা যে কোন গ্রামে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাই। পুকুরের নিকটে নারিকেল অথবা তাল গাছ রাখিলে কোনও ক্ষতি হয় না; কারণ, ঐ সকল গাছের পাতা পড়িয়া জল খারাপ হইতে পারে না। কিন্তু আম প্রভৃতি গাছের পাতায় জল একেবারে খারাপ হইয়া যায়। সামান্য লাভের জন্য আমরা আমাদের সর্ব্বনাশ করি।

বৃক্ষজাত ফলে পারিবারিক যে লাভ হয় রোগের প্রাবল্যে তাহার শতগুণ ক্ষতি হয়। এই সামান্য কথাটী আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। আমাদের ন্যায় আত্ম-বিস্মৃত জাতি অতি কমই দেখিতে পাই। জল যে রোগের ঔষধ, তাহাও আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। প্রাচীন বৈদিক যুগে জল যে রোগের ভেষজ তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বৈদিক ঋষি বলিতেছেন,—"আপো যাচামি ভেষজম্" (তৈঃ ব্রাঃ ২।৫, ৮।৬)। ব্রাহ্মণ-সন্তান প্রত্যহ সন্ধ্যা করিবার সময় পড়িতেছে "আপো যাচামি ভেষজম্"। কিন্তু ব্রাহ্মণ সন্তানও সত্য ভুলিয়া গিয়াছেন। জল ঔষধ—এই সত্য ভুলি আমরা জলকে আজ রোগের বীজাণু সৃষ্টি করিবার ক্ষেত্ররূপে পরিণত করিয়াছি। কিন্তু আমরা সামান্য চেষ্টা করিলেই জল পরিষ্কৃত রাখিতে পারি। মনুর বচনটী অনুসরণ করিলে বোধ হয় আমরা রোগের হাত হইতে মুক্ত হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারি।

"নাপ্সু মূত্রং পুরীষং বা ষ্ঠীবনং বা সমুৎসৃজেৎ।
অমেধ্য লিপ্ত মন্যদ্বা লোহিতং বা বিষাণি বা।"

মনুর এই বাক্যটী প্রতিপালিত হইলে, আমরা আত্মহত্যার পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি। শাস্ত্রগত-প্রাণ বঙ্গবাসী এই বাক্যটী স্মরণ করুন, প্রতিপালন করুন। দেশকে শ্মশান না করিয়া আবার নন্দন কাননে পরিণত করুন। আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজের ও দেশের যেন সর্ব্বনাশ সাধন না করেন।

পল্লী-স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা ও তাহার অন্তরায়।

ডাঃ শ্রীক্ষেত্রমোহন গুপ্ত, এম্‌বি, মহিষাদল রাজ ডিস্পেন্সারী।

পল্লীই বাংলার প্রাণ। কারণ বাংলা কৃষি প্রধান দেশ। কৃষকেরাই পল্লীর প্রধান অধিবাসী। শিক্ষিত সম্প্রদায় চাকরির খাতিরে এবং ধনী সম্প্রদায় বিলাসের সুবিধার জন্য পল্লীত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়া বসবাস করিতেছেন। সহরে জীবন সংগ্রামের প্রতিযোগিতায় তাঁহাদের স্থান অনেক নিম্নে, কারণ বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ই সহরে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। বাংলার আপনার বলিতে যদি কিছু থাকে, তাহা ঐ মৃতপ্রায় ম্যালেরিয়ার ও অন্যান্য মহামারীর আবাস ভূমি, অস্বাস্থ্যকর পল্লীগ্রাম। কৃষকেরা প্রধানতঃ অশিক্ষিত এবং দরিদ্র। যখন পল্লীর মস্তক স্বরূপ শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায় তাঁহাদের নিজ নিজ পল্লীতে বাস করিতেন, তখনকার পল্লী-চিত্র কি সুন্দরই না ছিল। তখন পল্লীগ্রামে ভাল ভাল রাস্তা ঘাট, পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত, নানারূপ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকায় ম্যালেরিয়া বা অন্যান্য মহামারী বড় একটা ঘেঁসিতে পারিত না। আসিলেও সকলের সমবেত চেষ্টায় তাহা অতি শীঘ্রই গ্রাম হইতে বিতাড়িত হইত। এখন অশিক্ষিত কৃষকেরা স্বাস্থ্য নীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়ায় এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক দুচার কথা জানিলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার অর্থের অভাব বশতঃ পল্লীর এই শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। ম্যালেরিয়ায় বাংলাদেশ বিশেষতঃ পল্লীগ্রাম প্রায় জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে; তাহার উপর আবার এমন বৎসর যায় না যে কলেরা ও বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর আক্রমণে পল্লীগ্রাম বিধ্বস্ত না হয়। ইহার প্রতিকারের কথা ভাবিতে গেলে নিরাশ হইতে হয়। তবে এখন দেশ মধ্যে একটু সুবাতাস বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় সহরের প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়া পুনরায় পল্লীর দিকে ফিরিয়া চাহিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু পল্লীগ্রামে আসিয়া দেখেন, যে স্থান এক সময়ে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ছিল, তাহা এখন ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি মহামারীর আবাস-ভূমি রূপে পরিণত হইয়াছে। দেশে ভাল চিকিৎসকের অভাব, সন্তান সন্ততিদের শিক্ষা দিবার ভাল বিদ্যালয়ের অভাব। ভাল পানীয় জলের অভাব, রাস্তা ঘাটের অবস্থা অতি শোচনীয়। এই সব অভাবের প্রতিকার না হইলে তাঁহাদের দেশে ফিরিয়া যাওয়াও একরূপ অসম্ভব হইয়াছে। তাই তাঁহারা ইহার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রায় সকল মাসিক পত্রে, সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদপত্রে পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতির বিষয় আলোচিত হইতেছে। সকলেরই মুখে ঐ এক কথা—পল্লীস্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে যে দুইটী অন্তরায় পরিলক্ষিত হয়, তাহাদের প্রতিকার করিতে হইবে। প্রথম অন্তরায় শিক্ষার অভাব; তাহা দূর করিতে হইলে, পল্লীগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয় অন্তরায় দারিদ্র্য তাহার প্রতিকার করিতে হইলে কৃষির উন্নতি, কৃষি সমিতি স্থাপন, কোঅপারেটিভ সোসাইটী ও কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে। এই সকলের ব্যবস্থা অনেক স্থানে আরম্ভ হইয়াছে। সদাশয় গভর্মেণ্ট ও অনেক সাহায্য করিতেছেন। ইহা ছাড়া আরও দুইটী অন্তরায় আছে, যাহার জন্য উল্লিখিত অন্তরায়দ্বয়ের প্রতিকার হইলেও পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতি হইতেছে না।

আমি আজ প্রায় আট বৎসর কাল মহিষাদল রাজষ্টেটের প্রধান চিকিৎসকের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া পল্লী স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়া ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছি। মহিষাদল মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক মহকুমার মধ্যে একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম।

এই গ্রামে মহিষাদলের রাজাবাহাদুরের রাজবাটী, রাজকাছারি, ডাক্তারখানা ও হাই স্কুল থাকায় এখানকার কৃষক সম্প্রদায় অনেক সুবিধা ও সাহায্য পাইয়া থাকে। সুধু এক তমলুক সব্‌ডিভিসনেই ৫।৬টী হাই স্কুল ও অনেক পাঠশালা থাকায় শিক্ষা বিস্তারের অনেক সুবিধা হইয়াছে। এখানকার কৃষকদের আর্থিক অবস্থাও মন্দ নয়। কারণ এখানে প্রায় শতকরা ৯৫ জন চাষী এবং এখানকার জমি খুব উর্ব্বরা হওয়ায়, যাহার দুই বিঘা জমি আছে তাহার অবস্থা সচ্ছল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে, যে দুইটী বিষয় পল্লীস্বাস্থ্যোন্নতির অন্তরায় বলিয়া সচরাচর আলোচিত হইয়া থাকে, তাহা এখানে নাই। তবু পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে না। এক সময় নিকটস্থ কতকগুলি গ্রামে কলেরার প্রাদুর্ভাব হওয়ায়, রাজা বাহাদুরদের সহৃদয়তায় ও উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমরা গ্রামে গ্রামে, বাড়ী বাড়ী অযাচিত ভাবে যাইয়া রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, যাহাতে রোগের প্রসার বৃদ্ধি না পায় তাহার উপায় প্রচার করিয়া, যে সকল পুষ্করিণী কলেরা বীজাণু দ্বারা দূষিত হইয়াছিল তাহার জল ব্যবহার নিষেধ করিয়া দিয়াও কোন ফল পাই নাই। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় ছাপাইয়া গ্রামবাসিগণের মধ্যে বিতরণ করিয়াও দেখিয়াছি, তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। পরন্তু গ্রামবাসিগণ বলিয়াছিল "মহাশয়, আমাদের দেশে প্রায়ই এইরূপ কলেরা বসন্তের প্রকোপ হইয়া থাকে, তবু আমরা চুল পাকাইয়া বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছি। যাহাদের আয়ু শেষ হইয়াছে তাহারা মরিবে। আবার রাখে কৃষ্ণ মারে কে? আপনারা আজ দুইপাত ইংরাজি পড়িয়া অদৃষ্ট মানেন না। দেব দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনও করেন না। আমরা এরূপ সময়ে গ্রামে হরিসংকীর্ত্তন, শীতলা দেবীর পূজা ও বারো পূজার ব্যবস্থা করিয়া থাকি এবং তাহাতেই মহামারি প্রকোপ কমিয়া যায়।" এই সব শুনিয়া আমার মনে হয়, শিক্ষার অভাব ও দরিদ্রতা ছাড়া ও পল্লী স্বাস্থ্যোন্নতির আরও দুইটী অন্তরায় থাকায় আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটী ধর্ম্মে প্রতি অন্ধ বিশ্বাস ও অপরটি কুসংস্কার। ধর্ম্মে প্রতি অন্ধ বিশ্বাসে গ্রামবাসিগণ বিচারশূন্যতা অলসতার অন্ধকারে ডুবিয়া আছে। তাহাদে বুঝাইলেও বুঝিতে চায় না। ভগবান মানুষকে বুদ্ধি বৃত্তি দিয়াছেন, সামর্থ দিয়াছেন তাহার পরিচালন না করিলে ভগবান কাহাকেও সাহায্য করেন না "God helps those who help themselves" অদৃষ্টও পুরুষকারের অভাবে সফল হয় না এবং অনেক সময় আবার প্রবল পুরুষকারের দ্বারা অদৃষ্টেরও খণ্ডন হইয়া থাকে। যাহা হউক, শেষো অন্তরায়দ্বয় সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হওয়া দরকার কারণ এই দুইয়ের প্রতিকার না হইলে সুধু স্বাস্থ্যো কেন, কোনও প্রকার জাতীয় উন্নতি সম্ভবে অদৃষ্টে যাহা আছে হইবে বলিয়া বসিয়া থা আমরা জীবন সংগ্রামের প্রতিযোগিতায় চিরকা জন্য পিছনে পড়িয়া থাকিব। তাই কবি গাহিয়াছিলে

"ছিল বটে আগে তপস্যার বলে
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,
* * *
এখন সে দিন নাহিক রে আর,
দেব আরাধনে গ্রামের উদ্ধার,
হবে না, হবে না * *
এখনো জাগিয়া উঠ রে সবে,
এখনো সৌভাগ্য উদয় হবে।"

পল্লীস্বাস্থ্য

পল্লীবাসী জনগণকে অল্প অল্প করিয়া স্বাস্থ্যতত্ত্ব দিবার জন্য মফঃস্বলের স্থানে স্থানে একটু চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী আছি। সহযোগী "বরিশাল হিতৈষী" সংবাদ দিতেছেন,—

ল্যাণ্টার্ণ বক্তৃতা—

নীয় জনসভার অক্লান্তকর্ম্মী বাবু নিশি কান্ত বসু গত বরিশালে আগমন করিয়া ম্যাজিকল্যাণ্টার্ণ সাহায্যে , বসন্ত, ম্যালেরিয়া রোগ কিরূপ ভাবে জন্মে ও প্রসারিত তাহা প্রতিষেধের উপায় কি তৎসম্বন্ধে তাঁহার স্বগ্রাম রে, স্থানীয় ব্রাহ্ম মন্দিরে, ব্রজমোহন স্কুলহলে ও টাউনস্কুলে প্রদান করেন। শেষোক্ত স্কুলে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও উপস্থিত ছিলেন। বাবু নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় তির আসন গ্রহণ করেন। শ্রোতৃবর্গ সকলেই এই বক্তৃতার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং নিশি বাবুর প্রশংসা করিয়াছেন। পল্লীগ্রামে এইরূপ বক্তৃতার রিতা অবর্ণনীয়!

াজনীতিক সভা সমিতিতেও আজ কাল কিয়ৎ-ণে দেশের স্বাস্থ্যের কথার আলোচনা হইতেছে; সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। সম্প্রতি মেদিনীপুরে যে প্রাদেশিক সম্মিলনের বৈঠক হইয়াছিল, তাহাতে না সমিতির সভাপতি স্বীয় অভিভাষণে স্থানীয় সম্বন্ধে যে সকল অভাব অভিযোগের কথা গোচর করিয়াছিলেন, কাঁথির সহযোগী নীহার তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

ম্র বাঙ্গালা দেশের মধ্যে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নপুর ও ক্ষীরপাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট। ানে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রতি হাজারে ৬২৪ ও ৫৫৮ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। চন্দ্রকোণা ও ঘাটাল ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব অল্প নহে। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ন বাহাদুর এ বিষয় সম্পূর্ণ অবগত থাকিয়াও প্রতীকারের কোনও চেষ্টা করিতেছেন না। গভর্ণমেণ্ট কুইনাইন কতক টাকা মিউনিসিপ্যালিটির হস্তে প্রদান করিয়া-, কিন্তু খালির বাঁধ সমুদ্রের উচ্ছসিত তরঙ্গকে নিরুদ্ধ করিতে পারে কি? বিশেষতঃ রোগ আক্রমণ করিলে পর ঔষধ প্রদান করা অপেক্ষা রোগ নিবারণের উপায় অবলম্বন করাই, একান্ত কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা বসন্ত, উদরাময় প্রভৃতি ত আছেই। গবর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে অর্থ সাহায্য ও প্রতীকার না করিলে আমাদের প্রাণ-রক্ষার উপায় নাই।

কাঁথির সাধারণ স্বাস্থ্যও এখন ভাল নয়। ঐ "নীহারই" বলিতেছেন—

স্থানীয়।

বসন্তের প্রাদুর্ভাব এখনও স্থানে স্থানে লাগিয়া আছে। জ্বরেও অনেকে আক্রান্ত হইতেছে।

তমলুকেরও স্বাস্থ্য খারাপ—

তমলুক সহরে ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বসন্ত ও ওলাউঠার খুবই প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এখন ওলাউঠার প্রকোপ অনেকটা কমিয়াছে বটে, কিন্তু বসন্তে অনেকে আক্রান্ত হইতেছে।

কাঁথিতে আবার ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রবল হইয়াছে—

ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ—ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব আবার এতদঞ্চলের নানাস্থানে ব্যাপ্ত হইতেছে। বহুলোক উহাতে আক্রান্ত হইতেছে এবং আক্রান্ত ব্যক্তিদের অনেকেই নিউমোনিয়াগ্রস্ত হইয়া প্রাণ হারাইতেছে। অনেক স্থলে ঘরশুদ্ধ লোকে এই ব্যাধিতে শয্যাগত থাকায় তাহাদের দুর্দ্দশার অন্ত নাই। একে বস্ত্রাভাবে লোকে ঘোর দুর্দ্দশাপন্ন,—এ অবস্থায় ইনফ্লুয়েঞ্জার বিষম প্রাদুর্ভাব হওয়ায় সাধারণের যে কি দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে।

সহরের অবস্থা ত এই। মফঃস্বলেও ইনফ্লুয়েঞ্জা কম নয়—

মফঃস্বলের দুর্দ্দশা—মফঃস্বলের প্রায় সর্ব্বত্র ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রবল প্রকোপ চলিয়াছে। ওলাউঠা ও বসন্ত অনেক স্থলে ব্যাপ্ত হইয়া লোকক্ষয় করিতেছে। ভগবানপুর, বেউদিয়া, বিষ্ণুপুর, পাঞ্জনকুল, কালুরভেড়ী, মণিরামচক, সেরপুর প্রভৃতি স্থানে ওলাউঠার ভীষণ প্রাদুর্ভাবে বহু লোক মারা যাইতেছে। স্থানে স্থানে বসন্তেরও অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ধান্য ফসল এবার ভাল জন্মে নাই। বাহিরী থানার মইসাই, কাঁথি থানার রামচন্দ্রপুর, আলাদরপুট প্রভৃতি স্থানেও ওলাউঠার লোকে মারা যাইতেছে।

রাজসাহীর স্বাস্থ্য ভাল দেখিতেছিন। "হিন্দু-রঞ্জিকা" সেখানকার আবহাওয়া ও স্বাস্থ্যের এইরূপ সংবাদ দিতেছেন,—

অনাবৃষ্টি

এখানে একেবারেই বৃষ্টি নাই। এ সপ্তাহে অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। দ্বিপ্রহরে বাহির হইবার উপায় নাই। সহরে বসন্ত ও কলেরা দেখা দিয়াছে। এ অবস্থায় সহরবাসীর স্বাস্থ্যের প্রতি মিউনিসিপালিটীর মনোযোগ বেশীভাবে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

মফঃস্বলে সুচিকিৎসকের অভাব দেশবাসী তীব্র ভাবে অনুভব করিতেছেন। অভাব বোধ করিতে শিখিলেই তাহার প্রতিকারের চেষ্টাও আপনি আরম্ভ হয়। চিকিৎসকের অভাবের কারণ, উপযুক্ত সংখ্যক চিকিৎসা বিদ্যালয়ের অভাব। সে অভাব দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে; ইহা সুখের বিষয়। সহযোগী "বঙ্গরত্ন" লিখিয়াছেন,—

মেডিকেল স্কুল।—বঙ্গের পাঁচটী বিভাগের তিনটী বিভাগেই মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সী ও ঢাকা বিভাগে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগে কোন মেডিকেল স্কুল বর্ত্তমানে নাই। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, চট্টগ্রামে শীঘ্রই একটী মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবে। পল্লীগ্রামে এখনও চিকিৎসকের খুব অভাব রহিয়াছে; সুতরাং চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি না করিলে পল্লীতে চিকিৎসার অভাব দূর হইবে না। রোগপীড়িত বঙ্গে চিকিৎসকের অভাব দূর করিতে না পারিলে মৃত্যু সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইবে। রাজসাহী জেলা ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত; সুতরাং রাজসাহীতে চিকিৎসক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তথায় একটী মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। আমরা আশা করি, কর্ত্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগে এক একটী মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবেন।

আয়ুর্ব্বেদের প্রতি শ্রদ্ধা-বৃদ্ধি আর একটী শুভ লক্ষণ। পূর্ব্বে যশোহরে আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয় প্রতিষ্ঠার সংবাদ দিয়াছি। এবার দেখিয়া সুখী হইলাম, রাজসাহীতেও ঐরূপ একটী সরকারী আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার কল্পনা হইতেছে। সহযোগী "হিন্দুরঞ্জিকা" লিখিয়াছেন—

"অনারেবল শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী, এ[illegible] এল, মহোদয় রাজসাহী টাউনে একটি আয়ুর্ব্বেদীয় [illegible] ঔষধালয় স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। রা[illegible] আয়ুর্ব্বেদ সভা তাহার একটি এষ্টিমেট করিয়াছেন যে [illegible] ঔষধালয়টী স্থাপন করিতে আপাততঃ এককালীন তিন [illegible] টাকা নগদ ও মাসিক ২০০৲ টাকা খরচ দরকার। [illegible] সূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, পুঁটিয়ার পাঁচ আনীর [illegible] হেমন্তকুমারী দেবী, ও কাশীমবাজারের মহারাজা [illegible] এবিষয়ে অধিক সাহায্য করিতে স্বীকৃত আছেন ও টা[illegible] মাড়োয়ারী মহাজন জ্ঞানিরামবাবু এককালীন ১০০০৲ হাজার টাকা দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন।

চাঁদপ্রতাপ গ্রাম কোথায়? সেখানকার "[illegible] ভদ্রলোক" সহযোগী "ঢাকা প্রকাশে" এক প্র[illegible] নূতন জ্বরের সংবাদ দিয়া গ্রামবাসীদের সমূহ [illegible] বর্ণনা করিয়াছেন—

চাঁদপ্রতাপে জ্বরের প্রকোপ।

(প্রাপ্ত)

এবারকার জ্বরের প্রবল আক্রমণে চাঁদ প্রতাপের [illegible] অধিবাসী দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। [illegible] যাইতেছে, ততই জ্বর-রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। [illegible] কোন বাড়ীতে প্রায় সকলেই শয্যাশায়ী; যাহার [illegible] রহিত হয় নাই, তাহাকেই অন্য রোগীদের পথ্যাদি [illegible] দিতে হইতেছে। ঐ সকল বাড়ী দেখিলে ক্ষুদ্র হা[illegible] বলিয়া মনে হয়। দরিদ্র গৃহস্থদের অনেকে অর্থের [illegible] ঔষধ ও পথ্যের যোগাড় করিতে পারিতেছে না।

এই জ্বরের লক্ষণও অতি অদ্ভুত; অধিকাংশ [illegible] জ্বর [illegible] কিছুই বুঝিতে পারে না। প্রথম দিন [illegible] জ্বর হয়, এবং অল্পকাল মধ্যেই কমিয়া যায়; তৎপ[illegible] শরীর ভালই বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু তারপর দিন [illegible] জ্বরের প্রবল আক্রমণে অস্থির হইয়া পড়ে। এই [illegible] খুব বৃদ্ধি পায়, এবং তদ্দরুণ শরীরে বিশেষতঃ [illegible] অতিমাত্রায় প্রদাহ হইয়া থাকে। চিকিৎসাদির ত্রুটিতে [illegible] জ্বরের গতি মন্দের দিকে যাইতেছে। দুঃখের [illegible] অঞ্চলে অনেক কাল হইতেই উপযুক্ত চিকিৎসকের অভা[illegible]

নিরক্ষর কৃষকবৃন্দ সাধারণতঃ হাতুরি চিকিৎসা[illegible] বিশ্বাসপরায়ণ। এ অঞ্চলে কতক দিন যাবত এ[illegible] সাধু আসিয়াছে। সে গাঁজা, মদ, আফিম, প্রচুর [illegible]

[illegible] সেবন করিয়া থাকে এবং তাহার মেজাজও অতি রুক্ষ। [illegible] প্রকৃতির লোকের নিকটও অনেকেই চিকিৎসার্থ উপস্থিত [illegible] থাকে। সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া জ্বরাক্রান্ত রোগীকে [illegible] আটটি ডুব দেওয়ায়, এবং কুপথ্য করাইতেও কুণ্ঠিত [illegible]। ইহার ফলে রোগের অবস্থা অতিশয় মন্দ হইয়া থাকে।

[illegible] দরিদ্র কৃষককুল, এমন কি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাও [illegible] অর্থাভাবে জ্বরের প্রধান ঔষধ কুইনাইন ক্রয় করিতে [illegible] সময় সমর্থ হইতেছে না। সম্প্রতি দেখা যাইতেছে, [illegible]ইর কোন কোন দোকানদার, পোষ্ট অফিস হইতে কুইনাইন [illegible] উচিত মূল্যাপেক্ষা অধিক দরে অর্থাৎ ৷৷০ আনার [illegible] ৷৷/০ আনায় এবং সময় সময় ৷৷৵০ আনায়ও বিক্রয় [illegible]। ইহাতে যে দরিদ্র ব্যক্তিদের কিরূপ কষ্ট হইতেছে, [illegible] সহজেই অনুমেয়। পোষ্ট অফিসের কুইনাইন বাজারে [illegible] হইতে পারে কিরূপে কর্ত্তৃপক্ষ তাহার তদন্ত করিয়া [illegible]ন কি?

জনৈক ভদ্রলোক।

মেদিনীপুরের স্বাস্থ্য ভাল নয়। মফঃস্বলের স্বাস্থ্য [illegible]যায় যে ভাল তাহাও ত দেখিতে পাইতেছি না। [illegible]গী "মেদিনী বান্ধব" লিখিয়াছেন—

স্বাস্থ্য—সহরের স্বাস্থ্য তত ভাল নয়, এখনও বসন্তের [illegible]ণ চলিয়াছে। অনেকে ইনফ্লুয়েঞ্জা ও টাইফয়েড জ্বরে [illegible] দিবসে প্রচণ্ড রৌদ্র ও রাত্রে ঠাণ্ডা হেতু স্বাস্থ্য [illegible] হইয়া শরীর গরম হইয়া অনেকেরই জ্বর হইতেছে।

[illegible] সহরের অবস্থা এইরূপ; মফঃস্বলের অবস্থাও [illegible]—

[illegible]ড়া—বীনপুর, কেশিয়াড়ি গোপীবল্লভপুর ও নারায়ণগড় [illegible] এলাকার অনেক গ্রামে কলেরা, বসন্ত ও হামের [illegible] দেখা দিয়াছে।

[illegible] ঘাটাল সাবডিভিজনের অন্তর্গত নোতুক ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম [illegible] ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রবল আক্রমণ দেখা দিয়াছে এবং অনেক [illegible] মৃত্যু হইতেছে।

[illegible] ইহার উপর আবার জলকষ্টও আরম্ভ হইয়াছে—

[illegible]—বৈশাখের কয়েকদিন পর্য্যন্ত আকাশে মেঘের সঞ্চার [illegible] কয়েকবার বৃষ্টিপাত হওয়ায় কৃষিকার্য্য বেশ চলিয়াছিল, [illegible] জলকষ্ট অনেকটা নিবারণ হইয়াছিল। প্রায় তিন [illegible] বৃষ্টি না হওয়ায় চাষের কার্য্যও বন্ধ আছে এবং জলকষ্টও [illegible] দিয়াছে।

"ঢাকা প্রকাশের" একজন মফঃস্বলস্থ সংবাদদাতা স্থানীয় অস্বাস্থ্যকর অবস্থার অতি ভীষণ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন—

সংক্রামক ব্যাধিতে সর্ব্বনাশ।—নবাবগঞ্জ ও হরিরামপুর থানার অন্তর্গত আইলকুণ্ডি, খানেপুর, দীর্ঘগ্রাম, বক্তারনগর, শিকারীপাড়া, বারুয়াখালী, বয়রা, ব্রাহ্মণখালী, নবগ্রাম, কান্দাবারিল্যা প্রভৃতি গ্রামসমূহে কলেরা, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা এই তিনটী ভীষণ ব্যাধিতে বহুসংখ্যক নরনারী এবং দুগ্ধপোষ্য বালক বালিকা অকালে কৃতান্ত-নিকেতনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে। এক আইলকুণ্ডি গ্রামেই না কি বসন্ত রোগে ২০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে, এবং আরও বহু লোক আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী রহিয়াছে। যাহাতে এই ভীষণ ব্যাধি এতদঞ্চলে আর বিস্তৃত না হইতে পারে, তাহার সমুচিত উপায় অবলম্বনের নিমিত্ত আমরা এদিকে জেলা বোর্ডের ও লোক্যাল বোর্ডের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি। স্থানে স্থানে গো-মড়কের প্রাদুর্ভাবও পরিলক্ষিত হইতেছে।

"ঢাকা প্রকাশের" ধামরাইয়ের সংবাদদাতাও আমাদিগকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছেন—

আজকাল এ পরগণায় প্রতি গৃহে রোগী বিদ্যমান; জ্বরে এঅঞ্চল ছাইয়া ফেলিয়াছে। ধামরাই গ্রামে কলেরা ও বসন্ত লাগিয়াই আছে; কোন কোন স্থানে নিউমোনিয়া-আক্রান্ত রোগীও দৃষ্ট হয়। উপযুক্ত চিকিৎসা, শুশ্রূষা ও পথ্যের অভাবে দরিদ্র কৃষকগণ রোগ-যাতনায় কঙ্কালসার হইতেছে; কেহ কেহ মারাও যাইতেছে। সদাশয় কর্ত্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টি এই হতভাগ্যদিগের প্রতি নিপতিত না হইলে ইহাদের রক্ষার উপায় নাই।

সহযোগী "খুলনা" স্থানীয় স্বাস্থ্যরক্ষার্থ যে পরামর্শ দিতেছেন, তাহা খুব যুক্তিসঙ্গত।—

খুলনা সহরের উপর স্বাস্থ্য রক্ষার্থ বিশেষ প্রয়োজনীয় যে সমুদয় সুন্দর সুন্দর খোলা ময়দান ছিল, সে গুলির উপর ধীরে ধীরে গৃহাদি প্রস্তুত হইয়া সহরের স্বাস্থ্যহানির কারণ হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি সহরে পুলিশ ব্যারাক এবং সেটেল্‌মেণ্ট আফিস প্রস্তুত হইবার প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা বলি, জেলখানার আয়তন আর বৃদ্ধি না করিয়া, ঐ বাড়ীতেই হয় পুলিস ব্যারাক, না হয় সেটেল্‌মেণ্ট অফিস স্থাপিত এবং সহরের বাহিরে অন্যত্র জেলখানা প্রস্তুত হউক। তাহা হইলে আর সহরের স্বাস্থ্যহানির বিশেষ কোন আশঙ্কার কারণ থাকিবে না। বর্ত্তমান জেলখানার আয়তন বৃদ্ধি হইলে আরও অনেকটা স্থান জেলের

অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। আমরা ভরসা করি, কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের এই মন্তব্যটীর বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিবেন।

কর্ত্তৃপক্ষ এই পরামর্শ অনুসারে কাজ করিলে ভবিষ্যতে অনেক সুবিধা হইবে বলিয়াই মনে হয়। কলিকাতায়, এবং হয় ত অন্যান্য সহরেও, এই ভুল হইয়াছে; তাহার ফলে, কলিকাতাবাসী আজ ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের ঠেলায় অস্থির। অন্যত্রও যাহাতে এই রকম ভুল আর না হয়, সে পক্ষে সময় থাকিতে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। "খুলনার" দ্বিতীয় মন্তব্য আরও গুরুতর। তবে তাঁহাদের আন্দোলনে যে সুফল ফলিতে চলিয়াছে, ইহাই শ্রুতি সুখকর—

সহরের মধ্যস্থলে ভদ্রপল্লীর মধ্যে ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড অর্থাৎ ময়লা পুতিবার স্থান মিউনিসিপালিটীর একটী বিশেষ কলঙ্ক। এতদিন পরে সেই কলঙ্ক বিদূরিত হইতে চলিল। কমিশনারদিগের গত সোমবারের সভায় উহা সহরের বাহিরে কোনও উপযুক্ত স্থানে উঠাইয়া লইবার মন্তব্য অবধারিত হইয়াছে। এতদিন আমরা কেবল অরণ্যেই রোদন করিতেছিলাম; কিন্তু বর্ত্তমান চেয়ারম্যান উপেন বাবুর কর্ণে আমাদের রোদনধ্বনি পৌঁছিয়াছে। সে জন্য তিনি করদাতা মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে একবার আমরা লিখিয়াছিলাম:—বানিয়াখামারের ময়লাখানা (trenching ground) মিউনিসিপালিটীর একটী স্থায়ী কলঙ্ক হইলেও, আজ কাল তাহার কার্য্য যে ভাবে চলিতেছে, তাহা নিতান্তই আপত্তিজনক। সাধারণের সর্ব্বদা যাতায়তের প্রধান দুটী রাস্তার সম্মিলন স্থলেই উহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়াই, তত্রত্য অধিবাসিগণ যে দৃশ্য উপভোগ ও যে সুগন্ধযুক্ত সুশীতল সমীরণ স্পর্শে শরীর [illegible] ও নাসিকা পরিতৃপ্ত করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে ভরসার [illegible] শর্ম্মের পরিবর্ত্তে এই অযাচিত অপরিমিত প্রেমের জন্য সর্ব্বান্তঃ মিউনিসিপালিটীরই নাম তাঁহাদের মনে পড়ে। পরে যেমন সঙ্গে সঙ্গে যেমন সহর বাজারের উদ্দেশ্যে ঐ পথ দিয়া সাধারণের চলাফেরার আবশ্যক হইয়া উঠে, অমনি ভারবাহী বাঁক মেথরদিগের হুড়াহুড়ি ছুটাছুটি ও লাট সাহেবের গাড়ীর [illegible] সমস্ত রাস্তাখানি জুড়িয়া ময়লাবাহী দ্বিচক্রযানগুলির [illegible] গতিও বাড়িতে থাকে—তখন ও পথ দিয়া চলে কার সাধ্য ও দিকে ময়লাখানায় যেমন এক এক খানি বাঁক বা গাড়ী পৌঁছিতে থাকে, এমনই নিঃসঙ্কোচিভাবে সাধারণের চক্ষের উপরই সেগুলির ময়লা হড় হড় করিয়া ঢালা উবুড় করা হইতে থাকে, যে, (সে দৃশ্য দেখিয়া আর ওদিক দিয়া বারান্তর মাড়াইতে ইচ্ছা কাহারও থাকে না। অন্যান্য মিউনিসিপালিটীর মেথরদিগকে একটু সকাল সকাল কার্য্য শেষ করিতে করিলে ও মনসা কাঁটার গাছ দিয়া ঐ স্থানটি ঘিরিয়া পথিকদিগের আর এ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় না। যে কিছু বেশী খরচ পড়ে এমনও নহে। কেবল কর্ত্তৃ অমনোযোগিতার জন্যই উহা হইয়া উঠে না বই আর বুঝিতে হইবে? বানিয়াখামার গ্রামের ময়লাখানার কোন আবশ্যক নাই এবং ঐ গ্রাম মিউনিসিপালিটী ভুক্ত হইয়া গোবরচাকার ন্যায় ডিঃ বোর্ডের অধীন হইলে ঐ গ্রা সহরের ময়লাখানার পরিণত করা কি সম্ভব হইত? কোন কারণে না হইলেও মাত্র এই খাতিরে উক্ত গ্রা করদাতাদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি মিউনিসিপালিটি একটু থাকা আবশ্যক নহে কি?" কিন্তু সে সময় এ কর্ত্তাদের কাহারই অন্তর টলাইতে পারে নাই।

আলোচনা

বড় বাজারে 'পার্ক'।—

কলিকাতা সহরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর স্থান যদি কোথাও থাকে, তবে সে বড় বাজার। বড় বাজারে যত বড় বড় বাড়ী, রাস্তাগুলি তেমনি সরু, বাড়ীগুলি তেমনি ঘেঁসাঘেঁসি। এই অঞ্চলে বাড়ীর ছাদগুলিতে একটু আধটু রোদ পড়িলে রাস্তায়, বিশেষতঃ, শীতকালে রোদ কখনও বলিয়া মনে হয় না। যদিই বা পড়ে, তাও দিনের মধ্যে কতক্ষণই বা? কলিকাতায় যখন প্লেগ আসে তখন সে, বড় রোগ বলিয়া বড় বাজারের বাড়ীগুলাতেই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিল। প্লেগে [illegible] বাজারে যত লোক মরিয়াছে, সহরের আর কোন অংশে তত লোক মরে নাই। হ্যারিসন রোডটি [illegible] বড় বাজারের ঘেঁসাঘেঁসি একটুখানি কমিয়াছে। [illegible] হ্যারিসন রোডই যা একটু রোদ পায়। বড় বাজারের সরু সরু গলিগুলির ভিতর হাওয়া কখনও খেলিতে পায় বলিয়া বিশ্বাস হয় না। এখন যদিও সেখানকার ধনী ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা ইলেকট্রিক পাখার হাওয়া খান, কিন্তু, সে হাওয়া ত বিশুদ্ধ নয়, —বিশুদ্ধ হইতেই পারে না। ইলেকট্রিক পাখার হাওয়া মানে আর কিছুই নয়;—ঘরের এক কোণের হাওয়া আর এক কোণে সরাইয়া দেওয়া। ইলেকট্রিক পাখা যত জোরে চলিলেও বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু ঘরে আসিতে পারে না, এবং ঘরের দূষিত বায়ুও বাহির হইতে পারে না। এই ত বড় বাজারের অবস্থা। স্বাস্থ্য-নীতির এমন ঘোর বিরোধী অবস্থা অন্যত্র কল্পনাও করা যায় না। সেই বড় বাজারে একটী 'পার্ক' (সাধারণ উদ্যান) গঠনের কথা বার্ত্তা চলিতেছে। বড় বাজারে বাস্তবিকই যদি একটী পার্ক হয়, তাহা হইলে বড় বাজার অঞ্চলের স্বাস্থ্যের অবস্থা অবশ্যই অনেকটা উন্নত হইতে পারে। বড় বাজারে পার্ক হইলে বড় বাজারের স্থায়ী অধিবাসীরা যাঁহারা দিবারাত্রি ঐ অঞ্চলে থাকেন, এবং যাঁহারা কর্ম্মসূত্রে কেবল দিনের বেলা তাঁহাদের দোকানে সমস্ত দিন বসিয়া থাকেন, সকলেই সবিশেষ উপকৃত হইবেন। আর সমগ্র সহরবাসীই, এই পার্ক হইলে, আনন্দিত হইবেন। সুতরাং পার্কের প্রস্তাব যে সকলেই সমর্থন করিবেন, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। শুনিয়াছিলাম, বড় বাজারে পার্ক তৈয়ারী করিবার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; এবং কর্পোরেশনের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। তার পরই শুনিতেছি, যে যায়গা পার্কের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেখানে বাড়ী তৈয়ার হইতেছে। পার্কের জন্য তাহা হইলে কি অন্য স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে? না প্রস্তাবটি একেবারে পরিত্যক্ত হইল?

ভারতে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা।—

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার সম্বন্ধে সিমলা হইতে প্রকাশিত একটী সাপ্তাহিক সরকারী সংবাদে প্রকাশ, ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে দুই চারিটী লোক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইলেও, রোগের সংক্রামকতা অনেকটা হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। ১৭ই এপ্রেল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে করাচিতে একজন লোক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়। ফলে ভারতের চারিটী প্রধান অংশই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা দূষিত হইয়াছিল। ঐ সপ্তাহে মান্দ্রাজে চারিজন, কলিকাতায় ৩২জন ও বোম্বাইতে ৩০জন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়। শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় মান্দ্রাজে ও বোম্বায়ে মৃত্যু-সংখ্যা বেশী ছিল। অন্যান্য গ্রাম নগরেও অল্পাধিক পরিমাণে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ হইয়াছিল; তবে সংক্রামকতা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। ১৭ই এপ্রেলের পরবর্ত্তী আর কোন সপ্তাহের বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে দেখি নাই।

নিজাম আয়ুর্ব্বেদিক ও ইউনানি কনফারেন্স।—

হায়দরাবাদে কৃষ্ণ থিয়েটার গৃহে নিজাম আয়ুর্ব্বেদিক ও ইউনানি মেডিক্যাল কনফারেন্সের একটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। রাজ্যের বহু আয়ুর্ব্বেদীয় ও ইউনানি কবিরাজ ও হাকিম এই সভায় যোগ দিয়াছিলেন। ৩রা মে প্রথম দিনের বৈঠকের সভাপতি, স্থানীয় উকীল পণ্ডিত কেশব রাও তাঁহার অভিভাষণে গভর্ণমেণ্টকে এবং জনসাধারণকে দেশীয় চিকিৎসা প্রণালী ও দেশীয় চিকিৎসকগণকে উৎসাহ দিতে অনুরোধ করেন। দ্বিতীয় দিন ব্যারিষ্টার মিঃ আসগর সভাপতি হইয়াছিলেন। এই দিন অনেক হাকিম সভায় উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত তারানাথ অন্যান্য চিকিৎসা প্রণালীর তুলনায় আয়ুর্ব্বেদীয় ও ইউনানি চিকিৎসা প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। এই কনফারেন্সের সঙ্গে একটী প্রদর্শনীও বসিয়াছিল। তাহাতে অনেক দেশীয় ঔষধ ও গাছ গাছড়া প্রদর্শিত হইয়াছিল। ডাক্তার মহম্মদ হুসেন এই সকল দেশীয় ঔষধ ও গাছগাছড়ার

গুণ বর্ণনা করিয়া বলেন, অনেক বিলাতী ঔষধের পরিবর্ত্তে এই সকল দেশীয় ঔষধ ও গাছ গাছড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে, এবং তাহাতে যথেষ্ট সুফলও পাওয়া যায়। দিল্লীর হাকিম আজমল খাঁ আয়ুর্ব্বেদীয় ও ইউনানি চিকিৎসা প্রণালীর উন্নতিকল্পে বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিতেছেন; ডাক্তার মহম্মদ হুসেন এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া হাকিম সাহেবের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। দেশীয় চিকিৎসা প্রণালী এইরূপে ক্রমে ক্রমে আবার লোকের যে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে, ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। এই সঙ্গে কবিরাজ ও হাকিম মহাশয়গণ যদি দেশীয় গাছ গাছড়া লইয়া মৌলিক গবেষণা (research work) আরম্ভ করিয়া দেন, তাহা হইলে আরও ভাল হয়। দেশীয় গাছ গাছড়ার অনেক দোষ গুণ জানা গিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও অনেক জানিতে বাকীও রহিয়াছে। সুতরাং এদিকে মৌলিক গবেষণার এখনও যথেষ্ট ক্ষেত্রও রহিয়াছে।

কুষ্ঠ রোগীদের হাঁসপাতাল।

চিকিৎসক পণ্ডিত কৃপারামের—কুষ্ঠ প্রবর্ত্তনায়, বাগবাজার-অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষ মহাশয়ের আগ্রহে ও উৎসাহে কুষ্ঠ রোগীদের জন্য একটী হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক এ সম্বন্ধে একটী অনুষ্ঠান পত্রও প্রচারিত হইয়াছিল। সে দিন ১২নং ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীটের বাড়ীতে এই হাসপাতালের সংশ্রবে একটী সভাধিবেশন হয়। পূর্ব্বে যে ভাবে হাসপাতাল নির্ম্মাণের কল্পনা হইয়াছিল, তাহার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, প্রত্যেক রোগীর বাসের জন্য এক একটী স্বতন্ত্র কুটীর নির্ম্মিত হইবে। প্রত্যেক কুটীরের চারি পার্শ্বে কুষ্ঠ রোগীদের পক্ষে হিতকর গাছপালা, ঔষধগুণ-সম্পন্ন তরুলতা ও বৃক্ষাদি রোপিত হইবে। তাহাদের হাওয়ায় রোগীদের বিশেষ উপকারই হইবে। এই হাসপাতাল স্থাপনের জন্য গোড়াতেই ৩৭৭০০০ টাকার দরকার হইবে। তার পর অবশ্য হাসপাতালের কার্য্য সুশৃঙ্খলে পরিচালনের জন্য আরও অধিক অর্থ চাই। হাসপাতালটি কোথায় স্থাপিত হইবে, এবং তাহার কার্য্য পরিচালনের জন্য ও অর্থ সংগ্রহের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, সে সম্বন্ধে সভায় অনেক বাদানুবাদের পর কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই হাসপাতাল স্থাপনের প্রথম প্রস্তাব হইবার সময় এইরূপ কল্পনা হইয়াছিল যে, সাধারণ হাসপাতালের ন্যায় একটী বড় হলে সারি সারি রোগীদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইবে। তাহাতে অল্পব্যয়ে অনেকগুলি রোগীর আশ্রয় লাভের সুযোগ ঘটিতে পারিত; কিন্তু সে প্রস্তাব সংশোধিত হইয়া, নূতন যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহা ভাল বটে, কিন্তু ইহাতে খরচ অনেক বেশী পড়িবে, এবং যথেষ্ট সংখ্যক রোগীর স্থান সঙ্কুলান হইবে না। এরূপ হাসপাতালের সংখ্যা অনেকগুলি না হইলে সকল রোগী আশ্রয় পাইতে পারিবে না। তবে আশার কথা এই যে, এ যেমন বেসরকারী হাসপাতাল হইতে চলিয়াছে, তেমনি সরকার বাহাদুরও কুষ্ঠ রোগীদের জন্য হাসপাতাল নির্ম্মাণের কল্পনা করিতেছেন, এবং তাহাদের segregate (স্বতন্ত্র) করিবার জন্য আইন রচনা করিতেছেন। সরকারী হাসপাতাল কেমন হইবে, তাহা এখনও জানিতে পারি নাই। আশা করি, ব্যবস্থা ভালই হইবে। যাহাই হউক, সরকারী হাসপাতালই হউক, বা, বেসরকারী হাসপাতালই হউক, কুষ্ঠ রোগীদের জন্য একটা সুব্যবস্থা করা আশু অতীব আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যে দিক দিয়াই হউক, কুষ্ঠ রোগীদের segregate করিয়া তাহাদের আশ্রয় স্থল, এবং সেবা শুশ্রূষা ও সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত হইলেই আমরা সুখী হই।

ম্যালেরিয়া নিবারণে টাইমস।—

লণ্ডনে কীটতত্ত্ব-বিদ্‌গণের একটী বৈঠক হইতেছে। এই প্রসঙ্গের আলোচনা উপলক্ষে লণ্ডন টাইমস নির্ব্বা

হকারে বলিতেছেন যে, পানামা ও খারটুমে ম্যালেরিয়া রোগীদিগকে লোক-সমাজ হইতে স্বতন্ত্র রাখিয়া, খাল-বিলের বদ্ধজল নিকাশের বন্দোবস্ত করিয়া উপায়ে ঐ দুইস্থান হইতে ম্যালেরিয়া দূর করা হইয়াছে, সমগ্র বৃটীশ উপনিবেশসমূহে ম্যালেরিয়া নিবারণের এই সহজ উপায়গুলি অবলম্বন করা হউক, এবং লোকসাধারণকে এতৎ সংক্রান্ত নিয়মসমূহ পালনে বাধ্য করা হউক। ভারতবর্ষও টাইমসের এই কলোনীসমূহের অন্তর্গত কি না বলিতে পারি না। যদি হয়, তাহা হইলে, ভারতবর্ষেও এইরূপ বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করা টাইমসের অভিপ্রায় বলিয়া বুঝিতে হইবে। Isolation বা স্বতন্ত্রীকরণের আবশ্যকতা আমরাও বুঝিতে পারি। লণ্ডনে কিছু দিন পূর্ব্বে রণস্থল হইতে প্রত্যাগত সৈন্যগণের মধ্যে ম্যালেরিয়া দেখা গিয়াছিল; রোগীদিগকে isolate করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে, তাহাও জানি। এনোফেলেস মশা ম্যালেরিয়া রোগীর দেহ হইতে রক্ত শোষণ করিয়া তৎসহ ম্যালেরিয়া বিষ তুলিয়া লইয়া, নিজদেহে তাহার পুষ্টিসাধন করিয়া, সুস্থদেহ ব্যক্তিগণকে দংশন পূর্ব্বক সেই দেহে ম্যালেরিয়া বিষ প্রবিষ্ট করাইয়া ম্যালেরিয়ার বিস্তারে সহায়তা করিয়া থাকে। অতএব ম্যালেরিয়া রোগীকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলে, মশারা যাহাতে তাহাদিগকে দংশন করিতে না পারে এরূপ ব্যবস্থা করিলে, ম্যালেরিয়া অনেকটা নিবারিত হইতে পারে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু যেখানে দেশশুদ্ধ লোক ম্যালেরিয়া-পীড়িত, সেখানে এরূপ ব্যবস্থা কতদূর ফলপ্রদ হইতে পারে, তাহা ভাবিবার বিষয়। বাঙ্গলার পল্লীগ্রামে ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া; এক একটী পরিবারের সমস্ত লোকই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। সেখানে কাহাকে সাবধান করিব, কাহাকে স্বতন্ত্র করিব? সেখানে স্বতন্ত্রীকরণে কি শুভ ফল লাভ হইতে পারে? ঠক বাছিতে গাঁ ওজড়। সুস্থকায় লোকদের রক্ষা করিবার জন্যই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে স্বতন্ত্র করার সার্থকতা। কিন্তু, বাঙ্গলা দেশে ম্যালেরিয়া পীড়া ভোগ করে নাই, এমন লোক লক্ষের মধ্যে একটা মিলিবে কি না সন্দেহ। আপাত দৃষ্টিতে যাহাকে সুস্থ দেহ বলিয়া মনে হইবে, তাহার দেহ হইতে রক্ত বিন্দু লইয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, ঐ রক্তে প্রায়ই হয় ত ম্যালেরিয়ার Parasite দেখিতে পাওয়া যাইবে। বাঙ্গলা দেশে সুস্থদেহ বলিয়া প্রতীয়মান তাবৎ লোকের দেহেও ম্যালেরিয়ার বিষ প্রচ্ছন্ন ভাবে (latent) বর্ত্তমান আছে, দেখিতে পাওয়া যাইবে। কাজেই আমাদের মনে হয়, বাঙ্গলা দেশে টাইমসের পরামর্শানুযায়ী ব্যবস্থায় বিশেষ কোন সুফল ফলিবে না। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বাঙ্গলা দেশের অবস্থা যেরূপ স্বতন্ত্র, বাঙ্গলা দেশে ম্যালেরিয়া নিবারণ করিতে হইলে, সেইরূপ স্বতন্ত্র ব্যবস্থারও প্রয়োজন।

হরিষে বিষাদ।—

আমেরিকার সেনেট সভা যুক্তরাজ্যে মদ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া জগতের সমক্ষে একটা মহৎ দৃষ্টান্ত ধরিয়া দিলেন, এই সংবাদ পাঠকগণকে জানাইবার সময়ে আমরা কত না আশা, কত না আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলাম! কিন্তু তাহা নিরানন্দে পরিণত হইতে চলিল। আমেরিকায় মদ্যপান নিষিদ্ধ হইবার পর মাতালরা গোপনে মদ্যপান করিতেছিল, এবং খুব ধর পাকড় চলিতেছিল। এ দিকে মাতালরা এই নিষেধ বিধি তুলিয়া দিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছিল। তাহারা ওজর আপত্তি তুলিয়াছিল যে, সেনেটের এই আদেশ আইনসঙ্গত হয় নাই। এই আপত্তির মীমাংসা হইতে না হইতে দেখিতেছি, যুক্তরাজ্যগুলির মধ্যে একটা রাজ্য, অর্থাৎ নিউ-ইয়র্ক ষ্টেটের ব্যবস্থাপক সভার একটা অধিবেশনে এই আইন পাশ হইয়া গিয়াছে যে, সেখানকার হোটেল, রেষ্টোরাঁ এবং ক্লাবসমূহে বীয়ার বিক্রীত হইতে পারিবে এবং তাহাতে শতকরা ৩॥ অংশ পর্য্যন্ত

একোহদ বা সুরাসার বিষ থাকিতে পারিবে। এখন কেবল ভরসা এই যে, যুক্তরাজ্যের সুপ্রীম কোর্ট ইহার অনুমোদন না করিলে আইনটি কার্য্যে পরিণত হইবে না,—বাতিল হইয়া যাইবে। দেখিতেছি, মাতালদেরই শেষটা জয় হইল।

শ্রীহট্ট জেলার আরও কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়।

আমরা এই বর্ষের বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীহট্ট জেলা সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় প্রকাশিত করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় ঐ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। বঙ্গদেশের অপরাপর জেলা হইতে ঐ প্রকার সংবাদ পাইলে সানন্দে আমরা উহা স্বাস্থ্য সমাচারে প্রকাশ করিব। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবু শ্রীহট্ট জেলা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বিষয় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহা হইতে ঐ দেশের অবস্থা অনেকটা অনুমিত হইবে। পাগল, মূক, বধির প্রভৃতি সম্বন্ধে শ্রীযুত যতীন্দ্র বাবু নিম্নলিখিত তালিকা দিয়াছেন।

বৎসর	পাগল		মূক, বধির		অন্ধ		কুষ্ঠরোগী		মোট		সর্ব্বমোট
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	
১৯০১	৫০৯	৩০৭	৯৩২	৫৫৭	১২১৬	১০২৮	১৭২৮	৪২২	৪৩৮৫	২৩১৪	৬৬৯৯
১৯১১	৬০৭	৩৭১	৯৯৪	৫৭১	১৩৬৮	১০৯৯	১৩০১	৩১১	৪২৫১	২৩৩৭	৬৫৮৯

উপরি উক্ত তালিকা হইতে বুঝা যায় যে ১৯০১ হইতে ১৯১১ সন পর্য্যন্ত ১০ বৎসরে পাগল, মূক, বধির ও অন্ধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উক্ত জেলায় একটিও অন্ধ বা মূক-বধির বিদ্যালয় নাই। এই সকল হতভাগ্য স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া দুর্ব্বিসহ জীবন যাপন করিতেছে। সমাজের উপকার করিয়া মানব জীবনের সার্থকতা সাধন করা দূরে থাকুক, উহারা বরং সমাজের বোঝা বৃদ্ধি করিতেছে। অপরাপর দেশে মূক, বধির ও অন্ধ প্রভৃতিগণের জন্য শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। কলিকাতায় যে অন্ধ ও বধির বিদ্যালয় আছে তাহাতেও অন্ধ বধির প্রভৃতিকে লেখাপড়া ও শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। আমরা কলিকাতার উক্ত বিদ্যালয়ের অন্ধ ছেলেকে ইংরেজী ও বাংলা বই পাঠ করিতে দেখিয়াছি। তাহাদের নির্ম্মিত শিল্প কার্য্যও মনোরম। কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশে ঐরূপ একটি বিদ্যালয় সহস্র সহস্র মূক বধির ও অন্ধ বালকের নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত কি?

[redacted]

DOUBLE COLOUR PAGE

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৯ম বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩২৭ সাল { ৪র্থ সংখ্যা

কলিকাতায় যক্ষ্মারোগ।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুমুদ শঙ্কর রায়, এম এ, বি-এস্‌সি, সি এইচ-বি (এডিন)

মানব-সভ্যতার যতই বিকাশ হচ্ছে, ততই নানারকম রোগের বীজ দেশময় ছড়িয়ে পড়ছে। এই যক্ষ্মা রোগটী (Tuberculosis) আজকালের নয়;— প্রাচীন ও আধুনিক সব সভ্যতারই সঙ্গে সঙ্গে এই রোগটী আমার চলে আসছে। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থিক সামাজিক ও ব্যবসায়িক বদল অবশ্যই হয়ে থাকে। সভ্যতা মানেই কৃষির অপেক্ষা বাণিজ্যের উন্নতি। সভ্যতা যতই বাড়ে ততই বড় বড় সহরের পত্তন, সময় কল-কারখানার আমদানী এবং তার ফলে সহরের লোকসংখ্যার কমতি হয় ও সহরের লোকসংখ্যা বাড়ে। এই সমস্ত বদলের ফলে জীবনযাত্রা দিন দিন জটিলতর হয়ে উঠে; পরিশ্রমের মাত্রা বেড়ে চলে এবং টাকার পরার কষ্ট দৈনিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সহরে কলকারখানা থাকায় লোক দলে দলে এসে সহরে জমে; কিন্তু থাকবার জায়গার ও টাকা কড়ির অভাবে তারা আলো বাতাস নেই এমন স্থানে ছোট ছোট ঘরের মধ্যে বাস করতে বাধ্য হয়। সভ্যতা দেশে ঐশ্বর্য্য আনে বটে, কিন্তু দেশের দরিদ্রতাও সেই সঙ্গে কম আনে না; কারণ, সে ঐশ্বর্য্য কেবল কয়েকজনের; অথচ দরিদ্রতা বহুলোকের। এই রকমে, বড়লোকের অতি-ভোজনের ও দরিদ্রের উপবাসের ফল হচ্ছে জীবনী-শক্তির হ্রাস ও দৈহিক শক্তির যথেষ্ট অবনতি। এর শেষ পরিণাম হচ্ছে কাজ করার অক্ষমতা।

এই সমস্ত ব্যাপার অন্য দেশেরও যে ক্ষতি না করেছে এমন নয়; কিন্তু তার তুলনায় কলিকাতার ক্ষতিটা সবচেয়ে বেশী। কলিকাতার অপর নাম "প্রাসাদ নগরী"। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, এই সহরটিই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র জঘন্য সহর! গ্লাসগো, ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি স্থানের slumএর তুলনায় কলিকাতার এই আলো-বাতাস-হীন, বাসের অযোগ্য বস্তীগুলি ঢের বেশী জঘন্য; অথচ ঐ সব স্থানের slumগুলিকে সবচেয়ে বিশ্রী বলা হয়ে থাকে। অন্য দেশের লোকেদের মত, বাসস্থানের কষ্টের উপরও আমাদের আরও কয়েকটি জিনিষ আছে, যাহা রোগের জন্ম ও বৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করে থাকে। সেগুলি হচ্ছে আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহার, এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিষয়ে সুগভীর অজ্ঞতা।

কয়েকটি উদাহরণে কথাটা পরিষ্কার করা যাক। এদেশে রোদের অভাব নেই। অথচ এই যক্ষ্মারোগটি (Tuberculosis) বেশ অল্প সময়ের মধ্যেই সহরটিতে

ছড়িয়ে পড়েছে। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের কতকগুলি প্রধান প্রধান সহরের সাধারণ ও যক্ষ্মারোগ-হেতু মৃত্যুর হার পরীক্ষা করে দেখা যাক। (১৯১১-১২)

সহর	হাজারকরা মোট মৃত্যুসংখ্যার হার	হাজারকরা যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর হার
১। লণ্ডন	১৫	১·৩৫
২। বার্ম্মিংহাম	১৪·১	১·২৩
৩। ম্যাঞ্চেষ্টার	১৬·২	১·৫৩
৪। লিভারপুল	১৭·৭	১·৪৯
৫। বোম্বাই	৩৫·৬	·৬২
৬। কলিকাতা	২১·২	২·৩

[বোম্বায়ের সংখ্যা কম হবার কারণ সেখানে যক্ষ্মারোগে মৃত্যু সাধারণতঃ শ্বাস-প্রশ্বাস রোগের তালিকাভুক্ত করা হয়।]

এখন দেখা যাচ্ছে যে, এ তালিকায় কলিকাতা প্রথম স্থানটি বেশ সহজেই অধিকার করেছে। যক্ষ্মারোগের বীজাণু অস্বাস্থ্যকর জায়গাতেই শীঘ্র বাড়ে; এবং আমাদের সাধারণ লোকদের বাড়ীতে অস্বাস্থ্যকর স্থানের অভাব নেই। কারণ, প্রথমতঃ, অন্তঃপুর হচ্ছে একটি প্রধান জায়গা যেখানে আলো হাওয়ার কোন বালাই নেই; এবং দ্বিতীয়তঃ, আমাদের বৈঠকখানা, যেখানে কাশরোগী নির্ব্বিচারেই থুতু ফেলে থাকেন, এবং অপরের সঙ্গে এক হুকাতেই ধূম পান করেন। যাতে রোগ ও মৃত্যু না হয় তার সপক্ষে অনেক ঔষধ ও স্বাস্থ্যতত্ত্বের নিয়ম থাকা সত্ত্বেও সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যে, কোন শিক্ষায় বা উপদেশে এই সমস্ত অনিচ্ছাকৃত অসাবধানতা ও অভ্যাসের হাত থেকে আমরা আজও মুক্ত হইনি, যদিও, এই সমস্ত অভ্যাসই সবচেয়ে গুরুতর দোষের মধ্যে গণ্য। দেশে এমন লোকও আছেন, যাঁরা ক্ষণেকের জন্যও ভাবেন না বা বোঝেন না যে, এই ভীষণ সংক্রামক কাশ রোগের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্ছে স্বাস্থ্যতত্ত্বের নিয়ম মেনে চলা; অর্থাৎ ঐ মারাত্মক থুতুর সম্পর্ক-বর্জ্জিত হওয়া।

১৯১৩ সালের রিপোর্টে কলিকাতার Health-Officer লিখছেন "গত বছরে কাশরোগীর মৃত্যু-সংখ্যা ১৯৩১; কিন্তু বর্ত্তমান বছরের সংখ্যা ২১৯৬; অর্থাৎ হাজারকরা মৃত্যু সংখ্যার হার ২·৫। এটা চোখে দেখতে বা কাণে শুনতে কম হলেও, বেশ উচ্চ রকমের হার। এদেশে কলেরা ও প্লেগ দুটি মহামারী রোগ থাকা সত্ত্বেও, অন্য সব সংক্রামক রোগের চেয়ে এই যক্ষ্মারোগেই (Tuberculosis) বেশী মৃত্যু ঘটছে—বিশেষ করে একথা যখন আমরা বুঝতে পারি, তখন উপরি উক্ত মৃত্যুর হার বিশেষ ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দেশে আধুনিক ও উন্নত নানারকম বিধি ব্যবস্থা করাতেও, গত পাঁচ বছরে এই রোগ এত বেশী বেড়েছে, যাতে করে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এই ভীষণ রোগের কারণ অনুসন্ধান ও তার প্রতিকারে ব্যবস্থা করতে হলে, আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করা বেশী দরকার।

আমাদের দেশে কেবল মুসলমানদিগের মধ্যে পর্দ্দার প্রাধান্য বেশী; সেজন্য তাহাদের মোট মৃত্যু সংখ্যার (১/৩) তিন ভাগের এক ভাগ কেবল এই রোগে (Tuberculosis) জন্যই ঘটে।

এই যক্ষ্মারোগটি (Pulmonary Tuberculosis) এদেশের পুরুষদের অপেক্ষা মেয়েদিগকেই বেশী আক্রমণ করে। কলিকাতার লোকসংখ্যায় মেয়েদের সংখ্যা কেবল মাত্র শতকরা ৩৩এর বেশী নয়; কিন্তু সব রোগের চেয়ে মেয়েদের কাশরোগে মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা ৪৫; অর্থাৎ হাজারকরা মৃত্যুর হার ৩·৩ জন কাশরোগেই স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মোট মৃত্যুসংখ্যা হাজারকরা ২·৫। কাশরোগটি (Phthisis) মেয়েদের মধ্যে কি ভয়ানক গুরুতর ব্যাপারে পরিণত হয়েছে উপরের হিসাবই তার প্রমাণ দিচ্ছে। এমন কি, ১৯১৬ সালেই পুরুষদের অপেক্ষা মেয়েরা সংখ্যায় দ্বিগুণ এই কাশরোগেই (Pulmonary Tuberculosis) ভীষণ ভাবে আক্রান্ত হয়েছিল এবং তার হাজারকরা হার পুরুষদের ১·২ এবং মেয়েদের ২·৬।

১৯১৬ সালের কলিকাতার স্বাস্থ্য রিপোর্টে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে পুরুষদের অপেক্ষা মেয়েদের মধ্যেই ঐ রোগের (Tuberculosis) প্রাবল্য বেশী এবং অত্যন্ত দুঃখের ও অনুতাপের বিষয় এই যে, সন্তান প্রসবের উপযুক্ত বয়সে, অর্থাৎ যৌবনাবস্থাতেই মেয়েদের এ রোগে বেশী মৃত্যু ঘটেছে। নীচের তালিকায় ঘটনা যে কি তা স্পষ্ট জানা যায়।

বয়স	লোকসংখ্যা পুরুষ	লোকসংখ্যা স্ত্রী	মৃত্যুসংখ্যা পুরুষ	মৃত্যুসংখ্যা স্ত্রী	হাজারকরা হার পুরুষ	হাজারকরা হার স্ত্রী
১০-১৫	১৩৪৭৮	২৪২৬৫	১০	৩৪	·২৩	১·৪
১৫-২০	৫৬৩১৬	২৬৩২৫	৫২	১২১	·২৯	৪·৫
২০-৩০	১৭৪৯৫১	৫৯৯৮৩	২১৬	২৪৪	১·২	৪·০
৩০-৪০	১৩৩৬৬৪	৪৫০৮৫	২৪১	১৮৯	১·৮	৪·১

এটা সহজে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা যায় না যে, ১৫ থেকে ২০ বছরের মেয়েদের যক্ষ্মারোগে মৃত্যু-সংখ্যা ঐ বয়সের পুরুষদের তুলনায় ৫গুণ; এবং ২০ থেকে ৩০ বছরের তুলনায় ৪গুণ। কিন্তু উপরের তালিকাই তাহার প্রমাণ। সন্তান-প্রসবোপযুক্ত বয়স্ক মেয়েদের মধ্যে এই যক্ষ্মা (Tuberculosis) রোগের ভয়ানক প্রাবল্যের জন্য ভবিষ্য সন্তানের উপর ইহার প্রভাব বড় কম নয়। জীবন-যুদ্ধে এই সমস্ত সন্তানেরা বিশেষ ভাবে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় লড়তে বাধ্য হয়। আজীবন তারা রোগের আকর হয়েই জীবন ধারণ করে এবং তাহার ফলে দেশের দৈন্য ও অবনতি। এই সমস্ত কারণে, জন্ম ও মৃত্যুর হার তুলনা করলে, বাংলার ভবিষ্য লোকশক্তির অবস্থা যে মোটেই আশাপ্রদ নয়, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। আর একটী বিশেষ কথা —যেটী ভুললে কোন মতে চলবে না—যে, Census রিপোর্টে লোক-গণনায় মেয়েদের সংখ্যায় অনেক বিধবাও আছেন; এবং আমাদের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার দরুণ তাঁরা আইন অনুসারে পুনর্বিবাহের অধিকার থেকে বঞ্চিত—তঁদের বিবাহ হতে পারে না; এজন্য এদেশের লোকসংখ্যার হ্রাস অনিবার্য্য। দেশের লোক যদি নিজেদের বিপদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা অবিলম্বে না করেন, তা'হলে মৃত্যু-সংখ্যা জন্ম-সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যেতে বেশী দিন লাগবে না; এবং তাহার ফলে, এই জাতির আশু কোন বিপদ ন ঘটবার কারণ নাই।

যদিও এসব ব্যাপার আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকরা বিশেষ করে বুঝেছেন, তথাপি সে সম্বন্ধে প্রতিকারের কি ব্যবস্থা হয়েছে তা দেখা যাক—

বোম্বায়ের লোকেরা এ বিষয়ে মন দিয়েছেন এবং King George Anti-Tuberculosis সমিতি এই সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করছেন; আশা করি, তাঁরা শীঘ্রই ঐ কাজে সফলতা লাভ করবেন। যুক্ত প্রদেশের লোকেরা Bhowali এবং অপর নানা স্থানে স্বাস্থ্যনিবাস (sanatoria) স্থাপন করেছেন এবং এই রোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা যথাসাধ্য করছেন। কিন্তু এই বাংলা দেশেই এ বিষয়ে কেবল কিছু হয় নি। যদিও এ রোগের প্রাধান্য এদেশেই অত্যন্ত বেশী, তথাপি, প্রতিকারের কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি। শুনতে পাই, সব কাজে বাংলা দেশ ভারতের অন্য সব দেশের চেয়ে অগ্রগণ্য; কিন্তু এ কাজে আজ বাংলা দেশ যে সবার পিছনে—এ দেশের পক্ষে তাহা একটা অপমানের বিষয়।

বাংলা দেশে কেন যে কোন ব্যবস্থা হয় নি, তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে; এবং সেটী না করার বিরুদ্ধে ওজর হিসাবেই প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। কথাটি হচ্ছে, বাংলা দেশটাই একেবারে অস্বাস্থ্যকর

জায়গা। এ দেশে এমন কোন সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থান নেই যেখানে একটি স্বাস্থ্যনিবাসের ব্যবস্থা করা যায়। অবশ্য এ কথা বোঝা দরকার যে এই যক্ষ্মারোগের (Tuberculosis) জন্য স্বাস্থ্যনিবাসের পত্তন করতে হলে, জলবায়ুর কথাই যে বিশেষ কথা, তা নয়। ডাক্তার Leen Petit বলেন, "আজকাল আমাদের কেমন ধারণাই হয়ে গেছে যে, কাশরোগের পক্ষে কোন রকম জলবায়ুই বিশেষ উপযুক্ত নয়; আর এমন কোন জলবায়ু নেই, যা সব রকম কাশরোগের প্রতিকারের পক্ষে সমান উপযোগী।" কিন্তু ডাক্তার Walter বলেন—আর সে কথাটাও খুব সত্যি—যে, "জলবায়ুকে যে ভাবে ব্যবহার করবে, সেই ভাবেই তার উপকার পাবে; কারণ জলবায়ুর নিজস্ব কিছু নেই। তাহার দোষ বা গুণ লোকের ব্যবহার করার উপরেই নির্ভর করে।" বিশেষ ভাল নয় এমন জলবায়ুতেও অনেক কাশরোগী স্বাস্থ্য লাভ করেছেন—এ ব্যাপারটা খুব আশ্চর্য্যের বিষয় নয়; এবং এই সমস্ত একত্র করে দেখতে গেলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে বিশেষ ভাল জলবায়ুর চেয়ে নির্ম্মল বায়ু ও নিয়মমত চিকিৎসার ব্যবস্থাই এ রোগের পক্ষে বিশেষ দরকারী। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যক্ষ্মারোগ (Tuberculosis) অধ্যাপনার প্রথম অধিবেশনে Sir Robert Phillip বলেন,—"চিকিৎসার ব্যবস্থা যথেষ্ট আশাপ্রদ; আর এ কথা সত্য যে অন্য সব রোগের চেয়ে যক্ষ্মারোগ (Tuberculosis) শীঘ্র সারান যায়, যদি গোড়াতেই এ রোগটীকে চেনা যায়। এ রোগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে, ব্যাপারটা খুব সহজ হয়ে আসে; আর এ রোগের চিকিৎসা-প্রণালীও বেশ সুনিয়মবদ্ধ। যক্ষ্মারেগের চিকিৎসার সফলতা, ততটা জ্ঞান ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে না, যতটা নির্ভর করে চিকিৎসা প্রণালীর উপর বিশ্বাস করে ধৈর্য্য ধরে থাকার উপর। কিন্তু সে ধৈর্য্য যে কেবল রোগীর তা নয়; ডাক্তারের এবং রোগীর আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের যথেষ্ট পরিমাণে থাকা চাই। কিছুদিন আগে লোকের ধারণা ছিল, কাশরোগ জলবায়ুর বিশেষ অবস্থা থেকেই জন্মায়; কিন্তু সেই ভুল ধারণা লোকের মন থেকে দূর করতে আমাদের যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভাবতেন, জলবায়ু থেকে যত রোগের উৎপত্তি, তার মধ্যে কাশরোগ অন্যতম। এ রোগের সম্বন্ধে অল্প অনুসন্ধান করেই এই ধরে নিয়েছিলেন যে, খোলা আকাশ, পূবে বাতাস প্রভৃতি বিশ্রী আবহাওয়ার দরুণই এর জন্ম হয়। এ কথা যে কেবল রাস্তার লোকে বলতো তা নয়;—লেখকেরাও লিখে গেছেন, কবিরাও বলে গেছেন। এই সমিতি গঠিত হবার পূর্ব্বে, বিশেষ সাহায্যের আশায়, এডিনবরার একজন খ্যাতনামা লোকের কাছে এই সব কথা পাড়ায়, তিনি উত্তর দিলেন, "যদি গরীব কাশরোগীদের সহর থেকে বাইরে সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়, তা হলে সানন্দ চিত্তে আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব দান করবো; কিন্তু এখানে রেখে তাদের যে কোন উপকার সম্ভব হতে পারে, এ কথা তোমরা আমাকে কোনমতে বিশ্বাস করাতে পারবে না।" কিন্তু সুখের বিষয়, সেই সমস্ত ভুল ধারণা ও অভ্যাসের হাত থেকে আমরা আজ ছাড়া পেয়েছি। এখন সকলেই বিশ্বাস করেন এবং বোঝেন যে, এ রোগ যেমন সব জায়গায় জন্মায়, তেমনি এ রোগ সারানোর উপায়ও সব জায়গাতেই সম্ভব। ডাক্তার Arthur Latham তাঁহার নিজের বইতে লিখছেন—"স্থান ও জলবায়ু সম্বন্ধে আমার মত,—শুধু আমার কেন, স্বাস্থ্যনিবাস চিকিৎসায় যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে, এবং স্বাস্থ্যনিবাস-ফেরৎ রোগীদের চিকিৎসা যাঁরা কিছুদিন ধরে করেছেন, তাঁরাও বলেন, যে, কাশরোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা সেই সব দেশেতেই করা উচিত, যেখানে তারা বসবাস করে বা যেখানে পরে তারা বসবাস করবে।"

কিন্তু এ কথা কেউ মনে করবেন না যে, জলবায়ুর কোন প্রভাব নেই। তবে কথাটা হচ্ছে, তার প্রভাব

* The Diagnosis and Modern Treatment of Pulmonary Consumption.

যে সব সময়ে যক্ষ্মার একমাত্র কারণ, তা নয়। মুক্ত হাওয়ায় চিকিৎসার ব্যবস্থা সব রকম জলবায়ুতেই করা যেতে পারে। উপযুক্ত জলহাওয়া এবং দক্ষ চিকিৎসকের সাহায্য এ রোগের পক্ষে সবচেয়ে সুন্দর ব্যবস্থা, যদিও তাহা সব সময়ে পাওয়া দুষ্কর। সে জন্য, রোগীকে বরং সহরের কাছে দক্ষ চিকিৎসকের সাহায্যের সম্ভাবনায় রাখা ভাল; কারণ, জলবায়ুর উপযুক্ততা বা অনুপযুক্ততায় বিশেষ কিছু যায় আসে না।

বাংলাদেশের এ অভাব ও অপমান দূর করবার একমাত্র ব্যবস্থা, শীঘ্র একটি স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন করা, যেখানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে চিকিৎসা চলবে এবং যাতে প্রত্যেকের, ও সেই সঙ্গে সমাজের উপকার হয়। বলামাত্রই যে দেশে স্বাস্থ্য নিবাস গড়ে উঠবে, অবশ্য সেটা আশা করা যায় না। সেজন্য আমাদের প্রথমে চেষ্টা করা উচিত, যাতে সমাজের বিশেষ কোন শ্রেণীর লোকদের কষ্ট দূর করা যায়—যাদের সাহায্যের প্রয়োজন বেশী এবং যাদের উপকারও হবে বেশী। এ রোগের চিকিৎসার জন্য একটি স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের জন্য আজ দেশের জ্ঞানী ও ধনীদের নিকট নিবেদন করছি; এবং আশা করি, তাঁরা এ বিষয়ে মনোযোগ দেবেন এবং শীঘ্রই ইহার একটা ব্যবস্থা করবেন।

Statisticsএ সব খবরই আছে; কিন্তু এই রোগে (Tuberculosis) কোন্ শ্রেণীর লোক যে বেশী ধরে, তার কোন হিসাব পাওয়া কঠিন। তবে এটা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সে শ্রেণীর লোকেরা হচ্ছেন আমাদের মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা। সব সময়ে তাঁদেরই সবচেয়ে বেশী সাহায্যের আবশ্যক। অর্থশালী লোকেরা প্রায়ই এ রোগে ভোগেন না; কারণ, তাঁদের বাড়ীতে যেমন আলোহাওয়ার অভাব নেই, তেমনি আবার পুষ্টিকর খাদ্যেরও অভাব নেই। জীবন সংগ্রামে তাঁদের দুঃখ কম; এবং স্বভাবতঃ পরিশ্রম ও ক্লান্তি না থাকায়, তাঁরা অল্পই কষ্ট ভোগ করেন। অভাবের চেয়ে বরং অতিমাত্রায় পানভোজনাদিই তাঁদের অসুখের একমাত্র কারণ। সেই সমস্ত ধনী লোকদের কথাই আলাদা; কারণ, তাঁদের রোগের সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। তাঁরা মনে করলে, মাঝে মাঝে সহরের ধূলো-হাওয়ার হাতে থেকে মুক্তি পাবার জন্যে দেশ-বিদেশ ভ্রমণে যেতে পারেন। আর তা'ছাড়া, বছরে দু' একবার করে পশ্চিম ঘুরে আসা তাঁদের একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে। যা কিছু দরকার, সবই তাঁরা সহজে করতে পারেন; কারণ, সাহায্যের কোন ধারই তাঁরা ধারেন না।

একটা জিনিষ সবচেয়ে অদ্ভুত যে, আমাদের দেশের তথাকথিত "ভদ্রলোকদের" তুলনায় মজুর শ্রেণীর লোকেরা বেশী সুখী। খোলা হাওয়াতেই তাদের জন্ম ও মৃত্যু দুইই ঘটে—যেন আলোহাওয়াই তাদের প্রাণ। বছরের মধ্যে বেশী দিনই তারা খোলা হাওয়ায় ঘুমিয়ে কাটায়। যেখানে এসব লোকেরা বসবাস করে, সেখানকার পথ দিয়ে রাতে যাতায়াত করা বিশেষ মুস্কিলের কথা; কারণ, তারা পথের উপর এমনি ভাবে পড়ে ঘুমোয় যে সেই সব ঘুমন্ত শরীরে পা ঠুকে পড়ে, যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। তাদের যা খাবার জোটে, তারা তা সন্তোষের সহিতই খায়; এবং দৈহিক পরিশ্রম করে বেশী। সেজন্য রাতে শোবা মাত্রই ঘুমিয়ে পড়ে। আর তা ছাড়া, রোজ আনে রোজ খায় বলে, তাদের মাথায় কোন বাজে ভাবনা থাকে না। বলতে গেলে, বিশেষ ভাবনা-চিন্তার কোন বালাই তাদের নেই। অসুখে পড়লেই তারা সাধারণ হাসপাতালে চলে যায়। সেখানে তাড়াতাড়ি চিকিৎসার ব্যবস্থা করায়, এবং হাসপাতাল থেকেই তাদের খাবারের ব্যবস্থা হয়ে থাকে, সেজন্য, তাদের জীবনে কষ্ট একদিক থেকে খুবই কম। আর স্বাভাবিক সহ্যশক্তি গুণে এত শীঘ্র তারা রোগের হাত থেকে মুক্তি পায় যে, সেটা ভারি একটা আশ্চর্য্যের বিষয়।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কথা, বিশেষতঃ যারা গরীব তাদের কথা ভাবলেই মনটা দুঃখে ভরে ওঠে। প্রায়ই দেখা যায়, তাদের বাসের ঘরগুলি খুবই ছোট ছোট—

তার উপরের চালটি খোলার, মেঝে ও দেয়ালগুলি সব মাটীর; এবং জানালার অভাবে দেয়ালে ছোট-ছোট ফোকর। এই সবের ফলে তারা আলোহাওয়া থেকে প্রায় একবারেই বঞ্চিত। কয়েকজন মিলে এক যায়গায় থাকবার ব্যবস্থা করলেও তাদের থাকবার উপায় নেই; কারণ, সমাজে নামের অনুযায়ী অবস্থায় থাকতে তারা বাধ্য—তাদের সে রকম সঙ্গতি থাক বা না থাক। তাদের অভাব থাকলেও, ছেলেদের শিক্ষা, মেয়েদের বিবাহ ইত্যাদি সমাজের সব রকম বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলতে তারা বাধ্য। আবার সমাজে বাল্য-বিবাহের ব্যবস্থা থাকায়, অল্প বয়সে সন্তান প্রসবের ফলে, তাদের সংখ্যা হ্রাসের দিকেই চলেছে। সেই জন্যই এটা খুব আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে, এই যক্ষ্মা রোগে (Tuberculosis) ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সের লোকের তুলনায় ঐ বয়সের মেয়েদের মৃত্যু সংখ্যা ৫ গুণ বেশী এবং ২০ থেকে ৩০ বছরের লোকের তুলনায় ৪ গুণ বেশী।

সেই সব ভদ্রলোকের প্রতিদিনের কাজ হচ্ছে, সকালে সকালে দুটি আহার করে তাড়াতাড়ি আপিস যাওয়া এবং সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক জায়গায় বসে মাথার কাজ করা। দিনের মধ্যে জলযোগের আর কোন ব্যবস্থাই তাদের থাকে না। তার পর সারাদিনের এই দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে, আপিসের একরাশ কাগজপত্র নিয়ে, সন্ধ্যার সময় সেই নিরানন্দ বাড়ীতে ফিরে দেখেন যে, বাড়ীর সব অর্দ্ধভুক্ত মেয়েরা তারই আশায় পথের দিকে চেয়ে বসে আছেন। এই সব লোকের স্বাস্থ্য বলে কোন জিনিষ প্রথমেই আছে বলে মনে হয় না। এই সমস্ত বাড়ীর কথা সকলের ভাবা উচিত; কারণ, তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ঐ সমস্ত বাড়ীর রোজ [illegible] ব্যক্তিই যখন রোগে আক্রান্ত হন, তখন তাঁদের বাড়ীর অবস্থা যে কি দাঁড়ায়, সে কথা মনে আনতেই ভয় হয়। এমন সঙ্গতি নেই যে, বাড়ীতে রেখে কিছুকাল ধরে সেই সব রোগীর চিকিৎসা করান। আর তা'ছাড়া বাড়ীতেও আলো-বাতাসের ও খাদ্যের যথেষ্ট অভাব। এ দেশে আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়—রোগীকে কখন একলা রাখা হয় না—সব সময়েই রোগীকে ঘিরে তার আত্মীয়-স্বজনেরা কথাবার্ত্তা কয়ে থাকেন। দিনের মধ্যে কিছুক্ষণ রোগীকে একলা চুপ করে থাকতে দিলে যে রোগীর উপকার হয়, এ কথা বোধ হয় কেউ বোঝেন না। যদি হাওয়া বদলাবার কথা কথা উঠে, তাহলে এ শ্রেণীর লোকের পক্ষে সে কথা বলাই বৃথা। আর একটি বিশেষ কথা এই যে, এ সব বাড়ীর লোকেরা স্থানাভাবে এক ঘরে অনেকে বাস করেন; এবং রোগীর সঙ্গে এক ঘরে বাসের ফলে, রোগের বীজ অন্যের শরীর আক্রমণ ক'রে রোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে তোলে। কারণ, এ রোগ ভয়ানক সংক্রামক এবং সেই সব কারণে বাড়ীখানি ক্রমশঃ এ রোগের আকর হয়ে উঠে। এই সব লোকেরা সাধারণ হাসপাতালে যেতে চান না—কেউ জাতি যাবার ভয়ে, আর কেউ বা বাড়ীর কারণে। তাছাড়া, এ কথা সবাই জানেন যে, সাধারণ হাসপাতালে এসব রোগীকে স্থান দেওয়া কতদূর অসঙ্গত ও অবাঞ্ছনীয়। যক্ষ্মা অতি ভীষণ রোগ। কারণ একবার এ রোগে আক্রান্ত হলে রোগী মাসের পর মাস এর হাত থেকে কিছুতেই মুক্তি পান না—যতদিন না তিনি ভুগে করে সেরে ওঠেন, কিম্বা এর কবলে পড়েন। সাধারণ হাসপাতালে সচরাচর অল্প রোগীরই ব্যবস্থা করা থাকে। সেজন্য এই সব চিরস্থায়ী রোগে আক্রান্ত লোকেরা সেখানে স্থান দেওয়া একবারেই অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ এসব রোগীকে সাধারণ রোগীর সংস্পর্শে আনা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। আর তাছাড়া, সাধারণ হাসপাতালে যে রকম চিকিৎসার ও খাদ্যের ব্যবস্থা আছে, তা, এ সব রোগীর পক্ষে যথেষ্ট নয়। এদের রোগীকে সারাতে হলে, আরও বেশী চিকিৎসা খাদ্য ও শুশ্রূষা আবশ্যক।

এই ভীষণ শত্রুর হাত থেকে এ শ্রেণীর লোকদের উদ্ধারের একমাত্র উপায়, সহরে ও তার আশে-পাশে স্বাস্থ্যনিবাস বা সেবাশ্রম স্থাপন করা,—যেখানে রোগীদের চিকিৎসা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মতেই করা যেতে পারে। এ রকম সেবাশ্রমে চিকিৎসা [illegible]

[illegible]কর জায়গায় করা যায়, তাহলে সেটা যে আদর্শ [illegible]য়া হয়, সে কথা বলাই বাহুল্য; কিন্তু কাজের [illegible]া আদর্শের অপেক্ষা রাখে না। খাস বাংলাদেশে এই রকম স্বাস্থ্যনিবাসের উপযুক্ত স্থান পাওয়া দুষ্কর; কিন্তু সে স্থান নেই বলে আমাদের চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। কোন ব্যবস্থা করবার সময় Sir Phillipএর কথা মনে রাখলেই চলবে; কারণ, তিনি বলেছেন—"যক্ষ্মা রোগের (Tuberculosis) জন্ম ও মৃত্যু সব যায়গাতেই সম্ভব।" সেজন্য আমাদের উপস্থিত একমাত্র কাজ সহরের কাছেই একটি স্বাস্থ্য-নিবাস স্থাপন করা। সহরের কাছেই করবার উদ্দেশ্যে—(১) প্রথমতঃ, যে শ্রেণীর লোকদের কষ্ট দূর করবার ব্যবস্থা হবে, সময়মত তাদের রোগীর সঙ্গে দেখাশুনা চলতে পারে; (২) দ্বিতীয়তঃ, রোগী কাছে থাকার দরুণ তাঁর আত্মীয়-স্বজনের কাজকর্ম্মের কোন অসুবিধা হবে না; এবং (৩) তৃতীয়তঃ, সুবিধা এই হবে যে, সহরের লোকের কাছ থেকে এ রোগের হাত থেকে সহজে পরিত্রাণ পাবার উপায় সাধারণ লোকে শিখে নিতে পারবে; এবং বাড়ীতে রোগীকে রেখে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা সব লোকের জানা হয়ে যাবে। সহরে দক্ষ চিকিৎসকের অভাব নেই—এ সমস্ত স্বাস্থ্যনিবাস সহরের কাছে হলে, লোকেরা রোগীর মনোমত চিকিৎসাও করাতে পারবেন। এই ভাবেই এ কাজটিকে আমাদের গড়ে তুলতে হবে।

তার পর এই ব্যাপারটিকে (Scheme) বাড়াবার ব্যবস্থা করা—যাহাতে বাংলাদেশে ও তার আশেপাশে নানা রকমের স্বাস্থ্যনিবাস বা সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং ক্রমশঃ "বোলপুরের শান্তি নিকেতনের" মত সুন্দর সুন্দর স্কুলের সৃষ্টি করা যায়। কতকগুলির পত্তন হবে পাহাড়ে পাহাড়ে, কতকগুলি সমুদ্রের ধারে; এবং এই ভাবে দেশময় যাতে ছড়িয়ে পড়ে তার ব্যবস্থা করা। কলিকাতার স্বাস্থ্যনিবাসটি হবে প্রধান এবং অপরগুলি ইহার অধীনে থেকে ইহার নিয়মাধীনেই চলবে। এ কাজে কেবল যে টাকার আবশ্যক তা নয়—সময়েরও যথেষ্ট দরকার। গরীব যক্ষ্মারোগীদের ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা স্বাস্থ্যনিবাস ছাড়া যে একবারেই অসম্ভব, এ কথা, আশা করি, কারুর বুঝতে কষ্ট হবে না। আজ আমাদের নেতারা দেশের মঙ্গল কাজে ব্রতী পরিকল্প হয়েছেন। তাঁরাই যদি আজ এ বিষয়ে একটু মনোযোগ দেন, তাহলে আমাদের টাকার জন্য ভাবতে হবে না; কারণ, দেশের এই মঙ্গলকর কাজে আর্থিক সাহায্য করতে কেহই কুণ্ঠিত হবেন না। বরং এই ব্যবস্থাটী কাজে পরিণত হতে আরম্ভ হলেই, Government এবং Corporation যে এ বিষয়ে সাহায্য করবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবং আশা করি, দেশের হিতৈষীরাও সাহায্যের জন্য অগ্রসর হবেন।

শিশু-স্বাস্থ্য-পাঠ।

প্রথম ভাগ

(যুক্তাক্ষর বর্জ্জিত)

১। সে দিন সকাল বেলা গুরু মহাশয়
সুধালেন বোসেদের শরতেরে ডাকি,
'বিপিন আসে না কেন দিন পাঁচ ছয়
পাঠশালে? পীড়া তার হইয়াছে না কি?

২। পড়ে শুনে ভাল বটে; তা' হলে কি হয়?
মাসেতে পনের দিন করে সে কামাই;
বড়ই অসাবধান, সকলেই কয়;
এমন অবোধ ছেলে কভু দেখি নাই।"

৩। শরৎ কহিল উঠি, হাত যোড় করি,—
"বিপিনের হইয়াছে পেটের অসুখ ;
আমাশয়ে ভুগিতেছে বিছানায় পড়ি।"
শুনি গুরু পাইলেন মনে বড় দুঃখ।

৪। কহিলেন তিনি, "শুন, শুন শিশুগণ,
নীরোগ শরীর হয় সুখের আগার ;
আপন শরীরে সদা করিবে যতন ;
বিপিনের মত কেহ হইয়ো না আর।

৫। আজ আমি তোমাদের দিব উপদেশ ;
নীরোগ রাখিতে যদি চাও নিজ কায়,
আমার কথায় মন করহ নিবেশ ;
পালন করিও উপদেশ সমুদায়।"

৬। প্রতিদিন যেই দেখে রবির উদয়,
ভোর না হইতে উঠে বিছানা ছাড়িয়া,—
তাহার শরীরে কভু পীড়া নাহি হয় ;
এই মহা উপদেশ রাখিয়ো জানিয়া।

৭। সকালে উঠিয়া ধোও হাত মুখ আগে ;
দাঁত মাজ ; দাঁত মাজা বড় সদাচার ;
দাঁত না মাজিলে দাঁতে বড় পোকা লাগে।
দাঁতন করিলে রোজ, আছে উপকার।

৮। নিমডালে রোজ দাঁত মাজে যেই জন,
দাঁত থাকে তার সাদা মুকুতার মত ;
দাঁতের যাতনা ভোগ করে না কখন ;
যাহা খায় পরিপাক হয় অবিরত।

৯। কিছু কাল ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি খেলা,
মাতামাতি, লাফালাফি, হা ডু ডু ডু আর,
শরীরের পক্ষে হিতকর ভোর বেলা ;—
সাবধান! চোট যেন লাগে না কাহার!

১০। তার পর পড়াশুনা গিয়া পাঠশালে
মনোযোগ দিয়া ; হলে ছুটীর সময়—
ধীরে ধীরে বাড়ী যেয়ো সকালে সকালে ;
পথে মিছামিছি দেরী করা ভাল নয়।

১১। বাড়ী গিয়া কিছু কাল রবে ধীর ভাবে ;
থাকিতে গায়ের ঘাম ঘাঁটিও না জল।
শরীর শীতল হলে নাহিবারে যাবে ;
নচেৎ হইবে বড় বিষম কুফল।

১২। মাথা হতে পা অবধি খাঁটি সরিষার
তৈল মাখি পুকুরেতে করিবে গমন।
গামছা ঘষিয়া গায়ে বার দুই চার
তৈল উঠাইয়া ফেল করিয়া যতন।

১৩। তাড়াতাড়ি করিয়ো না আহারে বসিয়া ;
ভাত, রুটি যাহা খাও, চিবাইয়া খাবে ;
চিবাইয়া খেলে যাবে হজম হইয়া ;
ধীরে ধীরে খেলে আয়ু, বল বেড়ে যাবে।

১৪। খেয়ে দেয়ে যতনে করিয়ো আচমন,
খাবারের কণা যেন দাঁতে নাহি থাকে ;
কুলকুচা করি মুখ ধোও ঘন ঘন ;
নচেৎ পড়িবে পরে বিষম বিপাকে।

১৫। মুখ না ধুইলে আর দাঁত না মাজিলে,
দাঁত পচে, গলে, পড়ে, যায় অবশেষে ;
খাবার হজম নাহি হয় কোনো কালে ;
ফোক্‌লা বলিয়া তারে সবে উপহাসে।

১৬। দাঁত না মাজায় আছে অনেক কুফল
দাঁত কন্ কন করে,—অশেষ যাতনা ;
দাঁত নড়ে, দাঁত পড়ে, হীন হয় বল ;
দাঁতে যদি লেগে থাকে খাবারের কণা।

১৭। জেনো, তার পরিণাম বড় বিষময়
দাঁতগুলি যাবে সব পচিয়া গলিয়া ;
হজম বিহনে শেষে হবে আমাশয় ;
অতএব মুখ ধুয়ো যতন করিয়া।

১৮। দুপরের রোদে ছুটে ছুটে বেড়াইলে
মাথা ধরে ; আরও নানা পীড়া হতে পারে।
বিকালে রোদের তেজ কমিয়া আসিলে,
খেলা কর মাঠে, ঘাটে, নদীর কিনারে।

১৯। লাফালাফি, ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি আর,—
ফুটবল, হা ডু ডু ডু—খেলা আছে কত।
নিয়মিত ভাবে খেলা করা দরকার ;
নচেৎ ভুগিতে হবে অসুখে নিয়ত।

২০। তার পর পুনরায় গিয়া পাঠশালে,—
সকালের মত পুন মনোযোগ দিয়া
নিয়মিত পড়াশুনা করিয়া বিকালে
সকালে সকালে গৃহে যাইবে ফিরিয়া।

২১। সার কথা জানিয়া রাখিয়ো শিশুগণ!
সকালে শুইবে আর সকালে উঠিবে ;
অনায়াসে লাভ হবে যশ, মান, ধন,—
লেখাপড়া শিখে সবে বড়লোক হবে।

২২। এইরূপ সুনিয়মে চল যদি সবে,
বিপিনের মত সদা পীড়ায় কাতর
হবে না কো ; সদা সুখী রবে এই ভবে ;
নীরোগ শরীর সব সুখের আকর।

২৩। আরো গুটিকত কথা বলি তোমাদের,—
মাথা যদি ধরে কভু,—খোলা যায়গায়,
মাঠে, ছাদে, ঘাটে, কিংবা দালানে ঘরের—
বহু উপকার পাবে বসিলে হাওয়ায়।

২৪। খুলিয়া রাখিবে সদা জানালা দুয়ার,
ঘরে যেন দিন রাত হাওয়া খেলে বেশ ;
রোদ, আলো আসে ঘরে,—জেনে রেখ সার
হক্ কথা বলিয়া দিলাম সবিশেষ।

২৫। প্রতিদিন খেয়ো কিছু তাজা ফলমূল ;
আম, জাম, নারিকেল অথবা কাঁটাল ;
কালোজাম হজমের ঔষধ অতুল ;
আনারস, বেল, কুল, জামরুল, তাল।

২৬। যেখানে সেখানে আর যায় তার হাতে
যে-কোন খাবার খাওয়া কভু ভাল নয় ;
ভূমি হতে কুড়াইয়া, কিংবা এঁটো পাতে
খেয়ো না কো কিছু,—তাতে নানা রোগ হয়।

২৭। যখনি খাইবে কিছু, আগে হাত ধোবে ;
ময়লা জিনিস কত লেগে থাকে হাতে,
নখের ভিতরে ; নখ ধুইয়া ফেলিবে ;
ময়লা না লাগে যেন খাবারে কি ভাতে।

২৮। মাছি বহুবিধ রোগ করে আনয়ন
নাহি খাবে মাছি-বসা খাবার জিনিস।
বাসি, পচা, ধূলা-লাগা খাবার কখন
খাইবে না,—ঠিক জেনে রেখো, উহা বিষ।

২৯। যেথা-সেথা থুথু ফেলিও না শিশুগণ!
সিকনী গয়ের মুছিও না যথা-তথা ;—
এ সকল পচি করে বায়ুর দূষণ ;
সিকনী গয়ের আনে রোগের বারতা।

৩০। জনক জননী আর গুরু মহাশয়
নিয়তই তব শুভ করেন কামনা ;—
পালহ তাঁদের উপদেশ সমুদায়
নীরোগ থাকিতে যদি করহ বাসনা।

শিশু-শাসন।

সকল দেশেই শিশুদিগকে শাসন করিবার প্রথা আছে, এবং এক এক দেশের শাসন প্রথার এক এক রকম বৈশিষ্ট্য আছে। শিশুরা স্বভাবতঃই দুষ্টামি করিতে ভালবাসে। কোন কোন শিশুর দুষ্টবুদ্ধির মাত্রা আবার অন্যান্য শিশুগণ অপেক্ষা কিঞ্চিত অধিক। দুষ্ট শিশুকে শাসন করিয়া সংযত রাখা অনেক পিতা মাতা বা অভিভাবক কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। শিশুদিগকে শাসন করিবার অনেক প্রণালী আছে। তন্মধ্যে শারীরিক দণ্ড (Corporal punishment) তিরস্কার, নির্জ্জন কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখা প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। শারীরিক শাসন আবার নানাপ্রকার। প্রহার, বেত্রাঘাত, কর্ণমর্দ্দন, চড়, চাপড়, কীল, ঘুসি প্রভৃতি শারীরিক দণ্ডের অন্তর্গত। পিতা-মাতা বা অভিভাবক খুব গম্ভীর প্রকৃতির রাশভারি

লোক হইলে শুধু তিরস্কার করিয়াই তিনি শিশুদিগকে শাসন করিতে পারেন। আবার এমন শিশুও আছে, কোন প্রকার শাসনেই যাহাদিগকে সংযত করিতে পারা যায় না। লর্ড ক্লাইব শৈশবে এইরূপ শাসনের অতীত বালক ছিলেন। অনেকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন যে, spare the rod, spoil the child; অর্থাৎ ছেলে দুষ্টামি করিলে তাহাকে শাসন করা চাই—বেত্রাঘাত করা চাই; নচেৎ তাহার স্বভাব একেবারে এমন খারাপ হইয়া যাইবে, যে, তাহাকে আর মানুষ করিয়া তুলিতে পারা যাইবে না।

কিন্তু আমাদের দেশে দুষ্ট বালকদের শাসন করিবার প্রধান উপায় কিল, চড়, চাপড় প্রভৃতি। নিতান্ত দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির বালক হইলে আরও গুরুতর শাসনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সেকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে, শুনিতে পাই, পড়াশুনা যতদূর হউক আর নাই হউক, শাসনের খুব কড়াকড় বন্দোবস্ত ছিল। গুরু মহাশয় বলিলেই, বেত্রদণ্ডধারী বিরাটাকৃতি, রক্তচক্ষু যমদূত-সদৃশ এক অতিমানব মূর্ত্তি মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হইত। বেত্রহীন গুরুমহাশয়ের কল্পনা করাও বোধ করি অসম্ভব ছিল। তা'ছাড়া, অতি দুষ্ট প্রকৃতির বালকগণকে শাসন করিবার জন্য গুরুমহাশয়ের ভাণ্ডারে 'নাড়ুগোপাল' প্রভৃতি এত রকমের শাসনের উপকরণ থাকিত যে, একালের অতি দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির বালককেও শাসন করিবার জন্য স্কুলে কিম্বা পাঠশালে এত রকমারি বন্দোবস্ত নাই।

কিন্তু সুখের বিষয়, আজ কাল সভ্য সমাজ হইতে এরূপ শিশু-শাসন প্রথা উঠিয়া যাইতেছে। শিশুদিগকে গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করিলে তাহাদের যতটুকু উপকার হয় বলিয়া শাসনকর্ত্তারা মনে করেন, তদপেক্ষা সহস্রগুণ অনিষ্টই হইয়া থাকে। মোটামুটি, আজকাল বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বুঝিতে পারিতেছেন যে, শিশুকে কঠোর শাসনাধীন করিয়া রাখিলে, কি ব্যক্তিগত ভাবে, কি জাতীয় হিসাবে—ঘোর অনিষ্ট হইয়া থাকে। কেবল বোঝা নহে, অনেকে ইহা স্বীকারও করিতেছেন, এবং শিশু-শাসন প্রথা রহিত করিবার জন্য আন্দোলনও চলিতেছে। তাহার ফলও ফলিতেছে। বিদ্যালয়ে শিশুদিগকে শাসন করিবার প্রথা বর্ব্বর আচরণ বলিয়া ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ, শিশুদিগকে খুব কড়া শাসন করিলে, তাহাদের স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। ইহাতে কেবল শিশু নয়, সমাজেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

শিশু-চিত্ত স্বভাবতঃই চঞ্চল; তাহাদের দুষ্ট বুদ্ধি খুবই স্বাভাবিক। তাহারা যখন দুষ্টামি করে তখন কাহারও অনিষ্ট করিবার জন্যই যে তাহা করে তাহা নয়—সেটা তাহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বলিয়াই করে। সেই কার্য্যে তাহাদিগকে বাধা দিলে, তাহাদের নিজ স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণে বাধ্য করা হয়। ইহাতে যে তাহাদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে ব্যাঘাত ঘটিবে, তাহাতে কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই। সেই জন্য সভ্য দেশের সুবিবেচক লোকেরা মনে করেন, সমাজ-হিতার্থে ছেলেমেয়েদের মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য যতদূর সম্ভব তাহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া কলাপে বাধা দেওয়া উচিত নহে। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের শিশু-পালন-পদ্ধতির কথা আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে দেখিতে পাইতেছি, ঐ সকল দেশে শিশুদিগকে বিলক্ষণ রূপে তাহাদের স্বভাবের অনুসরণ করিয়া চলিতে দেওয়া হয়। তাহাতে ঐ সকল দেশের শিশুদের দেহ ও মন সম্যক পুষ্টি লাভ করে। এবং পরিণামে তাহারা জগতের মহা মহা উপকার সাধন করিতে পারে।

আমাদের দেশে এখনও এ সকল গুরুতর তত্ত্ব সকলে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না,—শিশু চরিত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা এখনও এদেশে অবলম্বিত হয় নাই। বঙ্গ দেশে কেবল মাত্র স্বাস্থ্য-সমাচারে মধ্যে মধ্যে এ সম্বন্ধে যা একটু আধটু আলোচনা হইয়া থাকে। সভ্য দেশের সঙ্গে তুলনায় বাঙ্গলা দেশে শিশু-পালন-পদ্ধতির অনেক ত্রুটি রহিয়াছে। শিশু-পালন প্রথার অনেক বিভাগ রহিয়াছে; প্রত্যেক বিভাগের আলোচনা স্বতন্ত্র ভাবেই হওয়া কর্ত্তব্য। শিশুদিগকে শাসন করিবার

প্রথা না—ইহা শিশু পালন পদ্ধতির অন্যতম একটী বিভাগ। আজ আমরা কেবল এই বিভাগটিরই আলোচনা করিতে বসিয়াছি।

সুখের বিষয় সেকালের পাঠশালাও এখন নাই, সেকালের গুরুমহাশয়ও এখন নাই, সে কালের শিশু-শাসন প্রথাও এখন নাই। আমরা শৈশবে গুরু মহাশয়ের পাঠশালে যেরূপ কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা দেখিতাম, আজ কাল আর তাহা দেখিতে পাই না। ইহা মন্দের ভাল বলিতে হইবে। স্কুলে এত কঠোর শাসনের ব্যবস্থা নাই; তবে ইয়োরোপ-আমেরিকার তুলনায় আমাদের দেশের স্কুলসমূহে শিশু-চরিত্র-গঠন ব্যবস্থার অনেক ত্রুটি রহিয়াছে; সে সকল সংশোধন করিতে হইবে। তাহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়; আমরা প্রবন্ধান্তরে তাহার আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

কিন্তু স্কুলের ব্যবস্থা যেরূপই হউক, বাড়ীর ব্যবস্থা আদৌ ভাল নয়। বাড়ীতে দেখিতে পাই, ছেলে মানুষ করিবার দুইটি মাত্র প্রথা আছে। এক, খুব কড়া শাসন; আর এক, শাসনের একান্তই অভাব নিরবচ্ছিন্ন আদর। এই দুইটার একটাও আমরা ভাল মনে করি না। যেখানে বাপ-মা ছেলেকে খুব সভ্যভব্য শান্তশিষ্ট করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় খুব কড়া শাসনের প্রবর্ত্তন করেন,—কথায় কথায় ছেলেকে উত্তম মধ্যম দিয়া থাকেন, সেখানে তাঁহাদের উদ্দেশ্য কতটা সিদ্ধ হয়, ছেলে কতখানি সভ্য এবং শান্ত হয়, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না;—কিন্তু তাহার শরীর মন স্বভাবতঃ যেরূপ ভাবে পরিণতি লাভ করিতে পারিত, তাহা যে হয় না, সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। ইহা যে তাহার দেহ ও মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর, তাহা তাহার পিতামাতা বুঝিতে না পারুন,—সমাজ-হিতৈষী, দূরদর্শী ব্যক্তিমাত্রই তাহা বুঝিতে পারিবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুরা অত্যধিক আদর পাওয়ায়, তাহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ কোন হানি না হইলেও, তাহারা যে ঠিক মত মানুষ হইয়া উঠিতে পারে না, ইহাও অস্বীকার করা যায় না।

সে যাহা হউক, শিশুকে শাসন করিবার জন্য, অথবা ঠিক শাসন না হইলেও, তাহাকে অভিভাবকের বশীভূত করিয়া রাখিবার জন্য, আর একটা উপায় অবলম্বন করা হয়। সেটা তাহার মনে ভয়ের ভাবের সৃষ্টি করা। জুজুর ভয়, ভূতের ভয়, হুতুমথুমোর ভয়, কঙ্কা কাটা'র ভয়—প্রভৃতি নানা রূপ কাল্পনিক বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া শিশুর চিত্তকে এমন মুষড়াইয়া দেওয়া হয় যে, সে তো মানুষ হইতেই পারে না,—অধিকন্তু তাহার নিকট হইতে কোন বড় কাজেরই আশা করা যায় না। এই কাল্পনিক ভয়ের ভাব তাহার মনে মরণ কাল পর্য্যন্ত বদ্ধমূল হইয়া থাকে। এক কথায়, অতি শৈশবেই তাহার মনের growth একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। মনের এই দুরবস্থা শরীরের উপরও কম কাজ করে না। মনের সহিত তাহার শরীরও, যে ভাবে তাহার পুষ্টিলাভ করা উচিত ও সম্ভব ছিল, সে ভাবে পুষ্টিলাভ করিতে পারে না।

পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; ভগিনী, খুড়া, জ্যেঠা, অন্যান্য বয়স্ক স্ত্রী পুরুষ অভিভাবক বা আত্মীয়—ইচ্ছা পূর্ব্বক না হউক, কার্য্যক্ষেত্রে ত বটেই,—এজন্য দায়ী। বিশেষতঃ, দাসদাসীরা এ বিষয়ে আরও বেশী পরিমাণে দায়ী। শিক্ষার অভাব, বিবেচনার অভাব—এইরূপ ঘটনার কারণ। দাস-দাসীদের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে; কারণ, প্রভুর ছেলে-মেয়েদের জুজুর ভয় বা ভূতের ভয় দেখাইয়া তাহারা শিশুর যে কতটা অনিষ্ট করে, তাহা তাহাদের বুঝিবার ক্ষমতাই নাই। কিন্তু অনেক পিতামাতাও তাহা বুঝিতে পারেন না। অথবা, চিন্তা করিলে হয় ত বুঝিতে পারিতেন; কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহারা আদৌ চিন্তা করেন না। এমন কি, উচ্চ শিক্ষিত অনেক পিতামাতার এরূপ দৌর্ব্বল্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যে কতদূর দুঃখের কথা, তাহা কি কাহাকেও বলিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে? ইহাতে কেবল যে শিশুর অনিষ্ট হয় তাহা নহে,—ইহাতে সমাজেরও কতটা অনিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কি কেহ ভাবিয়া

দেখিতেছেন? আমাদের কাপুরুষতা ঐতিহাসিক রহস্যপার, এবং proverbial; এই কাপুরুষতার জন্য শৈশবে ভূতের ও জুজুর বিভীষিকা যে কতখানি দায়ী, কে তাহা বলিবে? Physically fit হইলেও mentally আমরা যে অত্যন্ত দুর্ব্বল, সে কথা ত আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। যে সকল শিশু সৌভাগ্য ক্রমে এরূপ জুজুর ভয়ে, ভূতের ভয়ে আতঙ্কিত হইতে অভ্যস্ত হয় নাই, তাহাদের চিত্তবৃত্তি যতখানি সবল হইতে পারে, জুজুর ভয়ে ভীত শিশুর চিত্তও যে ঠিক সেই পরিমাণে সবল হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারিবে, ইহা কখনই আশা করা যায় না। আমাদের জাতীয় চরিত্র যতটুকু অধ্যয়ন করিবার সুযোগ আমরা পাইয়াছি, তাহাতে আমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আমাদের দেশের লোকেরা যে সহসা কোন বড় কাজে, কিম্বা যে সব কাজে risk আছে সে সব কাজে, হাত দিতে ভরসা করে না, তাহার একমাত্র না হউক প্রধান কারণ যে শৈশবের জুজুর ভয় তাহাতে সন্দেহ নাই। শৈশবেই জুজুর ভয়ে বা ভূতের ভয়ে মনটা এমন ভয়প্রবণ হইয়া পড়ে যে, পরিণত বয়সে শত সহস্র অনুকূল অবস্থার মধ্যেও আমরা কোন risky কাজে হাত দিতে ভয় পাই। শিক্ষা, বয়স, প্রভৃতি কারণে পরিণত বয়সে ভূতের ভয় যদি নাও থাকে, তবুও একটা ভয়ের ভাব থাকিয়া যায়, তাহা ঐ শৈশবে ভূতের ভয়েরই আকারান্তর বা প্রকারান্তর মাত্র। মাথার উপর কেহ থাকিয়া আমাদিগকে পরিচালিত করিলে আমরা পারি না এমন কাজই নাই। নিজে পরিচালকতা করিতে, lead লইতে গেলে, আমরা এক হাত এগুই তো দশ হাত পিছাইয়া যাই। ইহার কারণ আর কিছুই নয়—শৈশবের সেই জুজুর ভয়।

এই মিথ্যা ভয় হইতে আমাদের শিশুদের আমাদের জাতিকে রক্ষা করিতে হইবে। পিতামাতার অজ্ঞতা দূর করিতে হইবে। দাসদাসীদের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন তাহারা মিথ্যা জুজুর ভয় দেখাইয়া ছেলেপুলেদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিতে না পারে। তবে আমাদের কলঙ্ক দূর হইবে। আমরা শরীর ও মনের বলে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি সমূহের সমকক্ষ হইতে পারিব। কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা পিছনে পড়িয়া থাকিব না। মনের এই গতি-প্রকৃতি ইহা চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্তর্গত হইলেও; সাধারণে ইষ্টানিষ্টের সহিত ইহার ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে। সেই জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি, দেশনেতৃগণ এ বিষয়ে অবিলম্বে লোকশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করুন।

মাছির আত্মকথা।

বড় দুঃখে, বড় কষ্টে, আজ আমার জীবনের কথা তোমাদিগকে বলিব। তোমরা বড় সাধ-আহ্লাদ করিয়াই স্বীয় জীবন-বৃত্তান্ত লিখিয়া থাক; কিন্তু আমি বড় অনুতাপেই নিজের কথা নিজে ব্যক্ত করিতেছি; এই বয়সে যে কত লোকের অনিষ্ট করিয়াছি, কত সুখের সংসারে আগুণ লাগাইয়াছি, কত সুকুমার শিশুকে মায়ের কোল হইতে ছিনাইয়া লইয়াছি, তাহা মনে করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। তোমরা না কি আমাদের স্বজাতি নানা রকম বীজাণুকে খুবই ভয় করিয়া থাক; তোমরা কামানের গোলার মুখে নিজেকে দাঁড় করাইতেও ভয় পাও না; কিন্তু আমাদের স্বজাতিদিগকে দেখিলেই ভয়ে আঁৎকে উঠে। কই, আমাদের বেলায় তো তোমাদের এরূপ ভয় পেতে দেখি না! আমরা কি তাদের চেয়ে বল আমাদের কি কোনই শক্তি নেই?

আজ বছর কয়েক হ'ল এক পায়খানায় আমার জন্ম হয়। লক্ষাধিক ভাই-ভগিনী আমার ছিল। তারা কোথায় আছে, বেঁচে আছে কি মরে গেছে, তা আমি জানি না। তবে এটা জানি যে, আমাদের মৃত্যু সহজ নয়। দৈবাৎ লোকের হাতে না মারা গেলে আমরা অনেক দিন বেঁচে থাকি।

যখন আমি নেহাৎ ছোট—দুই তিন দিনের, তখন কয়জন লোকের কাপড় ধরে আমার জন্মস্থান হতে লোকটির বাড়ী আসি। সেই হ'তে সেখানেই বাস করিতেছি। তাঁদের বাড়ীর মেয়েগুলো বড় ভাল লোক ছিলেন—রান্না কোরে খাবার দাবার ঢেকে রাখা তাঁরা মোটে পছন্দ করতেন না। আমরাও তাই অবাধে খাদ্য দ্রব্যের উপর বসে তাদের রসাস্বাদ করতে পেতাম। বাড়ীর সকলে খেতে বস্‌লে, আমরা কখনও বা তাঁদের সঙ্গে এক সঙ্গে, কখনও বা আগে বসিয়া আহার করতাম, তাতে তাঁরা মোটেই আপত্তি করতেন না। এমন ভাবেই আমাদের দিন কাটছিল। এ বাড়ীতে আমাদের বাস করার আরও অনেক সুবিধা ছিল। খুচা ভাত, তরকারী, মাছের আঁইস এঁরা যেখানে সেখানে ফেলে দিতেন। আমরা ঝাঁকে ঝাঁকে সেখানে গিয়ে বসে খেতাম। এঁরাই আবার ডাক্তারদের কাছে জিজ্ঞাসা করতেন, "মশাই, মাছি তাড়াবার কোন ওষুধ নেই?" আমি আজ নিজেই বলছি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই আমাদের তাড়াবার প্রধান ওষুধ। এ ছাড়া অন্য কোন ওষুধ নেই।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আমাদের তাড়াবার ওষুধ বলেও, আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খুব ভালবাসি। তোমরা হয় ত হেসে উঠবে; বলবে, যাদের ময়লাতে তারা আবার পরিষ্কার! আমরা স্বীকার করি আমাদের জন্ম ময়লা জায়গায়। কিন্তু যদি শরীরের কোন জায়গায় ময়লা লাগে—তবে আমরা তাহা সেই মুহূর্ত্তেই পরিষ্কার না করে জলটুকু পর্য্যন্ত গ্রহণ করি না—এমনি আমাদের স্বভাব।

ফাল্গুন মাস। আমাদের সংখ্যা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। যে বাড়ীতে আমি ছিলাম, সে বাড়ীতে আমাদের গানে গোলমালে চারিদিক নিরন্তর সরগরম হইয়া উঠিল। এমন সময়ে একদিন ঐ বাড়ীর কর্ত্তার একজন আত্মীয় আসিলেন। তাঁদের গ্রামে না কি কলেরা হইতেছিল। তিনি এখানে আসবার কিছুদিন পরে ঐ রোগেই মারা গেলেন। ডাক্তার বাবু বলিলেন, উনি রোগের বীজাণু শরীরে নিয়েই এসেছিলেন।

যাহা হোক দুই একদিন গেল,—দেখি, আমাদের আরও কয়েকজন একটা জায়গায় ভন্ ভন্ করিতেছে। আমিও উড়িয়া সেখানে গেলাম। দেখিলাম—সেই মৃত ব্যক্তির কাপড়চোপড় সেখানে পড়িয়া আছে। আমি সেখানে কিছুক্ষণ থেকে রান্না ঘরে উড়িয়া গেলাম। রান্নাঘরে এক বাটী দুধ ছিল। এ বাড়ীতে ঢাকা অবস্থায় কিছু থাকে না—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমি দুধের উপরে বসিলাম। আমার পায়ে কি যেন অপরিষ্কার জিনিষ আছে বোধ হইল। আমি তাহা সেখানে পরিষ্কার করিয়া, এক চুমুক দুধ খাইয়া,—ভাত, তরকারী ডাল যাহা সাম্‌নে পাইলাম তাহাতেই গিয়া বসিয়া, রসাস্বাদন করিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে কর্ত্তার এক বৎসরের শিশু পুত্র ঘুম হইতে উঠিয়া কান্না জুড়িয়া দিলেন। শিশুর পিসিমা তাড়াতাড়ি ঐ বাটী হইতে তাহাকে দুধ খাওয়াইতে লাগিলেন। দেখিয়া বড় কষ্ট হইল। যদি আমার ভাষা মানুষে বুঝিতে পারিত, তবে তাহাকে সাবধান করিয়া দিতাম। তিন দিন পরে বাড়ীতে কান্নার ধুম পড়িয়া গেল—শুনিলাম, ঐ শিশুটি কলেরায় মারা গেল। হা অদৃষ্ট!

এইরূপ ঐ বাড়ীতে সাতজন লোকের মধ্যে আমিই পাঁচজনকে শমনের কাছে পাঠাইয়াছি। আমরা ঐ গ্রামে সারা ফাল্গুন মাস এবাড়ী হইতে ওবাড়ী এইরূপ করিয়া রোগ ছড়াইতে লাগিলাম। শুনিলাম—১৩০ জন লোক মারা পড়িল। তার পর গভর্ণমেণ্ট হইতে নিয়ম হইল—জল সিদ্ধ করিয়া, ফিল্টার করিয়া খাইতে হইবে। সমস্ত জিনিষ ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। রোগও আস্তে আস্তে কমিয়া গেল।

বৈশাখ মাসে বসন্ত রোগ আরম্ভ হইল। আমরা রোগীর গাত্রের বিষ অপরের গায়ে ছড়াইতে লাগিলাম। ইহাতে অনেক লোক মারা গেল। নানা জনে নানাকথা বলিতে লাগিল; কিন্তু আমাদের দোষ বড় একটা কেহ দিল না। তাই বড় অনুতাপ হইল। আমি নিজের দোষ নিজেই স্বীকার করিতেছি।

এখন আমার বয়স ৭ বৎসর ৬ মাস। ঈশ্বর যদি না মারেন—তবে আরও কিছুদিন বাঁচিয়া যাইব। কিন্তু তোমাদের সাবধান করিয়া দিই, তোমরা কিছু আঢাকা অবস্থায় রাখিও না। যদি আমার কথা না শুন, তবে এরূপ অনর্থ ঘটিবেই।

তোমাদের খাদ্য দ্রব্য না খাইয়াও আমরা বাঁচিতে পারি; কিন্তু আঢাকা অবস্থায় পাইলে আমরা তাহার লোভ কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিব না। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের যতগুলি কারণ তোমরা নির্ণয় করিয়াছ, তাহার মধ্যে আমিও যে একজন, ইহা মনে রাখিও। তাহা হইলে তোমাদেরই মঙ্গল হইবে। শুধু আমাদের দোষ দিও না।

চায়ের কুল-পরিচয়।

লেখক—ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল-এম্-এস্।

সকল দেশে ও সকল কালে একটা-না-একটা মাদক দ্রব্য সেবনের রীতি দেখা যায়। সোমরস, আর্য্যগণের প্রিয় ছিল; উহাতে মাদকতা ছিল কি না বলিতে পারি না; তবে উহার যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রত্যবায় ছিল। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরা দেবতাকে উক্ত রস নিবেদন করিয়া দিয়া তবে প্রসাদ স্বরূপ তাহা পান করিতেন। যে হিসাবে খৃষ্টিয়ানেরা একখণ্ড রুটি ও মদ্যপান করেন, অনেকটা সেই হিসাবেই সোমরস পীত হইত। কিন্তু কালের মহিমায়, সাংসারিক দৈনন্দিন তথাকথিত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে—অর্থাৎ মানুষ যখন হইতে অন্তর্দৃষ্টি হারাইয়া বাহ্য জগতে গা ঢালিয়া দিতে আরম্ভ করিল, তখন হইতে মানুষ আর ধর্ম্মের অপেক্ষা না রাখিয়া ইচ্ছার দাস হইয়া যখন-তখন মাদক দ্রব্য সেবনে প্রবৃত্ত হইল—যেমন প্রবৃত্ত হয় অশিক্ষিত কোল ভীল সাঁওতালেরা, যেমন প্রবৃত্ত হয় অপর দেশের বর্ব্বর জাতিরা। ধর্ম্মের অন্তরালে, ধর্ম্মের নামে, পঞ্চমকারের দোহাই দিয়া, এদেশে এক সময়ে অর্দ্ধ-ঐশী, অর্দ্ধ-পাশবিক আচার হিসাবেও মদ্যপান প্রচলিত ছিল। ফল কথা এই যে, ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে সংযত ভাবেই হউক, অথবা যেচ্ছ অসংযত ভাবেই হউক, মাদক দ্রব্য মনুষ্য সমাজে অপরিহার্য্য সম্বল রূপে বিবেচিত হয়।

মানুষ মাদক দ্রব্য সেবনের এত পক্ষপাতী কেন? মাদক দ্রব্য সেবনে প্রথমতঃ একটা অব্যক্ত স্ফূর্ত্তির ভাব আসে। লঘুচিত্ত ব্যক্তিগণ সেই ক্ষণিক স্ফূর্ত্তির উন্মাদনার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বারংবার তাহার আরাধনা করিতে চাহে—ইহাই মাদকদ্রব্যের অনুরাগের প্রথম কারণ। যাহারা শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহারা মাদকদ্রব্য সেবনে ক্ষণ কালের জন্য শ্রান্তি দূর করিবার অবকাশ পায় বলিয়া, অবসাদ আসিলেই তাহারা মাদকদ্রব্যের শরণাপন্ন হইয়া থাকে। কেহ বা নিদ্রাসুখ ভোগ করিবার জন্য, কেহ বা শীতাতপ বোধ হ্রাস করিবার জন্য, কেহ শুধুই অনুচিকীর্ষার দাস হইয়া মাদকদ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে।

চা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কতকগুলি কথা খাটে। কথাগুলি চা-সম্বন্ধে অ-প্রযোজ্য। চা যে দেশে

(বা রাজ্যে), সে দেশ শীতল দেশ। সে দেশের লোকেরা জল অল্প ও অপরিষ্কার বিধায়ে, আমাশয়, ওলাউঠা প্রভৃতি ব্যারামের প্রকোপ যথেষ্টই হইত। শীত নিবারণের উদ্দেশ্যে এবং যথাসম্ভব উদরের পীড়ার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, সে দেশের লোকেরা সাধারণ ভাবে চা পানে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে—এবং ভালই করিয়াছে। চীনাদের নিকট হইতে ইংরাজেরা চা ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন, এবং ইংরাজেরাই আমাদের চা-পানের শিক্ষা-গুরু। ইংরাজেরা শীতদেশবাসী, তাঁহাদের পক্ষে শীতল পানীয় ব্যবহার করা অসম্ভব—কাজেই চা-পান বা মদ্যপান করা ব্যতীত তাঁহাদিগের উপায়ান্তর নাই।

কিন্তু আমরা,—উষ্ণদেশবাসী বাঙ্গালীরা কোন্ কারণে চা পান করি? আমরা চা পান করি,—কারণ, সাহেবেরা যে চা পান করেন। চা পান করিলে সাহেবীয়ানার পূরাদস্তুর মক্স করা হয়, চা পান করিলে সাহেবী সমাজে চলাফেরার সুবিধা হয়, চা পান করিলে সাহেবের মাপ্‌কাটির আমলে আসা যায়—তাই আমরা অনুকরণপ্রিয়, সাহেব-তোষামোদজীবী, স্ববৃত্তিপরায়ণ স্বজাতীয় বাঙ্গালীরা চা-পান করিতে অভ্যাস করিয়াছি। প্রথমে শুধু অনুকরণ করার হিসাবে অভ্যাসের আরম্ভ হইলেও, আজ তাহা হইতে লাভ করিতেছি। এ দেশে যে দুধ ক্রমশঃ দুর্ম্মূল্য ও দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে, দুধ-জলহীন সুলভ খাদ্যও একরকম অপ্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন অবস্থায়, দরিদ্রদিগের পক্ষে চা-পান যে কিরূপ সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক এবং সুবিধাজনক। যে দুধ, এক্‌বাটি গরম জলে উদরের জ্বালা নিবৃত্তি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরও ক্ষণেকের জন্য সবল হইয়া উঠে; অথচ যাহার ব্যয় মোটে একটি কি দুইটি পয়সা। তাই বলিতেছিলাম যে ধনীরা ও অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালী বাবুরা যে দেশেই প্রথমে চা-পান করিতে আরম্ভ করুন না কেন, বর্ত্তমান কালে গরীবেরা সস্তায় চা-পান করিয়া কালের মত ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পাইয়া ব্যয়বাহুল্যের অনাকারী খাদ্যদ্রব্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। দেশে দুধ সস্তা হইলে আজই চা-পানের বাহুল্য লোপ পায়।

চা-এর কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া আবশ্যক বিধায়ে আজ চা সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা এখানে বিবৃত করিলাম। চা একরকম গাছের পাতা। আমরা টাট্‌কা পাতা দেখিতে পাই না; ঐ পাতা তৈয়ারি চায়ের আকারে আমাদের নিকটে আসিয়া পৌঁছায়। সবুজ চা নামে আর এক রকমের চা আছে। সবুজ চাগুলি গাছের টাট্‌কা পাতাকে বারো ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া কাঠ কয়লার উত্তাপে শুকান পাতা। চায়ের পাতায় ট্যানিক অ্যাসিড নামক এক প্রকারের অতীব তীব্র কষায় পদার্থ আছে; বারো ঘণ্টাকাল পাতাগুলিকে জলে ভিজাইলে উক্ত ট্যানিক অ্যাসিডের পরিমাণের হ্রাস হয়। দ্বিতীয় প্রকার চা ইষ্টকের আকারে বিক্রীত হয় বলিয়া তাহাকে ব্রিক্‌টি বা চায়ের ইষ্টক বলা যায়। প্রকৃত পক্ষে উহা খাঁটি চা নহে; পরন্তু চায়ের "ঝাড়ানি", ধূলা, পাতা, ডাঁটা প্রভৃতির সঙ্গে কতকটা চর্ব্বি, লবণ ও ঝলসান মাংস মিশ্রিত করিয়া তাহাকে ব্রিক্‌টি বলা হয়। তুর্কীরা এই ব্রিক্‌টির বড় অনুরাগী। ঝুটা চা বা লাই-টি নামে আর এক রকমের পিষ্টক বাজারে পাওয়া যায়। চায়ের গুদাম ঝাঁট দিয়া যে চায়ের ধূলা সংগৃহীত হয়, তাহার সঙ্গে চালের গুঁড়া মিশাইয়া এক রকমের পিষ্টক প্রস্তুত করা হয়। ইহা পিষ্টকাকারে পাওয়া যায়,—ইষ্টকাকারে নহে এবং ইংরাজীতে lie শব্দের অর্থ ঝুটা বা মিথ্যা। পাক চা বা ডাইজেষ্টিভ-টি নামে যে চা পাওয়া যায়, তাহা সাধারণ চা নহে। বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার চা-পত্রের মধ্যস্থিত ট্যানিন নামক পদার্থকে ধ্বংস করিয়া যে চা পাওয়া যায়, তাহারই নাম ঐ ডাইজেষ্টিভ টি। প্রকৃত পক্ষে, চা-পত্রস্থিত ট্যানিন নামক পদার্থই পাকস্থলীর পক্ষে পরম অপকারী। সেই ট্যানিনকে নষ্ট করিয়া দিতে পারিলে চায়ের কতকটা অপকারিতা নষ্ট করা হয়। উপরি উক্ত প্রকারের চা এ দেশে বিরল। এ দেশে যত প্রকারের চা পাওয়া যায়, তাহার কথা নিম্নে বলিলাম।

আসাম ও সিংহলদেশীয় চা অপেক্ষা দার্জ্জিলিংএর চা অধিকতর সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত। চায়ের নিজস্ব মৌলিক গন্ধ ব্যতীত, টাটকা গোলাপফুলের সুগন্ধ বিশিষ্ট চাও দেখা যায়। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, চা-গাছের কচিপাতা ও ফুলের কুঁড়ি লইয়া যে চা বাজারে বিক্রীত হয়, তাহার নাম ফ্লাওয়ারি পিকো বা অরেঞ্জ পিকো। কচি অথচ বড় বড় পাতা লইয়া যে চা বাজারে বিক্রীত হয়, তাহার নাম পীকো সুচং। বাকী "খেলো" ধরণের পাতাগুলি কঙ্গু নামে বিক্রীত হয়। চায়ে গোলাপী, যুঁই প্রভৃতি গন্ধ করিতে হইলে চা-পাতার সঙ্গে ঐ সকল ফুলের পরাগ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। চায়ের ভালমন্দ সাধারণতঃ তিনটি জিনিষের উপর নির্ভর করে—যে জমিতে চায়ের চাষ হয়, তাহার দোষ গুণে চা ভাল বা মন্দ হয়; চায়ের পাতা কাঁচা বা বেশী পুরাতন হইলেও উহার গুণের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা তারতম্য বেশী হয় মিশানোর দোষে বা গুণে। অনেকে হয় ত মনে করেন যে, একই গাছের পাতা এক বাক্সে পুরিয়া বিক্রয় করা হয়। তাহা কিন্তু ঠিক নয়। পাঁচ রকম গাছের পাতা মিশাইয়া তবে তাহা কে বাক্সবন্দি করা হয়। সেই পাঁচ-মিশানোর তারতম্যে চায়ের দোষ বা গুণ দাঁড়ায়।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে চা-পানের প্রথা ভিন্ন রকমের। চীনারা সবুজ চায়ের পাতা সিদ্ধ করিয়া হাতের কাছে রাখিয়া দেয়। তাহাতে দুধ বা চিনি কিছুই দেয় না। কাজ করিতে করিতে যখন তখন এক বা দুই চুমুক ঐ সিদ্ধ জল খায়। কখনো দুই চুমুকের বেশী খায় না। সাহেবরা যখন চা পান করিতে বসেন, তখন খুব কম চা-ই খাইয়া থাকেন। তাঁহারা দুধ চিনি খুব অল্প মিশান। আমরা দুধ চিনি বেশী করিয়া মিশাইয়া চা পান করি। আজকাল বহুসংখ্যক চায়ের দোকান হইয়াছে। তাহাতে একই পাতা বারম্বার সিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং ব্যবহৃত পাতাগুলিকে দোকানের এক কোণে জমাইয়া রাখা হয়। সেই ব্যবহৃত পাতাগুলি বিক্রীত হইয়া থাকে। ঐ শেষোক্ত প্রকারের তথা-কথিত চা যাহারা পান করে, তাহারা "কষ-জল" ছাড়া আর কিছুই পায় না। ঐ পানীয় পরম অপকারী। ব্রিক-টি বলিয়া যে পদার্থ বিক্রীত হয় তুর্কীরা তাহাকে পাউরুটির মত খাইয়া থাকে। "লাই-টি"ও ঐরূপে ব্যবহৃত হয়।

চা পান করিতে হইলে টাট্‌কা ফুটান জলে চায়ের পাতাগুলিকে অর্দ্ধ বা একমিনিট কাল রাখিয়া তখনই ছাঁকিয়া ফেলিবে। সেই জলে ইচ্ছা মত দুধ, চিনি বা লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া পান করা উচিত। দিনে এক কি দুইবার, সামান্য কিছু খাদ্যসামগ্রীর সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। যখন তখন বহুবার চা পান করিলে অজীর্ণ হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য, হস্ত-কম্পন, অসংযত স্বভাব প্রভৃতি দাঁড়াইয়া যাইতে পারে। ঔষধার্থ চা পান করিলে উহার ফলে ঘর্ম্ম ও মূত্র পরিমাণে নির্গত হয়, শরীরের অবসাদ কাটিয়া এবং ক্ষণিক মনের প্রফুল্লতা আইসে।

শয্যা খুব কোমল হওয়ার অপেক্ষা একটু কম কোমল হওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিয়মিত ভাবে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে অভ্যাস করা উচিত। কোষ্ঠ সাফ না হইলে বার কতক খুব দীর্ঘনিঃশ্বাস টানিলে ভিতরে বায়ুর চাপ পাইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু কখনও কোঁৎ দিবেন না। কোঁৎ দিলে মাংস-পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইয়া কোষ্ঠ সাফ হওয়ার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মায়।

কাজ করিতে করিতে শ্রান্তিবোধ করিলে কাজ রাখিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবেন। শ্রান্ত দেহ মন কাজ করিলে কাজ ভাল হয় না। অধিকন্তু আরও শ্রান্ত ও অসুস্থ হইয়া পড়ে। শ্রান্তি একটা জানিবেন, এবং বিশ্রাম তাহার চিকিৎসা ও ঔষধ।

শয়ন কক্ষে যাহাতে রীতিমত রৌদ্র বাতাস করে, তাহার ব্যবস্থা করা অতীব আবশ্যক। অভাবে সুনিদ্রার ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, অসুস্থ হয়।

শিশুর খাদ্য।

সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান জন্মিবার পূর্ব্বেই আমাদের সমস্ত আবশ্যক পদার্থ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাদর সম্ভাষণে নবজাত শিশু আপ্যায়িত হয়। জন্মিবার পরই শিশু ক্ষুধা অনুভব করে; কিন্তু দয়ালু ভগবান কিছুই অপূর্ণ রাখেন না। তাহার জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মাতৃস্তনে পীযূষধারা সঞ্চারিত করেন। এই উহাই শিশুর জীবন ধারণের উপায়। বাস্তবিক মাতৃস্তন্য ব্যতীত শিশু আর কিছু পরিপাকও করিতে পারে না। কিন্তু আমরা নিজের বুদ্ধির প্রাখর্য্য দ্বারা এই ভগবান দত্ত আহার্য্যে অবহেলা করিয়া নানা প্রকার কৃত্রিম খাদ্যের ব্যবস্থা করি। তাহার বিষময় ফলে হতভাগ্য শিশু স্বীয় ভবিষ্যৎ জীবনে ভোগ করিয়া থাকে।

শিশুর জীবনের ভবিষ্যৎ সুখ ও স্বাস্থ্য শৈশবের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিলে, এবং নির্ম্মল বায়ু সেবন ও স্বাস্থ্যপূর্ণ স্থানে বাস করিলে, শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে নীরোগ ও সবল হইয়া সুখে জীবন যাপন করে। আর যদি এই সকল অবস্থা প্রতিকূল হয়, তবে তাহার দুঃখের অবধি থাকে না। মানসিক বৃত্তির স্ফুরণও স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। দুর্ব্বল শরীরে—উর্ব্বর মস্তিষ্ক কখনও কার্য্যকরী হয় না।

শিশুর আহার, নিদ্রা, শিশুর জন্য স্বাস্থ্যকর স্থান নির্ব্বাচন প্রভৃতি মাতা ও আত্মীয় স্বজনের উপর নির্ভর করে। সুতরাং শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ ও শান্তি প্রায় সম্পূর্ণরূপে ইহাদের হস্তে ন্যস্ত হয়। শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে উন্নতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে তাহার আহারের উপরই সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্টি পতিত হয়। বাস্তবিক শিশুর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট খাদ্য কি?

শিশুর খাদ্য নির্ব্বাচন বাস্তবিকই জটিল বিষয়। আমরা যদি ভগবান-দত্ত খাদ্যের উপর নির্ভর করি, তবে এই জটিল প্রশ্নের সহজেই মীমাংসা হয়। কিন্তু সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের-বিধি ব্যবস্থার উপর আমরা আর আস্থা রাখি না। প্রকৃতির ব্যবস্থার পদে পদে আমরা বিদ্রোহী হই। দুঃখ ও দৈন্য তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল। প্রায় সমস্ত চিকিৎসক এই বিষয়ে একমত যে, মাতৃস্তন্যই শিশুর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও প্রশস্ত খাদ্য। এই খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইলেই তাহার অকাল-মৃত্যু বা অকাল-বার্দ্ধক্য অবশ্যম্ভাবী। শিশুকালে যাহারা মাতৃ দুগ্ধ পান করিতে সমর্থ হয়, তাহারা দরিদ্রতা ও নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও সুস্থ ও সবল দেহে সুখ ও শান্তি ভোগ করিতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিশু-মৃত্যুর হ্রাস ও আধিক্যের ইহাই একটি কারণ। সহর অপেক্ষা গ্রামে শিশু মৃত্যুর পরিমাণ কম হওয়ার একটি প্রধান কারণ এই যে, গ্রামে এখনও অনেক শিশু মাতৃ দুগ্ধ পান করিয়া বর্দ্ধিত হয়।

এদেশে চিরকালই শিশুকে স্তন্য পান করাইতে জননী গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। বরং তাহাদিগকে ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা অনেক সময় কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সহরে ক্রমশঃ কৃত্রিম দুগ্ধের প্রচলন বৃদ্ধি পাইতেছে। ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জননী দাইয়ের উপর শিশুর পরিচর্য্যার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আবার গ্রামেও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে অনেক মাতার স্তনে দুগ্ধ থাকে না। তাঁহারাও বাজারের টিনের কৃত্রিম দুগ্ধ শিশুদিগের আহারের জন্য ব্যবস্থা করেন। পাশ্চাত্য দেশের অনেক মহিলা সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবার ভয়ে শিশুগণকে স্তন্য প্রদান করেন না। এদেশেও কোনও কোনও স্থলে এই বিষময় রীতির প্রচলন দেখা যাইতেছে। ইংলণ্ডে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস

করিবার জন্য অনেক সামাজিক নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; তাহাতে দুই, তিন, চার ও পাঁচ বৎসরের শিশুর মৃত্যু সংখ্যা কিছু হ্রাস হইলেও এক বৎসর বয়সে শিশু মৃত্যুর কোনও হ্রাস দেখা যায় না। আজকাল স্ত্রীলোকগণের মধ্যে শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ দানে ঔদাসীন্যের বিষয়ে ডাক্তার হেরল্ড স্কারফিল্ড (Dr Harold Scarfield) লিখিয়াছেন—

"First of all, we have to consider the dictates of fashion. The 'woman who coulndt' has perhaps in the past been considered rather a superior sort of person, too intellectual for such an animal task. There has been much ignorance of the importance of breast feeding no doubt encouraged by the half-hearted attitude of the medical profession on the subject. The ignorance of fathers in this respect is an important factor. One hears of fathers who do not like their wives to be tied, and wish them to go away for a holiday as usual and leave the baby to the nurse and the bottle. Fathers as well as mothers need be educated. The ordinary woman probably thinks it must be a great nuisance to have to feed her baby every few hours, and does not appreciate the fact that to the normal healthy mother giving the baby the breast is an actual physical pleasure. There has been shirking by women who did not wish to give up their usual pursuits or to spoil their figures. The refusal to breast-feed and the refusal to lead the regular kind of life which makes breast-feeding possible are, of course, the same thing."

অর্থাৎ "মাতার অক্ষমতাই শিশুর মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত হওয়ার প্রধান কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই অক্ষমতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ইহা উচ্চ সভ্যতার ফল। বাস্তবিকই ইহা সহজে বিশ্বাস হয় না যে, আধুনিক কালের মহিলাগণ দৈহিক উন্নতির বিষয়ে সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়াও তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী স্ত্রীলোক অপেক্ষা এই বিষয়ে অক্ষম হইতে পারে। আবার এই বিষয়ে সভ্যতার অর্থ কি? মাতার কর্ত্তব্য পালন করিয়াও কি স্ত্রীলোকগণ নিজের বুদ্ধি বৃত্তি পরিচালনা করিতে পারেন না? এই বিষয়ে অক্ষমতা বা অনিচ্ছার মধ্যে কোনটি প্রধান কারণ তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। এই বিষয়ে ফ্যাসানের অনুবর্ত্তী হইয়া লোক কতটা কার্য্য করে তাহাও বিবেচন করা উচিত। অনেকে স্তনদুগ্ধের উপকারিতা ও গুরুত্ব বুঝিতে পারেন না। চিকিৎসকগণও এই অজ্ঞতার উৎসাহ দাতা ছিলেন। পিতার অজ্ঞতাও ইহার একটি কারণ। ইহা শুনা যায় যে অনেক সময় পিতা ইচ্ছা করেন যে, মাতা সন্তানের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন; তাঁহারা সন্তানকে দুধের বোতল ও দাইয়ের নিকট রাখিয়া আমোদ প্রমোদে বাহির হইয়া যান। সাধারণ স্ত্রীলোক বোধ হয় মনে করেন যে কয়েক ঘণ্টা অন্তর শিশুকে স্তন্য পান করান একটা বিশ্রী কার্য্য। তাঁহারা বুঝেন না যে সুস্থ মাতার শিশুকে স্তন্য দানে বাস্তবিক আনন্দ অনুভূত হয়। কোনও কোনও স্ত্রীলোক শরীরের সৌন্দর্য্য নষ্ট হওয়ার ভয়ে শিশুকে স্তন্য পান করাইতে রাজী নহেন।"

বাস্তবিকই ইহাপেক্ষা বর্ত্তমান সভ্যতার কলঙ্ক কিছু হইতে পারে না। ফ্যাসানের জন্য মাতৃত্বের গৌরব বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। আমরা আজকাল স্ত্রীলোকের অর্দ্ধাংশ মাত্র বিবাহ করি। অপরার্দ্ধ ঔষধের দোকানে দুধ খাওয়ার বোতল (Feeding bottle) রূপে রাখিতে হয়।

অনেক সময়ে চিকিৎসকগণ অবস্থা, গুণ ও পরিজ্ঞাত না হইয়া, শিশুগণের জন্য কৃত্রিম দুগ্ধের ব্যবস্থা করেন। পরিতাপের বিষয় এই যে, চিকিৎসকগণ কিরূপে মাতৃদুগ্ধ বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহার কোনও রূপ ব্যবস্থা করেন না। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা

বিশেষ প্রকার খাদ্য ও ঔষধের ব্যবস্থায় স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

দেখা যাউক আমরা মাতৃদুগ্ধের পরিবর্ত্তে কি-কি ব্যবহার করিয়া থাকি। মাতৃদুগ্ধের পরিবর্ত্তে গরু বা ছাগলের দুগ্ধ অথবা বাজারের টিনের জমাট দুগ্ধ ব্যবহৃত হয়। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে এই সকল দুগ্ধের প্রভেদ অনুমিত হইবে।

	মাতৃদুগ্ধ শতকরা	গো দুগ্ধ শতকরা	ছাগ দুগ্ধ শতকরা	জমাট দুগ্ধ শতকরা
চর্ব্বি	৩·৫৪	৪·০	৪·৫	১·১
চিনি	৬·৭	৪·৫	৪·০	৫·২
আমিষ জাতীয় পদার্থ (Protein)	১·৫২০	৩·৫	৪·৫	·৮৭
লবণ	২·১০	·৭৫	·৬	·১৫
জল	৮৬·০৮৮	৮৭·০	৮৬·৪	৯২·১৬

অতএব দেখা যাইতেছে যে যে সকল দুগ্ধ ব্যবহৃত হয়, তাহা সর্ব্ব বিষয়ে মাতৃদুগ্ধের সদৃশ নহে।

কোনও দুগ্ধই পরিবর্ত্তিত না করিয়া মাতৃদুগ্ধের ন্যায় ব্যবহৃত হইতে পারে না। অন্য দুগ্ধকে মাতৃদুগ্ধের ন্যায় গুণবিশিষ্ট করিতে অনেক প্রণালী নির্ণীত হইয়াছে। কাহারও মতে গোদুগ্ধের সহিত জল মিশাইয়া পরে কিছু সর ও চিনি মিশাইলে উহা মাতৃদুগ্ধের ন্যায় গুণবিশিষ্ট হইবে।

বাজারের কৃত্রিম জমাট দুধ শিশুর পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। ইহাতে চিনির মাত্রা অধিক। কিন্তু আমিষ জাতীয় উপাদান ও চর্ব্বির পরিমাণ কম। ইহাতে ভাইটামাইনও (Vitamine) কম আছে। জমাট দুধ খাইলে শিশু দেখতে নাদুস্ নুদুস্ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে জীবনী শক্তি অনেক কমিয়া যায়। ফলে শিশু ডাইরিয়া (Diarrhœa) ও রিকেট (Ricket) রোগে* সহজে আক্রান্ত হয়।

প্রায় সমস্ত চিকিৎসক জমাট দুগ্ধের বিরোধী। ডাক্তার লুই ষ্টার (Dr. Louis Star) বলেন—

"Infants fed upon condensed milk (meaning the sweetened variety) though fat are pale, lethargic and flabby and though large are far from strong, have little power to resist disease, cut their teeth late and are very liable to drift into rickets before the end of the first year.

অর্থাৎ যে সকল শিশু মিষ্ট জমাট দুগ্ধ পান করে তাহারা স্থূল-দেহ হইলেও, বাস্তবিক পক্ষে অলস ও ম্লান হয়। তাহাদের শরীর আকারে বড় হইলেও তাহারা দৃঢ়কায় হয় না। তাহাদের রোগ প্রতিষেধের ক্ষমতা হ্রাস পায়। তাহাদের দাঁত গোনে উঠে। এক বৎসর বয়স না হইতেই তাহাদের রিকেট রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

বোতলে করিয়া শিশুদিগকে দুধ খাওয়াইবার প্রথা এদেশে ক্রমশঃ প্রচার লাভ করিতেছে। ইহার ফলও শিশুগণের পক্ষে অনিষ্টজনক। তাহাতে শিশুর বদহজম হয়। এবং শিশু-বয়সের এই বদহজম প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সেও থাকিয়া যায়। যে সকল শিশু বোতলে করিয়া দুধ খায়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ডাইরিয়া (Diarrhœa) রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শিশুগণের জীবনী শক্তি হ্রাস পায়। ইহা ব্যতীত তাহাদের ক্ষয় প্রভৃতি নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

* রিকেট রোগকে আমাদের দেশে পেঁচো পাওয়া বলে। প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে এই পীড়া হইয়া থাকে। এই রোগে এক বৎসরের শিশু ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় কখন বা স্বয়ং বসিয়া থাকে।

মাতৃদুগ্ধই শিশুর পক্ষে প্রকৃত উপকারী। ভগবান শিশুর জীবনের উপযোগী করিয়াই মাতৃ স্তনে পীযূষ-ধারা সঞ্চিত রাখিয়া দেন। সেই অমৃতধারাতেই আমাদের জীবন বিকাশের সমস্ত উপাদান থাকে। অতএব স্তনদুগ্ধ থাকা সত্ত্বেও যে সকল জননী সন্তানকে মাতৃ দুগ্ধ হইতে বঞ্চিত করেন, তাঁহারা শিশুগণের ভবিষ্য জীবনের অশুভের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। যাঁহারা বিলাসিতা বা অঙ্গ সৌষ্ঠবের জন্য পবিত্র মাতৃত্বের গৌরব নষ্ট করেন তাঁহাদের কথা কি বলিব!! শিশুর ভাবী শুভাশুভ জনক জননীর উপর নির্ভর করে। অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলে নিজের দোষ ক্ষালন করা যায় না।

পল্লীস্বাস্থ্য

বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলে জলের সংস্থানের জন্য যে সামান্য ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে মধ্যে মধ্যে এক আধটা পুষ্করিণী খনিত বা পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হইয়া থাকে; যেমন "হিন্দুরঞ্জিকা" সংবাদ দিতেছেন—

গোদাগাড়ী থানায় এলাকায় কমলাপুরের হাটে একটী পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিবার জন্য ডিষ্টিক্ট্ বোর্ড ১৬৬৫ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

জল-সংস্থানের পর ডাক্তারখানা। সহযোগিনী "হিন্দু রঞ্জিকা" আমাদের তাহাতেও বঞ্চিত করেন নাই—

অনারেবল শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন চৌধুরী এম এ, বি-এল মহোদয় তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান তানোর থানায় এলাকায় মাদরিপুরে একটী সরকারি ডাক্তারখানা স্থাপন করিতেছেন। তজ্জন্য সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে। রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড বাৎসরিক ৬০০৲ টাকা সাহায্য করিবেন।

"হিন্দুরঞ্জিকা" এবার সুসংবাদের পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছেন—

ইনফ্লুয়েঞ্জা।

গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ অক্টেবর মাস হইতে অত্র পাঁচুপুর পুলিশ ষ্টেশনের এলাকাধীন পল্লীসমূহে ভীষণ ইনফ্লুয়েঞ্জা আরম্ভ হওয়ায় শত শত নিরন্ন নরনারী উক্ত রোগে আক্রান্ত হইলে এতদঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দের প্রার্থনায় নওগাঁ মহকুমার হাকিম ও লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের চেষ্টায় শ্রীযুক্ত নলিনীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য নামক একজন সাহসী কর্ম্মঠ সুযোগ্য ডাক্তার পাঁচুপুর আইসেন। তাঁহার চেষ্টায় এবং যত্নে শত শত ইনফ্লুয়েঞ্জা সহ নিমোনিয়া আক্রান্ত রোগীগণ উক্ত রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে, এমন কি অনেক সময় দরিদ্র রোগীদিগকে নিজ খরচে বার্লি ও মিছিরী আদি পথ্য দিয়া চিকিৎসা করিয়াছেন। গত পৌষ মাসে শীতকালে অত্র পুলিশ ষ্টেসনের নিকট জয়তারা গ্রামে একজন কৃষক বন্য শূকর কর্ত্তৃক সাংঘাতিক রূপে আহত হয়, ডাক্তার বাবু দুপুর রাত্রে এই সংবাদ পাওয়া মাত্র কোন রূপ আপত্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রায় তিন মাইল পথ পদব্রজে রোগীর বাড়ীতে গিয়া প্রাণপণে ১৫।১৬ দিন চেষ্টা ও যত্ন করিয়া রোগীটিকে সুস্থ করিয়াছেন। বসন্ত, কলেরা ইত্যাদি রোগীর নিকট যাইতে বা ক্ষত রোগাদি ধৌত করা, ব্যাণ্ডেজ করা ইত্যাদি কার্য্যে কোনরূপ আপত্তি নাই। কিন্তু অধিবাসীবৃন্দের কর্ম্মফলে বা সরকারী কার্য্যের অনুরোধে উক্ত ডাক্তার বাবুকে গত রামনবমীর সময় মান্দার মেলায় বদলি করিয়াছেন। অবগত হইলাম মান্দারে তিনি যশের সহিত কার্য্য করিতেছেন। আশা করি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সহৃদয় চেয়ারমান মহোদয় উক্ত ডাক্তার বাবুর প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন মজুমদার নামক জনৈক ডাক্তার এখানে আসিয়াছেন। ভগবৎ কৃপায় তিনিও ঐরূপ সরল ব্যবহারে নলিনী বাবুর ন্যায় সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিবেন আশা করি। দুঃখের বিষয় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে কোন বিশেষ ঔষধ তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই।

কাটোয়ার সহযোগী "প্রসূন" সেখানকার দাতব্য ঔষধালয়ের সম্বন্ধে গুরু অভিযোগ করিয়াছেন; ইহার প্রতিকার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কাটোয়া দাতব্য ঔষধালয় ও হাঁসপাতাল।

কাটোয়ায় বর্ত্তমানে যে গৃহে স্থানীয় দাতব্য ঔষধালয় ও হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা জরাজীর্ণ হইয়াছে। ইহার

গাত্রটী সঙ্কীর্ণ, অস্ত্র করিবার কোন স্বতন্ত্র গৃহ নাই। ৪টীর অধিক রোগী এক সময়ে রাখিবার স্থান সঙ্কুলান হয় না! স্ত্রীলোক রোগীদের থাকিবার কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নাই। ঔষধালয় ও হাঁসপাতাল গৃহটী 'মান্ধাতার আমলে' নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদিন মেরামত করিয়া কোন প্রকারে কার্য্য চলিয়া আসিতেছিল। দুই তিনটী রেলওয়ে লাইনের সংযোগ স্থল হওয়ায় কাটোয়ার গুরুত্ব এক্ষণে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। গত বৎসর আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় বিভাগীয় কমিশনর শ্রীযুক্ত জে, এন, গুপ্ত মহোদয় স্থানীয় দাতব্য ঔষধালয় ও হাঁসপাতালটী পরিদর্শন করিয়া বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং যাহাতে একটী এই সহরের উপযোগী নূতন ধরণের ঔষধালয় ও হাঁসপাতাল গৃহ নির্ম্মিত হয়, তজ্জন্য স্থানীয় ভদ্রলোকগণকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা এই উদ্দেশ্যে অর্থ সাহায্য করিলে, তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে সাহায্য দেওয়া হয় সে পক্ষে যত্নবান হইবেন এ কথাও বলিয়া গিয়াছেন।

আমাদের সুযোগ্য সবডিভিজনাল অফিসার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র উপাধ্যায় মহাশয় নূতন দাতব্য ঔষধালয় ও হাঁসপাতাল গৃহ নির্ম্মাণ উপলক্ষে চাঁদা সংগ্রহ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন এবং এ বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। কাটোয়ার এজন্য একটী কমিটীও গঠিত হইয়াছে। আমাদের মহকুমার শিক্ষিত ও ধর্ম্মপরায়ণ মহানুভব ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে যেন মুক্তহস্তে সাহায্য করেন ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

আলোচনা।

আসামে কালা-আজর।—

আসামে আবার কালা-আজর নামক জ্বর-রোগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। একজন চা-কর ষ্টেটসম্যানে পত্র লিখিয়া অভিযোগ করিতেছেন যে, শত শত আসামী গ্রামবাসী কালা-আজরে মরিতেছে; অথচ গবর্ণমেণ্ট প্রতিকারের কোন উপায় না করিয়া কেবল সময় নষ্ট করিতেছেন। এই পত্রলখক কয়েক মাস পূর্ব্বে খবর দিয়াছিলেন যে, একখানি গ্রামে এই রোগ দেখা দিয়াছে; কিন্তু কেহই তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। ফলে, গ্রামের ১৬টি পরিবারের ১২ জন লোক মারা পড়িয়াছে, এবং গ্রামের সকল লোক জ্বরাক্রান্ত হইয়াছে। যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা যায়; আপেল ফল উৎপাদনে, কিম্বা 'ট্রাউটে'র বংশ বৃদ্ধি করিতে অর্থাভাব হয় না; কিন্তু কালা-আজর রোগ দমনের জন্য জনকতক ক্যাম্বেল-পাস ডাক্তার (সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন) নিযুক্ত করিতে কয়েক সহস্র মাত্র টাকা জুটে না। বাস্তবিক, প্ল্যাণ্টার মহাশয়ের অভিযোগ অন্যায় নহে। কিন্তু কেই বা সে কথা শুনে। ম্যালেরিয়ায়, বসন্তে, কলেরায়, প্লেগে, ইনফ্লুয়েঞ্জায় বাঙ্গালা দেশ ত উজাড় হইতে বসিয়াছে। কিছু অর্থব্যয় করিয়া উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে সকল স্থলে সমস্ত রোগ না কমুক, কোন কোন স্থলে কতক পরিমাণে ত কমিতে পারে। কিন্তু তাহা হইতেছে কই? আন্দোলন, আলোচনা, জল্পনা, কল্পনা প্রভৃতি যাহাতে কোন খরচ নাই, তাহার কোন ত্রুটি দেখা যায় না। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল কিছু করিতে হইলেই মুস্কিল। কারণ, তাহাতে টাকার দরকার; এবং এই জিনিষটারই একান্ত অভাব। কিন্তু আর কতকাল এই অর্থাভাবের ওজর শুনিতে হইবে? এদিকে দেশ যে যায়! যতদিনে অর্থের অবস্থা স্বচ্ছল হইবে, ততদিনে যদি দেশ লোকশূন্য হইয়া যায়, তখন অর্থেরই বা কি সার্থকতা থাকিবে?

রথে কলেরা।—

এবার পুরীতে রথযাত্রার উৎসব নিরাপদে কাটিল না। ট্রেণের অভাবে তবু এবার পুরীতে রথযাত্রীর তেমন ভিড় হয় নাই; তথাপি সেখানে কলেরা হইল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটী লোকের বসন্তও হইয়াছিল। কোন কোন সংবাদপত্রে যেন পড়িতেছিলাম যে, পুরীর

রথযাত্রীদের মধ্যে কলেরা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের আত্মীয়স্বজন রুগ্ন লোকদিগকে ট্রেনে তুলিয়া লইয়া নিজ নিজ গ্রামে চলিয়া গিয়াছিল। কেবল খড়্গপুরে কতক রোগীকে নামাইয়া লইয়া হাসপাতালে রাখা হইয়াছিল। বোধ হইতেছে, পুরীতে কলেরা রোগীদিগকে segregate কিম্বা আটক করিবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না; নচেৎ, লোকে কলেরা রোগীকে ট্রেনে তুলিবার সুযোগ পাইল পাইল কিরূপে? আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি, কলেরা নিবার্য্য ব্যাধি; সাবধান হইলে ইহ বিস্তৃত হইতে পারে না; এমন কি, সুব্যবস্থা হইলে কলেরা রোগের আদৌ প্রাদুর্ভাব হইতেই পারে না। এই ত পূর্ব্বাহ্নে সাবধান হওয়ায় গঙ্গাসাগর তীর্থ যাত্রার ব্যাপার নিরাপদে কাটিয়া গেল। তবে পুরীতে এমন দুর্ঘটনা ঘটিল কেন?

অন্ধের দৃষ্টিলাভ।—

বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টায় অন্ধ ব্যক্তিগণের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতায় একটী অন্ধ বিদ্যালয়ও আছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বেশ পড়িতে শিখিতেছে। তাহাদের পাঠ্য পুস্তক চক্ষুষ্মান লোকদের পাঠ্য পুস্তক হইতে বিভিন্ন। সম্প্রতি একখানি ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বার্ (Dr. Barr) Ophtohone (অপ্‌টোফোঁ) নামক একপ্রকার যন্ত্র তৈয়ার করিয়াছেন, যদ্দ্বারা অন্ধ ব্যক্তিরা সাধারণ পুস্তকাদিও পড়িতে পারিবে। দুইটী অন্ধ বালিকা না কি এই যন্ত্রের সাহায্যে মিনিটে ২৫টি করিয়া শব্দ পড়িতে পারিতেছে। যন্ত্রটির কৌশল এই যে, ইহার দ্বারা সঙ্গীতের সুরের উচ্চ ও নিম্ন গ্রামের মত, শব্দের মূলীভূত বিভিন্ন অক্ষরের অনুযায়ী আলো ও ছায়ার বিভিন্নতা দ্বারা অক্ষর সম্বন্ধে অন্ধের চক্ষুতে যে বিভিন্ন প্রকারের অনুভূতির সৃষ্টি হয়, তাহার দ্বারা পাঠ কার্য্য সহজ হইয়া আসে। অর্থাৎ, 'ক' অক্ষরটি হইতে যেরূপ ছায়া উৎপন্ন হয়, 'খ' হইতে উৎপন্ন ছায়া তাহা হইতে বিভিন্ন; এই বিভিন্নতার সাহায্যে 'ক' ও 'খ' অক্ষরের সম্বন্ধে অনুভূতির বিভিন্নতা সাধিত হয়। এইরূপে প্রত্যেক অক্ষরের সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলে, তাহাদের সমবায়ে উৎপন্ন শব্দটির সম্বন্ধেও জ্ঞান জন্মে। এই জন্য অন্ধদের পড়িতে কিছু বিলম্ব হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে অন্ধ ব্যক্তিরা যদি লেখা পড়া শিখিতে পারে, তবে তাহাদের শিক্ষা কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবে।

আদিগঙ্গার জল দূষণ।—

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে এদেশের যেন মা-বাপ নাই! যাহার যাহা খুসী, সে তাহাই করিয়া দেশের স্বাস্থ্যহীনতা ঘটাইতেছে—কেহ নিষেধ করিবার নাই। স্বাস্থ্যরক্ষার সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও উদাসীনতা প্রধানতঃ এরূপ অবস্থার কারণ। পল্লীগ্রামে একে জলাভাব, তাহার উপর, যেখানে যেটুকু জল আছে, পাট পচাইয়া, গবাদি পশুকে স্নান করাইয়া, এবং মানুষে নিজেরা স্নান করিয়া, পুষ্করিণীতে মূত্র ত্যাগ করিয়া এবং পুষ্করিণীর তীরে মল ত্যাগ করিয়া, বাসন মাজিয়া ও মাজা বাসন ধুইয়া, পুকুরের জলে উচ্ছিষ্ট ও আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিয়া, বর্ষাকালে গ্রামস্থ ধোয়া জল পুকুরে আসিয়া পড়িবার জন্য পয়ঃ প্রণালী নির্ম্মাণ করিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগীদের বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া এবং তাহাদের দেহ-নিঃসৃত রোগবীজাণুপূর্ণ দূষিত পদার্থ পুকুরে বা পুকুর পাড়ে নিক্ষেপ করিয়া জল দূষিত করা হয়। ভাগীরথীর তীরে বহু কল-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে; এই সকল কলের লক্ষ লক্ষ মজুরের মলমূত্র সেপ্টিক ট্যাঙ্কের সাহায্যে তরলীকৃত হইয়া ভাগীরথীতে নিক্ষিপ্ত হয়। এখন আবার আদিগঙ্গায় নূতন এক উপসর্গ উপস্থিত। আদিগঙ্গার তীরে অনেক চাউল-ইটের কল বসিয়াছে। সেই সকল কলের যাবতীয় আবর্জ্জনা আদিগঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হওয়ায়, আদিগঙ্গার তীরবর্ত্তী অধিবাসীগণের সমূহ কষ্টের কারণ ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ, এই আদিগঙ্গা হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থ। এই

তীর্থের জল দূষিত ও অপবিত্র করায়, কেবল স্বাস্থ্যহানি নহে, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর মর্ম্মস্থানেও আঘাত লাগিতেছে। আমরা আশা করি, কর্ত্তৃপক্ষ অচিরে ইহার প্রতিকার করিয়া সাধারণের অভিযোগের কারণ দূর করিতে যত্নবান হইবেন।

জাতিসঙ্ঘের সদনুষ্ঠান।—

যুদ্ধের পরে ইয়োরোপে যে লীগ অব নেশন্স বা জাতিসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা আর কোন কাজ যদি নাও হয়, তথাপি, সম্প্রতি জাতিসঙ্ঘ যে সদনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে সফলতা লাভ করিতে পারিলেও, জাতিসঙ্ঘ গঠন সার্থক হইবে। পোল্যাণ্ড ও তাহার চতুর্দ্দিকের দেশগুলিতে টাইফাস রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক। যুদ্ধ বন্ধ হওয়ায় এখন সকল দেশের লোক সর্ব্বত্র যাতায়াতের সুযোগ পাইয়াছে। সুতরাং টাইফাস রোগ ঐ সকল দেশ হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবারও সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। এই রোগের বিস্তৃতি নিবারণ ও তাহার দমনের জন্য জাতিসঙ্ঘ তদন্তর্ভুক্ত গবর্ণমেণ্টসমূহের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। আশা করি, আত্মরক্ষার খাতিরে এবং লোকরক্ষার্থ গবর্ণমেণ্টসমূহ লীগের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রথম দফায় ৫০০০০ পাউণ্ড এই সর্ত্তে লীগের হাতে অর্পণ করিয়াছেন যে, আর প্রধান চারিটি রাজ্যও এই পরিমাণ টাকা প্রদান করিবেন। যুদ্ধে বহু লোকক্ষয় হইয়াছে; পৃথিবীর লোক সংখ্যা যুদ্ধের ৫ বৎসরে বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। তাহার উপর রোগে শোকে আর লোকক্ষয় হওয়া অসহ্য। সুতরাং লীগ অব নেশন্স খুব ভাল কাজেই হাত দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এত লোকক্ষয়ের পরও পৃথিবীর লোকের রক্ত-পিপাসা এখনও মিটিল না। রুষিয়ার বোলশেভিকরা আপনা আপনির মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিতেছে। আলবানিয়া, মনাটোলিয়া, এসিয়া মাইনর, ককেসাস, উত্তর পারস্য, সাইবীরিয়া, দার্দানেলিস, মেক্সিকো প্রভৃতি স্থলে এখনও অল্পবিস্তর যুদ্ধ ও লোকধ্বংস কার্য্য চলিতেছে। এমন কি, যে পোল্যাণ্ডবাসীকে টাইফাসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য লীগ অব নেশন্স ২০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সেই পোলজাতিও বোলশেভিকদের সঙ্গে লড়ায়ে মাতিয়া রহিয়াছে। মানব-চরিত্র কি দুর্জ্ঞেয়! মানব-প্রকৃতিতে কি ঘোর অসামঞ্জস্য! আচ্ছা, পৃথিবী হইতে যুদ্ধ বিগ্রহাদি তুলিয়া দিয়া পূর্ণ শান্তি স্থাপন জাতিসঙ্ঘ গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া শুনিতে পাই। তা, জাতিসঙ্ঘ রোগ নিবারণের যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা করুন—সে বেশ ভাল কথা। অমনি সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ করিয়া পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করিয়া লীগ কি তাঁহাদের অন্যতম মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিবারও চেষ্টা করিতে পারেন না? কিন্তু গতিক দেখিয়া বোধ হয়, লীগের এই উদ্দেশ্যটি কোনকালেই সফল হইবে না,—পৃথিবী হইতে যুদ্ধবিগ্রহ কোন কালেই উঠিয়া যাইবে না।

নূতন বিপদ।—

অধ্যাপক লেফ্রয় (Prof. Lefroy) আবার একটা নূতন বিপদের সূচনায় আভাষ দিয়াছেন। পানামা খাল যখন খোলা হয়, তখন ঐ প্রদেশের পীতজ্বর জাহাজে চড়িয়া দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িবে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন। সে আশঙ্কাও নিতান্ত অমূলক ছিল না। কিন্তু পানামা প্রদেশের স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে যথেষ্ট যত্ন লওয়ায় সে আশঙ্কা এখন অনেকটা তিরোহিত হইয়াছে—পানামা প্রদেশ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হইয়াছে। অধ্যাপক লেফ্রয় বলিতেছেন, বিমানের সাহায্যে একস্থানের রোগ অন্যস্থানে সংক্রামিত হইবার খুব সুবিধা হইয়াছে। এরোপ্লেন যখন ভূমি হইতে আকাশে উড়িতে আরম্ভ করে, তখন রোগবীজাণুবাহী কীটপতঙ্গাদি তদ্দ্বারা আকর্ষিত হইয়া তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করে; এবং এরোপ্লেনখানি যখন স্থানান্তরে গিয়া অবতরণ করে,

তখন ঐ সকল কীটপতঙ্গাদি পুনরায় ভূমিতে নামিয়া যায় এবং চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং এতদ্দ্বারা এক এক দেশের বিশেষ বিশেষ প্রকারের রোগ, যাহা এখন সেই সেই দেশেই সীমাবদ্ধ, তাহারা ক্রমে দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িতে পারে বটে। অতএব দেখা যাইতেছে, অধ্যাপক লেফ্রয়ের আশঙ্কা অযৌক্তিক নহে। অধ্যাপক লেফ্রয় কৃষিতত্ত্ববিদ পণ্ডিত। তিনি শস্য ও উদ্ভিদাদির রোগের কথারই প্রধানতঃ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু নরদেহাশ্রয়ী রোগের সম্বন্ধেও এ কথা খুবই খাটে। অতএব এরোপ্লেন চালাইবার সময়ে এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

"অলিম্পিক গেম্‌স"।—

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, ভারতবর্ষ হইতে এবার ছয়জন ভারতবাসী সুপ্রসিদ্ধ সুপ্রাচীন "অলিম্পিক গেম্‌স" নামক ক্রীড়া কৌতুকে যোগ দিতে যাইতেছেন এই বীরত্বব্যঞ্জক খেলায় সমস্ত পৃথিবী হইতে বীরগণ প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া থাকেন। যে ছয়জন ভারতবাসী যাইতেছেন, তাঁহারা কোন্ প্রদেশের লোক তাহা জানিতে পারিলাম না। তবে তাঁহাদের খুব বিবেচনা সহকারে নির্ব্বাচন করা হইয়াছে বলিয়া শুনিতেছি। এই "অলিম্পিক গেম্‌স"এর বন্দোবস্ত করিবার জন্য একটী অলিম্পিক এসোসিয়েসন আছে। বোম্বাযে তাহার একটী শাখা আছে। এই শাখা সমিতি ভারতীয় মল্লগণকে ইয়োরোপে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহাতে ব্যয় পড়িবে ৩৬০০০ টাকা। তন্মধ্যে ১৮০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন ৬০০০ টাকা। আর ভারত গবর্ণমেণ্ট মল্লগণের জাহাজে যাত্রারও সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। এই অলিম্পিক গেম্‌সের রঙ্গস্থল বেলজিয়ম। সমিতির কার্য্যালয়ও সেখানে। নবনগরের মহারাজা ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই সমিতির কাউন্সিলে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন। আমরা আশা করি, ভারতীয় মল্লগণ পৃথিবীর ক্রীড়া ক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিচয় দিয়া জয়মাল্য অর্জ্জন করিতে পারিবেন।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ও যক্ষ্মা।—

কলিকাতা কর্পোরেশনের জেনারেল কমিটির একটা অধিবেশনে,—কলিকাতা সহরে কলেরা, বসন্ত, প্লেগ এবং ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগ সংক্রান্ত হেলথ অফিসার মহাশয়ের সাপ্তাহিক রিপোর্ট মঞ্জুরীর জন্য উপস্থাপিত হইলে, দেখা যায় যে, কলিকাতার অনেকগুলি ওয়ার্ডে যক্ষ্মা রোগের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে, হেলথ অফিসার মহাশয় কৈফিয়ৎ দেন যে, সহরে যখন সর্ব্বপ্রথম ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগ প্রবেশ করে, তখনই তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার পরই প্রায়ই যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া থাকে। এই যক্ষ্মা রোগের সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য একটী সম্পূর্ণ 'স্কীম' (কার্য্য-প্রণালী) নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু ডাক্তার ল্যাঙ্কেষ্টারের পুস্তকখানির প্রকাশ আসন্ন বলিয়া, যক্ষ্মা রোগের সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য প্রস্তুত স্কীমটির কার্য্য স্থগিত আছে। তার পরই হেলথ অফিসার মহাশয় বলিতেছেন, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার আগমনের পূর্ব্বে, কোন বিশেষ ব্যবস্থা না করা সত্ত্বেও, বৎসর কয়েকের মধ্যে যক্ষ্মা রোগের পরিমাণ শতকরা ৩০ হিসাবে কমিয়া আসিয়াছিল। কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রায় প্রত্যেক হেলথ অফিসারই সুযোগ পাইলেই বলিয়া থাকেন, অবরোধ প্রথাই যক্ষ্মা এবং অন্যান্য কয়েকটি রোগের প্রধান কারণ। এখানে যখন বিশেষ ভাবে যক্ষ্মা রোগের কথা হইতেছে, তখন আমরা কেবল যক্ষ্মা রোগের কথাই কহিব; অন্যান্য রোগের কথা এক্ষেত্রে উত্থাপন করিব না। হিন্দু মুসলমানের অবরোধ প্রথাই যদি যক্ষ্মার প্রধান কারণ হয়, তাহা হইলে, এই যে মিউনিসিপ্যালিটীর বিনা চেষ্টাতেই যক্ষ্মা রোগ শতকরা ৩০ হিসাবে কমিয়া গেল,—ইহা কিরূপে ঘটিল? হিন্দু মুসলমানের পুরমহিলারা কি এখন অবরোধ প্রথা বর্জ্জন করিয়াছেন, পর্দ্দা তুলিয়া দিয়া ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় রাস্তায় হাওয়া খাইয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন? সকল কথার মধ্যে আমরা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইতেছি না; সেইজন্য এই প্রশ্ন করিতেছি।

লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক

জন্ম-মৃত্যু ত নিত্য-ঘটনা। তবু বাল গঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুতে এরূপ একটা অভূতপূর্ব্ব শোকোচ্ছ্বাসের অর্থ কি? তিলকের চরিত্র চিন্তা করিয়া যদি আমরা এটুকু বুঝিতে পারি, তবেই জানিব তিলককে চিনিয়াছি; এই অভাবনীয় ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য্যে উপনীত হইতে পারিয়াছি। এখন অবশ্য অনেক স্থানে প্রধান লোকের মৃত্যুতে এক একটি করিয়া শোক সভার অনুষ্ঠান হয়; তাহাতে মৃত ব্যক্তির বন্ধু বান্ধব ও গুণগ্রাহিগণ যোগ দিয়া থাকেন। কিন্তু তিলকের মৃত্যু উপলক্ষে এই যে সমগ্র ভারতে আজ স্পন্দন—ইহা কি এই শ্রেণীর একটি ঘটনা? আমাদের জনৈক বোম্বাইবাসী বন্ধু লিখিয়াছেন যে, চৌপাঠির বালুকাময় সৈকতে যে তিলকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখে নাই, তাহার জীবনে একটা বড় গুরুতর রকমের অভাব রহিয়া গেল। অর্থাৎ ইহার পূর্ব্বে, একজন ভারত-সন্তানের জন্য সমগ্র ভারতবাসী এরূপ ভাবে বিয়োগ-বিধুরতা প্রকাশ করিবে, তাহা বুঝিতে পারা যায় নাই।

তিলকের দুইটি পুত্র ও তিনটি কন্যা বর্ত্তমান। সহধর্ম্মিণী ত পূর্ব্বেই গত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জন্যও শোক প্রকাশ ব্যাপার কেবল থাপার্দ্দে বা পুনাতে নিবদ্ধ নহে, কেলকার বা পারঞ্জপেতে নিবদ্ধ নহে, মহারাষ্ট্রে বা গুজরাতে নিবদ্ধ নহে; এমন কি মাত্র বোম্বাই প্রদেশেও নিবদ্ধ নহে; সমগ্র ভারতের কোনও ভৌগোলিক সীমা দ্বারা উহা আবদ্ধ নহে। এই ঘটনার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা স্বতঃপ্রণোদিত। কাহাকেও বলিতে হয় নাই, কাহাকেও বুঝাইতে হয় নাই। একটি অঙ্গুলিতে কণ্টকবিদ্ধ হইলে যেমন সমস্ত শরীর স্বতঃই বেদনা অনুভব করে, এই তিলক বিয়োগ ভারতে সেইরূপ একটি ব্যাপার। অর্থাৎ যে জাতীর জীবন-আদর্শ স্বপ্ন এবং কল্পনায় অধিষ্ঠিত ছিল, তিলকের সাধনায় এবং তিলকের দেহান্তে তাহা বাস্তবে পরিণত হইল! তিনি মূর্ত্ত জাতীয়তা রূপে রত্নগিরিতে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রধানতঃ পুণায় লীলা করিয়াছেন। জীর্ণবাসের মত দেহটি খসিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহা ভারতের গগনে পবনে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। মৃগ যেমন স্বীয় নাভি হইতে সুগন্ধ বিস্তৃত হইতেছে ইহা বুঝিতে পারে না, কোন্ দিক হইতে সেই গন্ধ আসিতেছে তাহার সন্ধানে ব্যাপৃত হয়, আমরাও এতদিন জানিতে পারি নাই যে, ঐ তিলক-নাভি হইতে সত্য সরল সম্পূর্ণ জাতীয়তার প্রভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইতেছে। এতদিনে বুঝা গেল, কেন তাঁহাকে পরীক্ষার উপর পরীক্ষা দিতে হইয়াছে। তুমি আমি ত কোনও কার্য্যের জন্য একবার বিপন্ন হইলে সাবধান হইয়া পড়ি। কিন্তু এত বড় সূক্ষ্মবুদ্ধি সম্পন্ন মারাঠী, যাঁহাকে লোকে কুচক্রী, ষড়যন্ত্রকারী, অভিসন্ধি-পরায়ণ বলিয়া নিন্দা করিয়াছে,—তিনি একবার নয়, দুইবার নয়, এমন কি বৃদ্ধ বয়সে তিনবারের বার ছয় বৎসরের জন্য ভীষণ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন; কিন্তু তথাপি সাবধান হইতে পারিলেন না, পরিণামদর্শী হইতে পারিলেন না। স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের প্রতি স্বাভাবিক পক্ষপাত পরিহার করিতে পারিলেন না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বুদ্ধির পরিপক্কতার সঙ্গে সঙ্গে, এই স্বদেশ-প্রীতির প্রভাব তাঁহার জীবনে উত্তরোত্তর বাড়িয়াই উঠিল। আমরা স্বভাব-কবির কথা শুনিয়াছি; কিন্তু এইরূপ স্বভাব-স্বদেশ-প্রেমিক জগতের ইতিহাসে বড়ই বিরল। বুদ্ধদেব যেমন রাজসিংহাসন পায়ে ঠেলিয়া পৃথিবীর আপামর-সাধারণের ত্রিতাপজ্বালা হরণ করিবার জন্য বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, এই মহারাষ্ট্রের জ্ঞানবীরও তদ্রূপ হস্তামলকবৎ পার্থিব উন্নতি উপেক্ষা করিয়া জীবনের পূর্ব্বাহ্ন হইতে দেশ-

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক।

দিবসতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। লোকে অবসর কালে, খোস মেজাজে, সকল স্বার্থ বজায় রাখিয়া অথবা স্বার্থেরই পোষক রূপে দেশের বা দেশের সেবা করেন। কিন্তু এই মহাপুরুষ জীবনে অন্য দেবতা স্বীকার করেন নাই। পতিত দেশের উদ্ধার ভিন্ন অন্য আদর্শ তাঁহাকে ক্ষণমাত্র প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। স্বাতন্ত্র্য যেন ইহার রক্তের সহিত মিশ্রিত ছিল। এই যা জাতীয় শিক্ষার কথা শুনিতেছ, তিলক আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, এই জাতীয় শিক্ষাকেই আমি আবার প্রথম পাত্রী-রূপে স্থির করি। যদি ফার্গুসন কলেজ তাহার স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রাখিতে পারিত তাহা হইলে হয় তো আমার জীবনের ধারা অন্যরূপ হইয়া যাইত। রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভই ঘটিত না। বাস্তবিকই জাতি জাতি বলিয়া এমন পাগল আর কাহাকেও দেখা যায় নাই। কিসে জাতীয়তা গড়িয়া তুলিবেন, কিসে তাহার পরিপুষ্টি ঘটিবে, কিসে তাহা অবশ্যম্ভাবী পরিণামে লইয়া যাইতে পারিবেন, ইহাই তাঁহার চিন্তা, জপ ও ধ্যানের বিষয় ছিল।

তিলক একটি সত্য স্বাভাবিক জীব ছিলেন। যেমন মুসলমান যুগে শিবাজী কর্ত্তৃক ভারতের রাজ-নৈতিক সম্ভাবনীয়তা প্রতিপন্ন হইয়াছিল, সেইরূপ এই যুগে তিলক কর্ত্তৃক সেই সম্ভাবনীয়তা পুনঃ প্রমাণিত হইয়া গেল। বর্ক আর ঝক, মার আর ধর, দেশকে বড় করিবই—আবালবৃদ্ধবণিতার কর্ণে স্বীয় জীবনে আচরিত ধর্ম্মের এই মন্ত্র প্রদান করিয়া মহাপুরুষ মানবলীলা সংবরণ করিলেন। এইটাই তিলক উৎসবের তাৎপর্য্য।*

* স্বাস্থ্যসমাচার পত্রিকায় আমরা সাধারণতঃ স্বাস্থ্য-বিষয়ক প্রবন্ধই প্রকাশিত করিয়া থাকি। কিন্তু লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে দেশ হইতে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কক্ষচ্যুত হইল। সমস্ত দেশই শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। আমরা এই মহাপুরুষের কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে আস্থাবান ছিলাম। তাঁহার তিরোধানে আমরা একটা বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছি। তাই তিলকের পরলোকগত পবিত্র আত্মাকে স্মরণ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ উৎসর্গীকৃত হইল। স্বাস্থ্যসমাচারের প্রত্যক্ষভাবে কোনও রাজনৈতিক সম্বন্ধ নাই।——স্বাস্থ্যসমাচার সম্পাদক।

DOUBLE COLOUR PAGE

BLANK PAGE(S)

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৯ম বর্ষ | ভাদ্র, ১৩২৭ সাল | ৫ম সংখ্যা

হিন্দু ডুবিল!

বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা ভীষণ ভাবে হ্রাস পাইতেছে।

লেখক—ডাক্তার শ্রীকামখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কতিপয় বৎসর গত হইল লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল ডাক্তার ইউ, এন্, মুখার্জ্জি এম-ডি, আই-এম-এস মহাশয় "ধ্বংসোন্মুখ জাতি" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেনঃ—

"১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে সর্ব্ব প্রথমে লোকসংখ্যা গৃহীত হয়। সেই জন-গণনায় দেখা যায়, বঙ্গের অধিবাসীর মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা এক কোটী একাত্তর লক্ষের অধিক ছিল। এবং মুসলমানের সংখ্যা এক কোটী সাতষট্টি লক্ষ ছিল। তাহা হইলেই মুসলমানের অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা চারি লক্ষ অধিক ছিল। ইহার পরে ১৮৮১ সালে পুনরায় আদমসুমারী গৃহীত হয়। তাহাতে প্রকাশ পায়, মুসলমানের সংখ্যা ১ কোটী ৭৯ লক্ষ হইতে ১ কোটী ৭৯ লক্ষে এবং হিন্দুর সংখ্যা ১ কোটী ৭১ লক্ষ হইতে এক কোটী সাড়ে বাহাত্তর লক্ষে পরিণত হইয়াছে। ইহা হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান

হইবে, ১৮৭২ সালের লোক গণনায় মুসলমান অধিবাসী অপেক্ষা হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা যে ৪ লক্ষ অধিক ছিল, সেই আধিক্য বিলুপ্ত হইয়া বরং সাড়ে ছয় লক্ষ ন্যূন হইল। অর্থাৎ এই দশ বৎসরে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে হিন্দুর সংখ্যা মোট দেড় লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

"তাহার পর, ১৮৯১ সালে তৃতীয় বার লোক গণনা হয়। এবারে দেখা যায়, মুসলমানের সংখ্যা ১ কোটী ৭৯ লক্ষ হইতে ১ কোটী ৯৬ লক্ষ হইয়াছে; এবং হিন্দুর সংখ্যা ১ কোটী ৭২॥ লক্ষ হইতে ১ কোটী ৮০ লক্ষ হইয়াছে। তাহা হইলেই হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ১৬ লক্ষ অধিক হইল।

"১৯০১ সালে চতুর্থ আদমসুমারী হইয়াছিল। এবারের লোক-গণনায় প্রকাশ পায়, মুসলমানের সংখ্যা ১ কোটী ৯৬ লক্ষ হইতে ২ কোটী ২০ লক্ষে এবং হিন্দুর সংখ্যা ১ কোটী ৮০ লক্ষ হইতে ১ কোটী

৯৪ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং ৩০ বৎসরে মুসলমানরা—যাহারা প্রথমে হিন্দুর অপেক্ষা চারি লক্ষ কম ছিল—পঁচিশ লক্ষ বেশী হইল। এই ৩০ বৎসরে মুসলমানেরা শতকরা ৩৩ জনের এবং হিন্দুরা শতকরা ১৭ জনের হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে, যেখানে ২ জন মুসলমান বাড়িয়াছে, সেখানে একজন হিন্দু বাড়িয়াছে। ১৮৯১ সালে সি, জে, ওডেনাল সাহেব বঙ্গের আদমসুমারীর কমিশনর ছিলেন। মুসলমানের বৃদ্ধি ও হিন্দুর হ্রাস যে ভাবে হইতেছে, তাহা দেখিয়া হিন্দুর অস্তিত্ব কত বৎসরে বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা, তাহা পর্য্যন্ত তিনি গণনা করিয়াছিলেন।

"সংসারে দেখা যায়, নানারূপে নানাদেশের অধিবাসী একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরাও (হিন্দুরা) সেই বিলোপের পথে ধাবমান হইতেছি। আমরাও মুমূর্ষু জাতির মধ্যে পরিগণিত হইতেছি। প্রত্যেক সেনসাসে ইহা সপ্রমাণ হইতেছে। অনুপাত অনুসারে আমরা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, কেন এমন হইতেছে? একই স্থানে, একই অবস্থায় কালযাপন করিয়া এই দুই জাতির এরূপ হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিতেছে কেন?"

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাচীন উকিল সুবিজ্ঞ ৺ কিশোরী লাল সরকার এম্-এ, বি-এল মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে (A Dying race. How Dying?) লিখিয়াছেন যে, ১৮৭২ সালের সেনসাস রিপোর্টে ভ্রম প্রমাদ ছিল। তাই তিনি ১৮৮১ সালের সেনসাস্ রিপোর্ট হইতে হিসাব উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত তালিকা এই ঃ—

সাল	হিন্দু	মুসলমান	মুসলমান অধিক
১৮৮১	১৮০৬৯৩৫২	১৮৩৯৬১১৭	৩২৬৭৬৫
১৮৯১	১৮৯৭৫৯৭৮	২০১৭৪৫৯৩	১১৯৮৬১৫
১৯০১	২০১৯১০৮২	২১৯৫৪৯৭৭	১৭৬৩৮৯৫

হিন্দুর এরূপ ভীষণ ভাবে সংখ্যা হ্রাসের কারণ সম্বন্ধে উক্ত সরকার মহোদয় কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। সরকার মহোদয়ের মতে, ম্যালেরিয়া ও দরিদ্রতা এই দুইটী হিন্দুজাতির ধ্বংসের সর্ব্বপ্রধান কারণ।

স্বদেশপ্রাণ, সুপণ্ডিত ৺ সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় উক্ত কর্ণেল মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থের প্রতিবাদ করিয়া "হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ?" নামক একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন। উক্ত দেউস্কর মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন, বাঙ্গালী জাতির বংশ-বৃদ্ধির পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন—"হিন্দু-প্রধান পশ্চিম বঙ্গে ভীষণ মহামারীর প্রকোপে (বর্দ্ধমানের ম্যালেরিয়া) প্রায় বিংশতি লক্ষ লোক না মরিলে এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়ায় হিন্দু মুমূর্ষদশায় কালযাপন করিতে বাধ্য না হইলে, হিন্দুর সংখ্যা এইরূপে হ্রাস পাইত না। বংশ-বৃদ্ধি বিষয়ে মুসলমানের পশ্চাতে কখনও পড়িয়া যাইত না। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মুসলমানদিগের এইরূপ সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছে।"

উক্ত দেউস্কর মহাশয়ও কর্ণেল মুখোপাধ্যায়ের যুক্তিগুলির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

উক্ত লেখকগণের গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পরে বিগত ১৯১১ সালের আদমসুমারী রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। ঐ সনের সেনসাসের গণনায় দৃষ্ট হয় যে, হিন্দু ২০৩৬৩৪৯৬ জন ও মুসলমান ২৩৯৮৪৬২১ জনে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ৩৬।০ লক্ষ বেশী। ১৮৭২ সালে সমগ্র বঙ্গে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা ৪ লক্ষ অধিক ছিল। ৩৯ বৎসর পরে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান ৪০ লক্ষ অধিক হইয়াছে। প্রতি বৎসর হিন্দু সংখ্যা এক লক্ষ হিসাবে হ্রাস পাইয়াছে !!

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যার কিরূপ ভীষণ ভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাও দেখুনঃ—

পূর্ব্ববঙ্গ—

সন	হিন্দু	মুসলমান
১৮৮১	৫৬,৭৩৭১৫	৮৫,৪১৪০৬
১৮৯১	৫১,৫৬৯৮৪	৯৯,৪৫৭৮১
১৯০১	৫৫,১৪০২৫	১১২,২০৪২৭
১৯১১	৫০,২৮৪৮২	১২০,৯৬৮৮৮

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে ও মুসলমানের সংখ্যা ক্রমেই অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন যে, "একই স্থানে একই অবস্থায় কাল যাপন করিয়া এই দুইটী জাতির এইরূপ হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিল কেন?" প্রশ্নটি অতীব গুরুতর ও সাময়িক সন্দেহ নাই। আমরা বঙ্গের নানা স্থানের ও পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ স্থানের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া যাহা অবগত হইয়াছি, আজ পাঠকবর্গের সমীপে তাহাই নিবেদন করিব।

১। হিন্দু রাজত্বের সময়ে হিন্দুরাই কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। মুসলমান রাজত্বের সময়ে হিন্দুরা কৃষি কার্য্যের ভার অনেকটা মুসলমানদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির দিকেই প্রাণপণে যত্ন চেষ্টা করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে এদেশের প্রায় সমস্ত শিল্প বাণিজ্য বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং হিন্দু শিল্পীদের নিদারুণ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। এক কথায়, বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুর জীবন ধারণের প্রায় সমস্ত পথগুলিই বিনষ্ট করা হইয়াছে, বা বিলুপ্ত ও রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আর মুসলমানেরা কৃষি কার্য্য দ্বারা যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন।

২। পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ এই——পূর্ব্ববঙ্গ নদীমাতৃকা প্রদেশ, জমি খুব উর্ব্বরা, যথা সময়ে বৃষ্টি পাত হয়, সামান্য যত্ন চেষ্টাতেই যথেষ্ট শস্য উৎপন্ন হয়, দুর্ভিক্ষ দেখা যায় না। পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানরা পাট ও ধান বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ পাইতেছেন। এতদ্ভিন্ন ম্যালেরিয়া খুব কম, পশ্চিম বঙ্গের ন্যায় ভীষণ ম্যালেরিয়া নাই বলিলেই হয়। মোটের উপরে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানই স্বাস্থ্যকর। এই সকল নানা কারণে পূর্ব্ব বঙ্গের মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা ও স্বাস্থ্য অনেকটা উন্নত রহিয়াছে।

৩। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা তাঁহাদের সমস্ত জমাজমি ছাপূর্ব্বক কৃষকদের হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছেন; বর্ত্তমান উচ্চ ও শিক্ষিত শ্রেণীর হিন্দুদের প্রায় কাহারও নিজ খামার নাই। তাঁহারা কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করা গৌরবজনক কার্য্য মনে করেন না। বলা বাহুল্য, হিন্দুদের অবনতির ইহাই একটী সর্ব্ব প্রধান কারণ।

৪। বর্ত্তমান সময়ে মুসলমানরাই সমস্ত আহার্য্য দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজের ক্ষেত্রের উৎপন্ন বিশুদ্ধ খাদ্য দ্রব্য আহার করেন, আর হিন্দুরা বাজারের পর্ব্বত প্রমাণ ভেজাল খাদ্য আহার করিতে বাধ্য হন। আজকাল হিন্দুরা প্রায় গো পালন করেন না, মুসলমানরাই গো পালন করিয়া থাকেন। মুসলমান শিশুরা বিশুদ্ধ গো দুগ্ধ পান করে ও হিন্দু শিশুরা বাজারের দূষিত ও বীজাণুপূর্ণ দুগ্ধ পান করিয়া থাকে। মুসলমান শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতির ইহাই সর্ব্ব প্রধান কারণ।

৫। হিন্দুদের সর্ব্বপ্রধান খাদ্য ছিল বিশুদ্ধ ঘৃত ও দুগ্ধ। আজ কাল এই দুইটী খাদ্য দ্রব্যেই ভীষণ ভেজাল দৃষ্ট হয়। সুতরাং হিন্দুদের গুরুতর স্বাস্থ্য-হানি ঘটিতেছে। মুসলমানদের সর্ব্ব প্রধান খাদ্য মৎস্য ও মাংস। পল্লীগ্রামের মুসলমানগণ প্রায় সকলেই নিজেরা মৎস্য ধৃত করিয়া আহার করেন, মাংসও তাঁহারা ভক্ষণ করিয়া থাকেন; আর হিন্দুরা বাজারের পচা বা বাসী মৎস্য ভক্ষণ করেন। তাহাও উপযুক্ত পরিমাণে কেহই আহার করিতে পান না। কারণ, মৎস্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। মুসলমানরা তাঁহাদের ক্ষেত্রের মোটা চাউল আহার করেন। এই চাউলে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর পদার্থ (ভাইটামাইন) থাকে। আর হিন্দুরা বাজারের সরু সাদা ও মাজা (বালাম ইত্যাদি) চাউল আহার করেন। এই চাউলে ভাইটা-মাইন থাকে না। মুসলমানরা নিজেদের ক্ষেত্রের উৎপন্ন বিশুদ্ধ ও টাটকা দাইল তরকারী ফল শাকশব্জী আহার করেন। ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন সরিষা কলুর বাড়ীতে পাঠাইয়া বিশুদ্ধ সরিষার তৈল সংগ্রহ করিয়া আহার করেন। আর হিন্দুরা বাজারের নানা ভেজাল ও বাসী দাইল, তরকারী শাক শব্জী আহার করেন ও বাজারের

অতি ভীষণ ভেজাল সরিষার তৈল আহার করিয়া নানা উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইতেছেন।

৬। কৃষিকার্য্য দ্বারা মুসলমান নরনারী, বালক বালিকারা সকলেই শারীরিক পরিশ্রম করিয়া থাকেন। ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য উন্নত থাকে, আর উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু নরনারী, বালকবালিকারা কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রম করেন না। এই শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়ামের অভাববশতঃই উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে।

৭। হিন্দুরা তাঁহাদের পৈত্রিক বাড়ীতে বাস করেন। আজকাল কোন হিন্দুই ধর্ম্মোদ্দেশ্যে পুকুর কাটাইয়া ভগবানের নামে উৎসর্গ করেন না। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুদের পিতৃপিতামহ ঠাকুরদের উৎসর্গী পুকুর-গুলি পুনঃসংস্কার অভাবে দূষিত জলে ও জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। অংশীদারেরা কেহ পানা, জঙ্গল ইত্যাদিও পরিষ্কার করেন না। বাড়ীর চারিদিক বড় বড় গাছ-গাছড়ায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ফলতঃ, বিশুদ্ধ জল বায়ু ও আলোর অভাবে হিন্দুদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। আর মুসলমানরা পরিষ্কার মাঠ বা বড় বড় নদীর ধারে অথবা চরভূমিতে নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। নদীর জল অনেকেই পান করেন। সুতরাং বিশুদ্ধ জল বায়ু আলোর প্রভাবে মুসলমানদের স্বাস্থ্য যথেষ্ট উন্নত থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের চরভূমি অতীব স্বাস্থ্যকর। এই চরভূমিতে অগণ্য মুসলমান বাস করেন। মুসলমানদের স্বাস্থ্য উন্নত থাকাই বংশ-বৃদ্ধির সর্ব্বপ্রধান কারণ। চরভূমির মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন অতি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে।

৮। অতএব যে যে কারণে বংশ বৃদ্ধি হয় বা স্বাস্থ্য উন্নত থাকে, সে সকল কারণ মুসলমানদের মধ্যেই সমধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়; যথা, আর্থিক সচ্ছলতা, পুষ্টিকর ও বিশুদ্ধ খাদ্য দ্রব্য আহার, শারীরিক পরিশ্রম, শান্ত ও সরল ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ ইত্যাদি। হিন্দুদের মধ্যে উপরি উক্ত একটী কারণও দৃষ্ট হয় না; সেই জন্য হিন্দুর বংশ লোপ পাইতে বসিয়াছে।

৯। পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুপ্রধান স্থান। সেই পশ্চিমবঙ্গে অতি ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রতি বৎসর অসংখ্য হিন্দু ম্যালেরিয়ায় অকালে প্রাণ ত্যাগ করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এই ভীষণ ম্যালেরিয়া বিষের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ হিন্দু নরনারী, বালকবালিকা জীর্ণ, শীর্ণ, রক্তহীন ও জড় হইয়া পড়িতেছেন। এইরূপ জড় লোকের দ্বারা কখনও বংশ বৃদ্ধি হইতে পারে না।

১০। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর পেষণ-যন্ত্রে হিন্দু যুবক যুবতী, বালকবালিকা নিষ্পেষিত ও স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছেন। মুসলমানদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যা যুবকগণের ঐ কারণে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে।

১১। ডাক্তারি তেজস্কর ঔষধ, কৃত্রিম ফুড্ (শিশু খাদ্য) বহুল রূপে ব্যবহার করিয়া হিন্দুগণের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। পল্লীগ্রামের মুসলমানরা ডাক্তারি ঔষধ অল্পই ব্যবহার করেন ও ডাক্তারি কৃত্রিম ফুড্ তাঁহারা কেহই শিশুদিগকে প্রদান করেন না। বলা বাহুল্য, এইকারণেও হিন্দুদের স্বাস্থ্যহানি ও শিশুদের অকালমৃত্যু দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

১২। মুসলমানরা তাঁহাদের জাতীয় ধর্ম্ম, রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার ও পরিচ্ছদ ইত্যাদির কোনই পরিবর্ত্তন বা পরিত্যাগ করেন নাই। হিন্দুরা তাঁহাদের জাতীয় ধর্ম্ম, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ প্রায় সমস্তই পরিবর্ত্তন বা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার ফলেও হিন্দুদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে।

কর্ণেল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বহু ব্যক্তিই বলেন যে হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রথা নাই এবং সময়ে সময়ে হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে; ইহার ফলে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে, বা বৃদ্ধি পাইতেছে না। আমরা এই দুইটী কারণকে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাসের কারণ বলিয়া মনে করি না। আমরা বারান্তরে এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিব।

ধ্বংসোন্মুখ জাতির স্বাস্থ্য-কথা

এ সম্বন্ধে প্রবাসী (ফাল্গুন, ১৩২৬) লিখিয়াছেন—

"বাঙ্গলার স্বাস্থ্য-বিভাগের ১৯১৮ সালের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সমগ্র বঙ্গদেশের জন্ম-সংখ্যা ছিল ১৬,২৭৮৭৩। সুতরাং আলোচ্য বর্ষে জন্ম-সংখ্যা ১৩৮৭৩৮ হ্রাস পাইয়াছে। ১৯১৮ সালের মৃত্যু-সংখ্যা ১৭,২৭৩৩১ ও ১৯১৭ সালের মৃত্যু-সংখ্যা ছিল ১১,৮৭৫০৯; সুতরাং আলোচ্য বর্ষে মৃত্যু-সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৫৩৯৮২২ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ১৯১৮ সালে ৫৭৫১৩৮ জন লোক মারা গিয়াছে। কলেরায় ৩৭৩১৮ জন মারা গিয়াছে। ১৯১৮ সনে শিশু মৃত্যুর হার সর্ব্বত্রই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোন কোন জিলাতে প্রতি সহস্রে শিশুর মৃত্যুর হার নয় শতের অধিক উঠিয়াছে। ফলতঃ, বাঙ্গলা দেশে যত শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সূতিকাগারেই মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়। ১৫ বৎসরের হইতেই স্ত্রীলোকের মৃত্যু-সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। এই ও যুবতী নারীর মৃত্যুসংখ্যা এইরূপে যদি ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিতে থাকে, তবে বঙ্গদেশ কতদিনে শ্মশানে পরিণত হইতে পারে, তাহা কেবল গণনা-সাপেক্ষ মাত্র।"

"স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারী ডাক্তার বেণ্টলী উক্ত বিবরণ সঙ্কলন কালে সুস্পষ্ট কথায় বলিয়াছেন, অন্ন খাদ্য এবং অপ্রচুর বস্ত্রাদির ব্যবহারের ফলেই লোকের জীবনী-শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে; এই জন্যই জ্বর ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় এত অধিক লোক প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। অত্যধিক মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে ডাক্তার বেণ্টলী যে কয়েকটী কারণের উল্লেখ করিয়াছেন, দারিদ্র্য ও অর্থাভাবই তাহাদের প্রধান। ডাক্তার বেণ্টলীর মতে কলিকাতা অপেক্ষা মফঃস্বলের সহরে অধিক লোক মরে। পল্লীগ্রামে পানায় জলের অভাবেই সকলের এত লোক মরে।"

বিগত ২৭শে মার্চ্চ (১৯২০) কলিকাতা টাউন হলে স্বাস্থ্য এবং শিশু মঙ্গল জন্য যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে মাননীয় বঙ্গেশ্বর মহোদয় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম 'সঞ্জীবনী' (১৯শে চৈত্র, ১৩২৬) হইতে উদ্ধৃত করা হইল।

"গত বৎসর সর্ব্বকারণে মোট ১৬,৪৫১১১ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। ইহাদের অনেকেই নিবার্য্য ব্যাধিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। গত বৎসর বঙ্গদেশে জ্বর, নিউমোনিয়া যক্ষ্মা প্রভৃতি নিবার্য্য রোগে প্রায় ১২ লক্ষ মারা গিয়াছে। গত বৎসর প্রায় সাড়ে ষোল লক্ষ লোকের মধ্যে ১০ বৎসরের নিম্ন বয়স্কের সংখ্যা ৬,২৬৭৫৫ জন। ইহাদের মধ্যে ১ বৎসরের নিম্ন বয়স্কের সংখ্যা ২৭০৩৭০। অর্থাৎ গত বৎসর বঙ্গদেশে যত শিশু জন্মিয়াছে, তাহাদের মধ্যে হাজার করা ২২৬ জন ১২ মাস পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

"কলিকাতা সহরে প্রত্যহ ১৬ জন শিশু প্রাণ ত্যাগ করে। কলিকাতায় শিশু-মৃত্যু কি ভীষণ, উহা অন্য স্থানের তুলনায় সুস্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। নিউজিলণ্ড হইতে কলিকাতার শিশু মৃত্যু ৭ গুণ অধিক।"

সঞ্জীবনী লিখিয়াছেন—"১৯১৮ সালে বঙ্গদেশে এক বৎসরের নিম্ন বয়স্ক ৩৩০০০এর অধিক শিশু প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে; অর্থাৎ বঙ্গদেশে গড়পড়তায় প্রত্যহ ১০০০ এক হাজার শিশুর মৃত্যু হয়।"

	জন্ম	মৃত্যু	উদ্বৃত্ত
জাপানে	৩২·৮	২০·৮	১২
ভারতে	৩৮·৫	৩৪·২	৪·৩
বঙ্গে	৩১·৬	৩২·৮	নাই

বঙ্গদেশে ক্ষয় হয়, হাজার করা ১০২ জন।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামরতন চট্টোপাধ্যায় বি, এল মহাশয় ভারতবর্ষে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫) লিখিয়াছেন:—

"বাঙ্গলাদেশে জন্মের অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক এবং এদেশের মৃত্যুর হার যত ভীষণ, পৃথিবীর আর কোন দেশে এইরূপ আছে কিনা সন্দেহ। বাঙ্গলা দেশে মৃত্যুর হার দেখিলেই মনে হয় যে, কেবল মরিবার জন্যই আমাদের জন্ম। বঙ্গদেশের এখন কি অবস্থা তাহা হৃদয়ে অনুভব করিতে হইলে, সেন্সাস বিবরণী ফেলিয়া রাখিয়া বাঙ্গলার পল্লীগ্রামে যাইতে

হয়। সেখানে গেলে বিচার বিতর্ক আর মনে আসে না, বাঙ্গলার যে কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, তাহা আর বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। কোথায় গেল পল্লী-রাণীর সে সৌন্দর্য্য, সে উচ্চ হাস্য, সেই ক্রিয়া কলরোল, সে আত্মীয়স্বজন ভরা প্রফুল্ল সংসার! কোথায় গেল সে জীবন্ত জীবন, কোথায় গেল সে আনন্দ উৎসব, কোথায় গেল সে পূজা পার্ব্বণ! পল্লীগ্রাম—যাহা একদিন উৎসবের আনন্দ-ভবন ছিল—যেখানে কুলবধূ সুস্থ সুন্দর দেহে, সবল শিশু ক্রোড়ে লইয়া "আয় চাঁদ আয়" বলিয়া মধুর শব্দে আকাশের দেবতাকে মুগ্ধ করিত। নারীগণের ব্রতে, দেবার্চ্চনায়, গুরুজনের সেবায়, দেব ভাব জাগরিত হইত; যুবক প্রৌঢ় জনের কীর্ত্তনে, তর্জ্জায়, যাত্রায়, পাঁচালিতে স্বতঃস্ফূর্ত্তি মুখরিত হইয়া হইয়া উঠিত—সেই পল্লীগ্রাম আজ নিরাশার ছায়ায় অন্ধকার। সেখানে আজ লোক সংখ্যা বিরল। যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহারা কঙ্কালসার, ম্রিয়মান, আনন্দের স্ফূর্ত্তি চিহ্ন নাই—শ্মশানের পূর্ব্বাভাষ মাত্র।

"ভাই সব! কাহাকে মাণিক দিবে বলিয়া সাগর ছেঁচিতেছ! কাহার জন্য জয়মাল্য গাঁথিতেছ? তোমার বংশধরগণ যে মৃত্যুশয্যায় শয়ান, তাহা কি একবারও চাহিয়া দেখ না? যদি তোমার বংশধরগণ বাঁচিয়া থাকে, তবেই ত এত যত্ন, এত পরিশ্রম, এত সাধনা সার্থক হইবে! নচেৎ সমস্তই বৃথা। তাই বলিতেছি, যাহাতে প্রাণটা বাঁচে তৎপ্রতি সকলের মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।"

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাধারমণ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাশয় বঙ্গদর্শনে (১৩১৭, শ্রাবণ) লিখিয়াছেন:—

"হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু আদর্শের সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আদর্শের সংস্রবে হিন্দুসমাজে যে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই হিন্দুজাতির ক্ষয়ের মূল কারণ। সুপ্রসিদ্ধ ডারউইন্ সাহেব তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—"যখন দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির অতিদূরবর্ত্তী দুইটী জাতি পরস্পরের নিতান্ত সন্নিহিত হয়, তখন কি এক অজ্ঞাত কারণে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জাতির মধ্যে নূতন পীড়ার আবির্ভাব হয়। ডারউইন সাহেব ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আহার ও জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ প্রণালী, আচার ব্যবহার ও চাল চলনের পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন পথ অবলম্বন করিলে অনেক সময়ে অনেক জাতির বিশেষতঃ ঐ জাতীয় শিশুগণের স্বাস্থ্য ভঙ্গ ঘটিয়া থাকে।"

রাধারমণ বাবু আরও বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালী হিন্দুর হৃদয় পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়াছে এবং যে বঙ্গদেশ অশেষ শিল্প পণ্যের উৎপত্তি স্থান ছিল, সেই বঙ্গদেশের অধিবাসীরা কতকটা দায়ে পড়িয়া কতকটা সাধ করিয়া 'প্রদীপটি জ্বালিতে খেতে শুতে যেতে' একেবারেই পরমুখপ্রেক্ষী হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুরা পুরাতন আদর্শের সহিত নূতন পাশ্চাত্য আদর্শের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে না পারায়, হিন্দু সমাজে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম বিষয়ে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। এই বিপ্লবে হিন্দুর মন কিরূপ ভীত, চকিত, বিচলিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছে তাহার বর্ণনায় রাধারমণ বাবু স্বামী বিবেকানন্দের বর্ত্তমান ভারত নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্রবের ফলে সমাজভুক্ত হিন্দুগণের মন আর সমাজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নাই, কাজেই ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা বাড়িতেছে। দেবালয় সংস্কার, জলাশয় প্রতিষ্ঠা ও সংস্কারাদি শুভ কার্য্য সকল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ব্যপদেশে যথেচ্ছাচার বাড়িতেছে। সমাজ বন্ধন শিথিল হইয়াছে। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সম্বন্ধ প্রায় ছিন্ন হইয়াছে। ত্যাগের পরিবর্ত্তে ভোগের আদর্শই প্রশংসনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এ সব "হিন্দুর ধাতে" সহ্য হইতে পারে না; যে জাতি বংশ-পরম্পর যেরূপ ভাবে গঠিত হইয়াছে, সে জাতি তাহার পরিবর্ত্তন বিন্দুমাত্র সহ্য করিতে পারে না। তাই আজ হিন্দু জাতির হ্রাস হইতেছে।

হিন্দুকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া আহারে, বিহারে, আচারে, ব্যবহারে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, ভাবে ও আদর্শে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য পদ্ধতির

সম্ভব অনুযায়ী হইতে হইবে। সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বতোভাবে স্বদেশী না হইলে হিন্দুজাতি পূর্ব্ব স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিবে না। হিন্দু জাতির ক্ষয় নিবারণের এইটিই প্রধান উপায়।

মহাপ্রাজ্ঞ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহোদয়ও বলিয়াছেন যে, আচার-ভ্রষ্টতাই হিন্দুদিগের পরমায়ু ক্ষয়ের প্রধান কারণ।

স্বাস্থ্য-তত্ত্ব।

লেখক—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু।

সার জেমস্ ময়ার নামক কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজ চিকিৎসক দীর্ঘ জীবন লাভের অনুকূল নিম্নলিখিত কতিপয় উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন:—

(১) প্রত্যহ আট ঘণ্টা নিদ্রা যাইবে।

(২) দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিবে।

(৩) শয়নাগারের অন্ততঃ দুই একটি জানালা সমস্ত রাত্রি খুলিয়া রাখিবে।

(৪) গৃহের সম্মুখে একটি পরদা ঝুলাইয়া রাখিবে।

(৫) গৃহের দেওয়াল হইতে কিছু দূরে শয়ন করিবে।

(৬) প্রাতে শীতল জলে স্নান না করিয়া শরীরের তাপের সম পরিমাণ উষ্ণ জলে স্নান করিবে।

(৭) প্রাতঃকালে জলযোগের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ ব্যায়াম করিবে।

(৮) পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদের পক্ষে দুগ্ধ পান প্রশস্ত।

(৯) আহারের কালে চর্ব্বিময় পদার্থ আহার করিবে।

(১০) মাদক দ্রব্য সেবনে বিরত থাকিবে।

(১১) খোলা মাঠে ব্যায়াম করিবে।

(১২) শয়ন গৃহে কোন গৃহপালিত জন্তু প্রভৃতি প্রবেশ করিতে দিবে না।

(১৩) সম্ভব হইলে সহরের বহির্ভাগে পল্লীগ্রামে বাস করিবে।

(১৪) পানীয় জল ও পয়ঃ-প্রণালীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

(১৫) সর্ব্বদা এক প্রকার কার্য্যে লিপ্ত থাকিবে না।

(১৬) মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম গ্রহণ করিবে।

(১৭) সর্ব্বপ্রকার দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিবে।

(১৮) মেজাজ সর্ব্বদা শীতল রাখিবে।

(১৯) অল্প পরিমাণে সুসিদ্ধ মাংস মধ্যে মধ্যে ভক্ষণ করিবে।

(২০) ভ্রমণ খুব ভাল ব্যায়াম, কিন্তু দুই মাইলের কম বেড়াইলে বিশেষ ফল হয় না।

দুগ্ধে রশুণ-গন্ধ।

লেখক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলায় উপযুক্ত গোচারণ মাঠের অভাব বলিয়া পল্লীর গৃহস্থগণ বাগানে, বাড়ীর আসে পাশে, ঝোপে ঝাপে, জঙ্গলে গরু ছাড়িয়া ও বাঁধিয়া রাখে। গরু ইচ্ছামত সমস্ত দিন তথায় চরিয়া থাকে, সন্ধ্যার সময় গৃহস্থের পুনরায় গরুর খোঁজ পড়ে। সমস্ত দিন গরু এইরূপে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। তাহাতে সে আগাছা কুগাছা ভোজন করে। সকলেই জানেন যে কোন স্থানে যদি উপযুক্ত ভাবে তদারক না করা যায়, তাহা হইলে সেই সব স্থানে বহু আগাছা জন্মায় সেই আগাছা কুগাছা সব ভক্ষণে অনেক সময়ে গরুর কঠিন ব্যাধি হয়। তাহার উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে তাহাকে শমন সদনে যাইতে হয়। এইরূপ ব্যাধিগ্রস্ত গাভীর দুগ্ধ সেবনে মানুষেরও বহু প্রকার ব্যাধি জন্মিবার সম্ভাবনা। যাহাদের বাড়ীতে গরু আছে তাহাদের অনেকে জানে যে, সময় সময় দুগ্ধে রশুণের গন্ধ পাওয়া যায়। তাহা এমনই তীব্র দুর্গন্ধ যে, সে দুগ্ধ সেবন করিতে পারা যায় না। এমন কি তাহা হইতে যদি দধি কিংবা ছানা প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলেও খাওয়া দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। যদি খাওয়া যায় তবে সমস্ত দিন উদ্‌গার উঠে ও সময় সময় বমন হয়। ঐরূপ দুগ্ধে উপকার না হইয়া বরং অপকার হইয়া থাকে। জীবন ধারণের জন্য যে দ্রব্যের প্রয়োজন, তাহা যদি দুর্গন্ধ-যুক্ত হয়—খাইবার সময় তৃপ্তির সহিত সেবন করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে তাহাতে উপকার না হইয়া অপকার হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

দুগ্ধে ঐরূপ দুর্গন্ধ—রশুণের মত গন্ধ হইবার কারণ কি? গরু চরিবার সময় আগাছা কুগাছা খায়। সময় সময় একরূপ বুনো গাছের পাতা তাহারা খাইয়া থাকে,—সেই জন্য দুর্গন্ধ হয়। মজা এই যে, যেদিন গরু ঐরূপ বুনো গাছ না খাইবে, সেদিন দুগ্ধে গন্ধ থাকিবে না। গৃহস্থরা ঐরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়া সময় সময় বড়ই বিপদগ্রস্ত হয়। ইহার প্রতিকার করিতে না পারিলে, দুগ্ধ ফেলিয়া দিতে হয়; তাহা কোন কাজে লাগে না। যদি ঐরূপ দুর্গন্ধযুক্ত দুধে কাঁচা অবস্থায় দুই একটী পান ছাড়িয়া দিয়া জাল দেওয়া যায়, তাহা হইলে দুগ্ধের গন্ধ নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার পরিবর্ত্তে পানের কিঞ্চিৎ গন্ধ পাওয়া যায়। জানি না পানের কি এমন শক্তি আছে, যাহাতে দুধে ঐরূপ ক্রিয়া করে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার মীমাংসা করিতে পারেন।

আমাদের বাড়ীতে প্রায় দুগ্ধে ঐরূপ দুর্গন্ধের জন্য দুগ্ধ ফেলিয়া দিত হইত,—জোর করিয়া সেবন করিলে শরীর অসুস্থ হইত। একদিন এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসিয়া, পান দিলে যে ঐরূপ দুর্গন্ধ নষ্ট হয়, তাহা বলিলেন। সেই অবধি আমাদের দুগ্ধ ফেলা যায় না, সেবনেও কোনরূপ ব্যাধি প্রকাশ পায় না— কেবল মাত্র একটু পানের গন্ধ পাওয়া যায়; তাহাতে দুগ্ধের আস্বাদ কোনরূপ খারাপ হয় না। সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

পাঁউরুটি।

লেখক—শ্রীচক্রধর সাহা।

বহু পূর্ব্বে "স্বাস্থ্য-সমাচারে" ঘরে ব্যবহারের জন্য অল্প পরিমাণ বিশুদ্ধ পাঁউরুটী প্রস্তুতের ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন লেখক কর্ত্তৃক কয়েক বারে প্রকাশিত হইয়াছিল। বাজারের প্রস্তুত রুটী সর্ব্বদা নিরাপদ বা বিশুদ্ধ নহে, এ কথা সকলেই জানেন। তবে কলিকাতার বড় বড় কারখানার (bakery) প্রস্তুত রুটীও যে সর্ব্বদা মন্দ এ কথা ঠিক নহে। বরং Great Eastern Hotel প্রভৃতি সাহেবদের bakeryতে অতি বিশুদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুত হওয়াতে সে সমস্ত রুটী সর্ব্বদা বিশুদ্ধ হইবারই কথা। কিন্তু সেরূপ রুটী মফঃস্বলের সহরে বা পল্লীগ্রামে পাইবার আশা কোথায়? অথচ রোগী কিম্বা শিশু ও সাধারণতঃ ভদ্র পরিবারের আহারের জন্য পাঁউরুটী এক অত্যাবশ্যক ও নিরাপদ খাদ্য বলিয়া খাদ্য পরীক্ষকগণ মত দিতেছেন। ঘরে প্রস্তুত সেকা রুটী অপেক্ষা পাঁউরুটী যে অধিক নিরাপদ খাদ্য তাহা ডাক্তার চুনিলাল বসু মহাশয় তাঁহার পুস্তকে স্পষ্টই বলিয়াছেন। আবার অনেক দিন পূর্ব্বে "স্বাস্থ্য সমাচারে" প্রাচীন ভারতে পাঁউরুটীর প্রচলন বিষয়ে এক অতি সুন্দর ও প্রয়োজনীয় প্রবন্ধে লেখক দেখাইয়াছেন যে "কন্দু পক্ব" নামে যে রুটী প্রাচীন ভারতে প্রস্তুত ও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত, তাহা ও আধুনিক পাঁউরুটী অভিন্ন বস্তু। এরূপ স্থলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশের ব্যবহৃত পাঁউরুটী এখন আর একটী বিলাস দ্রব্য বা নিষিদ্ধ খাদ্য নহে, আমাদের সকলেরই প্রস্তুত এক অতি পুষ্টিকর সুখাদ্য। সুতরাং ইহার প্রস্তুত প্রণালী ঘরে ঘরে জ্ঞাত ও প্রচারিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

প্রথমতঃ "স্বাস্থ্য-সমাচারে" প্রকাশিত মিঃ আর, দাস লিখিত প্রণালী অনুসারে রুটী প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হওয়াতে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে পত্র ব্যবহার দ্বারা এ সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ মত শেষ একবার যে চেষ্টা করি, তাহাতেও কৃত-কার্য্য হইতে পারি নাই। পরে হাজারিবাগে অবস্থিতি কালে সেখানকার ভিন্ন ভিন্ন রুটীওয়ালাদের নিকট তাহাদের প্রণালী জানিবার বিশেষ চেষ্টার ফলে তালের ও খেজুরের রসে (তাড়ি) প্রস্তুত করিবার পুনঃ পুনঃ প্রয়াসও বিফল হয়। একজন উক্ত প্রদেশের বাজারের রুটীওয়ালা আমাদের গৃহে তাহার নিজের জানা কি একটী মসলার চূর্ণ লইয়া দুই একদিন আমাদের সম্মুখেই রুটী করিয়াছিল। সেই চূর্ণের প্রস্তুত Yeast যোগে আমরাও বেশ রুটী প্রস্তুত করিয়াছিলাম। কিন্তু অনেক চেষ্টায়ও কিছু অর্থ-ব্যয়েও সেই ধূর্ত্তের সে মসলার উপকরণগুলি জানিতে পারি নাই।

তৎপরে "স্বাস্থ্য-সমাচারে" প্রকাশিত বাবু নরেন্দ্র কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর প্রণালী অনুসারে "হপ্ জল" প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা একবার রুটী করিতে গিয়াও বিফল মনোরথ হই। শেষ মিসেস্ এল, জি, মুখার্জ্জির লিখিত প্রণালী অনুসারে Yeast প্রস্তুত করিয়া বহু চেষ্টা ও বহু দ্রব্য ব্যয় করিয়া সুন্দর রুটী করিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার লিখিত প্রণালী অতি বিস্তৃত ও একটু বিশৃঙ্খল ভাবে লিখিত, এবং উক্ত প্রণালী অতি সহজ ও আমাদের দেশের পল্লী নারীদের উপযোগী নহে। সুতরাং সে প্রণালীতে চলিলে অনেক সময়, চিন্তা ও বস্তু নষ্ট হইতে চায়। যদি লেখিকা স্বয়ং, কিম্বা "স্বাস্থ্য সমাচারের" সম্পাদক, অথবা কোন লেখক বা গ্রাহক উক্ত প্রণালীটী অধিকতর প্রাঞ্জল ও সুশৃঙ্খল অথচ সংক্ষিপ্ত ভাবে লিপিবদ্ধ করেন তবে বেশ হয়। আনাড়ী পল্লী গৃহিণীর ও

যাহাতে উক্ত প্রণালী অবলম্বনে আপনাদের পারিবারিক প্রয়োজনে খাঁটী উপাদানে সদ্য প্রস্তুত রুটী শিশু ও রোগীদের মুখে তুলিয়া দিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে উহার প্রস্তুত প্রণালী যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ও Practical ভাষায় লিখিত হয় তাহাই বাঞ্ছনীয়।

এই উপলক্ষে বর্ত্তমান লেখকের আরও একটী অনুরোধ আছে। হাজারিবাগে বাসের সময়ে সংবাদ-পত্রে একটী সচিত্র বিজ্ঞাপন পাঠে জানিতে পারি যে, Brown and Polson's Paisley Flour যোগে অতি সহজে অতি সুন্দর বিশুদ্ধ পাঁউরুটী খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হইতে পারে। তদনুসারে তাহাদেরই লিখিত প্রণালী (Recipe) অনুসারে উক্ত Paisley flour দ্বারা পুনঃ পুনঃ রুটী প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়াও কোনরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। কোন মতেই উহাতে প্রস্তুত রুটী আশানুরূপ ফুঁলিয়া উঠে নাই। উনানেও যথাসাধ্য আগুণ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা রুটীর ভিতরের অংশ সুসিদ্ধ করিতে পারি নাই। কেবল উপকরণ ও পরিশ্রম বৃথা নষ্ট হইয়াছে। অথচ Brown and Polsonএর মত এত বড় একটী বিশ্বস্ত ইংরাজ Bakerএর বিজ্ঞাপন যে কোনই প্রচলিত বিজ্ঞাপন তাহাও বলা যায় না। কলিকাতার Messrs. Mackenzie Lyall & Co.র আফিসে চিঠি লিখিয়া Paisley flour নমুনা স্বরূপ আনাইয়া তাহাদেরই প্রেরিত Brown and Polson এর recipe দৃষ্টে চেষ্টা করিয়াছি। উনান ও আগুণ সম্বন্ধে আমাদের কোন ত্রুটী আছে কি না, তাহার পরীক্ষা করা হয় নাই। কিন্তু "স্বাস্থ্য সমাচারে" লিখিত প্রণালী অনুসারে আমরা উনান প্রস্তুত করিয়াছি। উনানে রাশি রাশি কাঠ জ্বালাইয়া হয়রাণ হইয়া রুটী সিদ্ধ করিতে গিয়া বিফল হইতে হইতে আজ "স্বাস্থ্য সমাচারের" সাহায্য লাভে অগ্রসর হইতেছি। যদি কেহ Paisley Flour যোগে রুটী প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া গুলি যথা ব্যাবহারিক ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া "স্বাস্থ্য-সমাচারে" প্রকাশ করেন, অথবা কলিকাতার কোন baker বা ব্যক্তি বিশেষের নিকট উহা হাতে কলমে জানিবার দেখিবার উপায় নির্দ্দেশ করেন, তবে আমাদের অনেক লোকই বোধ হয় বিশেষ বাধিত হইবেন। বলা বাহুল্য যে এত অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে বিশুদ্ধ পাঁউরুটী প্রস্তুত করিবার প্রণালী এই Paisley Flourএর প্রক্রিয়ার মত আর কোনটীই নাই। রোগী, শিশু ও সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ সদ্য রুটী বোধ হয় আর কোন প্রক্রিয়াতে সম্ভব নহে। তাড়ি প্রভৃতিতে প্রস্তুত রুটী বাসী হইলে সুস্থ পক্ষে ও সদ্যও রোগীর পক্ষে উপযোগী নহে। যদি সাহেবী বিজ্ঞাপনে অবিশ্বাস না করি তবে Paisley Flour যোগে প্রস্তুত রুটীই সর্ব্বথা নির্দ্দোষ ও সহজ লভ্য। "প্রাচীন ভারতে পাঁউরুটীর" কোন মহাশয়ও অনুগ্রহ করিয়া প্রস্তুত প্রণালিটি "স্বাস্থ্য সমাচারে" লিখিলেও উত্তম হয়।

ফুল ও ফল।

কবি গাহিয়াছেন, "সৃষ্টির সুন্দর শ্রেষ্ঠ পুষ্প মনোহর।" অর্থাৎ শ্রীভগবান যত কিছু সুন্দর পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে পুষ্পের সুষমাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ ফুলের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ না হয় এমন মানুষ দেখা যায় না। অতি শিশুও ফুলের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারে, এবং ফুল দেখিলে তাহা পাইবার আবদার ধরে।

ফুল কেবল সুন্দর নয়, তাহার গন্ধও মধুর। সকল ফুলের গন্ধ অবশ্য সমান নহে। কোন ফুলের গন্ধ মৃদু, কোন ফুলের গন্ধ চড়া; কোন ফুলের গন্ধ মিষ্ট, কোনটির বা উগ্র। কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও, যে ফুলের গন্ধ আছে, তাহারা তাহাদের বিশেষ গুণের জন্যই মানুষের কাছে আদৃত।

ফুল যেমন সুন্দর, তাহার যেমন সৌরভ আছে, তাহার আরও একটী গুণ আছে। সেটী কোমলতা। এই কোমলতা, সৌন্দর্য্য, সুগন্ধ লইয়া ফুল মানবমাত্রেরই প্রীতি উৎপাদন করিয়া আসিতেছে।

আজ আমি এখানে ফুলের গুণ-কীর্ত্তন করিতে বসি নাই। ফুলে আজ আমার প্রয়োজন আছে,—গুরুতর প্রয়োজন; তাই আমি আজ পাঠকপাঠিকাদের সঙ্গে ফুলের কথার একটু আলোচনা করিতে চাই।

ফুল ভালবাসে সকল জাতির সকল দেশের লোকে। আমরা হিন্দু;—এককালে আমাদের পুষ্প-প্রীতি অসাধারণ ছিল। হিন্দু ভাবপ্রবণ ধর্ম্মপ্রাণ, সৌন্দর্য্য-জাতি। এখন হিন্দু সমাজে যে সমাজ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, হিন্দুর সমাজ, নীতি, আচার-ব্যবহারের যে পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে, এইটী ঘটিবার পূর্ব্বে হিন্দু মাত্রেরই নিত্য পুষ্পের প্রয়োজন হইত। প্রায় প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের গৃহেই শালগ্রাম শিলা বা অন্য কোন না কোন গৃহ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাদের জন্য হিন্দু গৃহে নিত্য ফুলের প্রয়োজন হইত। প্রাতে পল্লীবৃদ্ধগণ, পল্লীবৃদ্ধাগণ, বর্ষিয়সী মহিলা-বালকবালিকা, শিশুগণ গৃহ-দেবতার পূজার জন্য বাহির হইতেন। প্রায় প্রতি গৃহস্থের গৃহ-একখণ্ড জমিতে ফুলের বাগান থাকিত। তাহাতে পুষ্প-বৃক্ষ রোপণ করা হইত। সেই বাগানের গাছে কত রকমের ফুল ফুটিয়া গন্ধ ছড়াইয়া দিত। আজ আর সে দিন নাই। আজ সেই পবিত্র প্রথা যাইতে বসিয়াছে। পল্লীগ্রাম এখন একরূপ সেখানে গৃহস্থবাড়ীর উঠানে বা গৃহসংলগ্ন

বাগানে নিত্য বিবিধ ফুল ফুটিয়া সৌরভ বিলায় না। আর, সহরের ত কথাই নাই। সহরের সঙ্কীর্ণ জায়গায় ফুলের বাগান করিবার স্থানই মিলে না। নিতান্ত সৌখিন লোকে টবে দুই চারিটা ফুল গাছ ও পাতা বাহারী গাছ পুঁতিয়া সৌন্দর্য্যাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধনের ছলনা করেন।

এরূপ ঘটিবার কারণ কি? কারণ আর কিছু নয়; অন্য অনেক জিনিসের ন্যায় আমরা আজকাল ফুলের প্রকৃত ব্যবহার ভুলিয়াছি। তাই ফুল আর আমরা তেমন দরকারী জিনিস বলিয়া মনে করি না। বিশেষতঃ, এখন অন্নচিন্তা চমৎকারা হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—ফুলের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ উপভোগ করিবার অবসরও নাই, প্রবৃত্তিও নাই।

কিন্তু আমরা যদি একটু তলাইয়া দেখি, তাহা হইলে অতি সহজেই আমাদের ভুল ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। ফুল আজকাল কেবল সৌখিন লোকের প্রিয় জিনিস বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সাধারণ লোকে উহার বিশেষ কোন উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারেন না। যাহাদের অন্নচিন্তা করিতে হয় না, অথচ প্রাণে সখ আছে, ফুল কেবল তাহাদেরই দরকার—ইহাই এখন সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু এ বিশ্বাসটি বিষম ভ্রম। সাহেবদের আচার-ব্যবহার যদি একটু মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, ধনী-নির্দ্ধন-নির্ব্বিশেষে তাঁহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে ফুল ভালবাসেন। নিতান্ত গরীব গৃহস্থও অন্ততঃ আহারের সময় টেবিলে কিছু ফুলের গুচ্ছ সংগ্রহ করিতে পারিলে বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করেন। যাহার দিনান্তে অন্ন জুটে না, সেও কোটের বুকের বোতাম পরাইবার জায়গায় একটী ফুল ব্যবহার করিতে পারিলে চরিতার্থ হইয়া যায়। তাঁহাদের এই যে পুষ্প প্রীতি—ইহা কেবল নিরবচ্ছিন্ন সখ নহে; ফুলের যে অসাধারণ স্বাস্থ্যকর গুণ আছে, তাহা তাঁহারা বুঝেন। বুঝেন বলিয়াই তাঁহারা ফুলের মর্য্যাদা রক্ষণে তৎপর।

আর, আমাদের ধনী-গৃহেও নিতান্ত সৌখিন লোক

না হইলে কেহ বড় একটা ফুল ব্যবহার করেন না—ফুল যে কি গুণে মানুষের কাছে আদর পাইবার যোগ্য, তাহাও হয় ত তাঁহারা জানেন না।

ফুলের সৌন্দর্য্য, সুষমা, সৌরভ—এ সকলই মানব-জাতির স্বাস্থ্যরক্ষায় সহায়তা করিয়া থাকে। ফুলের সুষমা দর্শনে সকলেরই মনে একটু প্রীতির সঞ্চার হয়। এই মানসিক প্রফুল্ল ভাব যে আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহা বিজ্ঞ লোকমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

তার পর ফুলের সৌরভ। পুষ্প-সৌরভ যে প্রত্যক্ষ ভাবে স্বাস্থ্যরক্ষায় সহায়তা করে, তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হওয়া উচিত নহে। ফুলের সুগন্ধ অনেক প্রকার দুর্গন্ধ দমন করে। অনেক সময়ে ফুলের মিষ্ট বা উগ্র গন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া মানুষের শত্রু অনেক কীট-পতঙ্গ দূরে পলায়ন করে। বকুলের গন্ধ যে ছার-পোকার যম, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। বকুল ফুল সংগ্রহ করিতে না পারিলে, বিছানায় দুই এক ফোঁটা বকুলের আতর ছড়াইয়া দিলেও ছারপোকারা দূরে পলায়ন করে। চাঁপা ফুলের উগ্র গন্ধেরও অনেকটা এইরূপ গুণ আছে।

যূথী চামেলী প্রভৃতি ফুলের মিষ্ট গন্ধে উগ্র মস্তিষ্ক শীতল হয়। ইহ উন্মাদ রোগীদের পক্ষে পরম হিতকর। ফুলের গন্ধে মনের পবিত্রতা সাধিত হয়। মানসিক পবিত্রতা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম হিতকর, এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন কি?

ভগবানের সৃষ্ট এমন একটী মহামূল্য স্বাস্থ্যের উপাদান হইতে আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদিগকে বঞ্চিত রাখিতেছি—ইহার অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমি পল্লী অঞ্চলে যতটা ঘুরিয়াছি, দেখিয়াছি, অনেক গৃহস্থের বাড়ীর পার্শে ফুল বাগান আছে, কিন্তু যত্নের অভাবে তাহা শ্রীহীন। ফুলগাছগুলি প্রায় মৃত, শুষ্ক; যা দুই একটা জীবিত আছে, তাহাতেও এখন আর ফুল ফুটে না। অথচ, একটু যত্ন করিলে আমরা এমন একটা মহা উপকার পাইতে পারি।

ফুলকে আমরা যদি কেবল বিলাসোপকরণ বলিয়া না ভাবি, স্বাস্থ্যরক্ষার্থ তাহার প্রয়োজনীয়তা যদি আমরা বুঝিতে পারি, তাহা হইলে, আমরা নিশ্চয়ই আবার ফুলের আদর করিতে বাধ্য হইব। আমার অনুরোধ, স্বাস্থ্য-সমাচারের পাঠক-পাঠিকামাত্রেই যথাসাধ্য ফুলগাছ রোপণপূর্ব্বক গৃহের শোভা সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার ব্যবস্থা করুন। ইহাতে কোনই ক্ষতি নাই; বরং সমূহ লাভ আছে। সন্ধ্যাকালে বাগানে অজস্র ফুল ফুটিয়া, তাহার সৌরভ বায়ু বাহনে যত দূর যাইবে, তত দূরের বায়ু পবিত্র ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইয়া উঠিবে। আশা করি, পাঠক-পাঠিকারা আমার এই কথাগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

ফুলের পরেই ফলের কথা আসিয়া পড়িতেছে। ইহাও শ্রীভগবানের একটী অমূল্য দান। কিন্তু আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা ইহার সমুচিত সদ্ব্যবহার করিতে পারি না। সাহেবদের আহারের সময় টেবিলে নানাবিধ ফলের সমাবেশ দেখা যায়। নিত্য আহারের সময় কিছু কিছু ফল না খাইলে তাঁহাদের মোটে খাওয়াই হয় না। আর ফলকে কদাচিৎ আমাদের ভোজন পাত্রের শোভা সম্পাদন করিতে দেখা যায়।

আমরা এই স্বাস্থ্য সমাচারে পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি, টাটকা তাজা ফলে ভাইটামাইন নামক একটী পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান থাকায়, উহা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিলক্ষণ অনুকূল। একে ত আমরা সচরাচর যাহা আহার করি, তাহার মধ্যে পুষ্টিকর পদার্থ খুবই কম। অতএব আমাদের সাধারণ মাছ ভাত ডালের সঙ্গে আমরা যদি প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে কিছু কিছু ফল ভক্ষণ করিবার সুযোগ পাইতাম, তাহা হইলেও বা আমাদের স্বাস্থ্য কতকটা বজায় থাকিতে পারিত; কিন্তু আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে আমরা আমাদের এমন একটা অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য হইতে নিজেদের বঞ্চিত রাখিতেছি। ইহাও আমাদের নিজেদের

ই ঘটিতেছে। আমার ইচ্ছাপূর্ব্বকই আমাদের
করিয়া যাইতেছি। এ পক্ষে আমাদের প্রধান
—আমরা ফলকে ভাত ডাল মাছের মত অপরি-
অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য মনে না করিয়া, উহাকেও
ury'র দলে ফেলিয়া দিয়াছি। ফল ভক্ষণ না
ার পক্ষে আমরা প্রায় অর্থাভাবের দোহাই দিয়া
। কিন্তু, যাঁহাদের সামর্থ্য আছে, তাঁহারাও ত
নিত্য নিয়মিত ভাবে ফল ভক্ষণ করেন না!
রা দুধ ঘী যথেষ্ট পরিমাণে খাইয়া থাকেন, কিন্তু
তাঁহাদিগকেও কদাচিৎ ভোজন করিতে দেখা
। সুতরাং অর্থাভাবই ফল না খাইবার পক্ষে
ঙ্গত ওজর নহে। ইহা আমাদের ইচ্ছাকৃত
লার দরুণই ঘটিতেছে। অচিরে ইহার প্রতিকার
আবশ্যক।

এই যে আমের season গেল,—এবার শ্রীভগবানের
আমের ফলন খুব বেশী হইয়াছিল, দামও
স্তা হইয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষ, দুর্ম্মূল্যের বাজারে
লোকেও এবার কিছু কিছু আম খাইতে পাইয়াছে।
আমের পুষ্টিকারিতা গুণ যে কত বেশী, তাহা সম্ভ
অনুভব করিতে পারা যায়। যাঁহারা একটু লক্ষ্য
া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন।
কার সস্তার আম অনেক নিরন্নের অন্নের স্থান
ার করিয়াছিল এবং আম সে অধিকারের মর্য্যাদাও
াছে। শুধু আম কেন, টাটকা তাজা ফল মাত্রেরই
একটী বিশেষ গুণ আছে। শ্রীফল বা বেলকে ত
ষধের সামিল করিয়া রাখা হইয়াছে।

কলিকাতা অন্ততঃ বাঙ্গলা দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
র। আমরা বাল্যকালে কলিকাতার বাজারে
রকমের কত উৎকৃষ্ট ফল প্রচুর পরিমাণে আমদানী
দেখিতাম; এখন আর সেটী দেখিতে পাই না।
দাম কত সস্তা ছিল; এখন তাহার চতুর্গুণ
হইতে দশগুণ মূল্য দিলেও আর তাহা বেশী পাওয়া যাইতেছে না। মূল্যের কথা ধরিতেছি না; কালধর্ম্মে অন্যান্য সব জিনিসের দাম যেমন বাড়িয়াছে, ফলেরও দাম না হয় তেমনি বাড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু বেশী দাম দিয়াও মনের মতন জিনিস পাই না কেন? ফল এত দুষ্প্রাপ্য হইল কেন? কলিকাতার উত্তরাঞ্চলের অর্থাৎ দেশীয় অংশের বাজারে যে সব ফল আমদানী হয়, তাহা অতি জঘন্য। যত অপুষ্ট অপরিপক্ক ফলের আমদানী এই সকল বাজারে হইয়া থাকে। আর সমস্ত ভাল জিনিস হগ সাহেবের বাজারে চলিয়া যায়।

ইহা আমাদের নিজেদের দোষেই ঘটিতেছে। আজ কাল আমরা চা-বিস্কুট টোষ্ট-রুটির খুব ভক্ত হইয়া উঠিয়াছি। বাসী বিলাতী খাদ্যে আমাদের যে পরিমাণে রুচি বাড়িয়াছে, টাটকা তাজা ফলে আমাদের সেই পরিমাণে অরুচি জন্মিয়াছে। কাজেই খরিদ্দার না পাইয়া ফল বিক্রেতারা দেশী বাজারে ভাল জিনিস আমদানী করিতে চায় না। আর, সাহেবেরা গুণের আদর করিতে জানেন। তাঁহাদের এই গুণ-গ্রাহিতা গুণে তাঁহারা ঘরের কাছে নিজেদের বাজারে বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল সকল সস্তায় পাইয়া থাকেন। আমরা আমাদের নিজেদের মূর্খতা দোষে নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারিতেছি। আমাদের স্বাভাবিক খাদ্যের যতই অভাব হইতেছে, ফল ও অন্যান্য খাদ্যের প্রতি আমরা ততই অবহেলা করিতেছি। আর এ রকম করা চলিবে না। এখন সকলকে নিজেদের অবস্থা, দেশের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিয়া চলিবার অভ্যাস করিতে হইবে। রোগে, শোকে, মহামারীতে পানীয় জলের অভাবে বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব লোপ হইতে বসিয়াছে। আর নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না—আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অচিরে করিতে হইবে।

হুকওয়ারম।

লেখক—ডাঃ শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ঘোষ

বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর বহু লোক হুকওয়ারম-জনিত পীড়ায় অকালে কাল-কবলে পতিত হইতেছে। দুঃখের বিষয়, সর্ব্বত্রই চিকিৎসার অভাব তাহার প্রধান কারণ। পল্লীগ্রামের অনেক চিকিৎসকই হুকওয়ারম-জনিত পীড়ায়, উপস্থিত লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসা করেন; সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা দেশের অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট সাধন হয় না।

আমি আমার জনৈক ডাক্তার বন্ধুকে। হুকওয়ারম-জনিত পীড়ার চিকিৎসার ফলাফল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন, "আমি ১৬।১৭ বৎসর যাবৎ চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছি—এ যাবৎ একটীও হুকওয়ারম পীড়ায় আক্রান্ত রোগী দেখি নাই।" আমি তাঁহার কথায় বুঝিলাম, তিনি হুকওয়ারম সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করেন নাই; কারণ, স্যানিটারি কমিশনর সাহেব বাহাদুরের রিপোর্টে দেখা যায় বঙ্গের প্রতি ৫ জন ব্যক্তির মধ্যে ৪ জনের হুকওয়ারম আছে; অথচ তাঁহার চক্ষে একটীও পীড়িত ব্যক্তি দৃষ্ট হয় নাই,—ইহা কত দূর সম্ভব?

এই সকল কারণে হুকওয়ারম সম্বন্ধে আমার যতটুকু শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা আছে, তাহা জন সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতে প্রয়াসী হইয়াছি। ইহা দ্বারা জনসাধারণের কিছু মাত্র উপকার হইলে, পরিশ্রম সফল মনে করিব।

জন্ম। স্ত্রী-কীটসমূহ মানুষের অন্ত্র মধ্যে (Intestine) ডিম্ব প্রসব করে। সেই ডিম্ব মলের সহিত বহির্গত হইয়া উপযুক্ত স্থান পাইয়া পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া শিশু কীটে পরিণত হয়।

উপযুক্ত স্থান। আলোক, ছায়া, ভিজে স্থান (Moisture), মুক্ত বায়ু। জলপাইগুড়ি হুকওয়ারম লেবরেটারিতে পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, ডিম্বগুলি আলোক অপেক্ষা অন্ধকারেই শীঘ্র ফোটে (hatch out)। এই ডিম্বগুলি ফুটিয়া যখন শিশু কীটে (larvæ) পরিণত হয়, তখন তাহারা জড়াজড়ি করিতে থাকে; এবং সেই জড়াজড়িতে তাহাদের গাত্রাবরণের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। ৪।৫ বার জড়াজড়ির পর তাহাদের উঠিয়া চলাফিরা করিবার ও ছিদ্র করিবার শক্তি জন্মে। এই সময়ে তাহাদের সেঁতসেঁতে স্থানে যাইবার ইচ্ছা প্রবল হয়। এই অবস্থায় তাহারা মানুষকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। তাহাদের ছিদ্র করিবার শক্তি এত অধিক যে, (Sand filter) স্যাণ্ড ফিল্টার, ব্লটিং পেপার (১৪।১৫ খানি একত্র) অনায়াসে ছিদ্র করিয়া থাকে। তাহারা ৩।৪ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ স্থানে আরোহণ করিয়া অপেক্ষা করিতে পারে।

আক্রমণ। মানুষের শরীরের যে কোনও স্থানে অলক্ষিত ভাবে ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্য দিয়া তাহারা মানব শরীরে প্রবেশ করে। প্রধানতঃ পায়ের তলা বা পার্শ্ব দিয়াই তাহারা মনুষ্য দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। পরে ত্বক ছিদ্র করিয়া শিরা (Vein) দিয়া হৃৎপিণ্ডে গমন করে, তথা হইতে ফুস্‌ফুস্ তাহার পর শ্বাস নালী, ও গলনালী দিয়া ডিওডিনামের তৃতীয় অংশে, এবং জেজুনামে ও ইলিয়মের প্রথম অংশে বাস করে। ত্বক ছিদ্র না করিয়াও অন্য রকমে তাহারা মানুষকে আক্রমণ করিতে পারে; যথা, শিশু কীট জলের সহিত বা খাদ্যের সহিত গলনালীর মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ব বর্ণিত স্থানসমূহে গিয়া বাস করিতে পারে। উক্ত স্থানে বাস করিয়া তাহারা অন্ত্র হইতে রক্ত শোষণ করিয়া জীবন ধারণ করে।

লক্ষণ। হুকওয়ারমজনিত পীড়ার লক্ষণগুলি সাধারণের সুবিধার জন্য, তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লিখিব। ১ম অবস্থা,(Slight case) ত্বক ছিদ্র করিয়া প্রবেশ করিলে, প্রথমতঃ সেই স্থানে এক প্রকার চুল-কানি, পরে বেদনা অনুভব হয়। কিছু দিন পরে ঐ স্থানে ক্ষত উৎপন্ন হয়। কাহার-কাহারও ক্ষতের লক্ষণ দৃষ্ট হয় না; সাধারণ লক্ষণের মধ্যে সামান্য পরিমাণে ফেঁকাসে রং দৃষ্ট হয়। কোন কোনও সময় তাহাও হয় না। গাত্রবর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাভ হয়। স্বাভাবিক ঘর্ম্ম কমিয়া যায়। সামান্য শ্বাস কষ্ট দৃষ্ট হয়। সামান্য পরিশ্রমেই রোগী অধিক পরিমাণে ক্লান্তি অনুভব করে। কোন কোনও সময়ে সামান্য হৃৎস্পন্দন, গা মাথা ঘোরা এবং শিরঃপীড়া অনুভূত হয়। সামান্য পরিমাণে মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। সামান্য দুর্ব্বলতা দেখিতে পাওয়া যায়। হিমগ্লোবিনের পরিমাণ স্বাভাবিক অপেক্ষা সামান্য কম দৃষ্ট হয়। কখন কখন ৬০ পার্সেণ্ট পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

২য় অবস্থা। Moderate case.

প্রথম অবস্থার সমুদয় লক্ষণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; এবং তৎসঙ্গে অত্যন্ত ক্ষুধা (যাহাকে রাক্ষসে ক্ষুধা বলে) দেখিতে পাওয়া যায়। বিবমিষা থাকে, কিন্তু বমন খুব কম দেখা যায়। জিহ্বা মলাবৃত এবং ঈষৎ হরিদ্রাভ ও কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকৃতি ও কোমল দেখিতে পাওয়া যায়। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে সঞ্চাপে বেদনা অনুভূত হয় এবং সমুদায় উদর প্রদেশে বিনা সঞ্চাপেও এক প্রকার বেদনা অনুভব করে। দুর্ব্বলতা এবং Patalereflx খুব বেশী পরিমাণে দৃষ্ট হয়। মানসিক অবস্থা দমিয়া যায়। রোগীকে নির্ব্বোধের মত দেখায়। সন্ধিস্থানসমূহে বেদনা কোন কোনও সময়ে এত অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় যে, বাত বেদনা (Rheumatism) বলিয়া ভ্রম জন্মে। হিমগ্লোবিন পরিমাণে স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক কম দৃষ্ট হয়। স্বাভাবিক পরিপোষণ অতিশয় মন্দ ভাবে আক্রান্ত হয়।

৩য় অবস্থা। Marked case.

এই সময় সমস্ত অবস্থাই অতিশয় মন্দ ভাবে দৃষ্ট হয়। রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত বলিয়া মনে হয়। অতিশয় রক্ত-হীনতা এবং পদদ্বয় ও পদসন্ধিসমূহে শোথ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। গা মাথা ঘোরা, ক্ষুধাহীনতা, বিবমিষার সহিত বমন দৃষ্ট হয়। শোথ-উদরী (Ocitis) পর্য্যায়-ক্রমে কোষ্ঠ কাঠিন্য ও উদরাময়, সামান্য পরিশ্রমে শ্বাস-কষ্ট, অতিশয় হৃৎস্পন্দন ও হৃৎপিণ্ড প্রদেশে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। নাড়ী দ্রুত দুর্ব্বল বিমর্দ্দনীয় (compressible)। গলদেশস্থ শিরায় নাড়ীর স্পন্দন অনুভূতহয় এই অবস্থায় Patalereflex অন্তর্হিত হয়। পুরুষদিগের ধ্বজভঙ্গ, স্ত্রীলোকদিগের বিলম্বিত ঋতু অথবা রজোহীনতা, কখন কখন গর্ভপাত পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। কনিনিকা (Pupil) প্রসারিত, রাত্রিতে অনিদ্রা, চক্ষে তারকা দৃষ্ট (চলিত কথায় যাহাকে সরষের ফুল দেখা বলে) হয়। মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়া যায়, অধিক পরিমাণে, কোন কোনও সময়ে অল্প পরিমাণে অ্যালবুমেন দেখিতে পাওয়া যায়। অনিয়মিত জ্বর, কখন কখনও স্বাভাবিক উত্তাপেরও ক্ষম হয়। হিমগ্লোবিনের পরিমাণ ১০ পার্সেণ্ট পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। জননেন্দ্রিয়ের পরিবর্দ্ধন বিলম্বিত লক্ষিত হয়।

উপরি উক্ত তিনটী অবস্থাতেই আক্রান্ত ব্যক্তির মলের সহিত হুকওয়ারম ডিম্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ ডিম্বসমূহ চক্ষুর অগোচর বলিয়া কেবলমাত্র অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায়; নচেৎ নহে।

চিকিৎসা। এই হুকওয়ারমজনিত পীড়ার চিকিৎসা সাধারণের সুবিধার জন্য দুইভাগে বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করিব। ১ম আরোগ্যকারী। ২য় প্রতিষেধক।

১ম। এতদর্থে বর্ত্তমান সময়ে দুইটী ঔষধের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্রমান্বয়ে তাহাদের নাম, এবং প্রয়োগপ্রণালী ও মাত্রাদির বিষয় বিবৃত করিতেছি।

১ম। থাইমল। (Thymol)

বয়স অনুযায়ী হুকওয়ারম রোগীতে ব্যবহৃত মাত্রা।

১—২ বৎসর	১—৩ গ্রেণ
৬—১০ „	৫—৭ „
১১—১৫ „	৭—১৫ „

১৬—২০ বৎসর	১২—২০ গ্রেন
২১—৫০ „	১৫—৩০ „
৫০ উর্দ্ধে	১২—২০ „

আমি এ যাবৎ ৫০টী রোগীকে থাইমল দ্বারা চিকিৎসা করিয়া সুফল পাইয়াছি। তাহাদের মধ্যে আমি নিম্নলিখিত মত মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছি।

১৮—২০ বৎসর	২৫—৩০ গ্রেণ
৩০—৪০ „	৩০—৪০ „
৪০—৫০ „	৩০—৩৫ „

আমি রোগীর দৈহিক অবস্থা বুঝিয়া মাত্রা নিরূপণ করিয়া থাকি।

প্রয়োগ ও প্রস্তুত প্রণালী—প্রথমে মাত্রানুযায়ী থাইমল লইয়া খলে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া উহার সহিত সম পরিমাণ বা কিছু বেশী পরিমাণ দুগ্ধ শর্করা (Sugar of Milk) মিশ্রিত করিয়া সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। ১ম অর্দ্ধাংশ প্রাতে ৭টায় বিনা জলে রোগীকে সেবন করাইতে হইবে। অপর অর্দ্ধাংশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পূর্ব্ব প্রণালীতে বেলা ৯টায় একমাত্রা এবং অপর মাত্রা বেলা ১১টায় প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহার ১ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা পরে নিম্ন লিখিত মাত্রানুযায়ী সলফেট অব ম্যাগনেসিয়া (Sulphate of Magnesia) জলে গুলিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

বয়স	মাত্রা
১—২ বৎসর	৪ড্রাম
৩—১০ „	৮ „
১১—১৫ „	১২ „
১৬—২০ „	১৬ „
২১—৫০ „	২৪ „
৫০ উর্দ্ধে	২৪ „

আমি এই মাত্রা নিম্নলিখিত প্রণালীতে ব্যবহার করিয়া বেশ ফল পাইতেছি।

	১মঘঃ	২য়ঘঃ	৩য়ঘঃ
১—২ বৎসর	৪ড্রাম	২ড্রাম	১ড্রাম
৬—১০ „	৮	৪	২
১১—১৫ বৎসর	১২	৬	৩
১৬—২০ „	১৬	৮	৪
২১—৫০ „	২৪	১২	৬
৪০ উর্দ্ধে	২৪	৬	৩

অনেক সময় ৩য় ঘণ্টার মাত্রা আরও ১ঘণ্টা পরে ২।৩ বার ব্যবহার করিতে হয়। ২টী রোগীতে ১ আং পর্য্যন্ত ম্যাগনেসিয়া সল্‌ফ ব্যবহার করিয়াছি। ম্যাগনেসিয়া প্রয়োগ চিকিৎসকের বিবেচনার উপর নির্ভর করে। ম্যাগনেসিয়া প্রয়োগ করিয়া বেশী রোগীর দাস্ত না হইলে তাহাকে ম্যাগনেসিয়ার সলিউশন দ্বারা পিচকারী করিতে হইবে; কারণ, দেহের অভ্যন্তর হইতে থাইমলের বহিষ্করণ বিশেষ আবশ্যক; নতুবা তাহা বিষক্রিয়া উৎপাদন করিবে।

থাইমল প্রয়োগের পূর্ব্বদিন রোগীকে সন্ধ্যায় ৬ Mag. Sulph. সেবন করাইয়া রাখিতে হয়; এ তাহাকে সাবধান করিয়া দিতে হয় যেন সে মদ্য পান করে। নিম্নলিখিত জিনিষ সমূহে থাইমল শোষিত হই বিষক্রিয়া করিতে পারে, সুতরাং থাইমল প্রয়োগে পূর্ব্বে এবং পরে এই সকল জিনিষের ব্যবহার নিষিদ্ধ—

1. Chloroform
2. Oil (Castor Oil or Any Kind of O
3. Terpentine
4. Glycerine
5. Eether.

থাইমল ব্যবহারে রোগীর বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইলে নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা, শিরঃপীড়া, দুর্ব্বলতা, কাণে একপ্রকার বাদ্য শ্রবণ। নাড়ী দুর্ব্বল এবং দ্রুত; মুখ মণ্ডলে ও শীতল ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে। ঠোঁট এবং অগ্রভাগ নীলাভ দৃষ্ট হয়। শ্বাস প্রশ্বাস গভীর হয়।

চিকিৎসা। রোগীর মস্তক নীচু করিয়া করাইতে হইবে। গরম কাপড় বা কম্বল দিয়া রো গাত্র আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া গরম জলের বোত

রোগীর দাস্ত হইয়া গেলে, প্রথমে তাহাকে ভাতের ফ্যান (Rice Water) খাইতে দিয়া, তাহার পর জল বা অন্য কোন পথ্য দেওয়া উচিত। এই দিন কোনও প্রকার কঠিন খাদ্য না দেওয়াই ভাল।

[redacted]মে প্রত্যেক রোগীকে তিনবার চিকিৎসা ম চিকিৎসার ৭দিন পরে ১০দিন মধ্যে ২য়বার, তাহার ১৫ দিন পরে ৩য়বার উপরি উক্ত প্রণালী মত চিকিৎসা করা দরকার।

আমি এই চা বাগানে এতাবৎকাল ৫০টী পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির চিকিৎসা উপরি উক্ত প্রণালীতে সম্পাদন করিয়া বেশ আশানুরূপ ফল পাইয়াছি।

ক্ষতের চিকিৎসা। Ung. Thymolin অঙ্গুয়েণ্টাম থাইমলিন ব্যতীত অন্য কোন ঔষধের প্রয়োজন হয় না। এই মলম আমি বহু প্রকারে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিয়াছি। তাহার মধ্যে নিম্ন প্রণালীর মলমটীতেই খুব বেশী পরিমাণে উপকার পাইয়াছি।

থাইমল চূর্ণ—১ড্রাম

ভেসেলিন—২½আং

উত্তমরূপে মিশাইয়া লইতে হইবে। এই ঔষধ প্রত্যহ প্রস্তুত করিয়া না দিলে, ভাল উপকার হয় না। একদিন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া তাহা ৩।৪ দিন পরে ব্যবহার করিয়া তেমন ফল পাই নাই। বর্ত্তমান সময়ে আমি একটী পাউডার পরীক্ষার্থ ব্যবহার করিতেছি। তাহা এই—

এসিড বোরিক	১আং
থাইমল	১ড্রাম
বিসমথ সবনাইট্রাম	৪ড্রাম
জিঙ্ক অক্সাইড	৩ড্রাম

এই পাউডার ব্যবহারের পূর্ব্বে ক্ষতটী বেশ পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিয়া এই চূর্ণ প্রয়োগ করিতে হয়।

২। প্রতিষেধক উপায়।

(১) হুকওয়ারম ডিম মলের সহিত নির্গত হইয়া মাটিতে ফুটিয়া থাকে এবং তথা হইতে মানুষকে আক্রমণ করে; সুতরাং সর্ব্বত্র মলত্যাগ বিধেয় নহে। অক্সিজেনের

১—৩ বৎসর	১মিনিম ১ঘণ্টাপরপর ২মাত্রা
৪—৮ „	২—৩ „ „ „
৯—১৩ „	৬—১১ „ „ „
১৪—১৭ „	৭—১২ „ „ ৩মাত্রা
১৮—৫০ „	১১—১৫ „ „ „
৫০—উর্দ্ধে	১০ মিনিম „ „

এই ঔষধ ক্যাষ্টর অয়েলের সহিত সেবন করান বিধি। ক্যাষ্টর অয়েলের মাত্রা আমি নিম্নলিখিত মত ব্যবহার করিয়া থাকি।

১ম	মাত্রার	সহিত	পূর্ণবয়স্কের	২আং
২য়	„	„	„ „	১আং
৩য়	„	„	„ „	১আং

আবশ্যক হইলে ইহা অপেক্ষা বেশী মাত্রাও দিতে পারা যায়।

থাইমল এবং চিনাপডিয়ম অয়েল দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইলে রোগীর যতক্ষণ পর্য্যন্ত দাস্ত বেশ পাতলা রূপে না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে কিছু খাইতে দেওয়া বিধেয় নহে। বিশেষতঃ জল দেওয়া বিশেষরূপে নিষিদ্ধ; কারণ, থাইমল ১০০ গুণ জলে দ্রব হইয়া শোষিত হয়।

অভাবে উক্ত ডিম সমূহ ফুটিতে পারে না; সুতরাং পল্লী-গ্রামে কুয়া পায়খানা মন্দের ভাল বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। এতদর্থে একোয়া প্রিভি, মন্দ নহে। বিশেষতঃ পল্লী-গ্রামে যেখানে মেথরের বন্দোবস্ত নাই, তথায় একোয়া প্রিভি অতি উত্তম জিনিষ। ইহার একটা প্রধান সুবিধা, গন্ধ ইহা হইতে বাহির [illegible] পরিষ্কারের জন্য মাত্র কয়েক বাল্‌তী জলের প্রয়োজন হয়। পিছনের ড্রেনও খুব অপরিষ্কার হয় না। প্রতি মাসে একবার মাত্র ৩।৪ বাল্‌তী জল দিলেই বেশ পরিষ্কার হয়।

ডাং গ্রিকেন সাহেব একপ্রকার কমনসেন্স পিট্ প্রিভির আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাও হুকওয়ারম জননের অনুকূল নহে। পায়খানা ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

(২) জুতা, খড়ম ব্যবহার করিলে অনেক পরিমাণে হুকওয়ারমের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

(৩) শাক সবজী ইত্যাদি ও ফল-মূলসমূহ উত্তম রূপে ধৌত করিয়া খাদ্য রূপে গ্রহণ করা উচিত।

(৪) পানীয় জল ফুটাইয়া ছাঁকিয়া পান করা বিধেয়।

(৫) গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগীয় ব্যক্তি-গণের নিকট মধ্যে মধ্যে উপদেশ গ্রহণ এবং তাহা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

(৬) অশিক্ষিত লোক-দিগকে উপদেশ দেওয়া উচিত, যেন তাহারা রাস্ত এবং মাঠ দূষিত না করে।

পল্লী-স্বাস্থ্য

কেউগুড়ি গ্রাম হইতে একজন পত্র লেখক উক্ত গ্রামের শোচনীয় নৈতিক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অবস্থা সম্বন্ধে "প্রসূনে" যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আমরা তাহা হইতে কেবল স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অবস্থার বর্ণনাটুকু উদ্ধৃত করিলাম—

গ্রামের রাস্তাঘাটের অবস্থা অতীব শোচনীয়। জল নিকাশের কোন বন্দোবস্ত নাই। জৈষ্ঠ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত গ্রাম্য পথগুলি জলকাদায় পরিপূর্ণ হইয়া থাকে ও গ্রাম্য পথের পার্শ্বে বহু সারগাদা থাকায় তাহাতে বর্ষার জল সঞ্চিত হইয়া এত দুর্গন্ধময় হইয়া উঠে যে তাহা বর্ণনতীত। পানীয় জলের অবস্থাও অতি শোচনীয়। গ্রামে বৃহৎ ও ভাল পুষ্করিণী নাই। দুই তিনটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী যাহা অছে, তাহা পঙ্কে ও শৈবালে পরিপূর্ণ। একই পুষ্করিণীর জলে লোকে স্নান করে, মলিন বসন ধৌত করে মল মূত্র ত্যাগ করে ও সেই জলই পান করিয়া থাকে। এখন পানীয় জলের পুষ্করিণীতে ৩।৪ হাতের অধিক গভীর জল কোন পুষ্করিণীতে নাই। প্রতি বৎসরই গ্রীষ্মকালে গ্রামবাসীদিগকে ২ মাইল দূরবর্ত্তী ভাগীরথী হইতে জল আনাইয়া পান করিতে হয়। যাহাদের আনিবার বা আনাইবার শক্তি নাই, তাহাদিগকে অগত্যা বাধ্য হইয়া পঙ্কিল ও দুষিত জল পান করিতে হয়।

এই সকল কারণে গ্রামটী নানা প্রকার রোগের প্রিয় আবাসস্থান হইয়া উঠিয়াছে। গত বৎসর হইতে প্রায় চারি শত লোক বসন্ত, কলেরা ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোনিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে ও এখন পর্য্যন্ত ২।৩ জন করিয়া লোক মধ্যে মধ্যে উক্ত রোগে মারা যাইতেছে। অনেক বাড়ী একবারে চিরকালের জন্য জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। গ্রামে জমী চাষ আবাদ করিবার লোকের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল হইয়াছে। এ বৎসর যেরূপ চাষী লোকের সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে লোকাভাবে অনেক জমী পতিত থাকিবে বলিয়া বিশ্বাস হয়। উক্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা এই যে যেন গ্রামটীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যাহাতে গ্রামের দলাদলি বিদূরিত হয়, স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম পালিত হইয়া গ্রামটী ধ্বংসের পথ হইতে মুক্ত হয় তাহার উপায় বিধান করিয়া দরিদ্রপ্রজাগণকে রক্ষা করেন। যদি ২।১টী পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও ১টী ইন্দারা গবর্ণমেণ্ট নিজ ব্যয়ে করিয়া দেন তবে গ্রামবাসীদের জীবন রক্ষা হয়। আশা করি, দয়ালু গবর্ণমেণ্ট আমাদের এই কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

নরম গরম দলের পেশাদারী দেশ-হিতৈষিতার কথা উল্লেখ করিয়া সহযোগিনী "রাঢ়দীপিকা" যথার্থ কথাই বলিয়াছেন,—

কলিকাতা প্রভৃতি কএকটী মুষ্টিমেয় সহরে রং তামাসার আনন্দ উৎসবে সাধারণের যোগদান দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষের কখন কখন হয় তো মনে হয় যে আমরা লক্ষ্মীর বরপুত্র, আমাদের কোন ক্লেশ নাই। বাংলার লোক-সংখ্যার একআনা রকমও বোধ হয় সহরবাসী কি না সন্দেহস্থল। অবশিষ্ট পনর আনা লোক বা ততোহধিক পল্লীবাসী। বাংলার পল্লীগ্রামে ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিমুনিয়া কলেরা বসন্তের যে কি তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে তাহা কর্ত্তৃপক্ষ বা আমাদের তথাকথিত নেতারা কতদূর ওয়াকিবহাল আছেন, তাহা আমরা সঠিক বলিতে পারি না। তবে আমাদের দুঃখের পসরা বাড়িয়া যাইতেছে বৈ কমিতেছ না দেখিয়া মনে হয় কর্ত্তারা বা নেতার দল আমাদের দুরবস্থা সম্যক পরিজ্ঞাত নহেন। দরিদ্র পল্লীবাসী দুর্ম্মূলতা বশতঃ অন্ন-বস্ত্রের জন্য যে কি নিদারুণ কষ্ট পাইতেছে তাহা বলিবার ভাষা নাই। যাহাদের কোনও প্রকারে দুবেলা কিছু অন্ন গলধঃকরণ করিবার সামান্য সামর্থ্য আছে, তাহারা দুধ ঘী প্রভৃতি পুষ্টিকর আহার্য্যের অভাবে দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। আর যাহাদের দুবেলার কোনও অন্ন সংস্থান নাই তাহারা ত মরিয়াই আছে। সুতরাং ইনফ্লুয়েঞ্জা নিমুনিয়া সহজেই তাহাদিগকে কালকবলে শীঘ্র শীঘ্র প্রেরণ করিয়া তাহাদের যন্ত্রণার অবসান করিতেছে। গ্রামে জলের পুষ্করিণী মজিয়া গিয়াছে, পবিত্র পানীয় জলের অভাবে কলেরা পল্লীগ্রামগুলিকে আপন খাসমহল করিয়া তুলিয়াছে। জল নিকাশের সুব্যবস্থা না থাকায় ম্যালেরিয়াও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে নিজ শাসন অব্যাহত রাখিয়াছে। বসন্তও সঙ্গসুখে দলে ঢুকিয়াছে। গোচারণ-ভূমি নাই, ষাঁড়ের অভাবে গাভীর বংশবৃদ্ধিও কম। পুষ্করিণীগুলি মজিয়া যাওয়ায় মাছের চাষও লুপ্তপ্রায়। তার উপর দেশের জল হাওয়াও যমের দিকে খরপ্রবাহে ধাবমান। কাজেই বাঙ্গালীজাতি যে ক্রমনিম্ন ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে এবং পল্লীগ্রামের বর্ত্তমান অবস্থার সংস্কার না হইলে বাঙ্গালী জাতি অদূর-ভবিষ্যতে মাডাগাস্কার দ্বীপের "ডো ডো" পক্ষীর দশা প্রাপ্ত হইবে সে বিষয়ের সিদ্ধান্ত কোন বিশেষজ্ঞের জ্ঞান-সাপেক্ষ নহে। প্রায় জমীদার পত্তনীদারই প্রজার রুধির শোষণে ব্যস্ত সমস্ত। মহালে হাজাশুকা অজন্মা দেখিবার চক্ষু ভগবান তাঁহাদিগকে দেন নাই। পতিত ডাঙ্গা বন্দোবস্ত করিয়া এই সকল ভূম্যধিকারী গোগ্রাস কাড়িয়া লইতেছেন, মজা পুষ্করিণী ধানী জমীতে পরিণত হইবার শুভাবসর ঘটিলে ডঙ্কা দিয়া সর্ব্বোচ্চ নজরে তাহা বন্দোবস্ত করিতেছেন, নিরক্ষর অদূরদর্শী প্রজা তাহা বন্দোবস্ত লইয়া নিজেদের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করিতেছে এবং জমীদারের সহরবাসের রসদ যোগাইতেছে। যেরূপ খর গতিতে পল্লীগ্রামসমূহ উৎসন্নের পথে অগ্রসর হইতেছে এই খর স্রোত দেশের মহামনা পুরুষ পুঙ্গবগণ (যদি কেহ থাকেন) আত্মত্যাগ ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা দ্বারা শীঘ্র প্রতিরোধ করিতে না পারিলে পল্লী সকল বোধ হয় আর ২৫ বৎসর মধ্যে জনশূন্য হইয়া যাইবে। তখন ভূম্যধিকারীগণও বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহারা স্বর্ণডিম্বপ্রসূ হংসীর পেট কাটিয়া ডিম্ব বাহির করিয়া ভবিষ্যতের আশাতরুমূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন এবং কর্ত্তৃপক্ষও অতি বিলম্বে বুঝিবেন তাঁহারা সময় থাকিতে প্রতিবিধান না করিয়া কি অপকর্ম্মই করিয়াছেন। আমাদের দরিদ্রতা দূর করিতে হইলে দেশে কৃষির উন্নতি, নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার এবং সর্ব্বাগ্রে পল্লীসমূহের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধায়ক উপায় অচিরে অবলম্বন আবশ্যক।

সম্পাদক মহাশয়ের মন্তব্যের সমর্থনকল্পেই যেন "রাঢ়দীপিকার" একজন পত্রলেখক লিখিয়াছেন—

বীরভূম জেলায় মুরারই থানায় রুদ্রনগর একখানি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম; ব্রাহ্মণ, মুসলমান এবং ইতর জাতিতে প্রায় পাঁচশত ঘর লোকের বাস। এককালে গ্রামখানি সর্ব্ববিষয়ে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। এক্ষণে বক্তব্য, এই উন্নতির বিশেষ কারণ স্বাস্থ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে গ্রামবাসীর আর সে সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য নাই বা ভবিষ্যৎ আশাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া এই গ্রামে কলেরা, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং নিমুনিয়া নামক সংক্রামক ও সর্ব্বব্যাপক রোগ ঘাঁটী বাঁধিয়াছে। গত বৎসর কয়েক মাসের মধ্যে এক নিমুনিয়াতেই প্রায় ৭০০।৮০০ শত লোকের অকালে জীবনলীলার অবসান হইয়াছিল। উৎকৃষ্ট পানীয় জলের সর্ব্বতোভাবে অভাবই ব্যারাম বৃদ্ধির প্রধান কারণ বলিয়াই অনুভূত হয়।

এই গ্রামে প্রাচীন অনেকগুলি বড় বড় পুষ্করিণী আছে। তাহা পাটা শেওলা প্রভৃতিতে আবর্জ্জনাময় এবং পঙ্কিল। ইহার সংস্কার হইলে বোধ হয় ব্যারামের প্রকোপ অনেকটা নিরাকৃত হয়।

বর্ত্তমান সময়ে ঐ নিমুনিয়াতে আক্রান্ত হইয়া অনেকে মারাও যাইতেছে। আমরা জানি এই গ্রামে একটী কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক আছে; ঐ ব্যাঙ্কে কয়েক বৎসরের চেষ্টায় প্রায় কয়েক শত টাকাও তাহার পরিচালকগণের নিকট মজুত আছে। তাহা হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকলেরই জিনিষ। উক্ত টাকার আংশিক ব্যয়ে কোন পুষ্করিণীর সংস্কার বা দুইটী ইন্দারা হইতে পারে না কি? এবিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন। আশা করি আমাদের মহামান্য মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে এই গ্রামখানির স্বাস্থ্যের পুনরুন্নতি হইতে পারে। নচেৎ যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এইরূপ ভাবে আরও কিছুদিন চলিলে এই গ্রামের দুরবস্থার পরিসীমা থাকিবে না।

বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলে স্বাস্থ্য কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না। শিলচরের সহযোগী "সুরমা" অতি ঘোর রাজনৈতিক পত্রিকা; আমরা এই কয়মাসের মধ্যে সুরমা হইতে একটীও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এবার সেই সুরমা অভিযোগ করিতেছেন—

দক্ষিণ শ্রীহট্টের সাতগাঁও পরগণায় একটি সরকারি ডিসপেন্সারি প্রতিষ্ঠিত হইবে শুনিয়া আমরা নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। এই উন্নতির যুগে শিক্ষা ইত্যাদিতে সকল স্থানই দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে সাতগাঁও পরগণা ক্রমশঃ অবনতির নিম্নসীমায় পৌঁছিতেছে। ইহার প্রধান কারণ,—স্বাস্থ্যের সহিত জাগতিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতির নিকট সম্বন্ধ। শরীর ভাল না থাকিলে মন ভাল থাকে না, এবং মন ভাল না থাকিলে মানসিক স্ফূর্ত্তি উদ্যম উৎসাহ কিছুই থাকে না; ফলে সর্ব্বপ্রকার উন্নতির দ্বারই রুদ্ধ হইয়া পড়ে। সাতগাঁও বর্ত্তমানে এই স্বাস্থ্যহীনতার কুফল হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছে। এই অঞ্চলে বহু সংখ্যক চা-বাগান খোলার পর হইতেই ম্যালেরিয়া এখানে স্থায়ী আসন পাতিয়া বসিয়া আছে। যথোপযুক্ত সেতু নির্ম্মাণ না করিয়া রেলওয়ে প্রস্তুত করাতেও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাতগাঁও ও বালিশীরার কয়েকটি গ্রামের ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিয়াছে। ইহার উপর ১৩০৪ বাংলার ভীষণ ভূকম্পনে গোঁফলা নদীর মুখ ভরিয়া যাওয়ায় স্থানীয় কৃষি ও স্বাস্থ্য দুইটিই নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

কাটোয়ার সহযোগী "প্রসূন" একটি শুভ সংবাদ দিয়াছেন—

গত ৪ঠা আষাঢ় ১৮ই জুন কাটোয়া মহকুমার অধীন গোপালপুর গ্রামে কাটোয়ার সুযোগ্য সবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র উপাধ্যায় মহাশয়ের যত্ন ও চেষ্টায় "শিবচন্দ্র দাতব্য ঔষধালয়" নামে একটী দাতব্য ঔষধালয় স্থাপিত হইয়াছে। ঐ তারিখ দিবা ৩ ঘটিকার সময় সবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে উক্ত ঔষধালয় গৃহে একটী সভা আহূত হইয়াছিল। ঐ সভায় ঐ অঞ্চলের অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়া সময়োপযোগী বক্তৃতাদি দিয়াছিলেন। আজকালকার দিনে দাতব্য ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠা যে একটী মহৎ কার্য্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা এ সংবাদে সুখী হইলাম। আমাদের আশা, উক্ত ঔষধালয়ের কার্য্য ভাল ভাবেই চলিবে।

সুপেয় পানীয় জলের আরও একটী অভাবের অভিযোগ পাঠক পাঠিকারা শুনিয়া রাখুন। মেদিনীপুরের সহযোগী "মেদিনীবান্ধব" লিখিয়াছেন:

পানীয় জলের অভাব:—

খড়্গপুর থানার অন্তর্গত বেনাপুর পোষ্টের অধীন কয়েতপুর গ্রামে ছোট বড় অনেকগুলি পুষ্করিণী আছে। কিন্তু তাহাদের একটীরও জল পানের উপযোগী নহে। অধিকাংশই দল ও পানায় পরিপূর্ণ এবং ক্রমশঃ পুষ্করিণী গুলি পঙ্কে ভরিয়া আসিতেছে। গ্রামবাসীগণের আর্থিক অবস্থা এমন নহে যে তদ্দ্বারা ঐ সকল পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করতঃ তাহার জল পানের উপযোগী করেন। কাজেই ঐ সকল দূষিত জল পান করিয়া গ্রামবাসীগণ সর্ব্বদাই নানারূপ রোগগ্রস্ত হইতেছে। পূর্ব্ব এই গ্রামটীর লোক সংখ্যা প্রায় ৫০০ শতেরও অধিক ছিল। ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে ইঁহার লোক সংখ্যা এতই হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে যে এক্ষণে গ্রামের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষে দেড়শত হইবে কি না সন্দেহ। কারণ অনুসন্ধানে সহজেই অনুমিত হয় যে, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই ভাবে আর কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইলেই গ্রামটীর অস্তিত্ব থাকিবে কি না সন্দেহ। ইতিপূর্ব্বে যখন স্বর্গীয় বাবু প্যারীলাল ঘোষ এম-এ, বি-এল মহোদয় লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন, তখন তিনি এই গ্রামের অবস্থা অবলোকন করতঃ লোক্যাল বোর্ডের সাহায্যে দুইটী কূপ খনন করাইয়া দিবেন বলিয়া গ্রামবাসীদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। পল্লীগ্রামে পুষ্করিণীর জল সর্ব্বদা বিশুদ্ধ রাখা সম্ভবপর নহে; সেইজন্য কূপ খননের ব্যবস্থা হইয়াছিল। অতএব এই গ্রামে জেলা বোর্ডের সাহায্যে দুইটী কূপ খনন করিয়া দিয়া ব্যাধি পীড়িত গ্রামবাসীগণকে ব্যাধিমুক্ত করিবার জন্য আমরা বোর্ডের নূতন বে-সরকারী চেয়ারম্যান মহোদয়ের করুণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বর্ষাগমের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলের স্বাস্থ্য আবার খারাপ হইতে চলিল। পূজা আসিতেছে—কোথায় লোকে মা আনন্দময়ীর আগমনে উৎফুল্ল হইবে, না, ম্যালেরিয়া, জ্বর, প্রভৃতি পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত থাকিবে,—বৎসরকার দিনের আনন্দোচ্ছ্বাস নিরানন্দে পরিণত হইবে। প্রতি বৎসরই প্রায় সমগ্র বঙ্গের এইরূপ অবস্থা যাইতেছে। এখন হইতেই তাহার সূচনা হইতে চলিল। কাঁথির সহযোগী "নীহার" সংবাদ দিয়াছেন,—

কেবল "নীহার" কেন, "খুলনা"ও ঐ সুর ধরিয়াছেন—

স্থানে স্থানে জ্বরের প্রাদুর্ভাব।

বর্ষা সমাগমে খুলনার লোকের প্রধান ভয় ম্যালেরিয়া। জ্বরের ড্রেণগুলি নিতান্ত অসম্পূর্ণ। জল নিঃসরণের সুব্যবস্থা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ স্বাভাবিক যাহা ব্যবস্থা আছে, তাহা যদি মানুষের হাতে পড়িয়া বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত না হইত, তবে খুলনা সহরে জল নিঃসরণের জন্য কোনই চিন্তা করিতে হইত না। ভৈরব ও রূপসা যে সহরের দুইদিকে বিরাজিত এবং সহরের দক্ষিণ ভাগ ক্রমে নিম্ন হইয়া বিলের দিকে জল নিঃসরণের উপায় হইয়া রহিয়াছে, সে সহরেও যে পশ্চিম পার্শ্বস্থ ড্রেণের জল বর্ষার সময় আটকাইয়া থাকে, ইহাই খুলনার স্বায়ত্ত শাসনের কলঙ্ক স্বরূপ পরিব্রাজক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সহরের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগটী এমন জঙ্গল ও আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ যে কোনও পল্লীগ্রামেও এই প্রকার কদর্য্য দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় না। আমরা প্রতি বৎসর চীৎকার করিয়া গলা ভাঙ্গি—কিন্তু মুচি পাড়ার ও ঝি পাড়ার স্বাস্থ্যের জন্য চিন্তা করা মিউনিসিপ্যালিটির শিক্ষিত সদস্যগণ বোধ হয় ঘৃণা বোধ করেন। বাজার কোয়াটারে সাধারণের মল মূত্র ত্যাগের কোনও সুব্যবস্থাই নাই। বোধ হয় পল্লী সন্নিকটে বলিয়া ঐ প্রকার ব্যবস্থা অনাবশ্যক বিবেচিত হয়। ধারায় কুইনাইনও যথেষ্ট পরিমাণে নাই; ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আরম্ভ হইলে যে কি উপায় হইবে, তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। ফেরিঘাট রোডের পার্শ্বস্থ ড্রেণটীর সংস্কার কার্য্য হইতেছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি; কিন্তু সিমেটি রোডের পার্শ্বস্থ ড্রেণটীর বন্দোবস্ত কেন হইল না ইহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। এই দুই রোডের মধ্যস্থিত অস্বাস্থ্যকর বস্তি ও জনাকীর্ণ স্থানগুলিকে সহরের উপযুক্ত করিবার ক্ষমতা বা অধিকার কি মিউনিসিপ্যালিটীর নাই?

"খুলনার" এ অভিযোগ ন্যায়সঙ্গত। অনেক সময়েই মানুষ খোদার উপর খোদকারী করিতে গিয়া নিজেদেরই অসুবিধা ঘটাইয়া থাকে। "খুলনা"র প্রতিবাসী "যশোহরের" অভিযোগও ঐ একই রূপ—

বর্ষার বারিপাতের সঙ্গে সঙ্গে যশোহর সহর এবং সহরতলীর গ্রামসমূহে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে; আমাদের মনে হয় যতদিন পর্য্যন্ত ভৈরব নদের সংস্কার সাধন না হইবে, অথবা যশোহর মিউনিসিপ্যালিটী সহরের ড্রেইন সংস্কার করিতে না পারিবেন; ততদিন সহরের স্বাস্থ্য তেমন ভাবে উন্নত হওয়া অসম্ভব। মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ অবিলম্বে সহরের ড্রেণ সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, এরূপ কথা অনেক দিন হইতেই আমরা শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার কিছুই হইতেছে না। সহরের বাড়ী ঘরের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে মিউনিসিপ্যালিটীর কাজ আরিও অনেক বাড়িয়াছে। কিন্তু কার্য্যতঃ সহরের তেমন কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না বলিয়া অনেকেই দুঃখিত। আমরা আশা করি, কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণের মনোভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইবেন।

আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ আন্দোলন করিয়া আসিতেছিলাম যে, স্কুলের বালক বালিকাগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা হউক; পীড়িত ছাত্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা হউক। এত দিনে আমাদের আন্দোলন কতকটা সফল হইতে চলিল দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। পাক্ষিক সহযোগিনী সম্মিলনীতে এই সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে—

ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা।—বঙ্গদেশের সেনিটারী কমিশনার ডাক্তার বেণ্টলি এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন যে বঙ্গদেশের বালিকাবিদ্যালয় সমূহের ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার নিমিত্ত এক জন মেডিকেল ইন্সপেক্ট্রেস্ নিযুক্ত হইবেন। এই পদের প্রারম্ভে বেতন মাসিক ২৫০ টাকা। ৩০৲ করিয়া বেতন বাড়িয়া মাসিক বেতন ৫০০৲ পর্য্যন্ত হইবে। এইপদে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল উপাধি প্রাপ্তরা নিযুক্ত হইবে। পদ প্রার্থিনীদিগকে কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বঙ্গের স্বাস্থ্য কমিশনার মহাশয়ের নিকটে আবেদন করিতে হইবে। এই স্বাস্থ্যপরীক্ষাকারিণী পরিদর্শিকার নিয়োগে বালিকাগণের স্বাস্থ্যনীতির প্রতি অধিকতর মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে দেশের যথার্থ কল্যাণ সাধিত

হইবে। বালকদের স্বাস্থ্য পরিদর্শনেরও ব্যবস্থা হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

কুমিল্লা সহরে জলের কল হইতে চলিল। ত্রিপুরা হিতৈষী এই শুভ সংবাদ দিতেছেন—

কুমিল্লা জলের কল—স্যানটারি বোর্ড হইতে কুমিল্লা জলের কলের স্কীম মঞ্জুর হইয়াছে। ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুরের নিকট হইতেও ৫০০০০৲ টাকা পাওয়া যাইবে। সুতরাং এখন কোন কিছুর অভাব আছে বলিয়া মনে হয় না। এরূপ অবস্থায় জলের কলটি যাহাতে শীঘ্র হইয়া যাইতে পারে তাহাই আমরা চাই।

জলের কল ত হইবে। কিন্তু তাহার নিত্য ব্যয়ের কথাটাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। অতিরিক্ত করভারে গরীব প্রজারা যেন মারা না যায়।

আলোচনা।

জেলা বোর্ডের সদনুষ্ঠান।—

ঢাকার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড একটী সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছেন। তাঁহারা আপাততঃ পাঁচজন ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া পাঁচটী গ্রামে স্থাপন করিতেছেন। এই সকল ডাক্তার বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিলের রেজিষ্ট্রিভুক্ত (অর্থাৎ রীতিমত qualified) হইবেন। তাঁহারা যে যে গ্রামে অবস্থিত হইবেন, সেই সেই গ্রামের চতুর্দ্দিকে ৫ মাইল ব্যাসার্দ্ধের মধ্যে যতগুলি স্কুল পড়িবে, সেই সকল স্কুল তাঁহারা মাসে একবার করিয়া পরিদর্শন করিবেন, এবং সেই সমস্ত স্কুলে যে সকল পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগী ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে, তাহাদিগের বিনামূল্যে চিকিৎসা করিবেন। তিনি যে যে গ্রামে স্কুল পরিদর্শন করিতে যাইবেন, এবং যে সকল বালকের চিকিৎসা করিবেন, তাহার একটী রেজিষ্টার রাখিবেন; এবং যখনই কোন সবডিভিসনাল অফিসার, বা জেলা বোর্ডের কোন সদস্য অথবা বোর্ডের হেল্‌থ্ অফিসার ঐ রেজিষ্টার দেখিতে চাহিবেন, তখনই তাহা তাঁহাকে দেখাইবেন। আর, বোর্ড যখনই বলিবেন, তখনই তিনি স্কুলসমূহে ছাত্রদের সামনে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যের ছবি দেখাইয়া বক্তৃতার ধরণে তাহাদের ব্যাখ্যা করিবেন। বোর্ড অবশ্য যন্ত্রতন্ত্রাদি সরবরাহ করিবেন। আর, তিনি বিনা পারিশ্রমিকে বেসরকারী যে সকল রোগীর চিকিৎসা করিবেন, তাহারও একটা রেজিষ্টার রাখিবেন, এবং পূর্ব্বোক্ত ধরণে প্রয়োজন হইলেই দেখাইয়া দিবেন। কাজটী অতি চমৎকার। দেশের ভবিষৎ আশা ভরসারস্থল ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে এই যে সুব্যবস্থার সূচনা হইল, পরিণামে ইহার ফল নিশ্চয়ই ভাল হইবে। ওদিকে, বালিকা বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য লেডী ডাক্তার নিয়োগের যে ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার বিবরণ পাঠক পাঠিকারা এ মাসের "পল্লী স্বাস্থ্য" প্রবন্ধে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু, ঢাকা জেলা বোর্ড ছাত্রগণের কেবল ম্যালেরিয়া রোগের পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিলেন কেন? ছাত্র মাত্রেরই যে কোন রোগ, বিশেষতঃ চক্ষু সংক্রান্ত রোগে পরিদর্শন ও তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা হইলে আমাদের মনে হয়, আরও ভাল হইত। যে যাহা হউক, আমরা একেবারে বেশী পীড়াপীড়ি করা সঙ্গত মনে করি না। আরম্ভ যখন উত্তমরূপে হইতেছে, তখন তাহার ফল ভাল হইতে দেখিলে এবং প্রয়োজন বুঝিলে অন্যান্য রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থাও হইবে, এরূপ আশা করিতে পারা যায়।

৫ কোটী টাকা চাই।—

লণ্ডনের লর্ড মেয়র সাহেব ইম্পীরিয়াল ওয়ার রিলিফ ফণ্ডের তরফ হইতে, ইয়োরোপের যে সকল স্থল যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই সকল স্থলের রোগ নিবারণ ও মানবের দুঃখ দুর্দ্দশা দূরীকরণ কল্পে অবিলম্বে ১০ লক্ষ পাউণ্ড চাঁদা তুলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং এইরূপ সংবাদ পাঠাইয়াছেন। এই তহবিলে দানের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানের ন্যায় ভারতবর্ষও আহূত হইয়াছে। মানবজাতির মঙ্গলের জন্য এই যে প্রচেষ্টা, ইহার আমরা সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করি। কিন্তু, এই সঙ্গে আমরা নিজেদের ভাবনাও ভাবিতে চাই। স্বাস্থ্য বিষয়ে ভারতের অবস্থা, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের অবস্থা, কোন ক্রমেই লোভনীয় নহে। দেশের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সম্বন্ধে বঙ্গদেশ পৃথিবীর কোন দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে সমর্থ। এমন এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে, এ বিষয়ে পৃথিবীর কোন দেশই বঙ্গদেশের সমকক্ষ নহে। কি মারক ব্যাধি, কি জন্ম মৃত্যুর হার; কোন বিষয়েই বঙ্গদেশকে অপর কোন দেশ পরাজিত করিতে পারে না। সুতরাং স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান কল্পে, রোগের মারকতা নিবারণ বিষয়ে মনুষ্যত্বের উপর, জনহিতৈষণা প্রবৃত্তির উপর বঙ্গদেশের দাবী প্রচুর। ইয়োরোপে স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনের জন্য ভারতবর্ষ টাকা দান দিবে। কিন্তু বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনের ভাবনা কি কেহ ভাবিবেন না? লণ্ডনের মেয়র ইয়োরোপের রণরঙ্গ স্থলগুলির অস্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রতিকারের জন্য চাঁদা তুলিতেছেন, বেশ কথা। কিন্তু, তাঁহার নিজের ঘরের লোক,—বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটী প্রধান অংশের অধিবাসীরা যে নানা রোগে প্রতিবৎসর পঙ্গপালের মত মরিতেছে, ইহাদের জন্য তাঁহার কিছুই করিবার নাই? করিলে, তাঁহার কাজে খুব সমদর্শিতা প্রকাশ পাইত,—মানব-হিতৈষণা প্রকৃতই চরিতার্থ হইতে পারিত।

ফ্রান্সে লোকরক্ষা।—

ফরাসী জাতি বড় সৌখিন। সেইজন্য তাহারা ঘরকন্নার, গৃহস্থালীর, ছেলেপুলের হাঙ্গামা পোহাইতে নারাজ। সেইজন্য তাহারা বিবাহের দায়িত্ব ঘাড়ে লইতে, পত্নীর সকল ভার বিশেষ রূপে 'বহন' করিতে অর্থাৎ 'বিবাহ' করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। তাই, ফ্রান্সের লোকসংখ্যা নিয়মিত ভাবে কমিয়া যাইতেছে। যুদ্ধের বহু কাল পূর্ব্ব হইতেই ফ্রান্সের এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। তার উপর গত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের বিস্তর লোকক্ষয় হইয়াছে। সমর্থ সবল যুবাপুরুষ মাত্রেই—অর্থাৎ, যাহারা সন্তান প্রজনন করিয়া জাতিকে রক্ষা করিবার উপযুক্ত, এমন লোক সকল যুদ্ধে হয় মরিয়াছে, না হয় আহত হইয়া চিরদিনের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। এখন ফ্রান্সে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের, সন্তান গর্ভে ধারণক্ষমা যুবতী ও প্রৌঢ়ার সংখ্যা পুরুষের অপেক্ষা অনেক বেশী। সেই জন্য ফরাসী গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। ফরাসী জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য নানারকম মতলব খাটানো হইতেছে; অনেকে অনেক রকম পরামর্শ দিতেছেন। ফরাসী গবর্ণমেণ্টের এখন মহা বিপন্ন অবস্থা। গভীর সমুদ্রের মাঝখানে প্রবল ঝড় উঠিলে জাহাজ যেমন বিপন্ন হইয়া উঠে, ফ্রান্সের গবর্ণমেণ্টেরও এখন সেইরূপ Any port in the storm! অবস্থা। কাজেই, এখন যে যা পরামর্শ দিতেছে ফরাসী গবর্ণমেণ্টও তাহাই শুনিতেছেন, তদনুসারে কাজ করিতেছেন। ফরাসী যুবকদের বিবাহ করিয়া গৃহী হইতে বাধ্য করিবার জন্য অবিবাহিত যুবকদের উপর কর বসানো হইতেছে, বিবাহিত দম্পতিকে নানারূপ সুবিধা দেওয়া হইতেছে; সন্তানের জননীদিগকে বৃত্তি দানের ব্যবস্থা হইতেছে। সম্প্রতি ডাক্তার পল কার্গো প্যারী মেডিক্যাল জর্ণালে এক অপূর্ব্ব প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার মতে এখন ফরাসী জাতির যেরূপ অবস্থা তাহাই চলিলে,

তাহার কোন প্রতিকার না হইলে, ২০ বৎসরের মধ্যেই ফরাসী জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। ফ্রান্সে এখন সন্তানের জননী হইবার উপযুক্ত নারীর সংখ্যা ২০০০০০০। ইহাদের বিবাহ হইবার সম্ভাবনা নাই,—কারণ, যুদ্ধে লোকক্ষয়ের দরুণ, যাহাদের ইহারা স্বামিত্বে বরণ করিতে পারিত, তাহারা হতাহত হইয়াছে। সমগ্র ইয়োরোপে এখন পুরুষের অপেক্ষা নারীর সংখ্যা ১৫০০০০০০ বেশী। ডাক্তার কার্ণো বলেন, লোক-রক্ষার্থ যে দুইটা প্রস্তাব হইয়াছে তাহা একেবারেই অকর্ম্মণ্য। ফরাসী নারীদের বৈদেশিকগণের সহিত বিবাহ দিলেও কিছুই হইবে না; ফরাসী পুরুষেরা বহু বিবাহ করিলেও কোন ফল ফলিবে না। ডাক্তার কার্ণোর আপত্তি সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, ফরাসী নারীদের বিদেশীদের সঙ্গে বিবাহ দিলে ফ্রান্সের লোক সংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে কি সুবিধা হইবে? যে সকল বিদেশী আসিয়া ফরাসী নারীকে বিবাহ করিবে, তাহারা বিবাহের পর স্ত্রী লইয়া স্বদেশে চলিয়া যাইবে। আর, বিদেশী পুরুষই বা পাওয়া যাইবে কোথায়? সব দেশেই ত পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা বেশী। গোটা ইয়োরোপে পুরুষের অপেক্ষা এখন দেড় কোটী বেশী স্ত্রীলোক রহিয়াছে। আর, ফরাসী পুরুষেরা যখন একটা স্ত্রীর দায়িত্বই ঘাড়ে লইতে নারাজ, তখন তাহারা যে একাধিক বিবাহ করিতে কখনই রাজী হইবে না, তাহাও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। অতএব, জলে নিমজ্জনোন্মুখ ব্যক্তির তৃণ ধারণের ন্যায় ডাক্তার কার্ণো প্রস্তাব করিতেছেন, বিবাহ প্রথাই একেবারে তুলিয়া দাও। সমগ্র ফ্রান্সের নরনারী একটী মাত্র পরিবারে পরিণত হউক এবং ষ্টেট তাহাদের গৃহস্থালীর ও সংসারের ভার গ্রহণ করুন। আর স্ত্রীপুরুষ অবাধে মিলিত হইয়া সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি করুক। কাহারও ঘাড়ে কোনরূপ দায়িত্ব থাকিবে না—ষ্টেট সকল ভার নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া ফরাসী জাতিকে রক্ষা করুন। এরূপ ব্যবস্থা হইলে, কোন কালেও যাহাদের বিবাহ হইবার সম্ভাবনা নাই এমন স্ত্রীলোকেরাও জননী হইতে পারিবে; অতএব ফ্রান্সের লোক সংখ্যা নিশ্চয়ই বাড়িয়া যাইবে। এই সকল শিশু ও জননীর ভরণ পোষণের ভার লইবে ষ্টেট। ডাক্তার কার্ণোর প্রস্তাবটি যে অভিনব তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবানের জীবসৃষ্টি প্রক্রিয়ার নিয়মানুসারে ইহা হয় ত ফলপ্রদও হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী মানব, যে নিজ বুদ্ধি বলে, বিবেচনা শক্তির বলে সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে, জ্ঞান বিজ্ঞানের এতটা উন্নতি করিয়াছে, সে কি আবার সেই আদিম যুগের মানুষের মত পশু-বৃত্তিতে ফিরিয়া যাইতে পারে? ইহা যে একেবারেই অসম্ভব!

মফঃস্বলে মেডিক্যাল স্কুল।

অভাব বোধ না করিলে প্রতিকারের উপায়ও করা যায় না। এখন প্রায় সকলেই বাঙ্গলার মফঃস্বলে অধিক সংখ্যক মেডিক্যাল স্কুলের অভাব বোধ করিতেছেন; এবং একে একে এক একটী জেলায় একটী করিয়া মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে ময়মনসিংহে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। এখন আবার চট্টগ্রাম জেলায় একটী মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে। এইরূপ মেডিক্যাল স্কুলের সংখ্যা মফস্বলে যতই বেশী হয়, ততই ভাল হয় বলিয়া আমরা মনে করি। ইহাতে যেমন একদিকে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে জন সাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারে সাহায্য করিবে, তদ্রূপ অনেক মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট এই সকল স্কুলে অধ্যাপকতা করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্র্যাকটিস করিয়া অন্নসংস্থানের উপায় করিতে পারিবেন; আবার, এই সকল স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা গ্রামে গ্রামে প্র্যাকটিস আরম্ভ করিলে, গ্রামবাসীদের সুচিকিৎসকের অভাবও কতকটা দূর হইবে। অতএব, এরূপ মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৯ম বর্ষ } আশ্বিন, ১৩২৭ সাল { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিলাতে ভারতীয় চিকিৎসক।

লেখক—শ্রীসন্ত নিহাল সিংহ।

ভারতীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত চৌরী মুখু এখন বিলাতবাসী হইয়া গিয়াছেন। যক্ষ্মারোগ আরোগ্য করার কার্য্যে তিনি বিলাতে এক জন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। তাঁর আন্তরিক চেষ্টায় ও সুদক্ষ চিকিৎসায় বিলাতের অনেক রোগী সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিতেছে। বিলাতে ভারতীয় চিকিৎসকদের মধ্যে তাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিলাতের সমারসেট্‌শায়ার প্রদেশে ওয়েল্‌স্ নগরে তিনি তাঁর চিকিৎসাগার স্থাপন করিয়াছেন। ওয়েল্‌স্ নগর লণ্ডন হইতে প্রায় চার ঘণ্টার পথ। একটি সুন্দর প্রশস্ত উপত্যকার উপর ইহা অবস্থিত। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড়। লণ্ডন হইতে যে প্রধান রেলপথ আছে, তাহা দিয়াই ওয়েল্‌সে আসা যায়। রেলপথটি বড় বড় বীচ-গাছের ঘন বনের পাশ দিয়া, ঝাউ (পাইন) ও অন্যান্য সরল গাছের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। এমনি মনোরম মুক্ত ও নির্জ্জন জায়গায় ডাক্তার মুখুর চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠিত। চিকিৎসাগারটির অবস্থানই রোগীদের পক্ষে আনন্দদায়ক।

কোন রোগী এখানে আসিয়া পৌঁছিলেই তাকে প্রথমে অভ্যর্থনা-ঘরে লইয়া যাওয়া হয় এবং একজন প্রধান সেবিকা তাকে চা খাইতে দিয়া যায়। তারপর সেখানকার ম্যানেজারের সহিত তাকে দেখা করিতে হয়। এবং পরে সেখানকার প্রধান চিকিৎসক চৌরী মুখুর কাছে তাকে লইয়া যাওয়া হয়; তিনি রোগের সমস্ত বিবরণ শুনিয়া রোগীর থাকিবার ঘর বা শয্যা নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

রোগীদের থাকিবার ঘরগুলি আধুনিকভাবে তৈরী। প্রত্যেক ঘরের পিছনে ও সাম্‌নে একটি করিয়া বারাণ্ডা, দরজা দক্ষিণ দিকে। দরজার সাম্‌নে যতদূর চোখ যায় বরাবর দেবদারু-গাছের সারি। ঘরের ভিতর একটি খাট, মুখ ধুইবার পাত্র ও খাবার রাখিবার জন্য টানা-দেওয়া একটি ছোট টেবিল. একটি বই-রাখিবার জায়গা ও একখানি চেয়ার। ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো এবং ঠাণ্ডা ও গরম জলের ব্যবস্থা আছে এবং গরম জলের বাষ্পযন্ত্রে ঘরগুলি গরম। ঘরের দেয়ালে রোগীদের পরিচর্য্যার নানাবিধ ব্যবস্থার তালিকা, দৈনিক খাদ্য-

তালিকা এবং শরীরের উত্তাপতালিকা ঝোলানো থাকে।

ডাক্তার মুথু স্বয়ং এই ঘরগুলির পরিকল্পনা করেন। ঘরগুলি এমনভাবে তৈরী ও দরজা জানালা এমনভাবে বসানো, যে, ঘরের কোন অংশে বদ্ধ বায়ু দাঁড়াইতে পারে না; সব জায়গাতেই মুক্ত হাওয়া যাওয়া-আসা করিতেছে।

চিকিৎসাগারে ভর্ত্তি হওয়ার প্রথম সপ্তাহটা রোগীদের বিশ্রাম করিতে হয়। রোজ বিকালে তার দেহের উত্তাপ যদি বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে তার বিশ্রামের কাল আরো বাড়াইয়া দেওয়া হয়। রোগী একটু স্থির হইলে তার দৈহিক ব্যায়াম করা আরম্ভ হয়। একটু একটু করিয়া রোগীকে বেড়াইতে হয়,—প্রথমে পাঁচ মিনিট, পরে দশ মিনিট, এবং ক্রমে ক্রমে এক ঘণ্টা। সকালে বেড়াইতে হয় সওয়া এক ঘণ্টা, বিকালে এক ঘণ্টা। শরীরের উত্তাপ ও ফুস্‌ফুসের ভাল মন্দ অবস্থার অনুপাতে রোগীর ভ্রমণ বাড়ানো ও কমানো হয়।

ঝড়জলের দিনে বা যেদিন বরফ পড়ে সেদিন রোগীদের ব্যায়াম করিবার জন্য ঝাউগাছের বাগানে পাঠানে হয়, সেখানে খানিকটা জায়গা ঝড়বৃষ্টি হইতে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। তার তলায় রোগীরা ব্যায়াম করে। চিকিৎসাগারের এই ব্যবস্থাটি উল্লেখযোগ্য। জায়গাটিতে কোন ব্যস্ততা, কোন গোলমাল নাই, চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ। গাছের মধ্য দিয়া যে বায়ুর হিল্লোল ছুটিয়া আসে, তাতে রোগীদের শিরা-উপশিরায় পরিতৃপ্তি আনিয়া দেয়, চারিদিককার উন্মুক্ত প্রকৃতি ও ঝাউগাছের সুগন্ধ রোগীদের ক্লিষ্ট বক্ষে শীতল হস্ত বুলাইয়া দিয়া যায়।

রোগী একটু একটু করিয়া আরোগ্য হইতে থাকিলে ভ্রমণ ছাড়া তাকে জোরে জোরে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করিতে ও গান গাহিতে শিখিতে হয়, কাঠ কাটিতে হয়, কাঠ চিরিতে হয়, ঝাঁদা দিয়া কাঠ পরিষ্কার করিতে হয়, বাগানে গাছপালার পরিচর্য্যা করিতে হয়, এবং এইরূপ অন্যান্য বিবিধ অল্পপরিশ্রমের কাজ করিতে হয়। রোগীর অবস্থা অনুযায়ী কাজ গুরু ও লঘু হয়। এ সমস্ত কাজের উদ্দেশ্য—রোগীর শরীরে বলসঞ্চয় করা, ফুস্‌ফুস্ বিস্তৃত করানো এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শক্তি বৃদ্ধি করা। এইরূপে রোগীর পুষ্টি সাধিত হয় ও ফুস্‌ফুস্ ক্রমে ক্রমে রোগমুক্ত হইতে থাকে।

এই-সব ব্যায়ামের মাঝে মাঝে বিশ্রামের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে - তার মধ্যে প্রধান—দুপুরের আহারের আগে ও রাত্রের আহারের আগে বিশ্রাম। রোগীদের খাদ্যের উপর ডাক্তারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তাঁর মতে রোগীদের তিনবার খাবার দেওয়া উচিত, চার ঘণ্টা অন্তর। রোগীদের বেশী খাওয়ানোর তিনি পক্ষপাতী নন। জার্ম্মানীতে রোগীকে অতিরিক্ত পুষ্টি দিবার যে ব্যবস্থা আছে, ডাক্তার মুথুর মতে তাহা অকর্ত্তব্য। কেন না, ইহাতে ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্তস্রাব, পেটের বিশৃঙ্খলা বা অপর কিছু অহিত ঘটিত পারে। রোগীরা যাতে টাট্‌কা তাজা খাবার পায় ডাক্তার মুথুর সেদিকেও তীব্র দৃষ্টি। রোগীরা তাজা মাংস, সেখানকার বাগান হইতে আহৃত তাজা তরকারী, ও টাট্‌কা দুধ খাইতে পায়। বাসি দুধ, ফোটানো দুধ বা ডাক্তারী প্রণালীতে তৈরী দুধ, বা বাসি খাবার, টিনে-করা খাবার, জমানো বা মিশ্রিত খাবার তাঁর মতে যক্ষ্মারোগীদের দেওয়া উচিত নয়। এ-সব খাদ্যে যক্ষ্মারোগের বৃদ্ধিই হইতে থাকে এবং রোগীর শরীর-পুষ্টির জন্য যে সব প্রক্রিয়ার প্রয়োজন তার ব্যাঘাত ঘটে।

চিকিৎসাগারে বেলা ৯টা, ১১টা ও সন্ধ্যা ৭টায় তিনবার রোগীদের খাবার দেওয়া হয়। রোগীরা একে একে ঠিক সময়ে খাইবার দালানে হাজির হইতে থাকে। ডাক্তার মুথু এমনি শৃঙ্খলাপ্রিয়, যে, কোন রোগীর আসিতে এক মিনিট দেরী হইলে তাকে জরিমানা-স্বরূপ দাতব্যভাণ্ডারে এক পেনি (এক আনি) জমা দিতে হয়।

ডাক্তারের প্রতিষ্ঠানের কথা ছাড়িয়া দিয়া এবার স্বয়ং চৌরী মুথুর সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক। চৌরী মুথুই এখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা, এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ। সকল দিকেই তাঁর সযত্ন দৃষ্টি। তাঁর সহকর্ম্মী আছেন—একজন অধ্যক্ষ, একজন প্রধান সেবিকা এবং কতকগুলি শুশ্রূষাকারিণী। তবে ডাক্তার মুথু স্বয়ং সমস্তই পর্য্যবেক্ষণ করেন। তাঁর চরিত্রে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য চরিত্রের সমস্ত ভালো গুণের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।

৫৫ বৎসর পূর্ব্বে মান্দ্রাজ প্রদেশে ডাক্তার মুথুর জন্ম হয়। তাঁর পিতা মাতা উভয়েই খৃষ্টিয়ান ছিলেন। মুথু বিলাতে আসিয়া কিংস্ কলেজে অধ্যয়ন করেন। সেখানে উপাধি গ্রহণ করিয়া লণ্ডনসহরের প্রান্তদেশে কিছুদিন চিকিৎসা-কার্য্য করেন। তারপর ইয়োরোপের নানা দেশে ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারীর উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতীয় চিকিৎসারীতি সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। ভারতীয় চিকিৎসা-রীতির তিনি যতই আলোচনা করেন ততই তিনি দেখিয়া বিস্মিত হন যে ভারতীয় প্রাচীন চিকিৎসকেরা মানুষের প্রকৃতির গুপ্ততম ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁরা বিবিধ রোগের হেতু অনুসন্ধানে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এবং প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করিয়া রোগ নিবারণের এমন কতকগুলি বিশদ প্রণালী আবিষ্কার করেন যাহা আজকালকার বৈজ্ঞানিকরা অবধি যুক্তিযুক্ত ও বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া মানিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করিবেন না।

সভ্যতার প্রভাবে যে সমস্ত রোগের আবির্ভাব হইয়াছে, ডাক্তার মুথুর মতে, যক্ষ্মা বা ক্ষয়কাশ তাদের মধ্যে একটি। দুই রকমে ইহার উৎপত্তি;—প্রথম, সভ্যতার নানা ব্যতিব্যস্ততায় মানুষকে অধিক খাটিতে হয় ও অধিক জাগরণ করিতে হয়; তা ছাড়া অতিশয় উত্তপ্ত ঘরে কাজ করা, অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদের উত্তেজনা, অতিরিক্ত কাজের জন্য ক্লান্তি এবং নানা স্ফূর্ত্তিতে মাতিয়া যাওয়া প্রভৃতিতে মনের প্রকৃতিগত স্থৈর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। দ্বিতীয় কারণ, কাজের খাতিরে সহরের মধ্যে বোঝাই-করা গাড়ীর মত অনেক মানুষকে একত্র বাস করিতে হয়, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকেরা নীচের তলায় ও আবর্জ্জনাময় বস্তিতে জীবন কাটায়, সেখানে মুক্ত হাওয়া বা আলোকের দেখা পাওয়া ভার, তার উপর এই-সব লোকে যা খাদ্য খাইতে পায় তাতে শরীর পুষ্টির কোনই সাহায্য হয় না। বিশেষতঃ গরীবেরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেষ্টনীর মধ্যে বাস করে, পুষ্টিকর খাদ্য পায় না ও আর্থিক দুরবস্থায় জীবনযাপন করে। সভ্যতার এইসব অনিবার্য্য কারণে মানুষের প্রকৃতির সহজ ক্রিয়াপ্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়, ভুক্ত খাদ্যের বিপরীত ক্রিয়া হইয়া থাকে। ক্ষয়কাশ বা যক্ষ্মা রোগ হওয়ার মূলে এইসব কারণ বিশেষরূপে বর্ত্তমান।

ক্ষয়রোগের বীজ বাহির হইতে আসিয়া কিরূপে এই রোগ বৃদ্ধি করে সে-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ডাক্তারদের অনেক মতামত। রোগের বীজাণুতত্ত্ববিদ ক্ষয়কাশের বীজ আছে এ-কথা স্বীকার করেন। ডাক্তার মুথু বলেন অনেক স্থলে ক্ষয়কাশ ফুস্‌ফুসে জন্মায় এবং ডাক্তাররা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও কোন বীজ দেখিতে পাইবেন না। ডাক্তাররা না কি ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিতেছেন যে যক্ষ্মারোগের জীবাণুর পাশেই দেখা যায় ভুক্ত দ্রব্যের বিকৃত পরিপুষ্টি, তারপরেই মানসিক বিকৃতি। অপর কথায় এই দাঁড়ায় যে যাকে যক্ষ্মা আক্রমণ করে তার শরীর রোগ গ্রহণের পক্ষে পূর্ব্ব হইতেই অনুকূল হইয়া থাকে। লোকের ভিতরটা সুস্থ ও সবল থাকিলে প্রবলতম জীবাণুও আক্রমণে সফল হয় না। অভিজ্ঞতা হইতে মুথু এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে এই রোগ অস্বাস্থ্যকর পরিবেষ্টনীর জন্য যত শীঘ্র উৎপন্ন হয়, জীবাণুর আক্রমণে তত হয় না।

বিলাতের ল্যান্‌সেট নামের একটি পত্রিকায় ডাক্তার মুথু সম্প্রতি লেখেন যে যক্ষ্মার জীবাণু ব্যতীতও যক্ষ্মারোগী পাওয়া গিয়াছে, যেমন জীবাণু ছাড়াও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার রোগী পাওয়া যায়। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে তাঁর চিকিৎসাগারে যে-সব রোগী আসিয়াছে তাদের মধ্যে শতকরা ৩০ জনের ফুস্‌ফুসে জীবাণু দেখা যায় না। আবার এমন লোকও তিনি দেখিয়াছেন- যাদের শরীরের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে জীবাণু দেখা গিয়াছে অথচ যাদের মধ্যে যক্ষ্মার অন্য কোন লক্ষণই দেখা যায় নাই। আবার পেটি ও মেণ্ডেনহল নামে দু'জন ডাক্তার হেন্‌রি ফিপ্‌স্ ইন্‌স্টিটিউটে দুজন টাইফয়েড রোগীর রক্তে যক্ষ্মার বীজ দেখিতে পান।

আমার সহিত এ-বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ডাক্তার মুথু বলেন যক্ষ্মারোগের প্রথম অবস্থাটি জীবাণুর বাসা বাঁধিবার অবস্থা। সে সময়ে রোগীর দেহের উত্তাপ ৯৯ ডিগ্রি বা ৯৯·৬ ডিগ্রির উপরে উঠে না। ফুস্‌ফুসের এক দিক বা দুই দিক অল্প একটু জায়গায় রোগাক্রান্ত হয়। তখন রোগীর ক্ষুধা বেশ থাকে, ঘুমও বেশ হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে কাশি হয়। মুথুর মতে রোগীর এই অবস্থার তিনটি ভাগ করা যাইতে পারে:—

প্রথম, রোগী একটু খিটখিটে হয়, অনিদ্রায় ভোগে এবং দুর্ব্বল বোধ করে। স্ত্রী-রোগীরা এ-সময়ে রক্তহীন বিবর্ণ হইয়া পড়ে। পরীক্ষার দ্বারা রোগীর শরীরে বিশেষ কিছু দেখা যায় না, কেবল শিরার অবস্থা বিকৃত বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয়—এ সময়ে বিকালে দেহের উত্তাপ বাড়িতে থাকে, রোগী উত্তেজনা বোধ করে ও অন্যান্য লক্ষণ পরিস্ফুট হইতে থাকে।

তৃতীয়—এ-সময়ে দেহের উত্তাপ বিকালে ১০০ ডিগ্রি উঠিয়া থাকে, কাশি বাড়ে ও পরীক্ষায় দেখা যায় যে ফুস্‌ফুস্ আক্রান্ত। এই অবস্থার শেষ ভাগে ও দ্বিতীয় অবস্থার প্রথম ভাগে। রোগীর লক্ষণ সমান থাকে। ইহার পর জীবাণু দেখা যায়। ডাক্তার মুথু তৃতীয় ভাগকে ফুস্‌ফুসের শোষের অবস্থা বলেন। টাইফয়েড রোগীর মত দেহের উত্তাপ ৯৮ ডিগ্রি হইতে ১০২ ডিগ্রির মধ্যে বাড়ে।

কুড়ি বৎসর ধরিয়া ডাক্তার মুথু এই রোগের আলোচনা করিতেছেন। সুতরাং এ-সম্বন্ধে তাঁর মতামত খুবই মূল্যবান্। তাঁর মূল্যবান সিদ্ধান্তগুলি এই:—

প্রথম—প্রকৃতিগত দৌর্ব্বল্য, ছেলেবেলায় মার দুধ খাইতে না-পাওয়া বা কৃত্রিম উপায়ে পুষ্ট হওয়া, শৈশবে বা যৌবনে বা জীবনের অন্য অবস্থায় পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব বা খাদ্য পরিপাক করিবার অক্ষমতা—এই সমস্ত যক্ষ্মারোগের মূল কারণ। এ সমস্ত ছাড়াও আরো অনেক কারণ আছে। সেগুলি —অস্বাস্থ্যকর স্থান, যেমন বস্‌তি বা আলো-বায়ু-হীন নীচের তলায় বাস, নেশা করার অভ্যাস, অতিরিক্ত আমোদপ্রমোদের উত্তেজনা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়বশ্যতা প্রভৃতি।

দ্বিতীয়—যে রোগীর দৌর্ব্বল্য যত বেশী তার উপর যক্ষ্মার আক্রমণ তত প্রবল।

তৃতীয়—রোগীর শরীরের আভ্যন্তর যন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া রোগ গ্রহণক্ষম না হইলে জীবাণুতে রোগ সৃষ্টি করিতে পারে না।

চতুর্থ—জীবাণু অপেক্ষা শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক নানা অবস্থার প্রভাবে এই রোগ জন্মে।

পঞ্চম—যক্ষ্মা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক অবস্থার যাতে না বিশেষ অবনতি ঘটে তার দিকে দৃষ্টি রাখা খুব প্রয়োজন। কেন না, এই-সকল অবস্থার অবনতিতে আভ্যন্তরীণ অবস্থা দুর্ব্বল হয় এবং জীবাণুও আক্রমণের সুযোগ পায়।

যক্ষ্মার চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাক্তার মুথু কতকগুলি নিয়ম নির্দ্দেশ করেন:—

প্রথম—রোগের প্রথম আক্রমণেই ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত।

দ্বিতীয়—প্রচুরভাবে মুক্ত হাওয়া গ্রহণ করিয়া ফুস্‌ফুস্ বিস্তৃত করা উচিত।

তৃতীয়—সম্পূর্ণ নির্জ্জন জায়গায় থাকা উচিত।

চতুর্থ—যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া উচিত, কিন্তু অতিরিক্ত খাওয়া উচিত নয়।

পঞ্চম—অতিরিক্ত উত্তেজনায় মত্ত হওয়া বা অতিরিক্ত শ্রম করা উচিত নয়।

এক কথায় বলিতে গেলে মন্দ গৃহে বাস, উত্তেজনা এবং ক্লান্তির জন্য প্রকৃতির উপর যে অত্যাচার করা হয় সেই অনিষ্টের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রোগীকে প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া দেওয়াই ডাক্তার মুথুর মত। রোগীকে নানা ঔষধের বশীভূত করিতে তিনি চাহেন না; অত্যন্ত প্রয়োজন হইলে দুই-একবার ঔষধ ব্যবহার করেন মাত্র। তিনি রোগীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রকৃতির পক্ষে এরূপভাবে অনুকূল করিয়া গড়িতে চান যাহাতে প্রকৃতি স্বয়ং সহজেই রোগীর গ্লানি দূর করিয়া দিতে পারে। সেইজন্য ঔষধের বদলে তিনি রোগীকে মুক্ত হাওয়ায় থাকিতে, মন ও শরীর সুস্থ রাখিবার মত কাজ করিতে এবং ব্যায়াম করিতে, মাঝে মাঝে শোধক গ্যাস গ্রহণ করিতে এবং নাক ও মুখ ঢাকা দিবার মত একটি ছোট মুখোস ব্যবহার করিতে নির্দ্দেশ করেন। রোগীর কাছে ডাক্তারের ব্যবহার দৃঢ় হওয়া উচিত। রোগীর মনে যাহাতে বিশ্বাস ও আনন্দ জন্মায় ডাক্তারের সেরূপ চেষ্টা করা উচিত। এক কথায়—ডাক্তারদের কেবল রোগীর রোগের দিকে লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না, তার মনের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

যিনি আজ ৩৫ বৎসর ধরিয়া মাতৃভূমি ভারতবর্ষ হইতে ছয় হাজার মাইল দূরে এবং লণ্ডন সহর হইতে দূরে বিলাতের গ্রাম্য প্রদেশে জীবন কাটাইতেছেন, তাঁর মুখে ভারতীয় লোকদের শক্তি ও সাধনার উপর তাঁর বিশ্বাসের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি বলেন—ভারতীয়েরা যদি তাদের জাতীয় রীতি-নীতির অনুসরণ করিয়া চলে, তারা যদি তাদের জাতীয় সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্ম, কলা ও বিজ্ঞানের অনুশীলন করে ও কেবল মাত্র পশ্চিমের অনুকরণ না করে এবং ভারতীয় আদর্শে ও প্রণালীতে যদি ভারতের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহা হইলে প্রাচীন যুগের মত তারা আবার জগতের শীর্ষস্থানে উঠিতে পারে। যদি ভারতবর্ষ জাতীয় আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে সে কেবল আত্মিক অবনতিতে ডুবিবে না, তার শারীরিক অবনতিও যথেষ্ট হইবে। দিনরাত্রি কলকারখানার কোলাহল ও ধোঁয়া, বিপর্য্যস্ত মন, অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও উত্তেজনায় অবসন্ন শিরাসমূহ এবং ঈশ্বরের আলোক ও বায়ু হইতে বঞ্চিত গৃহে বাস—এই সমস্ত যদি পশ্চিমের মত ভারতবর্ষে আমদানি করা হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে যক্ষ্মা ও অন্যান্য রোগ বাড়িয়াই চলিবে। ইয়োরোপে অসংখ্য কলকারখানার আবির্ভাবে নূতন নূতন রোগেরও আবির্ভাব হইতেছে।

ইয়োরোপ ও আমেরিকার দূরদর্শী বিজ্ঞ লোকেরা এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে সেখানকার লোকদের বাঁচিতে হইলে ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতি-নীতিও বদ্‌লাইতেই হইবে, এমন কি পাশ্চাত্য সভ্যতাকেও নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। ডাক্তার মুথু বলেন—পশ্চিম যে পোষাক আজ শরীরের পক্ষে প্রতিকূল ভাবিয়া ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে, যে বিষাক্ত অথচ চাকচিক্যময় পোষাকের স্পর্শে শরীর ও আত্মা কলুষিত হইয়া উঠে, ভারতবর্ষ সেই পোষাক পরিতে আজ লালায়িত। ভারতবর্ষ তার সেই চিরদিনের ব্যাপক, শান্তিময় ও ধ্যানময় জীবনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করুক। যে ভারতীয়েরা বাহিরের প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করিয়াও এবং কলকারখানার দাস না হইয়াও জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিষ অনায়াসে তৈরী করিতে পারিয়াছিল এবং এখনও পারে, তারা কি আজ

তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বাষ্প ও বিদ্যুতের আমদানি করিবে এবং তাদের অতীত ও পশ্চিমের নূতন অভিজ্ঞতা একেবারে ভুলিয়া যাইয়া জনতাবহুল অস্বাস্থ্যকর সহরসমূহ কলকারখানায় পরিপূর্ণ করিবে, না, প্রকৃতির অরণ্যানীর বুকের উপর আদর্শ ব্যবসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিবে?

ডাক্তার মুখু বলেন—যে-সমস্ত কারণে যক্ষ্মা ও অন্যান্য রোগ একে একে ভারতবর্ষের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতেছে, আজ ভারতবর্ষকে চেতন হইয়া সে সমস্ত দূর করিতে হইবে। কিছুদিন আগে তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া বোম্বাই, কলিকাতা ও মান্দ্রাজে পাশ্চাত্য বাণিজ্যের অনুকরণের বহু বহু কুফল দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ ও ভয় প্রকাশ করিয়াছেন। এ-সব জায়গায় পুরুষ নারী ও ছেলেমেয়েরা বাষ্পে-বোঝাই-করা ও সূর্য্যের অগ্নিময় উত্তাপে উত্তপ্ত ঘরে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাজ করিতেছে, অন্ধকার গহ্বরের মত জনবহুল ঘরে জীবন কাটাইতেছে এবং খাইতেছে অস্বাস্থ্যকর আধপেটা কিছু কুখাদ্য। স্বাস্থ্য-রক্ষার মোটামুটি নিয়মও তারা মানিয়া চলে না। এইরূপে নানা রোগের বীজ চারিদিকে জন্মিয়া চলিতেছে এবং লোকের শরীর শক্তি তাদের প্রতিরোধ করিতে একেবারে অক্ষম। এই জন্যই যক্ষ্মা জাতীয় রোগ ভারতীয়দের আক্রমণ করিতেছে। ডাক্তার মুখুর হিসাবে যক্ষ্মা রোগে ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর নয় দশ লক্ষ লোক মারা পড়িতেছে। কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও ভারতীয় অন্যান্য সহরে লোক সংখ্যার অনুপাতে গ্রেট বৃটেনের বার্মিহাম, গ্লাসগো ও অন্যান্য সহরের অপেক্ষা অধিক লোক মরিতেছে। ভারতবর্ষে আবার পুরুষ অপেক্ষা যক্ষ্মারোগে নারীর মৃত্যু অধিক। আবার পর্দ্দানশিন স্ত্রীলোকরাই অধিক মরিতেছে। সকলের চেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে একটা মহাদেশের মত এত বড় দেশ ভারতবর্ষে এই ভীষণ যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসার জন্য মোটে চারটি বা পাঁচটি চিকিৎসাগার আছে। এই রোগের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইতে হইলে আমাদিগকে পাশ্চাত্যের অনুকরণ সম্বন্ধে চেতন হইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা চেষ্টা করিয়া ও রাজসরকারকে জাগাইয়া তুলিয়া প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ডাক্তার মুখুর ইচ্ছা—ভারতবর্ষে যক্ষ্মারোগ নিবারণের জন্য তিনি প্রচুর চেষ্টা করেন এবং যাতে এই বিলাতি রোগের অনুকূল কারণসকল দূর করা যায় তারও বিস্তৃত ভাবে চেষ্টা করেন। তিনি বলেন ভারতবর্ষে একটি যক্ষ্মানিবারণ কেন্দ্র স্থাপিত হওয়া উচিত, তার শাখা থাকিবে নানা প্রদেশে নানা সহরে। ইহাদের কাজ হইবে যক্ষ্মারোগের কারণ, উৎপত্তি ও নিবারণ সম্বন্ধে সাধারণকে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় জানানো। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় হাসপাতাল থাকিবে, তাহাতে রোগীদের আত্মীয়রা পর্য্যন্ত থাকিতে পাইবে, কেন না তাহা হইলে তারা রোগীদের ইচ্ছা ও রুচিমত খাদ্য তৈরী করিয়া দিতে পারিবে। নগরের বাহিরে জেলায় জেলায় স্বাস্থ্যাগার স্থাপন করিতে হইবে, সেখানে রোগী তার পরিবারবর্গ লইয়া কাজ করিতে থাকিবে ও সঙ্গে সঙ্গে আপনার রোগ সারাইতে থাকিবে।

ডাক্তার মুখুর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিবেচনা ও বিজ্ঞ চিকিৎসার কথা লিখিতে লিখিতে স্বতঃই দুঃখ হয় যে ভারতের এমন একটি যোগ্য সন্তান আজ ভারত হইতে কত দূরে বিদেশে তাঁর প্রকৃষ্ট কাজ করিয়া চলিয়াছেন। ভারতবর্ষই যে তাঁর কাজের উপযুক্ত স্থান। বিদেশীয়দের স্বাস্থ্য, আশা ও আনন্দ দান করার অপেক্ষা স্বজাতীয়দের এই ভীষণ রোগ হইতে রক্ষা করা ও নৈরাশ্য ও ধ্বংসের কবল হইতে মুক্ত করা কি তাঁর কাজ নহে? এরূপ একটি সন্তানের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বিদেশের কাজে নিযুক্ত থাকিতে দেখা ভারতবর্ষের পক্ষে বড়ই ক্ষতির কথা।—প্রবাসী।

এরারুট

লেখক—ডাক্তার বসন্তকুমার চৌধুরী।

এরারুট পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই পরিচিত। ইহ দ্রব্য দেখেন নাই বা আহার করেন নাই এরূপ লোক অতি বিরল। রুগ্নাবস্থায় চিকিৎসকগণ ইহা পথ্য রূপে ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ভারতে পাশ্চাত্য চিকিৎসা আরম্ভের পূর্ব্বে ইহা পথ্য রূপে ব্যবহৃত হইত বলিয়া কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কারণ আয়ুর্ব্বেদে এই দ্রব্যের উল্লেখ নাই। আয়ুর্ব্বেদোক্ত পথ্য মধ্যেও ইহার কোন নাম ও বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং বোধ হইতেছে, এদেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসা আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা এদেশে প্রচারিত হয় এবং প্রায় ৫০।৬০ বৎসর হইল এদেশে ইহা বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

য়্যারো নামক বৃক্ষের মূল হইতে এরারুট প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা আর্দ্রক ও হরিদ্রা জাতীয় বৃক্ষের ন্যায় এবং তদনুরূপ মূল হইতে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সমীপবর্ত্তী দ্বীপসমূহে, বিশেষতঃ বারমুডা দ্বীপে ইহা বহু পরিমাণে স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে। এক্ষণে ঐ সকল স্থানে ইহার চাষ ও পালো প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। মালাবার উপকূলে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এবং ঐ সকল স্থানে এরারুট প্রস্তুত হইয়া সকল দেশে প্রেরিত হয়। এক্ষণে বর্দ্ধমান, বীরভূম, ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানেও এরারুটের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। আর্দ্রক ও হরিদ্রার ন্যায় ইহা প্রায় এক বৎসরেই জন্মিয়া থাকে। এবং পৌষ বা মাঘ মাসে বৃক্ষগুলি শুষ্ক হইয়া যায়। বৈশাখ মাসে আর্দ্রক ও হরিদ্রার ন্যায় ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূল রোপণ করিতে হয়। যে সকল জমি ঠাণ্ডা ও সেঁতসেঁতে সেইরূপ জমিতেই ইহা ভাল জন্মিয়া থাকে। এই বৃক্ষ ছায়াতেও জন্মে; কিন্তু ছায়াতে হইলে গাছগুলি বেশী বড় ও মূলগুলি তত পুষ্ট হয় না। বহুকালের বন জঙ্গল মারিয়া তথায় ইহার চাষ করিলে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। রোপণের পর ১০।১২ দিন মধ্যে গাছ বাহির হয়। তৎপর উত্তমরূপে কোদালি করিয়া মাটী আল্‌গা করিয়া পিল বাঁধিয়া দিলে, যথেষ্ট মূল জন্মিয়া থাকে। এক একটী বৃক্ষে দশ-বারটী করিয়া মূল হয়। পৌষ বা মাঘ মাসে যখন ইহার গাছগুলি মরিয়া যায়, তখন মূলগুলি উঠাইতে হয়। বেশী বিলম্ব করিয়া উঠাইলে, মূলের কতক পচিয়া যায়। ইহার গাছগুলি দেখিতে প্রায় বন-আর্দ্রক বৃক্ষের ন্যায়। পাতাগুলি তাহাপেক্ষা কিছু বড়। সার-যুক্ত মাটীতে জন্মিলে গাছগুলি বেশ বড় হয়। অতুবা প্রায় আর্দ্রক বৃক্ষের ন্যায় হয়। কিন্তু পাতাগুলি কতকটা হরিদ্রা বৃক্ষের ন্যায় হইয়া থাকে। ইহার মূলগুলি শ্বেতবর্ণ, মোটা ও লম্বা এবং গোল রেখাযুক্ত। মূলের উপরে এক প্রকার ছাল থাকে। সে গুলি পরিষ্কার করিলে, মূলগুলি অতি সুন্দর দেখায়। এই বৃক্ষের কোন কোনটীতে ছোট ছোট শ্বেত ও হলুদ বর্ণ মিশ্রিত এক প্রকার রঙ্গের ফুল ও পিপুলের ন্যায় এক প্রকার লম্বা ফল জন্মিয়া থাকে। কিন্তু সমস্ত বৃক্ষেই এই ফুল ও ফল হয় না।

পৌষ বা মাঘ মাসে মূলগুলি উঠাইয়া উত্তমরূপে ধৌত করতঃ ইহার উপরের আল্‌গা ছালগুলি ছাড়াইয়া ঢেঁকি উল্‌কি অথবা শিলে থেঁতলাইয়া বহু পরিমাণ জলে ফেলিলে ছোবড়াগুলি জলের উপর ভাসিয়া উঠে। এবং শ্বেত বর্ণ পালোগুলি জলের নীচে থিতাইয়া পড়ে। উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ছাঁকিয়া ফেলিয়া নিচের পালোগুলি বারবার শীতল জল দ্বারা ধৌত করিলে, উহার সঙ্গে মিশ্রিত নীল আভাযুক্ত যে অণ্ডলালিক পদার্থ থাকে, তাহা ধৌত হইয়া উত্তম শ্বেতবর্ণ এক প্রকার লেই

মত পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। উহা হইতে জল পৃথক করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই উত্তম মসৃণ শ্বেত বর্ণ যে পদার্থ পাওয়া যায় তাহাই বিশুদ্ধ এরারুট।

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে যে, এই এরারুটে শতকরা ২০ ভাগ শরীর পোষণোপযোগী পদার্থ এবং ফস্‌ফরাস ও শ্বেতসার অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। সেই জন্যই ইহা রুগ্ন, দুর্ব্বল ও শিশুর উত্তম পথ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

ইহার একভাগ পালো চারিগুণ ঠাণ্ডা জলে উত্তম রূপে গুলিয়া মৃদু অগ্নির তাপে বারবার নাড়িয়া ফুটাইলে, যখন ভাতের ফেণের ন্যায় জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় তখন নামাইতে হয়। এইরূপে ঠাণ্ডা দুগ্ধে গুলিয়া তৎসহও পাক করা যাইতে পারে। প্রায় ২০ মিনিট ফুটাইলেই উত্তম পথ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাপেক্ষা বেশীক্ষণ জাল দিয়া ঘন করিলেও সুস্বাদু হইয়া থাকে। আদা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচি সহ পাক করিলে ইহা সুগন্ধযুক্ত সুস্বাদু পথ্য হইতে পারে। শুঁট, পিঁপুল, গোলমরিচ, ও মিশ্রি সহ পাক করিলেও উত্তম পথ্য হইয়া থাকে।

ইহা পাক করিয়া লবণ, লেবুর রস, দুগ্ধ, চিনি, মিশ্রি, মৎস্যের ঝোল অথবা তরকারীর ঝোল সহ আহার করা যাইতে পারে।

এই পথ্য উত্তম ঠাণ্ডা, স্নিগ্ধ, ও ধারক। আমাশয়, উদরাময়, জরাতিসার, কলেরা, গণোরিয়া, প্রভৃতি রোগে মহোপকারী পথ্য।

বার্লি যবচূর্ণ বলিয়া দুগ্ধের সহিত অসম্মিলন সম্পর্ক (incompatible) হিন্দু শাস্ত্র মতে দুগ্ধের সহিত যবচূর্ণ সেবন করা সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। কিন্তু এরারুটের সহিত দুগ্ধ সেবনে কোন বাধা নাই। সে জন্য ইহা দুগ্ধ সহ সেবন করা যাইতে পারে।

কোন পীড়ায় অত্যধিক ঘর্ম্ম হইলে, এরারুট-চূর্ণ মালিস করিলে, ঘর্ম্ম নিবারণ হয়। ঘামাচি ও খোস রোগে এরারুট মালিসে তাহার চুলকণা নিবারিত হইয়া থাকে। যে সকল ক্ষতে দুর্গন্ধ ও পূয হয়, সেই সকল ক্ষতে এরারুটের পুল্টিস ব্যবহার করিলে শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে। এরারুট পালো অল্প জলের সহিত মাড়িয়া অগ্নির তাপে লেই মত প্রস্তুত করিয়া ময়দার পুল্টিসের ন্যায় পুল্টিস্ প্রস্তুত করিতে হয়।

এরারুট চূর্ণ মুখে মাখিবার উত্তম পাউডার। ইহার সহিত ল্যাভেণ্ডার অয়েল কিম্বা রোজ অয়েল মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ রোজ পাউডার প্রস্তুত হইয়া অগ্নিমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। মুখের ব্রণ ও মেছেতা প্রভৃতি রোগে এই পাউডার ব্যবহার করিলে আরোগ্য হয়। এতদ্ব্যতীত মুখেরও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে।

এরারুট চূর্ণের সহিত মঞ্জিষ্ঠা নামক বৃক্ষের ক্বাথ মিশ্রিত করিয়া আবির প্রস্তুত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে কার্ম্মাইন নামক এক প্রকার রঙ এরারুটের সহিত মিশ্রিত করিয়া আবির প্রস্তুত করা হয়।

বাজারে সাধারণ ভাবে যে এরারুট বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহার সহিত ময়দা, চাউলের গুঁড়া, যব চূর্ণ, বার্লি ও অন্যান্য অনেক প্রকার অপরিষ্কার পদার্থ মিশ্রিত থাকে। তাহা কিছুতেই পথ্যরূপে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সাধারণ লোক সস্তা বলিয়া তাহাই পথ্যরূপে ব্যবহার করায় রোগ আরোগ্য না হইয়া দুরারোগ্য রোগে নিয়ত পতিত হইতেছে। যদি কেহ এ বিষয়ে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বাজার হইতে কিছু এরারুট খরিদ করিয়া জলে গুলিলেই তাহার মধ্যে যে সকল পদার্থ আছে, তাহা দেখিতে পাইবেন। আমাদের দেশে প্রস্তুত এরারুট পথ্যের পক্ষে উত্তম।

DOUBLE COLOUR PAGE

দীর্ঘ জীবন।

দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে কাহার না সাধ যায়? কিন্তু কোটী কোটী লোকের মধ্যে কয় জন লোক দীর্ঘজীবী হইতে পারে? অথচ, সকলেরই চেষ্টা, কি করিয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া সংসারের সুখ ভোগ করিতে পারা যায়। কিন্তু সে চেষ্টা ঠিক পথে চালিত না হওয়ায়, দীর্ঘ জীবন মানুষের পক্ষে ক্রমশঃ আকাশ-কুসুম তুল্য হইয়া উঠিতেছে। ঠিক মত জীবন যাপন করিতে পারিলে, দীর্ঘ জীবন কাহারও পক্ষেই দুর্লভ জিনিস নহে।

সেকালের মুনি ঋষিরা না কি খুব দীর্ঘজীবী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই না কি সহস্র বৎসর বাঁচিয়া থাকিতেন। কিন্তু এখন মানুষের গড় পরমায়ু কাগজে কলমে একশত বৎসর থাকিলেও, প্রকৃত পক্ষে ৬০।৬৫ বৎসরের অধিক নহে। মুনি ঋষিরা ১০০০ বৎসর জীবিত থাকুন আর নাই থাকুন, তাঁহারা যে সাধারণ মানুষের অপেক্ষা বেশী দিন বাঁচিতেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কেমন করিয়া তাঁহার সাধারণ মানুষের অপেক্ষা দীর্ঘজীবী হইতেন? অনেকে বিবেচনা করেন, তাঁহাদের তপঃ প্রভাবেই তাঁহাদের দীর্ঘ জীবন লাভ হইত। আসল কথা কিন্তু তাহা নয়। প্রকৃত কথা এই, তাঁহারা অতি সহজ ভাবে জীবন যাপন করিতেন; যাহাকে ইংরেজীতে simple life বলা যায়। সেই জন্যই তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইতে পারিতেন। আর, তপঃ প্রভাবই যদি তাঁহাদের দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় হয়, তবে সে রূপ তপ আর কিছুই নয়—সহজ ভাবে জীবন যাপন করা, পাপানুষ্ঠান না করা। কারণ, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম লঙ্ঘনও একটা পাপ; এবং রোগ ভোগ ও অকাল-মৃত্যু সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

একালেও যে সকল দীর্ঘজীবী লোকের বিবরণ জানিতে পারা যায়, তাঁহাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধানে জানিতে পারা গিয়াছে যে, তাঁহারাও সহজ ভাবে, বিনা আড়ম্বরে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন।

সহজ ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা বলিতে এই বুঝায় যে, তাঁহারা দৈনন্দিন সকল কার্য্য নিয়মিত সময়ে সম্পাদন করিতেন। যাহা সহজে হজম হয়, এমন খাদ্য আহার করিতেন; সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা হইতে দূরে থাকিতেন; নিত্য নিয়মিত ভাবে শারীরিক পরিশ্রম অথবা ব্যায়াম করিতেন। ধনীগণের ন্যায় আড়ম্বর সহকারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করাকে সহজ ভাবে জীবন যাপন করা বলে না। আকণ্ঠ ভোজন করিয়া পরিপাক শক্তিকে হ্রাস করিয়া ফেলা, সর্ব্বদা গাড়ীঘোড়া চড়িয়া পঙ্গু হওয়া, বেশ-ভূষার আড়ম্বরে ধনগর্ব্ব প্রকাশ করিতে গিয়া শরীরকে শীতবাতাসহিষ্ণু করিয়া তোলা,—এ সকল কাজ দীর্ঘজীবন লাভের পরিপন্থী।

এখন, এই দীর্ঘ জীবন লাভের secret (গুপ্ত তথ্য) টি কি,—সহজ ভাবে জীবন যাপন করিলে কেমন করিয়া আমরা দীর্ঘজীবী হইতে পারি, তাহার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাক। ফরমোসা দ্বীপের আদিম অধিবাসীরা খুব দীর্ঘজীবী ছিল। সাধারণতঃ তাহাদের পরমায়ু ছিল গড়ে ১৩০ বৎসর। কেমন করিয়া তাহারা এতদিন বাঁচিত, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া প্রকাশ পায় যে, তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রণালী অতি সহজ ছিল। তাহারা প্রধানতঃ ফল, বাদাম ও শাকশব্জী খাইয়া জীবন ধারণ করিত। সভ্য-সমাজ-সুলভ তামাক, চা, কফি, কিম্বা এলকোহল ঘটিত কোনরূপ খাদ্য বা পানীয় তাহারা স্পর্শও করিত না। একজন বহুদর্শী চিকিৎসক অনেক গবেষণার পর সিদ্ধান্ত করিলেন, তামাক, চা, কফি, এলকোহল-ঘটিত মাদক দ্রব্যাদি এবং অপর কতকগুলি উত্তেজক খাদ্য গ্রহণ করায়

আমাদের দেহের রক্তবহা শিরাগুলি উত্তেজিত হইয়া ফুলিয়া মোটা হইয়া যায়। তাহার ফলে রক্তের অবাধ চলাচলের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে, এবং তাহার জন্যই অকাল-বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়া মানুষের মৃত্যু ঘটায়। বস্তুতঃ, সভ্যতার নামে আমরা যেরূপ আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করি, যেরূপ খাদ্য গ্রহণ করি, তাহা ভুল; তাহা প্রকৃতির নিয়মের বিরোধী। প্রকৃতির সহিত পদে পদে বিরোধ করিয়া চলায় আমাদের দীর্ঘ জীবন লাভে ব্যাঘাত ঘটে।

ইংরেজী চিকিৎসা-শাস্ত্রে একটী কথা আছে,—"A person is as old as his arteries"; অর্থাৎ মানুষের রক্তবহা শিরাগুলির নবীনত্ব বা প্রবীণত্ব অনুসারেই তাহার দেহ তরুণ বা অকালপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির নিয়মানুসরণ পূর্ব্বক ঠিক মত জীবন যাপন করিতে পারিলে, শিরাগুলির পক্কতা নিবারণ করা যায়; এবং তাহার ফলে আমাদের দেহও চির-নবীন থাকিতে পারে। চির-যৌবন লাভের ইহাই secret বা গুপ্ততথ্য। রক্তই দেহের জীবনী-স্রোত। রক্ত যতক্ষণ বিশুদ্ধ থাকিবে, রক্তবহা শিরাগুলিও ততক্ষণ সতেজ, সবল ও তরুণ থাকিবে। রক্তের অবস্থার উপরই জীবন বা মৃত্যু অনেকটা পরিমাণে নির্ভর করে। সর্ব্ব শরীরে রক্তের অবাধ সঞ্চালন রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলে, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিও তরুণ অবস্থায় থাকিবে। শরীরের কোন অংশে রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত ঘটিলে, সেই অংশ প্রবীণ হইয়া পড়িবে; এমন কি, সে অংশের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

মানব দেহের শতকরা ৭৫ অংশ জল। জলের পরেই দেহে রক্তের পরিমাণ অন্য সকল পদার্থের অপেক্ষা অধিক। অর্থাৎ সমস্ত দেহটির ওজনের সিকি ভাগই রক্ত। আমরা যাহা কিছু আহার করি, তাহার সারাংশ প্রথমে রক্তে পরিণত হয়। সেই রক্ত সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালিত হইয়া শরীর পোষণ করিয়া থাকে। সুতরাং অখাদ্য (অর্থাৎ যাহা পুষ্টিকর নয়, শরীর পোষণের উপযোগী নয়, তাহাই অখাদ্য) গ্রহণ করিলে,—অথবা সুখাদ্য গ্রহণ করিলেও, রক্তের অবাধ চলাচলের ব্যাঘাত ঘটিলে,—উপযুক্ত ভাবে শরীর পোষণের পক্ষেও যে ব্যাঘাত ঘটিবে, তাহা না বলিলেও চলে। রক্তের অর্দ্ধাংশই জল। এই জল রক্তকে উপযুক্ত পরিমাণে তরল অবস্থায় রাখে; তজ্জন্যই রক্ত সর্ব্বশরীরে অবাধে সঞ্চালিত হইতে পারে। আমাদের শরীরের সমস্ত রক্তটা মিনিটে একবার করিয়া হৃদয়ের ভিতর দিয়া গমন পূর্ব্বক সর্ব্ব শরীর প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। Volkmann নামক একজন চিকিৎসক গণনা ও হিসাব করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, মানব দেহের প্রধান প্রধান মোটা শিরাগুলিতে রক্তের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১২ইঞ্চি আর কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাগুলিতে রক্তের গতি বেগ প্রতি মিনিটে দুই ইঞ্চি। মানব দেহে মোটা শিরার (blood-vessels) সংখ্যা পাঁচশতাধিক এবং সূক্ষ্ম শিরার (Capillaries) সংখ্যা করা যায় না। এই সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম শিরার ভিতর দিয়া দেহের সর্ব্বত্র রক্ত সঞ্চালিত হইয়া থাকে।

দেহের মধ্যে তিনটি স্থান আছে, যেখানে রক্তবহা শিরাগুলি রক্তের আকারে বা ভিন্ন আকারে রক্ত ঢালিয়া দেয়। সেই তিনটি স্থান যথাক্রমে ফুসফুস, লোমকূপ ও মূত্রনালী। শারীর ক্রিয়ার দরুণ রক্তে যে কার্ব্বনিক এসিড জমে, অম্লজান বায়ুর সাহায্যে তাহার শোধন ক্রিয়া ফুসফুসের অভ্যন্তরে নির্ব্বাহ হয়। এখানে রক্ত তাহার স্বাভাবিক আকারে জমা হয়। মানব দেহের চর্ম্মে ২০০০০০০ এর অধিক লোমকূপ আছে। রক্তের অসার ভাগ ও দূষিত পদার্থ বা আবর্জ্জনাসমূহ এই সকল লোমকূপের ভিতর দিয়া ঘর্ম্মের আকারে বাহির হইয়া আসে। ঘর্ম্ম দেখিতে জলের মত। সেই জন্য আমরা বুঝিতে পারি না যে উহাই রক্ত। আর উহার সহিতই যে শরীরের রক্তের সহিত মিশ্রিত আবর্জ্জনা লোমকূপের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসে

তাহাও হঠাৎ বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু কয়েক দিন স্নান বা গাত্র মার্জ্জনা না করিলে, চর্ম্মের উপর একপ্রস্তু ময়লা জমিতে দেখা যায়। উহাই আবর্জ্জনা। প্রত্যহ পরিষ্কার জলে স্নান ও গাত্র মার্জ্জনা করিয়া এই সকল আবর্জ্জনা শরীর হইতে দূর করিয়া না ফেলিলে, ক্রমে ঐ আবর্জ্জনার দ্বারা লোমকূপ সকল বন্ধ হইয়া যায়। তখন আর দেহের ভিতরের ময়লা বাহির হইয়া আসিতে পারে না। তখন ক্রমে চর্ম্ম রোগ ও পরে দেহের ভিতর নানা প্রকার জটিল রোগ উৎপন্ন হয়। আর মূত্রনালী পথে মূত্রের আকারে রক্তের কিয়দংশ দেহের আবর্জ্জনা বহন করিয়া লইয়া বাহির হইয়া যায়। শরীর সুস্থ থাকিলে মূত্র জলের আকারে বাহির হয় বলিয়া বোঝা যায় না যে উহাই রক্ত। কিন্তু মূত্রনালী-ঘটিত পীড়ায় রক্ত তাহার স্বাভাবিক আকারেই বাহির হইয়া রোগীর মনে ভীতি উৎপাদন করিয়া থাকে। ফুসফুস, লোমকূপ এবং মূত্রনালীর কার্য্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে সম্পন্ন হয়, ততক্ষণ শরীরও সুস্থ থাকে। যখন স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, তখনই লোকে পীড়িত হইয়া পড়ে। প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ প্রণালীতে জীবন যাপন করিতে গেলে, মদ্যকূট, চা, কফি, মদ্য এবং শারীর ক্রিয়ার সহিত অস্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটায় এমন উদ্ভিজ্জ বা মাংসাদি দরুণ শরীরের মধ্যে ৬০ প্রকারেরও অধিক বিষ পদার্থ (toxin) উৎপন্ন হয়। ইহারাই রক্তকে ও বিষাক্ত করিয়া ফেলে। কাম ক্রোধাদি অযথা এবং অত্যধিক উত্তেজনাতেও শরীরে ক্রিয়া হয়। অথবা ইহার ঠিক উল্টা,—toxin বেশী পরিমাণে জমিলে এবং অবিলম্বে তাহাদের চিকিৎসা করিয়া বাহির করিয়া ফেলিতে না পারিলে, ঋপু সকল ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠে; তাহার ফলে লোকে অনেক অপরাধের অনুষ্ঠানও করিয়া ফেলিতে পারে। অনেক অপরাধের অন্তরালে বিকৃত শারীরিক অবস্থার নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। কেবল ইহাই নয়। Blood poisoningএর দরুণ হঠাৎ মানুষের মৃত্যুও হইয়া থাকে। বিশেষ ভাবে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদেরই এইরূপে মৃত্যু হইয়া থাকে। সুতরাং গর্ভাবস্থায় যাহাতে শরীরের রক্ত দূষিত হইতে না পারে, সে পক্ষে খুব সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। আহারাদি নিত্য ক্রিয়া সম্বন্ধে সতর্ক না হইলে বিপদ ঘটিতে বেশী বিলম্ব হয় না। বিশেষতঃ গর্ভবতী নারীদের রক্তের উপর দুইটী প্রাণীকে নির্ভর করিতে হয়। তখন তাহার বিশুদ্ধিতা রক্ষা করা যে কতখানি আবশ্যক, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। রক্তে বিষ (toxin) আবর্জ্জনা প্রভৃতি জমিলে, বা অস্বাভাবিক জীবন যাপন প্রণালীর দরুণ রক্ত ঘন হইয়া তাহার অবাধ চলাচলে ব্যাঘাত জন্মিলে, পরিষ্কার বিশুদ্ধ শীতল জল ঘনঘন পান করিলে, রক্তে জলীয় অংশ বেশী হইয়া তাহার চলাচলের ব্যবস্থা অনেকটা সহজ হইয়া আসে, এবং জলের সাহায্যে toxin তরল হইয়া সহজে বহির্গমন করিতে পারে।

যে সকল খাদ্য পুষ্টিকর নহে, যাহা শরীরে শোষিত হয় না, শরীর ধারণের পক্ষে যাহা অনাবশ্যক,—এরূপ খাদ্য ভক্ষণে রক্তের অবাধ গতিতে ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সন্ধিস্থলগুলিতে আবর্জ্জনা জমিতে আরম্ভ করে। ক্রমে বাত রোগ উৎপন্ন হয়। বেশী পরিমাণে জল পান করিলে রক্ত তরল হইয়া তাহার স্বাভাবিক গতি ফিরিয়া আসে, এবং ঐ সকল আবর্জ্জনা ঘর্ম্ম বা মূত্রাকারে শরীর হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে।

শরীর পোষণের পক্ষে যাহা অনাবশ্যক, এমন বস্তু ভক্ষণ করিলে, তাহা যেমন শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়, গুরু ভোজনও ঠিক সেইরূপ অনিষ্টকর। কারণ, পাকস্থলী শরীরের পোষণার্থ প্রয়োজনীয় অংশটুকু মাত্র গ্রহণ করে; অবশিষ্ট অতিরিক্ত অংশ জীর্ণ না হইয়া পাকস্থলীতে থাকিয়া তাহাকে পীড়া দেয়। নিত্য আকণ্ঠ ভোজন করিলে অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি রোগের সহিত রক্তও দূষিত হইয়া পড়ে।

আমরা নিশ্বাস বায়ুর সহিত অম্লজান বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকি। সেই অম্লজান শরীর মধ্যে দাহক্রিয়া সম্পাদন করিয়া দেহের প্রয়োজনীয় তাপ সরবরাহ করে। আমরা খাদ্যরূপে যাহা গ্রহণ করি, তাহার অঙ্গার অংশের সহিত অম্লজানের মিলনের ফলে এই তাপ উৎপন্ন হয়। এই মিলিত পদার্থের নাম দ্ব্যম্লঙ্গারক বায়ু (CO_2)। শরীরের মধ্যে যত প্রকার বিষ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। প্রশ্বাসের সহিত ইহা বাহির হইয়া গিয়া থাকে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধ পাউণ্ড (আন্দাজ একপোয়া) পরিমাণে এই বায়ু শরীর মধ্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়মিত ক্রিয়ার ফলে এই বিষাক্ত বায়ু শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। কোন কারণে শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন না হইলে, ইহা রক্তমধ্যে শোষিত হইয়া রক্ত দূষিত হয়।

মানুষের অজ্ঞাতসারে এইরূপ নানা কারণে শরীর মধ্যে রোগের বীজ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই সকল কারণের মধ্যে খাদ্যের অনিয়ম এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার ব্যাঘাতই প্রধান। মধ্যে মধ্যে দুই একদিন উপবাস দিলে এই সকল দোষ কিয়ৎ পরিমাণে সংশোধিত হইতে পারে। নচেৎ আমরা জানিতে না পারিলেও, শরীর মধ্যে এই সব বিষ জমিতে জমিতে হঠাৎ এক দিন সামান্য একটু ঠাণ্ডা লাগিয়া, কিম্বা, অতি সামান্য একটু পেটের অসুখ হইয়া, দেখিতে দেখিতে তাহা গুরুতর হইয়া উঠে; এবং অবশেষে তাহা সাংঘাতিক আকার ধারণ করিতে পারে। বস্তুতঃ, শরীরের ভিতরে আগে হইতেই বিষ জমিয়া জমিয়া শারীর যন্ত্রসমূহকে বিকৃত করিয়া না রাখিলে, সামান্য উপলক্ষ মাত্র অবলম্বন করিয়া কঠিন রোগ উৎপন্ন হইতে পারে না। অর্থাৎ, ক্রমাগত অনিয়ম হইতে থাকিলে, রক্তের অন্যতম উপাদান শ্বেত রক্ত-কণিকা সকল (white blood-corpuscles) নিস্তেজ হইয়া পড়ায়, অতি সামান্য পীড়াকেও বাধা দিবার তাহার কোন শক্তি থাকে না। কাজেই, বাধা না পাইয়া এবং অনুকূল অবস্থা পাইয়া, সামান্য রোগও দেখিতে দেখিতে কঠিন হইয়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, সামান্য খুব কঠিন কাজ নহে—যে কেহ এই সহজ তত্ত্বটুকু এবং প্রত্যক্ষ উপলক্ষই সর্ব্বত্র কঠিন পীড়ার কারণ। একটু চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন।

নহে; এবং কেবল সেই সকল উপলক্ষ হইতে সাবধান হইলে চলিবে না—সর্ব্বতোভাবে চির কালই শরীর রক্ষা সম্বন্ধে যত্নবান থাকিতে হইবে।

এই সকল আলোচনা হইতে আমরা মোটামুটি এই কয়টি সিদ্ধান্ত করিতেছি। প্রথমতঃ খাদ্য হইতে হইবে যথা, যে খাদ্য শরীর ধারণের পক্ষে আবশ্যক, যাহা পুষ্টিকর, যাহা সুপাচ্য, যাহা সহজে পাকস্থলীতে জীর্ণ হইয়া শোষিত হয়, তাহাই আমাদের প্রকৃত খাদ্য। অন্য সকল প্রকার খাদ্য, যতই মুখরোচক হউক না কেন, বর্জ্জন করিতেই হইবে। আজ কাল সভ্যসমাজে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম বহু প্রকার খাদ্য প্রচলিত হইয়াছে। নানাবিধ মসলা সংযোগে ইহাদিগকে পাক করিয়া অত্যন্ত গুরুপাক করিয়া ফেলা হয়। ইহারা কেবল রসনার পক্ষে তৃপ্তিকর মাত্র; স্বাস্থ্যের এবং শরীর রক্ষার দিক হইতে ইহাদের কোনই সার্থকতা নাই। এ সকল খাদ্য গ্রহণ না করিলেই ভাল। রসনা তৃপ্তির লোভে নিজের মৃত্যুকে অগ্রসর করিয়া আনা বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে না; এ পক্ষে লোভ সংবরণই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ, নির্ম্মল জল মাত্র আমাদের পানীয় হওয়া উচিত। চা, কফি, মদ্য প্রভৃতি-সভ্য সমাজের মোদিত পানীয় স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মতে প্রত্যক্ষ বিষ। উহারা তিল তিল করিয়া শরীর ক্ষয় করিয়া ফেলে। তামাক প্রভৃতি মাদক দ্রব্যেও শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর বিষ যথেষ্ট পরিমাণেই রহিয়াছে। দীর্ঘ জীবন লাভের পক্ষে ইহা সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। যাঁহারা চা কফি প্রভৃতি উষ্ণ পানীয় সেবনে অভ্যস্ত, তাঁহারা উহাদের পরিবর্ত্তে যদি গরম জল পান করেন, তাহা হইলে চা কফি পানের ফল পাইবেন, অথচ, [illegible] মধ্যে যে বিষটুকু আছে, গরম জলে তাহা থাকায়, ইহাতে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিবে না।

তৃতীয়তঃ, বিশুদ্ধ বায়ু যত বেশী পরিমাণে পারেন গ্রহণ করিবেন। এ পক্ষে দীর্ঘ নিশ্বাস deep breath) প্রশস্ত। প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু রক্তের [illegible]বনিক এসিড গ্যাস গ্রহণ করিয়া রক্তকে বিশুদ্ধ করিবে, তাহার ক্রিয়া অক্ষুণ্ণ রাখিবে এবং তাহাকে প্রদান করিবে। রক্তই মানুষের জীবনীশক্তি life fluid)।

এই সকল সর্ব্বজনের পক্ষে সহজ সাধ্য নিয়মগুলি পালন করিয়া চলিলে, আমরা সহজেই দীর্ঘজীবী হইতে পারি। নচেৎ, সভ্যতার খাতিরে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া মৃত্যুকে আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া থাকি। আমাদের এই অকাল-মৃত্যু—ইহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের ইচ্ছাকৃত। ইহার প্রতিকারও আমাদের নিজেদের হাতে। আমরা নিজেরা ইচ্ছা করিয়া কেন আমাদের নিজেদের পায়ে কুড়াল মারিব? একটু সাবধানে, একটু বিবেচনা করিয়া চলিলেই যখন আমরা দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারি, তখন আমরা কেন না তাহা করি? রাবণের মৃত্যুবাণ ছিল মন্দোদরীর জিম্মায় স্ফটিক স্তম্ভের ভিতর। হনুমান মন্দোদরীকে ঠকাইয়া সেই মৃত্যুবাণ বাহির করিয়া লইয়া গিয়া রাবণের মৃত্যু ঘটাইয়াছিল। প্রত্যেক মানুষের নিজের নিজের মৃত্যুবাণ তাহার নিজের হাতে। সভ্যতা, লোভ, অসংযম—ইহারা যেন হনুমান সাজিয়া আসিয়া, আমাদের ঠকাইয়া, আমাদের মৃত্যুবাণ হস্তগত করিতে না পারে, এ পক্ষে সকলেরই সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত।

বায়ু

লেখক—শ্রীপ্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৈদিক ঋষি গাহিয়াছিলেন,—

"বাত আবাতু ভেষজং শম্ভুময়োপুনো হৃদে।
প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ ॥১
উতবাত পিতাসিন উত ভ্রাতোতনঃ সখা।
সনোস নো জীবাতবেকৃধি। ২
যদদো বাত তে গৃহে মৃতস্য নিধির্হিতঃ
ততো নো ধেহি জীবসে ॥৩
(ঋক্‌বেদ ১০ম্ মণ্ডল ১৮৬ সূ)

অর্থাৎ বায়ু আমাদের মঙ্গলের নিদানরূপে, রোগ নাশকরূপে ও সুখের বিধায়করূপে প্রবহমান্ হউক। হে বায়ু, তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের ভ্রাতা, তুমি আমাদের বন্ধু। আমাদিগকে দীর্ঘজীবী কর। তোমার ঐ গৃহেতে অমৃতরূপ ধন সঞ্চিত আছে। সেই অমৃতধন হইতে আমাদিগকে দীর্ঘ জীবন প্রদান কর।

বৈদিক ঋষি উপলব্ধি করিয়াছিলেন বিশুদ্ধ বায়ু আমাদের জীবনধারণের অন্যতম প্রধান উপাদান। অন্ততঃ খ্রীষ্ট জন্মিবার ৬০০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় ঋষির হৃদয়ে বায়ুর স্বাস্থ্যকরতা বিভাত হইয়াছিল। বিশুদ্ধ বায়ু রোগ বিনাশে সমর্থ—এই সার সত্যও উদ্ভাসিত হইয়াছিল। আমরা বেদের মর্য্যাদা স্বীকার করি। কিন্তু দূষিত পদার্থ দ্বারা আমরা যেরূপ ভাবে বায়ুকে অবিশুদ্ধ করিয়া তুলি, তাহা কি আমাদের শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষার নিদর্শন? বেদ আমাদের শাস্ত্র।

বেদ-বাক্য আমরা কিরূপে পালন করি, তাহা আমাদের গৃহ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান দেখিলেই বুঝা যায়। দূষিত বায়ু নিশ্বাস রূপে গ্রহণ করিয়া আমরা রোগে ভুগিতেছি। আমাদের চৈতন্য হইতেছে না। তামসিক জাতির ইহাই ধর্ম্ম। নিজের মৃত্যু নিজে আহ্বান করিয়া আনে। আমরা বায়ুর বিশুদ্ধির জন্য কোনও চেষ্টা করি না। অবিশুদ্ধ বায়ু নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া সর্দ্দি, ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিতেছি।* ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের বীজাণুও আমরা নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি—ইহাই বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত। এই রোগে গত দুই বৎসরে দেশের বহুলক্ষ লোক বিনষ্ট হইয়াছে। এই সকল রোগের আধিক্যের অন্যতম কারণ অবিশুদ্ধ বায়ু। বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে রোগ বিদূরিত হয়। ইহাই বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সাক্ষ্য। আমাদের দেশেও বৈদিক ঋষি বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন,—

"অবাত বাহি ভেষজং। ত্বং হি সর্ব্বভেষজঃ।"

(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২.৪ ১,৭)

অর্থাৎ হে বায়ো, তুমি ঔষধরূপে প্রবাহিত হও। তুমি বিশ্বভেষজ—তুমি সকল রোগের ঔষধ।

বায়ু দূষিত হইবে বলিয়াই মলমূত্রাদি ত্যাগের পরে মৃত্তিকা দ্বারা তাহা আবৃত করা স্মৃতি-শাস্ত্রের বিধান।

আজ কাল আমরা শাস্ত্রের বচন বলি, কিন্তু পালন করি না। দুর্গন্ধ ও পচন নিবারণের পক্ষে মৃত্তিকা একটী প্রধান উপায়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা মৃত্তিকার দুর্গন্ধ-নাশিকা শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। কয়লার চূর্ণ বসন্ত রোগীর শরীরে মাখাইলে শরীরের গলন ও দুর্গন্ধ নিবারিত হয়।

বায়ুর চলাচল যত বেশী থাকে, ততই বায়ুর বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয়। গৃহের অভ্যন্তরে বায়ু নিরন্তর দূষিত হইতেছে। বাহিরের বায়ু প্রবিষ্ট না হইলে নানা প্রকার রোগ জন্মিতে পারে। সেই জন্যই আচার্য্য গোভিল তৎকৃত গৃহসূত্রে দক্ষিণদ্বারী গৃহের সর্ব্বপেক্ষা প্রশস্ততা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"তত্রাবসানং প্রাগুদ্বারং যশস্কামো বলকামঃ কুবীতোদগ্ দ্বারং পুত্রপশুকা দক্ষিণ দ্বারং সর্ব্বকামো ন প্রত্যগ্ দ্বারং কুর্বীত।" (গৃঃ সূঃ প্রঃ ৪ খঃ ৯ সূ ১২) অর্থাৎ যশঃ প্রার্থী ও বলকামী ব্যক্তি পূর্ব্বদ্বারী গৃহ, পুত্র ও পশুকামী ব্যক্তি উত্তরদ্বারী গৃহ এবং সর্ব্বকামী দক্ষিণদ্বারী গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। কিন্তু পশ্চিম দ্বারী গৃহ কেহই নির্ম্মাণ করিবে না। আচার্য্য গোভিলের মতে দক্ষিণ-মুখ গৃহ সর্ব্বকামনা পূর্ণ করে। ইহার তাৎপর্য্য দক্ষিণদ্বারী গৃহে বায়ু প্রবিষ্ট হয়। দূষিত বায়ু বিদূরিত হয়। রোগের বীজাণু গৃহে থাকিতে পারে না। রোগের অভাবে সর্ব্ব কামনা পূর্ণ হয়।

গৃহের দরজা জানালা সমসূত্রে স্থাপিত করিতে হইবে। গোভিল বলিয়াছেন,—

"অনুদ্বার মত" (খঃ সূঃ ৪ ৯. ১১সূত্র) অর্থাৎ বায়ু চলাচলের জন্য গৃহের দরজা জানালা সমসূত্রে স্থাপিত করিতে হইবে। সহরে মিউনিসিপ্যালিটীর আইন অনুসারে গৃহে বৃহৎ দরজা জানালা রক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে সমসূত্রেও দরজা জানালা নির্ম্মিত হয়। কিন্তু গ্রামে মৃত্তিকার দেওয়ালে জানালা অনেক ক্ষেত্রে থাকে না। থাকিলেও গবাক্ষ থাকে এবং সমসূত্রতা আদৌ নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বোধ হয় চোর ডাকাতের উপদ্রবের জন্যই এরূপ অস্বাস্থ্যকর বিধান আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়াছে, এবং গোভিলীয় অনুশাসন প্রতিপালিত হয় নাই। জানালা প্রভৃতি না থাকায় রুদ্ধ গৃহের বায়ু নানা প্রকার পীড়া সৃষ্টি করে। গ্রামের বায়ু সহরের বায়ু অপেক্ষা নির্ম্মল। কিন্তু তাহা হইলেও গৃহের দরজা জানালা বৃহৎ, ভিত্তিসংলগ্ন ও সমসূত্রে স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। জানালা প্রভৃতি সমসূত্রে স্থাপিত হইলে বায়ু প্রবেশ ও নির্গমের সুবিধা হয়। ভিত্তি সংলগ্ন হইলে গৃহ বিশুদ্ধ হয়। আমরা গোভিলের অনুশাসন মানিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করিলে অনেক রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি।

আমাদের একটী কু-অভ্যাস আছে। আমরা রাত্রিকালে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শয়ন করি। ইহা নিতান্ত অন্যায়। অনেকে গৃহের ভিতরে প্রদীপ জ্বালিয়াও শয়ন করি। ইহাতে প্রাণ নাশের একান্ত সম্ভাবনা। ঘরে প্রদীপ থাকিলে দরজা জানালা খুলিয়া রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। যদিও বঙ্গদেশের বায়ুতে জলীয় বাষ্প সমধিক পরিমাণে থাকে, তথাপি সকল ঋতুতেই জানালা খুলিয়া রাখা আবশ্যক। শীতকালে উষ্ণ বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া শয়ন করিলে কোনও ক্ষতি হইতে পারে না। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গ্রীষ্মকালে লোকে বহির্ব্বায়ুতে শয়ন করে। বোধ হয় এই জন্য তদ্দেশবাসিগণের স্বাস্থ্য অনেকটা পরিমাণে ভাল থাকে। অন্যান্য কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও ইহা অন্যতম কারণ। যাহা হউক, জানালা প্রভৃতি বৃহৎ ভিত্তি সংলগ্ন ও সমসূত্রে স্থাপিত হওয়া আবশ্যক, এবং রাত্রিকালেও বায়ুর প্রবেশ ও নির্গমের জন্য জানালা খুলিয়া শয়ন করা সঙ্গত।

প্রভাতে উঠিয়াই গৃহের সমস্ত দরজা জানালা খুলিয়া দেওয়া দরকার। প্রচুর সূর্য্য কিরণে ও প্রভাত বায়ুতে গৃহের অভ্যন্তরীন দূষিত বায়ু বিশেষরূপে পরিশুদ্ধ হয়। সন্তানসন্ততিগণের, জাতির ও স্বীয় মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া হয় শাস্ত্রীর অনুশাসন অথবা বৈজ্ঞানিক সত্য মানিয়া চলা আমাদের কর্ত্তব্য।* জাতির হিসাবে আমরা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতেছি। জাতিকে বাঁচিতে হইবে। দেহ রক্ষা করিয়া প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে হইবে। জাতীয় জীবন অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। পূর্ণ স্বাস্থ্যই জাতীয় জীবনের চিহ্ন। বায়ু, জল, খাদ্য প্রভৃতি বিষয়ে অবহিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

---

* "Suspended matters of various kinds are recognised causes of disease of the respiratory organs producing effects, passing through the stages of irritation, Catarrh, Bronchitis and possibly proceeding to Pneumonia."

(Public Health Problems, Contemporary Science Series—Chap. III.)

সঙ্কলন।

কয়েকটি তরকারী।

লেখক—শ্রীরজনীকান্ত সৎপতি।

[এই ভাগে যাবতীয় স্বাস্থ্যোন্নতিকর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ, নানাবিধ সৎ-সাহিত্যের সার, এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বহুবিধ বিষয় আহরণের চেষ্টা করা হইবে। তদ্ব্যতীত নানান দেশের আচার ব্যবহার, তাহাদের শিক্ষা, উদ্যম, রীতি-নীতি প্রভৃতি বিষয়ও ইহাতে প্রকাশের চেষ্টা করা হইবে। যাহা হউক এবারে যে কয়েক তরকারীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাই স্বাস্থ্য-সমাচারের পাঠকপাঠিকগণকে উপহার দিয়া আমার মত বক্তব্য শেষ করিব। *

* প্রবন্ধটিতে যে কয়েকটি তরকারীর "রাসায়নিক গুণ" লিখা হইয়াছে তাহা "কৃষক" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

১। বিলাতী-আলু।

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহ্যগুণ শতকরা		মেদকারিতা গুণ	
শ্বেতসার ও শর্করা	১৪.৭	প্রোটিড	১৮
তৈল	০.১	ভস্ম	০.৮
জল	৬২.৬		

ইহাতে বিলক্ষণ শ্বেতসার পাওয়া যায়। অন্যান্য তরকারী অপেক্ষা ইহাতে প্রোটিড ভাগ অধিক আছে। কেহ কেহ বলেন যে ভাত রুটির বদলে আলু ব্যবহার

করা চলে। যাহা হউক, আয়ুর্ব্বেদে ইহার কি গুণ আছে দেখা যাউক।

আলুর গুণ—রুক্ষ, গুরুপাক, মল-মূত্র-নিঃসারক এবং পুষ্টিকারক। গোল আলু আজ কাল সকল ঋতুতেই ব্যবহৃত হয়। গ্রীষ্মকালে, (আজকাল) ইহা যত কম ব্যবহৃত হয় ততই ভাল।

অধিকাংশ রোগীকে আলু খাইতে দেওয়া উচিত নহে (সুশ্রু আয়ুর্ব্বেদ ৭৫ পৃষ্ঠা)।

২। ওল-কচু।

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহ্যগুণ শতকরা		মেদকারিতাগুণ	
শ্বেতসার ও শর্করা	১২.৮	প্রোটিড	২.৩
তৈল	২.৯	ভস্ম	১.৪
জল	৭৮		

মেদকারিতা গুণে ইহা তরকারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে লবণাক্ত পদার্থ (ভস্ম) থাকায় ইহার কোষ্ঠ-পরিষ্কারক গুণ আছে। এজন্য অর্শ রোগীদের পক্ষে ইহা উত্তম পথ্য।

সুশ্রু আয়ুর্ব্বেদে ইহার গুণ লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক ও অর্শ রোগে উপকারী। ইহা দদ্রু, কুষ্ঠ ও রক্ত-পিত্ত রোগে ছাড়া, আর সমুদয় রোগে ব্যবহৃত হয়। রক্তবর্ণ ওল বেশী উপকারী নহে।

৩। কাঁচকলা ও মোচা।

কাঁচকলা ও মোচা উত্তম তরকারী। ইহাতে ট্যানিক এসিড থাকায় পেটের পীড়া ও কৃমি রোগের পক্ষে উপকারী। আয়ুর্ব্বেদে কাঁচকলার মোচার গুণ শীতল, গুরুপাক, এবং বায়ু, পিত্ত, ক্ষয় রোগে হিতকর।

কাঁচকলার গুণ—কষায়রস, শীতল, রুক্ষ মলরোধক ও বলবর্দ্ধক। ইহার রাসায়নিক গুণ—

৪। (শুষ্ক কাঁচকলা)

দাহ্যগুণ শতকরা—		মেদকারিতাগুণ	
শ্বেতসার ও শর্করা	৭৭.৮	প্রোটিড	৪.১
তৈল	০.৪	ভস্ম	২.৭
সুত্র	১.২		

৫। মূলা।

রাসায়নিক গুণ

দাহ্যগুণ শতকরা		মেদকারিতা গুণ	
শ্বেতসার ও শর্করা	৩.৪	প্রোটিড	২
তৈল	কিঞ্চিত	ভস্ম	৮
জল—৯৫.৭			

সুশ্রু আয়ুর্ব্বেদে মূলার গুণ—উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, উদর-পরিষ্কারক, কফবর্দ্ধক। ছোট কচি মূলা—লঘুপাক, পাচক, রুচিকর, ত্রিদোষনাশক, এবং শোথ নিবারক। জ্বর, কাস, শ্বাস, কণ্ঠ ও নেত্রের রোগেও হিতকর।

শুষ্কমূলা—লঘুপাক, ত্রিদোষনাশক। মূলার শাক তৈলসহ পাকে উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, পাচক, রুচিকর, ত্রিদোষনাশক। মূলায় কিঞ্চিৎ গন্ধক থাকা প্রযুক্ত ইহা চর্ম্মরোগে উপকারী।

৬। বাঁধা কপি।

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহ্যগুণ শতকরা		মেদকারিতাগুণ	
শ্বেতসার ও শর্করা	৪.৬	প্রোটিড	১২
তৈল	৩.২	ভস্ম	৮
জল—৭৫.৬			

ইহার মেদকারিতাগুণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে কিঞ্চিৎ গন্ধক থাকা প্রযুক্ত উহা উষ্ণগুণবিশিষ্ট। ইহা দাহক, গুরুপাক ও বলকর পথ্য।

৭। ফুল কপি।

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহ্যগুণ—		মেদকারিতা গুণ	
শ্বেতসার ও শর্করা	৫.০	প্রোটিড	৩.০
তৈল	২.১	ভস্ম	১.১
জল—"উল্লেখনাই"।			

ফুল কপির গুণ বাঁধাকপি হইতে শ্রেষ্ঠ।

৮। কমলা লেবু।

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহ্যগুণ শতকরা—		মেদকারিতা গুণ	
শ্বেতসার ও শর্করা	৮.৫	প্রোটিড	০.৬
তৈল	০.১	ভস্ম	০.৪
জল—৬৩.৪			

কমলা লেবু অতি উত্তম সুস্বাদ; লঘুপথ্য, অগ্নিবর্দ্ধক পরিপাচক ফল। দ্রব্যগুণে ইহার নিম্নলিখিত গুণ লিখিত আছে; যথা—গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, শ্রান্তিনাশক ও বলবর্দ্ধক। পেটের পীড়ায় ইহার উপকারিতা যথেষ্ট।

৯। ডাবের জল।

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহ্যগুণ—		মেদকারিতা গুণ	
শ্বেতসার ও শর্করা	২৪	প্রোটিড	১৪
তৈল	কিঞ্চিৎ	ভস্ম	৬
জল—"উল্লেখ নাই"।			

ডাব জলের গুণ—প্রায়ই বিরেচক অর্থাৎ মলভেদক বলিয়া জানিবে। নারিকেল জলের গুণ স্নিগ্ধ, মধুর, শীতল, হৃদ্য, অগ্নি-সন্দীপক, মূত্রাশয় পরিষ্কারক, বীর্য্য-বর্দ্ধক, পিত্তনাশক, পিপাসানিবারক এবং গুরুপাক।

১০। নারিকেল।

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহ্যগুণ শতকরা—		মেদকারিতা গুণ	
শ্বেতসার ও শর্করা	৩.৫	প্রোটিড	৬.৩
তৈল	৫৭.৪	ভস্ম	১.৩
জলের উল্লেখ নাই।			

রাসায়নিক খাদ্যগুণ বিচার করিলে, নারিকেল রাজার রাজা। ইহাতে তৈলের ভাগ অত্যধিক থাকা প্রযুক্ত ইহা অত্যন্ত গুরুপাক। পরিপাক করিতে পারিলে শরীরের অয়েলের মত উপকার করিয়া থাকে।

নারিকেল কোরা আমরা নানাবিধ ব্যঞ্জনের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকি। খোলা সমেত গোটা নারিকেল অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অন্ন রোগীকে সেবনের জন্য দেওয়া হয়। মুক্তাবলীতে ইহার নিম্নলিখিত গুণ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—শীতল, দুষ্পাচ্য, বস্তি শোধক, বিষ্টম্ভকারক, পুষ্টিকর, বলকারক, বাতনাশক, পিত্তঘ্ন, রক্তপিত্তনাশক ও দাহনিবারক।

১১। বেগুন।

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহ্যগুণ—		মেদকারিতা গুণ	
শ্বেতসার ও শর্করা	৪.০	প্রোটিড	১.৪
তৈল	১.৫	ভস্ম	১.৩
জল—৯০.৯			

বেগুনের গুণ—অগ্নিজনক, বায়ুনাশক। কচি বেগুন কফ, বায়ুনাশক।

পাকা বেগুন পিত্তবর্দ্ধক। পোড়া বেগুন লঘুপাক সারক, কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক এবং কফ ও বায়ুর হিতকর।

১২। কড়াই শুঁটি

খোসাছাড়ান

রাসায়নিক খাদ্য গুণ

দাহ্যগুণ—		মেদকারিতাগুণ	
শ্বেতসার ও শর্করা	১৬.৯	প্রোটিড	৭.০
তৈল	.৫	ভস্ম	১.০
জল—৭০.৬			

মেদকারিতা গুণে ইহা অন্যান্য তরকারী হইতে শ্রেষ্ঠ। ডাইল যেরূপ দুষ্পাচ্য, ইহা সেরূপ নহে। পক্ক বুট বা মটর জলে ভিজাইয়া অঙ্কুরিত হইবার সময়ে রন্ধন করিলে ইহার সার পদার্থ অধিক পরিমাণে জীর্ণ হইতে পারে। মটর রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক, আমদোষজনক, কফপিত্তনাশক এবং দাহনিবারক। মটর শুঁটি ও মটর শাকের গুণ অনেকটা মটরের ন্যায়। তবে কচি মটর শুঁটি মটর অপেক্ষা লঘুপাক।

১৩। সিম।

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহ্যগুণ—	মেদকারিতাগুণ
শ্বেতসার ও শর্করা.....৬·৯	প্রোটিড.....২·১
তৈল.....·৩	ভস্ম.....·৭

জল—৮৩·।

সিমের গুণ—গুরুপাক, রুক্ষ, কোষ্ঠগত বায়ুর প্রকোপক, এবং অগ্নি, বল, শুক্র ও মলের ক্ষয়কারক।

১৪। বরবটী।

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহ্যগুণ—	মেদকারিতাগুণ
শ্বেতসার ও শর্করা.....১·৬	প্রোটিড.....৩·৫
তৈল.....১·২	ভস্ম.....১·৬

জল—১২·।

বরবটী অতি বলকারক দ্রব্য। মেদকারিতাগুণে ইহা কড়াই শুঁটি ব্যতীত, অন্যান্য তরকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বরবটীর গুণ গুরুপাক, সারক, রুচিকর, বলকারক, স্তন্যজনক, এবং কফ, শুক্র ও অম্ল পিত্তের বৃদ্ধিকারক।

স্বাস্থ্যরক্ষা ও লোকশিক্ষা।

সকল দেশেই পল্লীই দেশের প্রাণ; সেখানেই জাতির প্রধান বাসস্থান। যে কোন দেশেই,—নগরের সংখ্যা কয়টিই বা, এবং তাহাতে কয়জন লোকই বা বাস করে! দেশের অধিবাসী বলিতে পল্লীগ্রামবাসী-দেরই বুঝিতে হয়। যে দেশের পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ, সে দেশের অধিবাসীদের জীবনীশক্তিও সেই পরিমাণে কম বা বেশী।

বাঙ্গলার পল্লীসমূহের স্বাস্থ্যের অবস্থা সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে মন্দ—অতিশয় মন্দ। বাঙ্গলার পল্লীবাসীরাও সেই কারণে, দুর্ব্বল চিররুগ্ন, অস্থিচর্ম্মসার, ক্ষীণ-জীবী। তাহাদের মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যাও খুব বেশী। ইহার প্রতিকারের জন্য দেশময় আন্দোলন চলিতেছে। সকলেই গবর্ণমেণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, কখন গবর্ণমেণ্টের অবসর হইবে, অর্থের স্বচ্ছলতা ঘটিবে,—গবর্ণমেণ্ট পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দূর করিয়া গ্রামগুলিকে স্বাস্থ্যসম্পন্ন করিয়া তুলিবেন। কিন্তু, কেবল সরকারের মুখের দিকে চাহিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকাই কি ঠিক? এ সম্বন্ধে আমাদের নিজেদেরও কি কিছুই কর্ত্তব্য নাই?

কথায় আছে, "God helps those who help themselves." অর্থাৎ, উদ্যমশীল ব্যক্তিই ভগবানের করুণা লাভ করিয়া থাকে। প্রজারক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের যাহা কর্ত্তব্য, গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই তাহা করিবেন। নূতন শাসন-সংস্কার-ব্যবস্থা অনুসারে দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার দেশীয় মন্ত্রিগণের হাতে আসিয়া পড়িতেছে। ইহার ফল ভালই হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা নিশ্চেষ্ট থাকিব কেন? গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে অনুরোধ করিতেছি বটে, কিন্তু আমরাই কি আমাদের নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিব না কেন?

দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা যে খুবই খারাপ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু ৫০ বৎসর পূর্ব্বে অবস্থা এমন দুরবস্থা ছিল না। আবার ১০০ বৎসর পূর্ব্বে দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা আরও ভাল ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বঙ্গদেশের পল্লীগ্রাম অঞ্চলের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালর দিক হইতে ক্রমশঃ মন্দের দিকে যাইতেছে। যেরূপ অবস্থা চলিতেছে, তাহার প্রতিকার না হইলে, ৫০ বৎসর পরে বাঙ্গলাদেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা এখনকার অপেক্ষাও অনেক খারাপ হইয়া যাইবে। আরও ৫০ বৎসর পরে তদপেক্ষাও খারাপ হইবার সম্ভাবনা। অতএব, বঙ্গদেশকে, বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে, অচিরে প্রতিকারের উপায় আবিষ্কার ও অবলম্বন করিতেই হইবে।

বেশ কথা। সকলেই এই কথা বলিতেছেন। কিন্তু সে উপায়টি কি? সেটি এখনও স্থির হয় নাই। এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। একটা দুরবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে, তাহার সঠিক কারণটি আগে জানা আবশ্যক। বাঙ্গলা দেশের স্বাস্থ্য যে দিন দিন খারাপ হইয়া যাইতেছে, তাহার পিছনে একটা কারণ আছেই। সেটি স্থির হইয়া গেলেই, প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করা সহজ হইয়া আসিতে পারে। সুতরাং এই কারণটি আবিষ্কারের উপরেই বাঙ্গলা দেশের স্বাস্থ্য,—বাঙ্গালী জাতির জীবন-মৃত্যু নির্ভর করিতেছে।

বাঙ্গলা দেশের আয়তন বড় ছোট নয়। এত বড় দেশটা যে রোগে রোগে জীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহার কারণ নিশ্চয়ই খুব ব্যাপক ও বিস্তৃত ব্যাপার। কোন একটা স্পেসিফিক বিষয়কে এই কারণ বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। কোন একটা কারণে এরূপ বহু-বিস্তৃত দেশের স্বাস্থ্য একেবারে খারাপ হইয়া যাইতে পারে না। অনেকগুলি কারণের সমবায়ে ইহা ঘটিতেছে, এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

এই কারণ সমবায়কে দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হইবে। এক, মুখ্য বা প্রত্যক্ষ কারণ; অপর, গৌণ বা পরোক্ষ কারণ। বাঙ্গলা দেশে ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছে; আরও বহু লক্ষ লোক জীবন্মৃত অবস্থায় কোনরূপে বাঁচিয়া রহিয়াছে। এই ম্যালেরিয়া রোগকে বাঙ্গলার স্বাস্থ্যহীনতার একটা প্রত্যক্ষ কারণ বলা যাইতে পারে। সেইরূপ বসন্ত, ওলাউঠা, প্লেগ, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, প্রভৃতি ব্যাধিগুলিকেও বাঙ্গলার স্বাস্থ্যহীনতার এক একটা প্রত্যক্ষ কারণ বলিতে পারা যায়।

আবার, গ্রামগুলিতে আগাছা, গুল্মলতাদির জঙ্গলের বাহুল্য ঘটায়, জলনিকাশের প্রণালীগুলি রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায়, পুষ্করিণীগুলি মজিয়া, হাজিয়া, তাহাদের জল পানা, বৃক্ষলতাদির পচনের ফলে দূষিত হওয়ায় ম্যালেরিয়ার প্রাবল্য ঘটিতেছে; দেশের সর্ব্বত্রই অবস্থা এই একইরূপ হওয়ায় ম্যালেরিয়া দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে; অতএব এই অবস্থাটি, বাঙ্গলার স্বাস্থ্যহীনতার একটী গৌণ বা পরোক্ষ কারণ। সেইরূপ, বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব কালে স্পর্শ-দোষ পরিহার সম্বন্ধে সতর্কতার অভাব, কেবল মাত্র ৺শীতলা মাতার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া নিষ্ক্রিয়-ভাবে বসিয়া থাকা, প্রতিকারের বা চিকিৎসার কোনরূপ ব্যবস্থা না করা, প্রতিষেধক টিকা লইয়া পূর্ব্বাহ্নে সাবধান না হওয়া—প্রভৃতি কারণে, কোন স্থানে একবার বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে, রোগ অচিরে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। বসন্ত রোগ সংক্রান্ত এই ত্রুটিগুলি বাঙ্গলার স্বাস্থ্যহীনতার অন্যতম গৌণ বা পরোক্ষ কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

আবার, যখন কোন স্থানে কলেরা রোগ দেখা দেয়, তখন দেখিতে দেখিতে এই রোগ গ্রামময় বিস্তৃত হইয়া পড়ে; এবং ক্রমশঃ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। চিকিৎসকেরা জানেন, পানীয় জল দূষিত হইয়া কলেরা রোগ উৎপন্ন হয়, এবং কলেরা রোগ-বীজাণু-দুষ্ট পুকুর বা পাতকুয়ার জল যাহারা ব্যবহার করে, তাহারাই এই রোগে আক্রান্ত হয়। চিকিৎসকেরা বা স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা এই তত্ত্বটুকু জানিলেও, আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তারের অল্পতা হেতু, শতকরা ৯৫ জন অশিক্ষিত হওয়ায়, এই অতি প্রয়োজনীয় তত্ত্বটুকু তাহারা জানে না। কাজেই তাহারা কলেরা রোগীর মলমূত্রদূষিত বস্ত্রাদি পুকুরে বা পাতকুয়ার ধারে ধৌত করে এবং তদ্দ্বারা জলও দূষিত হয়। কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই তত্ত্ব-টুকু জানিয়া, সাধারণ গ্রাম্য লোকদের ঐরূপ করিতে নিষেধ করিতে গেলে, বা তাহাদিগকে এই তত্ত্বটুকু বুঝাইতে গেলে,—তাহাদের চিরন্তন অধিকারে হস্তক্ষেপ

করা হইতেছে মনে করিয়া,—তাহারা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে; এবং ফলে, গ্রামে দলাদলি, ঝগড়া, বিবাদ, মারামারি উপস্থিত হয়। ইহাও রোগ-বিস্তৃতির একটী পরোক্ষ কারণ।

এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, শিক্ষার অভাব কতকটা পরিমাণে আমাদের পল্লী অঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্য দায়ী। শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটাইতে পারিলে, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি জনসাধারণকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিলে, পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য সর্ব্বতোভাবে না হউক, কতকটা যে ভাল হইতে পারে, তাহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু, এই লোকি-শিক্ষার ভার লইবে কে? ইহা ত বড় ছোটখাট বা সোজা কাজ নয়। স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইলে, গোড়ায় জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটাইতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার না ঘটিলে,—দেশের সর্ব্বসাধারণ অল্প বিস্তর লিখিতে পড়িতে না শিখিলে, তাহাদিগকে স্বাস্থ্য তত্ত্ব শিক্ষা দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র হইয়া পড়িবে। অশিক্ষিত লোকে স্বাস্থ্য তত্ত্বের একটীও কথা বুঝিতে পারিবে না; অধিকন্তু এরূপ যে কোন চেষ্টাবেই তাহারা সন্দেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া, এরূপ চেষ্টার বিরোধী হইয়া উঠিবে, এবং এই মহৎ অনুষ্ঠানটিকে সর্ব্বপ্রকারে বাধা দিবার ও নিষ্ফল করিবার চেষ্টা করিবে।

সুখের বিষয়, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃতি সাধনের পক্ষে একটা সুবিধা এই হইয়াছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই আইনটিকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে অনেক কাটখড় লাগিবে। ইহা সাধন করা প্রচুর অর্থ ব্যয় ও দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। হয় ত বা এজন্য নূতন ট্যাক্স বসাইতে হইবে। তখন দেশব্যাপী একটা আপত্তির রোল উঠিবে নিশ্চয়ই। কিন্তু, আমাদের মনে হয়, এ বিষয়ে আপত্তি করা ঠিক হইবে না। আইন যখন পাশ হইয়া গিয়াছে এবং কাজটিও যখন আমাদের পক্ষে হিতকর, তখন এজন্য কিছু অতিরিক্ত কর দেওয়া যাইতে পারে।

সে যাহা হউক, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার রীতিমত বিস্তার ঘটাইতে অনেক বৎসর কাটিয়া যাইবে। ততদিনে দেশের স্বাস্থ্য আরও খারাপ হইয়া পড়িবে। অতএব আশু কোন প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করা অতীব আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বারান্তরে তৎসম্বন্ধেই একটু আধটু আলোচনা করিব।

পল্লী-স্বাস্থ্য

বাঙ্গলার চারিদিকে নূতন শাসন-ব্যবস্থা উপলক্ষে নবগঠিত ব্যবস্থাপক পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচনের মহাধুম পড়িয়া গিয়াছে। মফস্বলের সংবাদপত্র সকল এখন এই রাজনীতি-তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছেন। ঘরের কথা, দেশের স্বাস্থ্যের কথা, দেশবাসীর জীবন মরণের কথা ভাবিবার কাহারও বড় একটা অবসর বা প্রবৃত্তি দেখিতেছি না। ইহারই মধ্যে পল্লীস্বাস্থ্য সমাচার যেটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই পাঠকবর্গের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতেছি। সহযোগী বঙ্গরত্ন লিখিয়াছেন—

স্বাস্থ্য—আজকাল কৃষ্ণনগরের স্বাস্থ্য কিঞ্চিৎ মন্দ দাঁড়াইয়াছে অজীর্ণ আমাশয় উদরাময় প্রভৃতি পেটের পীড়ার সংখ্যা অত্যন্ত

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে জ্বরজাড়ীও কম নাই। কৃষ্ণনগর সরকারী হাঁসপাতালে দৈনিক রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এক্ষণে প্রায় দেড়শত করিয়া রোগীর সমাগম হইতে দেখা যায়।

সহযোগী "যশোহর" অভিযোগ করিতেছেন—

স্বাস্থ্য:—শ্রাবণ মাসের প্রারম্ভ হইতে চারি দিকে জ্বরজ্বালা প্রারম্ভ হইয়াছে। এক ডাক ঘরের কুইনাইন লোকের সম্বল; তাহাও এক টিউবের কম বিক্রয় করা নিষেধ; মূল্যও ।৷৹ আনা।

জলপ্লাবনে মেদিনীপুর জেলার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মেদিনীপুর সহর যদিও জলমগ্ন হয় নাই, তথাপি, তাহার স্বাস্থ্য আশাপ্রদ নয়। সহযোগী "মেদিনীবান্ধব" লিখিয়াছেন—

সহরের স্বাস্থ্য:—

সহরের স্বাস্থ্য এখন ভাল নয়। কারণ কয়েক সপ্তাহ হইতে সহরের বিভিন্ন পল্লীতে কলেরার আক্রমণ দেখা দিয়া, তাহা ক্রমেই সহরময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইহার আক্রমণ যাহাতে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ না করে, তজ্জন্য মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ মনোযোগী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। এবং সহরবাসীগণেরও আহারাদি সম্বন্ধে যথারীতি সাবধান হওয়া উচিত। বসন্তের আক্রমণ এখন আর নাই; তবে জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। দুই একটা টাইফয়েড জ্বরের আক্রমণ দেখা যাইতেছে। ১নং ওয়ার্ডের হবিবপুর, আপ্রিপ বাজার ও কোতবাজার পল্লীতে কলেরার আক্রমণ দেখা দিয়াছে।

বর্ষান্তে চারিদিকেই জ্বর জাড়ির প্রকোপ আরম্ভ হইল। সহযোগিনী "কল্যাণী" সংবাদ দিতেছেন—

অবিশ্রান্ত বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা রাক্ষসীর করাল কবলে মানবের অস্থিমাংস চর্ব্বণের উপক্রম হইয়াছে। একে একে বাড়ীশুদ্ধ সকলে শয্যাশায়ী হইতেছে। ডাক্তার ডাকাইবার, পথ্য সংগ্রহের অর্থ হাতে নাই—কদাহার, কুবাস, কদাচ্ছাদন তাহাদিগকে অহরহঃ মরণের দিকে ঠেলিতেছে। এখন প্রত্যেকেরই যন্মরণং সোহস্তু বিশ্রামঃ।

রাজসাহীর সহযোগিনী "হিন্দুরঞ্জিকা" বড় গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন। ইহার অবিলম্বে প্রতিকার হওয়া আবশ্যক; নচেৎ সাধারণের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হওয়া অনিবার্য্য—

মিউনিসিপালিটী।

অত্রত্য মিউনিসিপালিটীর রডাক্ রোড দক্ষিণ দিকে যেখানে নাটোরের জিলা বোর্ডের রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে, সেখানে পদ্মার জল যাতায়াতের ড্রেণে গোসাঁই কুঠীর ও সম্পূর্ণ ঘোড়ামারা অধিবাসীদের মূত্র, পায়খানার জল ও অন্যান্য দুর্গন্ধযুক্ত জল আসিয়া জমা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে কিছুদিন ঐ জল ছিদ্রযুক্ত গাড়ীতে পূর্ণ হইয়া রাস্তায় ঐ দুর্গন্ধযুক্ত জল ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যাইত; এক্ষণে মিউনিসিপালিটী হইতে প্রতিদিন ঐ জল ছেঁচিয়া উত্তরাভিমুখে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ও কুমুদনাথ দত্ত মহাশয়দের বাসার সম্মুখের ড্রেণের জলের সহিত মিশাইয়া দেওয়া হইতেছে। মিউনিসিপালিটী সহরের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বৎসরে প্রায় ৩০০৲ টাকা স্বাস্থ্যরক্ষক ডাক্তার ও ইন্স্পেক্টারের বেতন বাবত দিতেছেন। ইঁহারা কিছুদিন এইরূপে, অধিবাসীদের স্বাস্থ্য যাহাতে নষ্ট না হয় তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, অনেক কাজ করা হয়। আমরা এ সম্বন্ধে মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়ের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এই ড্রেণে পদ্মার জল প্রবাহিত হইলে ঐ জল বহু পুষ্করিণীতে দেওয়া হইয়া থাকে, এবং সেই সমস্ত পুষ্করিণীর জল সহরের অধিবাসীদের পানীয় জলরূপে ব্যবহৃত হয়। এই রডাক রোডের দক্ষিণদিকের নিকটস্থ ড্রেণে সম্পূর্ণ সাগরপাড়ার অধিবাসীদের ও গো মহিষাদি পশুর শরীরের সমস্ত ক্লেদ ও উত্তর দিকে শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাসার নিকটে ঐ ড্রেণে সম্পূর্ণ রাণীবাজারের অধিবাসী ব্যক্তিগণের ও জীবসমূহের শরীরের ক্লেদ বহিয়া আসিয়া জমিয়া থাকে; এবং বর্ষাকালে ঐ সমস্ত মলমূত্রাদি পানীয় জলের জন্য ব্যবহৃত পুষ্করিণীতে পতিত হইয়া আবার জীব-শরীরের বিনির্গত ক্লেদ আরও পচিয়া জীব শরীরেই প্রবেশ করিয়া সহরের অধিবাসীদের নানারূপ ব্যারামের সৃষ্টি করিয়া থাকে। মিউনিসিপালিটীর বোর্ডে বহু শিক্ষিত কমিশনর আছেন; এবং তিনজন ডাক্তারও —বোর্ডে স্থান পাইয়াছেন। সহরের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থার জন্য বহু টাকা ব্যয়ও হইতেছে; অথচ স্বাস্থ্যরক্ষার তেমন কোন ব্যবস্থা হইতেছে কি?

আলোচনা।

ভৈরব নদের সংস্কার।—

একটা সুখবর আছে; পাঠকেরা শুনিয়া সুখী হইবেন আশা করি। ম্যালেরিয়ার প্রভাবে এবং অন্যান্য রোগে ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থার দরুণ যশোহর জেলা উজাড় হইবার উপক্রম হইয়াছে। যে সকল কারণে এই জেলার এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে জলনিকাশের সুবন্দোবস্তের অভাব অন্যতম। ভৈরব নদ এই জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত। কিন্তু মজিয়া যাওয়ায় তদ্দ্বারা ভালরূপ জলনিকাশ হয় না। বিগত ২৫ বৎসরেরও অধিক কাল এই নদটির সংস্কারের জন্য প্রার্থনা করা হইতেছিল। এত দিনে সে প্রার্থনা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। যশোহরের সুবিখ্যাত জননেতা রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর যশোহর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রূপে এই সংস্কার কার্য্য করাইবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। গত ২৫শে আগষ্ট তারিখে বাঙ্গলার লাট লর্ড রোণাল্ডশে বাহাদুর যখন দৌলতপুর পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি রায় বাহাদুরকে জ্ঞাপন করেন যে, সেপ্টেম্বর মাসে কৃষি ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি পাশ হইয়া আইনে পরিণত হইলেই, অক্টোবর মাসে ভৈরব নদের সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইবে। এই সংস্কার কার্য্য সাধন করিতে ২২ হইতে ২৪ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত খরচ হইতে পারে। কিন্তু এতদ্দ্বারা যশোহরের ন্যায় একটী বড় জেলা যদি ম্যালেরিয়া-মুক্ত হয়, তাহা হইতে এ কাজটা খুব সস্তায় হইয়া যাইবে, এ পক্ষে বোধ করি কাহারও ভিন্ন মত হইবে না। লাট বাহাদুর যদি অন্ততঃ এই কার্য্যটি করিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পবিত্র স্মৃতি বঙ্গবাসী আনন্দিত চিত্তে তাহাদের হৃদয়ে চির জাগরুক রাখিতে একটুও ইতস্ততঃ করিবে না।

মফস্বলে চিকিৎসা-বিদ্যালয়।—

দেশে যতই চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞানের বিস্তার হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ, দেশের বর্ত্তমান অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্য দেশের অধিবাসিগণের চিকিৎসা বিষয়ে অজ্ঞতা যে কতকটা পরিমাণে দায়ী, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। দেশে চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি চিকিৎসা-বিষয়ক জ্ঞান বিস্তারের অন্যতম উপায়। সেই জন্য কোথাও নূতন চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হইলে আমরা আনন্দের সহিত সেই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া থাকি; এবং মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপনের পরামর্শও দিয়া থাকি। বঙ্গদেশে জেলায় জেলায় মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হইলে একটা পরোক্ষ উপকারও আছে। অধুনা প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক বঙ্গীয় যুবক ম্যাট্রিকুলেশন, আই-এ, আই-এসসি, বি-এ, বি-এসসি, এম-এ, এম-এসসি পাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইতেছে। পূর্ব্বে এই সকল পরীক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে অর্থকরী ছিল। শিক্ষিত যুবকগণ, আর কিছু না হউক, অন্ততঃ কেরাণীগিরির যোগাড় করিয়াও অন্ন সংস্থান করিতে পারিত। এখন পাশকরা যুবকের সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। এই সকল যুবকের এখন চাকুরী মিলিতেছে না। ইহারা অন্ন সংস্থানের কোনই উপায় দেখিতে না পাইয়া জীবনে হতাশ হইয়া পড়িতেছে। ইহার পরিণাম দেশব্যাপী অসন্তোষ। পাশ-করা যুবকগণের মধ্যে অনেকেই চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু দেশে যে কয়টি মেডিক্যাল কলেজ ও স্কুল আছে, তাহাতে সকল চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থীর স্থান সঙ্কুলান হইতে

পারে না। সেই জন্য কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ, ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল ও অন্যান্য মেডিক্যাল স্কুলে প্রবেশার্থী বহু ছাত্রকে স্থানাভাবে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়। দেশে মেডিক্যাল স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধি হইলে ইহাদের অন্নসংস্থানের একটা সদুপায় হয়। বিশেষতঃ ওকালতী ব্যবসায়ের ক্ষেত্র এখন যেমন জনাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, চিকিৎসা ব্যবসায়ের ক্ষেত্র এখনও সেরূপ হয় নাই। এখনও দেশে সুচিকিৎসকের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। এ অভাব এখনও এত বেশী যে, অনেক স্থলে লোকে উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাবে অকালে অনর্থক হাতুড়ের হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইতেছে। সেইজন্য আমরা আনন্দের সহিত পাঠক-বর্গকে জানাইতেছি যে, সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট মৈমনসিংহ নগরে একটী মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। স্কুল স্থাপনের জন্য ভূমি সংগ্রহ করা হইতেছে। মৈমনসিংহ নগরে ১৮ বিঘা জমির উপর একটী সুন্দর প্রথম শ্রেণীর হাসপাতাল আছে। মৈমনসিংহে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হওয়া যে খুবই দরকার, তাহা এই জেলায় স্বাস্থ্য-তালিকা হইতে বেশ বুঝা যায়।—১৯১২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই জেলায় কলেরা, বসন্ত ও জ্বর রোগে নিম্নলিখিত পরিমাণে লোকক্ষয় হইয়াছে:—

বৎসর	কলেরা	বসন্ত	জ্বর
১৯১২	৪৮৪০	২৯৫১	৬২৯৪৪
১৯১৩	৬৩৬৪	১৯৯৩	৬৩৮৫১
১৯১৪	৪২৯২	৪৭৫	৭২১৪১
১৯১৫	২৬৬৫৩	১০৮০	৮২৮৫৪
১৯১৬	৭৩১৯	১৯৯৬	৬৭৩২৭
১৯১৭	৩৫৯৫	১০৪৭	৭০২৫০
১৯১৮	১১১৭২	২২২	১৫৬০১৩
১৯১৯	৯৯৪০	২৮৫৬	৯৫১৭৫

ইহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, এই জেলায় একটী মেডিক্যাল স্কুলের প্রয়োজনীয়তা কত অধিক। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, চট্টগ্রাম জেলাতেও একটী মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আমরা আশা করি, বাঙ্গলার প্রত্যেক বড় জেলাতে ক্রমে ক্রমে একটী করিয়া মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হইয়া দেশে সুচিকিৎসকের অভাব দূর করিতে সমর্থ হইবে।

প্যারী নগরে ম্যালেরিয়া।—

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের কিসে এত পার্থক্য, কেন এত তফাৎ, তাহার একটা দৃষ্টান্তের আলোচনা করা যাক। হয় ত ইহাতে আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের পক্ষে কিছু সুবিধা হইবে। সম্প্রতি ইয়োরোপের অন্যতম প্রধান দেশ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরে ম্যালেরিয়ার বীজবাহী এনোফেলেস মশক আবিষ্কৃত হইয়াছে। যেমন আবিষ্কৃত হওয়া, অমনি তাহার প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিতেও লাগিয়া যাওয়া। প্যারীতে পাস্তুর ইনষ্টিটিউট নামে একটী চিকিৎসাবিষয়ক পরীক্ষাগার আছে। রোগের কারণ অনুসন্ধান এবং তাহার প্রতিকারের উপায় আবিষ্কার করাই এই পরীক্ষাগারের কাজ। কুকুরে কামড়ানো রোগের (hydrophobia) টীকা এবং চিকিৎসা প্রণালী এই পরীক্ষাগার হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্যারী নগরে ম্যালেরিয়া-বাহী মশক ধরা পড়িবামাত্র, এই বিজ্ঞানাগারের কর্ত্তৃপক্ষ মশা তাড়াইবার উপায় আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। নানারূপ পরীক্ষার পর স্থির হইল যে, যে জলে এই মশা ডিম পাড়িবে সেই জলে ফর্ম্মালিন (formaline) নামক ঔষধের চূর্ণ ছড়াইয়া দিলে তাহা ভক্ষণ করিয়া মশার বাচ্ছাগুলি মরিয়া যাইবে। এই ঔষধ এত অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিতে হয় যে, তাহাতে কেবল মশক-শাবকেরাই মরে; গরু বাছুর বা অন্য জীবজন্তু সেই জল পান করিলেও তাহাদের কোন অনিষ্ট হয় না। এই ত গেল ফ্রান্সের অবস্থা। আর আমাদের দেশের অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখুন। আমরা কত বৎসর ধরিয়া

লাখে লাখে বছর বছর ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া মরিতেছি। অথচ, এমন নূতন নূতন পরীক্ষা ও আবিষ্কার হওয়া ত দূরের কথা, অন্যান্য দেশে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য যে সকল ফলপ্রদ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে; সেগুলিও এখানে কার্য্য পরিণত হইতেছে না; এমন কি, সে পক্ষে বিশেষ কিছু চেষ্টাও যে হইতেছে, তাহারও তেমন কোন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। ইহা কি নিতান্ত দুঃখের বিষয় নহে?

রাটোনার কসাইখানা।—

মধ্য প্রদেশের রাটোনা নামক স্থানে একটী কসাই-খানা স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন হইতেছিল। কলি-কাতার কোন ইয়োরোপীয়ান সওদাগর কোম্পানী এই কসাইখানা নির্ম্মাণ করিয়া তাহা চালাইবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। মধ্য প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ পূর্ব্বক কোম্পানীকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। এই কসাইখানা স্থাপনের প্রস্তাব শুনিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ-ময় আন্দোলনের তরঙ্গ উত্থিত হয়। ভারত গবর্ণ-মেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় এই বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে গবর্ণমেণ্ট বলেন উহা প্রাদেশিক ব্যাপার, উহাতে ভারত গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না। মধ্য প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায়ও এ সম্বন্ধে প্রশ্ন হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট উত্তরে দেশীয় কসাইদিগের উপর নিষ্ঠুরতা, স্বাস্থ্যজ্ঞানহীনতা প্রভৃতি নানারূপ দোষারোপ করিয়া প্রস্তাবিত কসাইখানার পক্ষ সমর্থন করেন। কিন্তু তাহাতে দেশের লোক শান্ত হয় নাই। সমস্ত ভারত-বর্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ হইতেছিল। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, এই কসাইখানা স্থাপনের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমরা বলি, ভালই হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, ভারতে গো-জাতির বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া নূতন নূতন কসাইখানা স্থাপনে উৎসাহ দেওয়া ত দূরের কথা, বর্ত্তমান কসাই-খানা সমূহের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমাইয়া ফেলা উচিত। গোমাংসের লোভে গোহত্যা করিয়া গোদুগ্ধ হইতে দেশবাসীদের বিশেষতঃ কচি কচি শিশুদের বঞ্চিত করা কেবল মূর্খতা নয়, উহা ইকনমিক্স শাস্ত্রের বিরোধী। দেশে খাদ্যাভাব যেরূপ দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে একটু বিবেচনা করিয়া কাজ করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। একদিনের রসনা তৃপ্তির জন্য বহু দিনের খাদ্য সংস্থানের উপায় নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কার্য্য হইতেছে না। ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, দেশীয় বা ইয়োরোপীয় কাহারও মঙ্গল হইবে না; পরিণামে খাদ্যাভাবে সকলকে সমান ভাবে কষ্ট পাইতে হইবে। গোহত্যার প্রশ্ন সম্বন্ধে ধর্ম্মের কথা না তুলিয়া ইকনমিক্সের দিক হইতে কথাটার বিচার করিতে হইবে। এদিকে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কাহারও সহিত কাহারও বিবাদের সম্ভাবনা নাই; এপক্ষে সকলেরই স্বার্থ সমান। সেই জন্য, দেশের ভবিষ্যৎ খাদ্য সংস্থানের কথা বিবেচনা করিয়া, আমরা এই গোবধ প্রশ্নটির সম্বন্ধে সকলকে ধীর ভাবে আলো-চনা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

প্রাপ্তী-স্বীকার ও সমালোচনা।—

"ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার"; ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-নাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য বিশারদ প্রণীত; মূল্য আট আনা ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

গ্রন্থকার স্বাস্থ্য সমাচারের পাঠক পাঠিকাগণের নিকটে অপরিচিত নহেন; তাঁহার সুলিখিত স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবন্ধ মধ্যে মধ্যে স্বাস্থ্য-সমাচারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমরা তাঁহার এই সুন্দর পুস্তকখানি পড়িয়া যথার্থই তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। ইহাতে তিনি সরল, প্রাঞ্জল, সাধারণের বোধগম্য ভাষায় নিত্য প্রচলিত কতকগুলি রোগের বিবরণ ও তাহার প্রতিষেধের উপায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে অনভিজ্ঞ পাঠকও পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক হইয়া অনেক রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। এরূপ ধরণের পুস্তক দেশবাসীর মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান বিস্তারে সহায়তা করে। সেই জন্য আমরা এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

স্বাস্থ্য সমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৯ম বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩২৭ সাল { ৭ম সংখ্যা

আগমনী।

'আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে ভরেছে দেশ।' আনন্দময়ীর আগমনে দেশ আনন্দে ভাসিতেছে। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আনন্দ। যে নিতান্ত দরিদ্র সেও নিজের ছেলেমেয়েদিগকে রঙ্গীন বস্ত্রে সজ্জিত করিয়াছে। বড়লোকের বাড়ীতে ঘটার সীমা নাই। দুর্গাপূজা বাঙ্গালীর নিজস্ব। লোকে কথায় বলে,—

যেথানে বাঙ্গালী,
সেখানে দলাদলি;
সেখানে পাঁঠাবলি
সেখানে দুর্গাকালী

প্রায় সকল সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়ীতেই মায়ের অর্চ্চনা হইয়া থাকে। পূজার কয়দিন সমস্ত গ্রাম আনন্দ-ধ্বনিতে ও হাস্য-কলরোলে মুখরিত থাকে। প্রবাসী ছাত্র ও আফিসের কর্ম্মচারিগণ দলে দলে পূজার ছুটিতে বাড়ী যাইয়া এক মাসের জন্য আত্মীয় স্বজনের সহবাস সুখ ভোগ করে। কিন্তু দশ বৎসর পূর্ব্বেও শারদীয়া পূজার সময় গ্রামে যাইয়া গ্রামবাসীগণের সহিত বৎসর কাল পরে যে আনন্দ অনুভব করিতাম, আজ ত তাহা পাইতেছি না। পূজার ঘটা অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। সাজ সজ্জা আড়ম্বর নাই বলিলেই হয়। গ্রামে নরনারী বিষণ্ণ মুখে ঠাকুর ঘরের আঙ্গিনায় প্রতিমার পানে তাকাইয়া আছে। কারণ, এই দুর্ভিক্ষের দিনে অনেকের হাঁড়িতে ভাত নাই, পেটে অন্ন নাই। ঘরে প্রিয়তম পুত্র কন্যা ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত, গ্রামবাসী অনশন-ক্লিষ্ট, বর্ষাশেষে ম্যালেরিয়া রাক্ষসী গ্রাম বিধ্বস্ত করিয়া গিয়াছে। বৎসর কাল পরে গ্রামে প্রবেশ করিলে অনেক পরিচিত ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ শুনিতে হয়। যাহারা মৃত্যুর করল হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহারাও কঙ্কালসার হইয়া কোনও মতে জীবন ধারণ করিয়া আছে। নবজাত শিশু স্তন্য বা বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধের অভাবে জীর্ণ শীর্ণ হইতেছে। কলেরা বা বসন্ত প্রভৃতি মহামারী সকল ঋতুতেই গ্রামে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছে। বর্ষার জলে গ্রামের চারিদিকে ডোবা নালা ভরিয়া গিয়াছে ও উহা মশককুলের আবাস স্থলে পরিণত হইয়াছে। গৃহস্থের বাটীর চারিদিকে আগাছা ও জঙ্গল ঘেরিয়া আছে। গ্রামের বাজার ক্রমশঃ জন-শূন্য হইতেছে। গৃহস্থের বাড়ীতে আর সে আমোদ

প্রমোদ নাই। সন্ধ্যার সময় পুকুরের পাড়ে বসিয়া যুবকগণ আর হাস্যধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করে না। গ্রামের প্রৌঢ়গণ সংকীর্ত্তন, পাঁচালী ও তর্জ্জা গানে আর পল্লী জীবন সঞ্জীবিত রাখে না। গ্রামের সেই জীবন্ত জীবন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেই পল্লীগ্রাম, একদিন যাহা স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের লীলা নিকেতন ছিল, যে পল্লীগ্রামে শারদীয়া সুষমায় মণ্ডিত হইয়া জগদ্ধাত্রী মাতা অবতীর্ণা হইতেন, আজ তাহা শ্মশান, ভূত প্রেতের আবাস স্থল, জনশূন্য—নীরব—নিস্তব্ধ। শারদীয়া পূজার সময় দেশে যাইলে এই চিত্রই চক্ষে পতিত হয়।

কবির কথায়—

'আর নাহি বয় শিহরি মলয়
আর নাহি হাসে আকাশের চাঁদ।'

এই দৃশ্য দেখিলে প্রথমেই মনে হয়, ইহার জন্য দায়ী কে? এমন একদিন ছিল, যখন বাঙ্গালার শ্রী, সৌন্দর্য্য, ধন, সম্পদ, আমোদ, প্রমোদ, আশা, ভরসা, সুখশান্তি, স্বাস্থ্যবল, সকলই শ্যামতরু-শোভিত, কাকলীমুখরিত ও বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র-পরিবৃত পল্লীগ্রামের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তখন সহরের নাম শুনিলে লোকে ভয় পাইত; সহরে আসিয়া বাস করা দূরে থাকুক, নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কেহ সহরে দুই চারি দিনের জন্যও আসিতে চাহিত না। সহর তখন লোকের কর্ম্মস্থলই ছিল এবং "প্রবাস" বলিয়া পরিগণিত হইত। লোকে যখনই কর্ম্মজীবনে অবকাশ পাইত তখনই "দেশে" যাইয়া নিঃশাস ফেলিয়া বাঁচিত। সহরের নানা মোহকর আকর্ষণ শান্তিসুখময় পল্লী-জীবনের সহিত বিচ্ছেদ সংঘটন করিতে পারিত না। পূজা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক জীবনে যাহা কিছু ক্রিয়া কর্ম্ম সে সকলই পল্লীগ্রামে নির্ব্বাহ হইত। লোকে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পল্লীগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিত এবং তাহাদের জীবনের অবশিষ্টাংশ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সহিত পরম সুখে অতিবাহিত করিত।

কিন্তু এখন গ্রামই বরং "প্রবাস" বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ কি? ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লোক সরকারী চাকরীর প্রতি অধিকতর প্রলুব্ধ হয়। সকলেই ক্রমশঃ গ্রাম ছাড়িয়া সহরে বাস করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তখনও পল্লীগ্রামে স্ত্রী-পুত্র রাখিয়া পুরুষগণ সহরে কর্ম্ম করিত। জীবন-সংগ্রাম যতই কঠোরতর হইতে লাগিল, লোক ততই গরীব হইতে চলিল। ক্রমে একজন লোক সহরে ও গ্রামে দুইটি বাসায় ব্যয় নির্ব্বাহ করা দুঃসাধ্য মনে করিল এবং পুত্র কলত্র লইয়া সহরেই বসবাস আরম্ভ করিল। এইরূপে গ্রামের শিক্ষিত লোকসমূহ সহরে বাস করিতে আরম্ভ করিল। গ্রামে অশিক্ষিত কৃষকগণ মাত্র অবস্থান করিতে লাগিল। বিদ্যা ও জ্ঞানের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকাতে তাহারা ক্রমশঃ কুসংস্কারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। গ্রাম হইতে পাঠশালা, টোল, মোক্তব, প্রভৃতি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইল। রোগ ও মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া গ্রামের অসহায় অশিক্ষিত অধিবাসী-গণ আরোগ্যের পথ খুঁজিয়া পাইল না। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারীর আক্রমণে গ্রাম ক্রমশঃ জনশূন্য হইতে লাগিল। বৃহৎ অট্টালিকা সংস্কারাভাবে ভগ্নস্তূপ মাত্রে পরিণত হইয়া সর্প, গোসাপ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থল হইল। মন্দির, দেবালয় প্রভৃতিতে বট অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ আশ্রয় গ্রহণ করিল। পূর্ব্ব পুরুষের পুষ্করিণী প্রভৃতি কে সংস্কার করিবে? "কাক-চক্ষু নিরমল" জল পঙ্ক ও পানা প্রভৃতি দ্বারা আবিল হইয়া পানের অযোগ্য হইয়া উঠিল। এই ত গ্রামের অবস্থা। শারদীয়া পূজার সময় সহরের কোলাহলময় জীবনে লোক ক্লান্ত হইয়া শান্তির আশায় গ্রামে গেলে এই বিষাদ ছবিই নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইয়া মর্ম্মন্তুদ পীড়া উৎপাদন করে।

উপায় কি? এখনও সময় আছে। দেশের শিক্ষিত পুরুষগণ এখনও গ্রামের প্রতি দৃষ্টিপাত

করিলে উহার উন্নতির আশা আছে। সহরের প্রচণ্ড সভ্যতার চাকচক্যময় মোহে না ভুলিয়া গ্রামের শান্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে আশ্রয় লইলে পল্লীসমূহ আবার পূর্ব্ব শোভা ও সুষমামণ্ডিত হইতে পারে। জ্ঞানের মশাল হস্তে শিক্ষিত যুবকগণ পল্লীগ্রামে প্রবেশ করিলে, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার বিদূরিত হইবে। স্বাস্থ্যতত্ত্বে অভিজ্ঞ যুবকগণ ঘরে ঘরে আরোগ্যের বার্ত্তা বহন করিলে ম্যালেরিয়া মহামারী অধ্যুষিত গ্রামগুলি স্বাস্থ্য ও শোভায় আবার হাসিতে থাকিবে।

ইহাই যুবকগণের ভাবিবার বিষয়। গ্রামে বাস করিলে তাহাদের ক্ষতি হইবার কারণ কি? বি-এ পাশ করিয়া কলিকাতার ন্যায় সহরে ২৫৲ ৩০৲ টাকার কেরাণীগিরি অপেক্ষা পল্লীতে পৈতৃক জায়গা জমির চাষবাস করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা অনেক সুখ-কর। আর্থিক হিসাবেও তাহা লাভজনক। কারণ সহরে ৩০৲ টাকার চাকরী করিলে মেসের খরচ ইত্যাদি বাদে ৫৲ টাকা উদ্বৃত্ত হয় কি না সন্দেহ। কিন্তু গ্রামে ২৫৲ টাকায় একটী পরিবার সহর অপেক্ষা সুখে জীবন যাপন করিতে পারে।

আমাদের দেশের যুবকগণের স্কন্ধে গুরু ভার ন্যস্ত হইয়াছে। এই কার্য্যের ভার তাহাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রামের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি। সমগ্র ভারতবর্ষে কয়টি সহর আছে। আর এদেশে শতকরা নব্বই জনই ত গ্রামে বাস করে। তাহাদিগের সুখ বিধান করিলে দেশের মঙ্গল হইবে। অনেকে মনে করে গ্রামে বিদ্যালয় নাই, শিক্ষিত সমাজ নাই। সহরে বাস করিবার পর তথায় বাস অসহ্য। কথাটি আংশিক সত্য বটে। কিন্তু কয়েকজন শিক্ষিত যুবক এক গ্রামে একত্র বাস করিলে তথায় বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। লোক শিক্ষিত হইবে। দরকার হইলেই উপায় উদ্ভাবিত হয়। গ্রামের কয়েকজন যুবক বদ্ধপরিকর হইলে ম্যালেরিয়া গ্রামে তিষ্ঠিতে পারিবে না। উহা ত নিবার্য্য ব্যাধি, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে সকলের সমবেত চেষ্টায় এই ব্যাধি নিরাকৃত হইয়াছে।

কর্ত্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, যুবকগণকে কোমর বাঁধিতে হইবে। সকলে মিলিয়া সদলে এই কার্য্যে ব্রতী হইলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই ম্যালেরিয়ার করাল কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। প্রথমে সন্ধান করিয়া জানিতে হইবে কোথায় ইহার সূতিকাগার। তার পর চেষ্টা করিতে হইবে মশক প্রসবের সেই আধারগুলি কিরূপে নষ্ট করা যায়। পঙ্কিল ও দুর্গন্ধময় নালা আর ডোবাগুলি পত্রপাঠ বুজাইয়া দিতে হইবে। মজা ও হাজা পুষ্করিণীর পানা ও পঙ্ক উদ্ধার করিতে হইবে। বাড়ীর নিকট জঙ্গল বা আস্তাকুঁড় রাখিবে না। পানীয় জল শোধন করিয়া লইবে। সর্ব্বদা পুষ্করিণী পরিষ্কার রাখিবে। ঝোপ ঝাপ ও জঙ্গল গ্রামের মধ্যে যত না থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। এই সকল নিয়ম পালন করিলে নিশ্চয়ই ম্যালেরিয়া গ্রাম হইতে বিদূরিত হইবে। এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিলে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীও গ্রাম হইতে দূর হইবে।

পল্লী রাণী আবার সৌন্দর্য্যে ভূষিতা হইবেন। পল্লীগ্রাম শৈশবের ক্রীড়াভূমি যৌবনের উপবন ও বার্দ্ধক্যের বারাণসী হইবে। তখনই আবার আনন্দময়ীর আগমনে সমস্ত নরনারীর বদন প্রফুল্ল হইবে। আবার শিশু ও বালকবালিকাগণের হাস্য কলরোলে দিগ্-দিগন্ত মুখরিত হইবে। দুর্গতিহারিণী উমাও শস্য শ্যামলা পল্লীগ্রামে আবার আসিয়া সুখে পাঁচ দিবস অতিবাহন করিবেন।

হিন্দু ডুবিল।

লেখক—ডাক্তার শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিশুদের অকাল-মৃত্যুর কারণ ও তাহা নিবারণের উপায়।

১। হিন্দুজননীগণের স্বাস্থ্যহীনতা।

এদেশের শিশুদের স্বাস্থ্যহানি ও অকাল মৃত্যুর কারণগুলি সংখ্যায় অনেক। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলি প্রধান, যথা—

(১) পিতামাতার ব্রহ্মচর্য্যের অভাব, (২) সুসন্তান উৎপাদন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা, (৩) সন্তান লালন-পালনে অবহেলা, (৪) বিশুদ্ধ মাতৃ-দুগ্ধের অভাব, (৫) বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধের অভাব, (৬) সূতিকা-গৃহ, (৭) ডাক্তারি তেজস্কর ঔষধ ও কৃত্রিম পথ্য (ফুড) প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার, (৮) বিদেশী বস্ত্রাদি ও পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার, (৯) জননীগণের স্বাস্থ্যহীনতা, (১০) ম্যালেরিয়া প্রভৃতি পীড়া।

আমরা এই প্রবন্ধে জননীগণের স্বাস্থ্যহীনতার কারণ ও তাহা নিবারণের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

হিন্দু জননীগণের স্বাস্থ্যহীনতার কারণ ও তাহা নিবারণের উপায়।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু জননীগণের স্বাস্থ্যহীনতা-বশতঃই হিন্দু শিশুগণের স্বাস্থ্যহানি ও অকাল-মৃত্যু ভীষণ ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। নিম্নলিখিত কারণে বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু জননীগণের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি হইতেছে, যথাঃ—

১। পাশ্চাত্য সভ্যতার ও বিলাসিতার অনুসরণ।

২। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ও ভেজাল দ্রব্য আহার।

৩। সংযমের অভাব ও অমিতাচার।

৪। বিশুদ্ধ জল, বায়ু ও আলোর অভাব।

৫। নাটক-নভেল পাঠ।

৬। শারীরিক পরিশ্রমের অভাব।

৭। পাশ্চাত্য স্ত্রী-শিক্ষা-প্রণালী।

৮। পাশ্চাত্য পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার।

৯। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি পীড়া।

১০। রমণীগণের বিশেষ বিশেষ পীড়া।

১। পাশ্চাত্য সভ্যতার ও বিলাসিতার অনুসরণ।

প্রাচীনা হিন্দু মহিলারা বলিষ্ঠা, নীরোগ ও দীর্ঘ-জীবিনী ছিলেন। বিলাসিতা কাহাকে বলে, হিন্দু রমণীরা তাহা জানিতেন না। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু জননীরা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিলাসিতা বা ফ্যাশনের অনুসরণ করিয়া দিন দিন স্বাস্থ্যহীন ও শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছেন। পাশ্চাত্য দেশের রমণীগণের এই বিলাসিতার বা ফ্যাশনের ফলে যে শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে, তাহা সে দেশের মহাপ্রাজ্ঞ ও সমাজহিতৈষী মহাত্মগণ জলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

আমেরিকার জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার কাউয়েল এম-ডি মহোদয় লিখিয়াছেনঃ—

"আমেরিকার শতকরা ৯৯ জন রমণী নানা পীড়া বিশেষতঃ জরায়ু সম্বন্ধীয় নানা গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকেন।" (1)

বিখ্যাতনামা ডাক্তার চাভাসী মহোদয়ঃ—

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বিলাতের

(1) "Out of a hundred women, there may on examination be found one who has perfect normal play of all the functions of her body—the remaining ninetynine being troubled with neuralgia or otherwise "dreadfully nervous" or have some one or other of the many "female complaints" (See The Science of a New Life, by Dr. Cowan, M. D. p. 307).

শতকরা ১০ জন স্ত্রীলোক বন্ধ্যা সন্তান হীন। (2) প্রাচীনা হিন্দু মহিলারা বিলাসিতার ফলে বন্ধ্যা ছিলেন, এমন একটী দৃষ্টান্তও আমরা অবগত নই। উক্ত ডাক্তার মহাশয় লিখিয়াছেন :—

আলস্যই বহু পীড়ার কারণ। যে স্ত্রীলোক সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে রত থাকেন, তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুস্থ ও সবল অনুভব করেন না। (3)

"বর্ত্তমান সময়ে বিবাহিতা রমণীগণ অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও উত্তেজনা পূর্ণ জীবন যাপন করিয়া থাকেন।" (4)

"আলস্য ও বিলাসিতা মৃদু বিষের কার্য্য করিয়া থাকে। আর্শেনিক প্রভৃতি বিষাক্ত ঔষধ যেমন ধীরে ধীরে শরীর ধ্বংস করে, বিলাসিতাও সেইরূপ শরীর একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে।" (5)

"বর্ত্তমান বিকৃত সভ্যতা স্বাস্থ্যরক্ষা ও পারিবারিক শান্তির সম্পূর্ণ অনুপযোগী।" (6)

"বর্ত্তমান যুগটা বিলাসিতার যুগ। প্রত্যেক বিষয়েই কৃত্রিমতা ও অস্বাভাবিকতা দৃষ্ট হয়। ইহার ফলে নানা পীড়া ও স্বাস্থ্যহানি হইয়া থাকে এবং রমণীরা বন্ধ্যা হয়।" (7)

(2) "It is an astounding and lamentable fact that about ten per cent of all the wives of England are barren—are childless." (See Dr. Chavassi's Advice to a Wife, p. 3.)

(3) "Idleness is the mother of many diseases * * * * a lady surrounded with every luxury and every comfort, she can not say that she ever and even for a single day really feels well and strong." (See Ditto, P. 6.)

(4) "The fact is, a wife now-a-days is too artificial, she lives on excitement." (See Ditto, P. 8.)

(5) "Indolence and luxury are slow poisons, they destroy by degrees." (See Ditto p 59).

(6) "The hurly-burly of a fashionable life is very antagonistic to health and to all home comforts (See Ditto p. 66.)

(7) "Unfortunately this is an age of luxury, everything is artificial and disease and weakness and even barrenness follows as a matter of course." (See Ditto P. 16.)

উক্ত মহাত্মা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের (পাশ্চত্য দেশের) বালিকারা প্রকৃত শিক্ষা মাত্রই প্রাপ্ত হয় না। উপযুক্ত মাতা হওয়ার জন্য কোন শিক্ষাই তাহারা লাভ করে না। গৃহকর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে যে জ্ঞানের, যে শিক্ষার একান্ত আবশ্যক, তাহাতে তাহারা গর্ভস্থ শিশুর ন্যায় অজ্ঞান ও অশিক্ষিতা থাকে। তাহারা এবং তাহাদের হতভাগ্য পতি ও সন্তানেরা নিশ্চয় সময়ে এই অজ্ঞানতার বিষময় ফল ভোগ করিবে সন্দেহ নাই। ফলতঃ, বর্ত্তমান সময়ে এদেশের বালিকাদের শিক্ষা প্রণালী অতীব দোষনীয় ও ঘৃণিত।" (8)

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চত্য স্ত্রীশিক্ষা প্রণালীর ফলেই হিন্দু সমাজও ডুবিতে বসিয়াছে। আমরা এসম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

উক্ত মহাত্মা আরও বলিয়াছেন :—

"বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশের গৃহিণীগণ অনেকেই কোন প্রকার গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করেন না, আলস্যে বসিয়া দিন কাটাইয়া থাকেন; চাকরের দ্বারা গৃহকার্য্য সমাধা করা হয়। এই আলস্যে বসিয়া থাকার ফলে পাশ্চাত্য রমণীগণের স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়া যাইতেছে।" (9)

প্রাচীন কালে হিন্দুরমণীরা বাল্যকাল হইতেই গৃহকার্য্য উত্তমরূপে শিক্ষা লাভ করিতেন; ইহার ফলে

(8) "Unfortunately in this our age girls are not either educated nor prepared to be made wives, useful, domesticated wives. * * * Verily they and their unfortunate husbands and offspring will in due time pay the penalty of their ignorance and folly! Away with such folly! The system of the bringing up to the young ladies of the present day is rotten to the core"! ! ! (See Ditto P. 77)

(9) "The misfortune of the present day is, that servants are made to do all the work, while the mistress of the house remain idle. Remain idle. Yes! and by remaining idle, remains out of health! (See Ditto P. 75)

প্রাচীনা হিন্দু গৃহিণীগণ সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতা ছিলেন এবং এক একটী হিন্দু পরিবার এক একটী আদর্শ গৃহ ছিল। তদ্ভিন্ন প্রাচীনা হিন্দু রমণীদের গৃহকার্য্যে সর্ব্বদা মনোনিবেশ করার ফলে স্বাস্থ্য খুব উন্নত থাকিত। বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিতা ও অর্দ্ধশিক্ষিতা হিন্দু রমণীগণ পাশ্চাত্য প্রথার অনুসরণ করার ফলে এবং শারীরিক কোন প্রকার পরিশ্রমের অভাবে তাঁহাদের স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়া যাইতেছে।

উক্ত ডাক্তার চাভাসী মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"পাশ্চাত্য রমণীরা অনেকেই নিজহস্তে রান্না করিতে জানেন না বা রান্না করেন না; এবং অনেক স্থলে পাশ্চত্য রমণীদের রান্না করার সুবিধাও দৃষ্ট হয় না, কারণ, অনেকেই হোটেলে বাস করেন। পাশ্চাত্য রমণীরা নিজহস্তে বিশুদ্ধ ও পবিত্র ভাবে রান্না করিতে অক্ষমা, এজন্য তাহাদের পতি ও পুত্রদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে এবং সামাজিক নানা বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হইয়া থাকে।"

"উত্তম সুস্বাদু ও পবিত্র রান্নার উপরে স্বাস্থ্যের উন্নতি অনেকটাই নির্ভর করে। সুস্বাদু ও পবিত্র খাদ্য আহার করিলে পরিপাক শক্তি উন্নত হয়, স্বাস্থ্য ও চরিত্রও উন্নত থাকে। এদেশের (পাশ্চাত্য দেশের) প্রত্যেক বালিকাকে রান্না বিষয়ে সুশিক্ষা প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। বালিকা বা যুবতীরা নিজহস্তে রান্না করিতে শিখিলে ও রান্না করিলে বিলাতের অর্দ্ধেক পারিবারিক অশান্তি ও অজীর্ণ পীড়া দূর হইয়া যাইতে পারে।" (10)

(10) "A well-cooked dinner is a blessing to all who partake it, it promotes digestion, it sweetens the temper, it cheers the hearth and home."

"Every girl, then, let her rank be what it may, ought, above all things, to be accomplished in housewifery, especially in the culinary department. "Poor Creature," quoth a wife, "for a man to be so dependent on his cook!" "half of the household miseries and much of the dyspepsia in England would, if cookery were better understood, be done away with!" (See Ditto P.P. 72-73.)

হিন্দু মহিলারা সকলেই শৈশবকাল হইতে নিজ হস্তে রান্না করিতেন। হিন্দু রমণী পতি, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু বান্ধব, অতিথি, অভ্যাগত ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে অতি বিশুদ্ধ ও পবিত্র ভাবে রান্না করিয়া পরিতোষ রূপে ভোজন করাইতেন। এতদ্ভিন্ন প্রাচীনা হিন্দু মহিলারা অতীব ভক্তি, শ্রদ্ধা ও যত্নের সহিত দেবভোগ রান্না করিতেন,—সেই দেবভোগ আহার করিয়া প্রাচীন কালে সকলেই উন্নত স্বাস্থ্য লাভ করিতে সক্ষম হইত।

(২) পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ও ভেজাল দ্রব্য আহার।

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব বশতঃই যে আমাদের দেশে রোগ, শোক, তাপ, স্বাস্থ্যহীনতা ও অকাল মৃত্যু দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে, এসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ও পর্ব্বত প্রমাণ ভেজাল খাদ্য আহার করিয়া হিন্দুদের জীবনী-শক্তি ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। কোন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেই তাহারা অকালে মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। এদেশে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব হইল কেন? দরিদ্রতাই ইহার মূল কারণ। আমরা এই রূপ দরিদ্র হইলাম কেন? দরিদ্রতার অনেক গুরুতর কারণ আছে সত্য; কিন্তু আমরা নিজেরা ইচ্ছা পূর্ব্বক বা মোহান্ধ হইয়া দরিদ্রতার কঠোর নিগড়ে আবদ্ধ হইতেছি। এ সম্বন্ধে স্বদেশপ্রাণ মহাপ্রাজ্ঞ স্যার শ্রীযুক্ত পি, সি, রায় ডাক্তার মহোদয় তাঁহার অন্ন সমস্যা প্রবন্ধে অনেক কাজের কথাই বলিয়াছেন। আমরা এস্থলে অতি সংক্ষেপে ২।১ টি কথা নিবেদন করিব।

প্রাচীন কালে, এমন কি, ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বেও দেখিয়াছি, এ দেশের অধিকাংশ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদেরই নিজ নিজ "খামার" ছিল। সেই খামার হইতে চাউল, ডাইল, তরি তরকারী ফল ফলারী, সরিষা তিল, ইত্যাদি নিত্য আহার্য্য সমস্ত দ্রব্যই উৎপন্ন হইত। প্রাচীন কালের নরনারীগণ সেই বিশুদ্ধ ও

টকা খাদ্য দ্রব্যাদি আহার করিয়া সুস্থ শরীরে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে এদেশের শিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর হিন্দু সন্তানগণ চাকুরীর মোহে পড়িয়া নিজেদের জমাজমি সমস্তই কৃষকদের হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছেন; সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা বাধ্য হইয়া বাজারের পর্ব্বত প্রমাণ ভেজাল দ্রব্য ও বাসী খাদ্যাদি আহার করিয়া থাকেন। ফলতঃ, তাহার ফলেই আজ হিন্দু নরনারীর গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু যুবকগণ যদি তাঁহাদের পিতৃ-পিতামহঠাকুরদের সেই খামার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে না পারেন জমাজমি নিজেদের তত্ত্বাবধানে আনিয়া বা পতিত জমি সংগ্রহ করিয়া চাষ বাসের ব্যবস্থা না করেন তবে হিন্দু জাতিকে এই ভীষণ ধ্বংসমুখ হইতে কিছুতেই রক্ষা করা যাইবে না।

(৩) সংযমের অভাব ও অমিতাচার।

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব। ফলতঃ, বর্ত্তমান সময়ে নবীনা রমণীগণ যদি প্রাচীনা হিন্দু মহিলাদের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়ে সংযমী বা ব্রহ্মচারিণী ব্রত অবলম্বন না করেন তবে হিন্দু জাতির উন্নতির আর কোনই ভরসা নাই। বর্ত্তমানে এই ভীষণ স্বাস্থ্যহানি ও অকাল-মৃত্যুর মূলে সংযমের অভাব বা অমিতাচারই সর্ব্ব প্রধান কারণ দেখিতে পাইতেছি। বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই বাল্য-বিবাহকেই স্বাস্থ্যহানির ও জাতির অবনতির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রাচীন কালেও এদেশে বাল্য-বিবাহ (বালিকাদের ঋতুর পূর্ব্বে বিবাহ) প্রথা সর্ব্বত্রই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু প্রাচীনা হিন্দু রমণীগণের সংযমের বা ব্রহ্মচারিণী ব্রতের ফলে হিন্দু সমাজের কোন অনিষ্টই হইতে পারিত না।

(৪) বিশুদ্ধ জল, বায়ু ও আলোর অভাব।

এ সম্বন্ধে সঞ্জীবনী লিখিয়াছেন—"পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে প্রসূতিগণ নানা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকেন।" কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের এইরূপ অভাব হইল কেন? যে দেশে এখনও শতসহস্র পুকুর বিদ্যমান রহিয়াছে, সে দেশের কোথাও একবিন্দু বিশুদ্ধ জল নাই কেন? ইহার এক মাত্র কারণ—হিন্দু ধর্ম্মের ও রীতিনীতির উপরে গভীর অশ্রদ্ধা। এ সম্বন্ধে আমরা বারান্তরে সবিস্তার আলোচনা করিব।

প্রাচীন কালে প্রত্যেক হিন্দু মহাত্মাই সর্ব্বাগ্রে পুকুর খনন করিয়া ভগবানের নামে "উৎসর্গ" করিতেন। পুকুর সংস্কার ও জলাশয় খনন প্রাচীন হিন্দু নরনারীর জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্রত ছিল। জল দানে মহা পুণ্য সঞ্চয় হয়, জল দূষিত করিলে পাপ হয়, এই বিশ্বাস হিন্দু নরনারী, বালকবালিকা সকলেরই হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। এই উন্নত ধর্ম্ম বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই প্রাচীন নরনারী জলাশয় খনন করিয়া জনসাধারণের বিশুদ্ধ জল পানের সুব্যবস্থা করিয়া দিতেন। বলা বাহুল্য, উৎসৃষ্ট পুকুরের জল কেহই কোন প্রকারে দূষিত করিতে সাহসী হইত না। সুতরাং বিশুদ্ধ জল পান করিয়া প্রাচীন কালের নরনারী বহু পীড়ার হাত হইতে রক্ষা পাইতেন। বর্ত্তমান সময়ে এদেশে যে এত ভীষণ অকাল মৃত্যু ও নানা উৎকট পীড়ার এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, হিন্দু ধর্ম্মের ও রীতিনীতির প্রতি অনিচ্ছা।

বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ হিন্দুর বাড়ী জঙ্গলে ও বড় বড় বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়; ইহার ফলে বিশুদ্ধ বায়ু ও আলো বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার ফলেও স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে।

৫। নাটক নভেল পাঠ।

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চত্য দেশের ও এদেশের শিক্ষিতা বিশেষতঃ অল্প শিক্ষিতা রমণীগণ অনেকেই বাজারের নিকৃষ্ট শ্রেণীর নাটক নভেল পাঠ করিয়া থাকেন। এই নাটক নভেল পাঠ করিয়া রমণীগণ নানা পীড়ায় আক্রান্তা হইতেছেন। এ সম্বন্ধে জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার

কাউয়েন এম্-ডি মহোদয় আমেরিকার অবস্থা জলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন ; যথা :—

"উত্তেজক দ্রব্য আহার ও কসা বস্ত্রাদি ব্যবহারে মনে যেরূপ কুচিন্তার উদয় হয়, সেইরূপ আলস্যে বসিয়া থাকিলে ও নাটক নভেল পাঠ করিলেও মানসিক অবনতি ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে কৃত্রিম প্রেম, ভালবাসা ইত্যাদি ঘটিত উত্তেজনা-পূর্ণ নাটক নভেল পাঠ করিয়া রমণীগণের দারুণ অবনতি ঘটিয়া থাকে ও ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়।"

"আমেরিকার বড় বড় সহরে শত সহস্র যুবক যুবতী হোটেলে বাস করে। যুবকগণ বিষয় কার্য্যের অনুরোধে প্রত্যহ প্রাতে হোটেল হইতে বাহির হইয়া যায়। অধিক রাত্রিতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তাহাদের স্ত্রীগণের হোটেলে কিছুই করিবার থাকে না ; সুতরাং উত্তেজনাপূর্ণ নাটক নভেল ইত্যাদি পাঠ করিয়া সময় কাটায় ও উত্তেজক দ্রব্য আহার করে এবং হোটেলের বিবাহিত ও অবিবাহিতা অন্যান্য যুবকের সহিত হাস্য-পরিহাস করিয়া থাকে। ইহার ফলে যুবতীগণের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক অবনতি ঘটিয়া থাকে।" (11)

৬। শারীরিক পরিশ্রমের অভাব।

শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুরমণীর গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। প্রাচীনা হিন্দু মহিলারা শৈশবকাল হইতেই গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। এই গৃহকার্য্যের ফলে প্রাচীনা হিন্দু রমণীরা যে শারীরিক পরিশ্রম করিতেন, তাহাতেই তাঁহাদের স্বাস্থ্য খুব উন্নত থাকিত। বলা বাহুল্য শৈশব কাল হইতে গৃহকার্য্যগুলি হাতে-কলমে করার ফলে গৃহধর্ম্মেরও উন্নতি হইত। তাই প্রাচীনা হিন্দু মহিলারা প্রায় সকলেই আদর্শ গৃহিণী হইতে সক্ষমা হইতেন। বর্ত্তমান সময়ে বালিকাগণ শৈশব কাল হইতে একমাত্র লেখাপড়ার দিকে মনঃসংযোগ করে, শারীরিক পরিশ্রম বা গৃহকার্য্যগুলি মাত্রেই শিক্ষা লাভ করে না, ফলে তাহাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে ; ও অনেকেই সুগৃহিণী হইতে না পারায়, হিন্দু সমাজের চারিদিকে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, অভাব, অনাটন দৃষ্ট হইয়া থাকে। আজ কাল কোন কোন বালিকা বিদ্যালয়ে বালকদের ন্যায় কঠিন ব্যায়াম অভ্যাস করানো হয়। ইহা যেমনি বালিকাদের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর, তেমনি হিন্দু বালিকাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে বালিকারা শৈশব কাল হইতে গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ না করায় তাহাদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ বড় বড় পণ্ডিতগণও এক বাক্যে বলিতেছেন যে, বালিকাদের গৃহকর্ম্মই স্বাস্থ্য। উন্নতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। (12)

৭। পাশ্চাত্য স্ত্রী-শিক্ষা প্রণালী।

পাশ্চাত্য স্ত্রী-শিক্ষার প্রণালীর ফলেই যে দেশের (পাশ্চাত্য সমাজের) এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজের কোন দিক দিয়া বিষম অবনতি দৃষ্ট হইতেছে, এ সম্বন্ধে আমরা বারান্তরে সবিস্তার আলোচনা করিব। এস্থলে ২।৪ টি কথা মাত্র সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল।

বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষা প্রণালীর ফলে হিন্দু বালিকাদের নিম্নলিখিত বিষয়ে অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। প্রথমতঃ, বর্ত্তমান ধর্ম্মনীতিহীনা শিক্ষা প্রণালীর ফলে হিন্দু রমণীর উন্নত ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও রীতিনীতি দিন দিন হীনপ্রভঃ হইয়া পড়িতেছে। দ্বিতীয়তঃ যে স্কুল কলেজের শিক্ষা প্রণালীতে যুবকদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ও মানসিক অবনতি হইতেছে বলিয়া সকলে এক বাক্যে স্বীকার করেন, ঠিক সেই প্রণালী অনুযায়ী বালিকাদিগকে কেন শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তৃতীয়তঃ বর্ত্তমান স্কুল ও কলেজের সময়, স্কুল গৃহ, স্কুলের কুঠরী, পাঠ্যগ্রন্থ, শিক্ষনীয় বিষয় কোনটিই হিন্দু রমণীর উপযোগী ও শিক্ষনীয় নহে। এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে দুপুর বেলা, অল্প-পরিসর কুঠরীতে বহু বালিকার একত্র অবস্থান, অসংখ্য পাঠ্যগ্রন্থ পাঠ, ইত্যাদি নানা কারণেই বালিকাদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। চতুর্থতঃ, রমণীগণের মাতৃত্ব বিকাশের সর্ব্বোচ্চ অধিকার ;—বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর ফলে রমণীগণ মাতৃত্ব হইতে ক্রমেই দূরে সরিয়া পড়িতেছেন, ইহার ফলে শিশুদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। পঞ্চমতঃ বর্ত্তমান কালের রমণীদের রান্না বিষয়ে প্রাচীনা হিন্দু রমণীদের ন্যায় অভিজ্ঞতা বা কার্য্যপটুতা নাই, ইহার ফলেও বর্ত্তমান সময়ের নরনারী বালকবালিকাগণের স্বাস্থ্যহানি দৃষ্ট হয়। এইরূপ কত দিক দিয়া যে হিন্দু সমাজের মহানিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহার বর্ণনা করাও দুঃসাধ্য।

বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে জগতের ও স্বদেশের ২।৪ জন পণ্ডিতের অভিমত নিম্নে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল।

(11) "Closely allied to food and dress, in women, as a producer of evil thoughts, is idleness and novel-reading. It is almost impossible for a woman to read the current "love-and-murder" literature of the day and have pure thoughts, and when the reading of such literature is associated with idleness—a woman's thoughts and feelings cannot be other than impure and sensual."

"In our towns and cities hundreds, aye thousands, of married men who, with their wives, live in hotel and boarding-houses, leave for business every morning, not returning till perhaps late at night ; and the wives of these men having absolutely nothing to do, * * read the last sensation novel—and can anything pure and good come out of such a life ? Or the novel-reading is followed by a confidential gossip with some man boarder married or single, who has also nothing to do, and the small size of whose soul is located in his amative propensities ; and the husband may not know what follows, but all acute observers within range do. "Nothing to do" as in time past, as now, and as it will continue. has done more to lower man and woman's nature—morally, mentally, socially, and physically—than the non observance of any other requirement in living. (The Science of a New Life by Dr. Cowan, M. D., P. 100).

(12) "For nothing lovelier can be found
In woman than to study household good."
(Milton)

Dr. Chavassis says—"She ought to devote herself to her infant and to her household and she will then experience the greatest happiness the world can afford." (See Advice to a Wife, P. 310.)

জগদ্বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাত্মা হার্ব্বার্ট স্পেনসার মহোদয় তাঁহার "শিক্ষা" পুস্তকে লিখিয়াছেন—"বর্ত্তমান স্ত্রী শিক্ষা-প্রণালীর ফলে বালিকাদের দুর্ব্বলতা, স্ফূর্ত্তির অভাব ও সাধারণ অস্বাস্থ্য দৃষ্ট হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, দুই বৎসর বিদ্যালয়ে থাকিলে বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর পেষণ যন্ত্রে পড়িয়া শতকরা ৯৯ জন যুবতী কুব্জ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান বহু যুবতীর মাতৃত্ব যন্ত্রগুলি বিকৃত বা লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।" (13)

পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠতম লেখক ৺ কালীপ্রসন্ন ঘোষ রায় বাহাদুর মহাশয়ের শেষ মন্তব্য—

"বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দোষে এদেশের স্ত্রী-শিক্ষা অধিকাংশ স্থলেই একটা পোষাকী আসবাব বা সভ্যতার উপসর্গ বিশেষে পরিণত হইয়া পড়িতেছে। এরূপ পোষাকী শিক্ষার কৃত্রিম আলো অপেক্ষা অশিক্ষার অন্ধকারে থাকা সহস্রগুণে শ্রেয়। বস্তুতঃ আজকালকার শিক্ষা—শিক্ষা নহে, অশিক্ষাও নহে., ঘোরতর কুশিক্ষা।" (বান্ধব, ১৩১২, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়)

অশেষ ভক্তিভাজন, সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি মহাশয় তাঁহার আর্য্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"পুরুষরা যেন পরিবার প্রতিপালনের দায়ে পড়িয়া এইরূপ শিক্ষা প্রণালীর পেষণ-যন্ত্রে নিষ্পিষ্ট হইতে স্বীকার করে। কিন্তু মেয়েদের এই ব্যবস্থা স্বীকার করিবার কারণ মাত্র আত্মাভিমান-পরিতৃপ্তি। এই শস্য-শ্যামলা বঙ্গদেশে আতিথেয়তা-নিপুণ ভারতবর্ষে যেখানে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণের ভাবনা থাকে না এবং যেখানে কোন গৃহস্থ ব্যক্তিই আত্মীয় স্ত্রীলোকদিগকে পালন করিতে কখনই কাতর হয় না, সেখানে স্ত্রীলোকের বিশ্ববিদ্যালয়ের পেষণ যন্ত্রে নিষ্পেষ্ট হইতে স্বীকার করা কেবল বাতুলতা নহে,

(13) "In the pale, angular, flat-chested young ladies so abundant in London draw-room"

(See Education by H. Spencer)

তাহা পাপ এবং এই পাপের ফল তাহাদিগের সন্তানরাও উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ করিয়া থাকে।"

সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম, এ মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"যে শিক্ষা দ্বারা বালক ও যুবকবৃন্দের মস্তিষ্ক নির্য্যাতিত হইতেছে, শরীর ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, মন বিকল হইতেছে এবং তাহাদিগকে জড় পদার্থবৎ করিয়া তুলিয়াছে, তাহা যে আমাদের রমণীগণের পক্ষে একেবারেই অনুপযোগী, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন?" (ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২)

ফলতঃ বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত না হইলে, হিন্দু বালিকাদিগকে ষোলআনা জাতীয় বা হিন্দু ভাবে শিক্ষা দিতে না পারিলে—হিন্দু সমাজের কখনও উন্নতি হইবে না এবং এই ধ্বংসের হাত হইতে হিন্দু সমাজকে কেহ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। এ কথা যে কেবল হিন্দুরাই বলেন তাহা নহে, পাশ্চাত্য দেশের মহাপ্রাজ্ঞ মহাত্মারাই অনেকেই সেই কথা বলিতেছেন। এই দেখুন, পাশ্চাত্য দেশের মহাজ্ঞানী পণ্ডিত ডোবিশ মহোদয় বলিয়াছেন :—

"হিন্দুদের শিক্ষা প্রণালী পাশ্চাত্য জাতিদের অপেক্ষা অনেক উন্নত। হিন্দু মহিলারা লেখাপড়া শিখিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগকে যে সুপ্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহার ফলেই হিন্দু বালিকারা কর্ত্তব্যপরায়ণা, স্ত্রীগণ খুব বিশ্বাসী, মাতারা কোমল স্বভাবা ও গৃহিণীগণ বুদ্ধিমতী ও গৃহকার্য্যে সুদক্ষা হইতেন।" (14)

৮। পাশ্চাত্য পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার।

পাশ্চাত্য দেশের পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি ব্যবহারেও হিন্দু রমণীর গুরুতর স্বাস্থ্যহানি দৃষ্ট হইতেছে। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত চাভাসী মহোদয় কি লিখিয়াছেন দেখুন :—

"পাশ্চাত্য রমণীরা ফ্যাশানের দায়ে পড়িয়া স্বাস্থ্যহানি করিয়া থাকে। শরীরের যে সকল স্থান সর্ব্বদা উষ্ণ রাখা উচিত, সে সকল স্থান খোলা রাখা হয়। বলনাচ ইত্যাদি নানা কারণে এবং পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি ব্যবহারে তাহাদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়া থাকে। তাহারা (পাশ্চাত্য রমণীরা), শরীরের যে স্থান বা যন্ত্রকে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে দেওয়া উচিত, সেই সকল স্থান বা যন্ত্র কসা পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি (জ্যাকেট, করসেট, ষ্টে, ইত্যাদি ব্যবহার দ্বারা) ব্যবহার করিয়া বিকৃত ও শক্তিহীন করিয়া ফেলে। যন্ত্রগুলি স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারে না।" (15

১০। জননীগণের বিশেষ বিশেষ পীড়ার সামাজিক কারণ।

জননীগণের স্বাস্থ্যহীনতার কারণ উপরে মোটামোটি বলা হইয়াছে। এক্ষণে নিম্নে জননীগণের বিশেষ বিশেষ পীড়ার সামাজিক কারণগুলি উল্লেখ করা হইল। কি আশ্চর্য্যের বিষয় প্রাচীনা হিন্দু মহিলারা আমাদের জননী, পিতামহী, মাতামহী, প্রভৃতি আর্য্য রমণীগণ—তাঁহাদের বধূ ও কন্যাদিগকে (বর্ত্তমান নবীনা অল্প শিক্ষিতা রমণীগণকে) সর্ব্বদা যে যে বিষয়ে সাবধান করিতেন, যে যে কার্য্য করিতে নিষেধ করিতেন, বর্ত্তমান সময়ে রমণীগণের বিশেষ বিশেষ পীড়ার সামাজিক কারণগুলিও ঠিক তাহাই দেখিতে পাইতেছি। যথা :—

(14) "In Education and manners, the Hindus shines far above the European. Without a knowledge of alphabet the Hindu females are dutiful daughters, faithful wives, tender mother and intelligent house-wives; such is the result of my own observation." (Abbe F. A. Dubios).

(15) "There is perfect disregard of health in everything appertaining to fashion. Parts that ought to be kept warm, remain unclothed. Parts that should have full play are cramped and hampered; the chest is cribed in with stays, the feet with tight shoes—hence causing deformity, and preventing a free circulation of blood, oh, that a mother should be so blinded and so infatuated!" See Dr. Chavasse's Advice to a Mother P. 355.)

১। হিষ্টিরিয়া (Hysteria)—কারণ—প্রেম নৈরাশ্য, নাটক নভেল পাঠ, বিলাসিতা, কোন বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ না করা, সুখাভিলাষ, মানসিক উদ্বেগ, ভয়, ত্রাস) রাত্রি-জাগরণ, ইত্যাদি। (16)

২। গর্ভপাত (Miscarriage)—কারণ—অধিক রাস্তা হাঁটা, ঘোড়ায় চড়া, অথবা অসমান রাস্তা দিয়া গাড়ীতে বা মোটর গাড়ীতে যাওয়া, অধিক দূর রেলওয়ে ভ্রমণ, কোন প্রকার মানসিক উত্তেজনা, অধিক রাত্রি জাগরণ, আলস্যে বসিয়া থাকা, অতিরিক্ত সহবাস, পতন, ভয়, ত্রাস, মানসিক উদ্বেগ, সিড়ি দিয়া উঠা নামা, ভারী বস্তু উঠান, কোষ্ঠবদ্ধ, নৃত্য, গীত-বাদ্য শ্রবণ, কসা বস্ত্রাদি ব্যবহার ইত্যাদি। (17)

৩। অকালে ঋতু প্রকাশ—কারণ—গরমজলে স্নান, উত্তেজক দ্রব্য আহার ও পান, নৃত্য, নাটক নভেল পাঠ, সর্ব্বদা আলস্যে বসিয়া থাকা, সহরে বাস, সুখাভিলাষ, বিলাসিতা ইত্যাদি। (18)

৪। ঋতুরোধ (Suppression of Menses)—কারণ—সর্ব্বদা আলস্যে বসিয়া থাকা, মানসিক উদ্বেগ, ভ্রমণ বশতঃ হঠাৎ ভয়, ত্রাস, মানসিক চিন্তা, অতিরিক্ত বরফ ভক্ষণ, অতিরিক্ত সহবাস, ক্রোধ, শোক, কসা জুতা ব্যবহার, কোমর বন্ধ ইত্যাদি কসা বস্ত্রাদি ব্যবহার ইত্যাদি। (19)

৫। অনিয়মিত ঋতু—কারণ—সর্ব্বদা বসিয়া নাটক নভেল পাঠ, কোন কার্য্যের অভাব, ভয়, ত্রাস ইত্যাদি।

৬। অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Menorrhagia)—কারণ—মানসিক উদ্বেগ, চিন্তা, সর্ব্বদা আলস্যে বসিয়া থাকা।

৭। বেদনা সংযুক্ত ঋতু (Painful Menstruation—Dysmenorrhœa)—কারণ—কোষ্ঠবদ্ধতা, হিষ্টিরিয়া, কোমরবন্ধ বা ষ্টে ইত্যাদি পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার।

৮। শ্বেত প্রদর—কারণ—সর্ব্বদা জোলাপের ঔষধ সেবন, বিলাসিতা, বড় বড় সহরে বাস ইত্যাদি।

৯। রক্তহীনতা—কারণ—সর্ব্বদা অধ্যয়ন আলস্যে বসিয়া থাকা, মানসিক চিন্তা বা বিষাদ, অস্বাভাবিক প্রেম, মানসিক উদ্বেগ, ভয়, ত্রাস ইত্যাদি।

১০। জরায়ুর অধঃপতন—কারণ—বহুসন্তান, অতিরিক্ত সহবাস, নৃত্য, লম্ফপ্রদান, ইত্যাদি।

১১। বন্ধ্যাত্ব (Sterility)—কারণ—মানসিক চিন্তা, অধিক বয়সে বিবাহ, বিলাসিতা ইত্যাদি।

১২। যক্ষ্মা (Consumption)—কারণ—সঙ্কীর্ণ বক্ষঃস্থল, অপ্রচুর অপুষ্টিকর ও ভেজাল খাদ্য আহার, স্কুল গৃহে বহুসংখ্যক ছাত্র বা ছাত্রীর একত্র অবস্থান, সঙ্কীর্ণ স্থানে, অন্ধকার ও বায়ুশূন্য স্থানে অবস্থান, রাত্রি জাগরণ, অত্যধিক অধ্যয়ন, কসা পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি ব্যবহার, বড় বড় সহরে বাস ইত্যাদি। (20)

(16) "Disappointed love novel-reading. luxurious mode of life, depressing emotions, fright, loss of sleep &c." (See Lady's Manual, by Dr. E. H. Ruddock, M.D, 87).

(17) "Long walks, riding on horseback or over rough roads in a carriage or motor-car, long railway journey, over-exerting herself, and sitting up late at night, frequent sexual intercourse, falls, all emotions of the mind, passion, fright, over-reaching, shocks, falling down stairs, lifting heavy weights, constipation, dancing, fashionable amusements, late hours, tight lacing &c" (See Dr. Chavassi's Advice to a Wife, P. 192)

(18) "Hot baths, stimulating food and drinks, dancing novel-reading, too much sitting late hours &c." (See Lady's Manual by Dr. Ruddock M. D., P. 27).

(19) Eating ices, violent emotions—anger, terror, fright, wearing thin-soled shoes, &c." "See Ditto P. 38)

(20) "Narrow and contract chest bad and scanty diet or food, close indoor confinement in schools or factories, dissipation, late hours, over taxing with book light-lacing &c." (See Dr. havassi's Advice to a Mother, B. 389.)

বর্ত্তমান সময়ে এদেশে যক্ষ্মা পীড়া ভীষণ ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে; অসংখ্য অগণিত যুবক যুবতী এই ভীষণ পীড়ার আক্রমণে অকালে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। দেশের প্রত্যেক সদাশয় মহাত্মাই এজন্য অত্যন্ত ভীত ও চকিত হইয়া পড়িয়াছেন। শীঘ্র ইহার এবং উপরি উক্ত পীড়াগুলির প্রতিকার না হইলে এদেশ যে অচিরেই ডুবিয়া যাইবে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

প্রাচীনা হিন্দু মহিলাদের মধ্যে উপরি উক্ত বিশেষ বিশেষ পীড়া এবং যক্ষ্মা পীড়া প্রায় দৃষ্ট হইত না। এতদ্ভিন্ন সাধারণ পীড়া যথা ওলাউঠা, জ্বর, বসন্ত ইত্যাদি পীড়াও প্রাচীনাদের মধ্যে অতি অল্পই দৃষ্ট হইত। প্রাচীনারা শৈশব কাল হইতেই অত্যন্ত সংযমী হইতেন, কোন প্রকার অমিতাচারই তাঁহাদের মধ্যে দৃষ্ট হইত না। সুতরাং তাঁহারা কোন পীড়া দ্বারাই প্রায়শঃ আক্রান্ত হইতেন না। পাশ্চাত্যরা এবং পাশ্চাত্য-শিক্ষিত কোন কোন হিন্দু সন্তান হিন্দুর প্রাচীন রীতিনীতিগুলিকে নানারূপ বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা করিতেন, এবং এখনো কেহ কেহ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশের মহাপ্রাজ্ঞ ও সমাজ-হিতৈষী মহাত্মগণ যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন এবং যে সকল রীতিনীতি সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন হইতে পারে বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, সেই সকল রীতিনীতি সেই অনাদি কাল হইতেই হিন্দু সমাজে সুপ্রণালী মতে সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু জনক-জননী ও শিশুদিগকে অকাল-মৃত্যু ও স্বাস্থ্যহীনতার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে প্রাচীনকালের রীতিনীতিগুলির সম্যক রূপে হিন্দু-সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। হিন্দুর বর্ত্তমান ধ্বংস নিবারণের ইহাই একমাত্র উপায়।

এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত চৌরী মুখু মহোদয় (ইনি যক্ষ্মা পীড়া আরোগ্য করার দক্ষতায় বিলাতের একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ) যক্ষ্মা পীড়ার উৎপত্তির কারণ ও প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এদেশের প্রত্যেক হিন্দুর বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। প্রবাসী (১৩২১, ভাদ্র উক্ত মহাত্মার মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"তাঁর মুখে ভারতীয় লোকদের শক্তি ও সাধনার উপর তাঁর বিশ্বাসের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি বলেন—ভারতীয়েরা যদি তাদের জাতীয় রীতি-নীতির অনুসরণ করিয়া চলে, তারা যদি তাদের জাতীয় সাহিত্য, দর্শন, কলা ও বিজ্ঞানের অনুশীলন করে এবং কেবল মাত্র পশ্চিমের অনুসরণ না করে এবং ভারতীয় আদর্শে ও প্রণালীতে যদি ভারতের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহা হইলে প্রাচীন যুগের মত তারা আবার জগতের শীর্ষ স্থানে উঠিতে পারে। যদি ভারতবর্ষ জাতীয় আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে কেবল আত্মিক অবনতিতে ডুবিবে না তাহার শারীরিক অবনতিও যথেষ্ট হইবে। দিনরাত্রি কলকারখানার কোলাহল ও ধোঁয়া, বিপর্য্যস্ত মন, অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও উত্তেজনায় অবসন্ন শিরা সমূহ, এবং ঈশ্বরের আলোক ও বায়ু হইতে বঞ্চিত গৃহে বাস—এই সমস্ত যদি পশ্চিমের মত ভারতবর্ষে আমদানি করা হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে যক্ষ্মা ও অন্যান্য রোগ বাড়িয়াই চলিবে। ইয়োরোপে অসংখ্য কল কারখানার আবির্ভাবে নূতন নূতন রোগের আবির্ভাব হইতেছে।"

"ইয়োরোপের ও আমেরিকার দূরদর্শী বিজ্ঞ লোকেরা এখন বুঝিতে পারিয়াছেন, সেখানকার লোকদের বাঁচিতে হইলে ব্যবসা বাণিজ্যের রীতিনীতিও বদ-লাইতে হইবে; এমন কি পাশ্চাত্য সভ্যতাকেও নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। পশ্চিম যে পোষাক আজ শরীরের পক্ষে প্রতিকূল ভাবিয়া ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে, যে বিষাক্ত অথচ চাক-চিক্যময় পোষাকের স্পর্শে শরীর ও আত্মা কলুষিত হইয়া উঠে, ভারতবর্ষ সেই পোষাক পরিতে আর

লায়িত। ভারতবর্ষ তার সেই চিরদিনের ব্যাপক, শান্তিময় ও ধ্যানময় জীবনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করুক। ভারতীয়েরা বাহিরের প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করিয়াও এবং কলকারখানার দাস না হইয়াও জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস অনায়াসে তৈরী করিতে পারিয়াছিল এবং এখনও পারে, তারা কি আজ তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বাষ্প ও বিদ্যুতের আমদানি করিবে এবং তাদের অতীত ও পশ্চিমের নূতন অভিজ্ঞতা একেবারে ভুলিয়া যাইয়া জনতা-বহুল অস্বাস্থ্যকর সহরসমূহ কল কারখানার পূর্ণ করিবে, না প্রকৃতির অরণ্যানীর বুকের উপর আদর্শ ব্যবসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিবে?"

বঙ্গে শিশু-মৃত্যু ও আমাদের দায়িত্ব।

বঙ্গের শিশু-মৃত্যুর লোমহর্ষক কাহিনী স্বাস্থ্য-সমাচারে একাধিক বার বিবৃত হইয়াছে। অত্যধিক শিশু-মৃত্যুর কারণ ও তাহার নিদানগুলির বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে। দরিদ্রতা, কুসংস্কার, লোকের অজ্ঞতা এবং সরকার বাহাদুরের অমনোযোগিতা ইত্যাদি কারণে আমরা প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র সোণার চাঁদ শিশুকে হারাইতেছি। যে কারণে এই দেশে অত্যধিক শিশু মৃত্যু ঘটিতেছে, আবার ঠিক সেই কারণেই, যাহারা মৃত্যুর রুধিরাক্ত ভীষণ খর্পর হইতে অব্যাহতি লাভ করে, তাহারা চিররুগ্ন দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া সমাজের বোঝা বৃদ্ধি করিতেছে। ফলে, সমাজ সৌধ দিন দিন জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং আশঙ্কা হয়, অদূর-ভবিষ্যতে উহা ভগ্ন স্তূপে পরিণত হইয়া, এই মহা জাতিকে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে চির দিনের জন্য বিলুপ্ত করিয়া দিবে।

এদেশে জন্ম ও মৃত্যুর তালিকা দেখিলে হৃদয় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। বাঙ্গলা দেশে জন্ম সংখ্যা ৩১.৮, আর মৃত্যু সংখ্যা ৩২.৮। ইহা দেখিলে মতঃই মনে হয়, মরিবার জন্যই বাঙ্গালী জাতির জন্ম। ইংলণ্ডে জন্ম সংখ্যা হাজারকরা ২৬.৮, মৃত্যু সংখ্যা ১৫.১৫। লণ্ডনে ভূমিষ্ঠ শিশু প্রত্যেক হাজারে ১১০ মরে; আর কলিকাতায় প্রতি হাজারে ৩১০ জন মরিতেছে। বাঙ্গলায় প্রতি দিন গড়ে ১০০০ শিশুর মৃত্যু হয়। তাহার মধ্যে ধাত্রী ও উপযুক্ত পরিচর্য্যার অভাবে মরে প্রায় ৭৫০ জন। ইংলণ্ডে প্রতি ২০০০ হাজার প্রসূতির মধ্যে মরে মাত্র ১ জন; আর বাঙ্গলা দেশে প্রত্যেক ৪০ জন প্রসূতির মধ্যে একজন মারা যায়। অর্থাৎ ইংলণ্ডে যে স্থলে একজন মরে, আমাদের দেশে সে স্থলে ৫০ জন প্রসূতি মারা যায়।

এই দেশের অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমান আসুরিক সভ্যতার প্রচণ্ডতাই এত শিশু-মৃত্যুর কারণ। প্রতি সহরেই অগণিত কলকারখানার চিমনির ধোঁয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা ও ভীষণ জীবন-সংগ্রামে এই দেশের শিশু-মৃত্যুর হার বর্দ্ধিত করিয়াছে। মানিলাম, এই কথা আংশিক সত্য; কিন্তু লণ্ডনের কলকারখানা, ব্যবসা বাণিজ্য ও জীবন-সংগ্রাম বঙ্গদেশ হইতে শতগুণে ভীষণতর, কিন্তু তথায় শিশু-মৃত্যুর হার ত এদেশ হইতে অল্প। আর বাঙ্গলা দেশে শান্ত পল্লীতে কলকারখানার আবিলতা এখনও প্রবেশ করে নাই। সেখানে আম গাছের নিবিড় ছায়ায় আবৃত কুটীর গৃহে কৃষক-দম্পতি মনের সুখে বাস করে। সেখানে ফুলে ভরা আঙ্গিনাতে গৃহস্থ-শিশু মধুর হাস্যধ্বনিতে গৃহ প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ করে এবং সে স্বপ্নরাজ্যের প্রতি গৃহে সন্ধ্যার প্রাক্

কালে গৃহবধূ নবজাত শিশু কোড়ে লইয়া 'আয় চাঁদ আয়' শব্দে আকাশের দেবতাকে মুগ্ধ করে। তথাকার শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা কোলাহল ও আবর্জ্জনা-পূর্ণ সহর হইতে ত কম নহে। অনেকে বলিবেন, গ্রামের অধিবাসীর দরিদ্রতাই এই শিশু-মৃত্যুর আধিক্যের কারণ। পল্লীবাসিনী প্রসূতিগণ দুগ্ধ ঘৃত আদি পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করিতে পায় না; নবজাত শিশুগণও উপযুক্ত পরিমাণে মাতৃ দুগ্ধের অভাবে দুর্ব্বল ও কৃশতনু হইয়া পড়ে। আমরা এই কারণকে অস্বীকার করিতে চাহি না। দরিদ্রতা যে এই দেশের শিশু-মৃত্যুর প্রধান কারণ, তাহা আমরা ইতিঃপূর্ব্বেও আলোচনা করিয়াছি।

কিন্তু তাই বলিয়া আমরা কি নিজেদের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি? দেশের দারিদ্র্য ত এক দিনে যাইবার নহে; এবং তাই কপোলে হস্ত বিন্যস্ত করিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিলেও কোন ফল লাভ হইবে না। যেরূপ অবস্থা, তাহার সঙ্গে ভাব করিয়া চলিতে হইবে, ও উহার উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে।

দরিদ্রতা ভিন্ন অজ্ঞতা ও কুসংস্কার শিশু-মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। উহার নিরাকরণও আমাদের হস্তে। আমরা এই প্রবন্ধে আঁতুড়-ঘর ও দাইগণের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইবে, সন্দেহ নাই। শিশুর জন্মের ৫।৬ মাস পূর্ব্ব হইতে প্রসূতির যত্ন লওয়া দরকার এবং সেই যত্নের উপরই শিশুর ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। মাতাকে সেই সময় স্বীয় জীবন ব্যতীত গর্ভস্থ শিশুরও জীবন রক্ষা করিতে হয়। শিশু তাহার আহার্য্য মাতার শরীর হইতে আহরণ করে। সুতরাং মাতার খাদ্য দ্রব্য যে পুষ্টিকর হওয়া আবশ্যক তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। গর্ভাবস্থায় প্রসূতির যে সকল রোগ হয়, তাহারও সাবধানে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। সেই সকল রোগের ফল শিশুর জীবনে পরিদৃষ্ট হয়। উপযুক্তরূপ চিকিৎসা না হইলে গর্ভস্থ ভ্রূণ অনেক সময়ে নষ্ট হইয়া যায়; এবং কোন কোন সময়ে শিশু বিকলাঙ্গ হয়। যাহাতে মাতার মন প্রফুল্ল থাকে ও স্বাস্থ্য অটুট থাকে, তৎপ্রতি গৃহস্থের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। পল্লীগ্রামে অনেক স্থলেই গর্ভবতী স্ত্রীলোকের কোন যত্ন লওয়া হয় না। আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোককেও অনেক সময়ে গৃহ-কর্ম্মে রত থাকিতে দেখা যায়। তাহাতে গর্ভস্থ শিশু ও প্রসূতি উভয়েরই শারীরিক অমঙ্গলের বিশেষ সম্ভাবনা। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের সাধারণ রূপে গৃহস্থালীর কর্ম্ম সহজ প্রসবের অনুকূল বটে, কিন্তু দশ মাস গর্ভাবস্থায় যদি স্ত্রীলোককে কঠিন গুরুভার বহন করিতে হয়, বারংবার উপরে নিচে উঠিতে নামিতে হয়, পুকুর হইতে কলসী করিয়া জল আনিতে হয়, তবে তাহার গর্ভপাতের আশঙ্কাও আছে।

গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোক অনেক সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হয়। ঐ সকল পীড়া শিশুর শরীরেও সংক্রামিত হয়, এবং ঐ সকল পীড়ার জন্য অনেক সময়ে শিশু বিকলাঙ্গ হয়। আবার স্ত্রীলোক গর্ভাবস্থায় রোগাক্রান্ত হইলে প্রসবের সময় সেই সকল রোগ মারাত্মক হয়। এই কারণে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। গর্ভবতী স্ত্রীলোক পীড়িত হইলে তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ, আঁতুড় ঘর সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য এবং উহা সংশোধন করা উচিত। সাধারণতঃ বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অন্ধকার সেঁতসেঁতে ও পরিত্যক্ত ঘর শিশুর আঁতুড়-ঘর রূপে নির্ব্বাচিত হয়। সে ঘরে বায়ু চলাচলের উপযুক্ত দরজা জানালা থাকে না। ঘরের ভিত্তিও উপযুক্তরূপে উঁচু থাকে না। এই প্রকার অস্বাস্থ্যকর স্থানে নবজাত শিশু প্রথম পৃথিবীর আলোক দর্শন করে। স্বাস্থ্যকর আঁতুড় ঘর শিশু ও প্রসূতি উভয়ের জীবনে বিশেষ আবশ্যক। ঐ ঘরে উপযুক্ত পরিমাণে জানালা থাকা উচিত ও প্রচুর পরিমাণে বাতাস চলাচলের বন্দোবস্ত থাকা উচিত। আলো

বাতাস উভয়েরই শিশু জীবনে বিশেষ প্রয়োজন। ঘরের ভিত্তি জমি হইতে অন্ততঃ আড়াই হাত উঁচু হওয়া আবশ্যক। ঐ ঘরের দেওয়ালগুলিতে ও মেজে গোবরের লেপ দিলে দুষ্ট বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়। আঁতুড় ঘর স্বাস্থ্যকর করিতে হইলে অধিক অর্থ আবশ্যক হয় না। গৃহস্থ নিজে চেষ্টা করিলে অল্পব্যয়ে এই সকল সংস্কার করিতে পারে।

উপযুক্ত ধাত্রী নির্ব্বাচন শিশু জীবনের শুভাশুভের প্রধান কারণ। উপযুক্ত দাইয়ের অভাবে অনেক শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এদেশে দাইগণের শিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা নাই। তাহারা নিজের মাতা ও মাতামহীগণের নিকট হইতে যে কুসংস্কার পূর্ণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার সাহায্যেই নবজাত শিশুর পরিচর্য্যা করে। ধাত্রী-বিদ্যার উন্নতি আধুনিক যুগের শিক্ষার একটী বিশেষ গৌরব। কিন্তু আমাদের দেশের ধাত্রীগণ সেই শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। তাহারা পরিষ্কার কাপড়, বিশুদ্ধ জল, উপযুক্ত আলো ও বাতাসের মর্য্যাদা জানে না। দুর্গন্ধ পূর্ণ ও ময়লা কাপড় পরিধান করিয়া তাহারা শিশুর পরিচর্য্যা করে। শিশুর জন্ম গ্রহণের সময়ে আকস্মিক বিপদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য যে সকল সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক পল্লীগ্রামের অনেক দাই তাহা অবগত নহে। তাহাদের অসাবধানতায় শিশু ও প্রসূতি উভয়ে নানা পীড়ায় আক্রান্ত হয়। দাইগণ উহাকে নানা প্রকার দৈব ঘটনা বলিয়া ব্যাখ্যা করে এবং ঐ সকল রোগে শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পিতামাতা নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়।

ধাত্রী-শিক্ষা দেশে এক সমস্যার বিষয়। কারণ, সাধারণতঃ এদেশে নাপতিনি, জোলা প্রভৃতি নীচ জাতীয় রমণীগণই ধাত্রীর কাজ করে। ঐ সকল রমণী কুসংস্কারাচ্ছন্ন, শিক্ষার সহিত কোনও সংশ্রব রাখে না। ঐ শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণকে সহরে পাঠাইয়া শিক্ষিত করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে বলিয়া মনে হয়। আমাদের মনে হয়, গ্রামের বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীগণের দ্বারা ইহাদের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারের সুবিধা হইবে। ধাত্রী বিদ্যা ও সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্বে অভিজ্ঞা মহিলাগণকে গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী পদে নিযুক্ত করা উচিত। সন্ধ্যার সময়ে তিনি গ্রামের দাইগণকে ডাকাইয়া সপ্তাহে দুই দিন বা তিন দিন অনায়াসে ধাত্রী বিদ্যা ও শিশু পরিচর্য্যা বিষয়ে উপদেশ দিতে পারেন। কিছু পারিতোষিকের ব্যবস্থা করিলে বা মাসিক দুই টাকা বা তিন টাকা অর্থ সাহায্য করিলে সহজেই ধাত্রীগণের মধ্যে এই শিক্ষার প্রচলন হইতে পারে। প্রসবকালীন প্রয়োজনীয় দ্রব্য দাইগণকে বিনামূল্যে সরবরাহ করা যাইতে পারে। ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য অধিক নহে। নিম্নলিখিত জিনিষ প্রসবের সময়ে আবশ্যক হইতে পারে—

(১) শিশুকে জড়াইয়া রাখিবার জন্য একখণ্ড ছোট কম্বলের ন্যায় গরম কাপড়।

(২) নাড়ী বাঁধিবার জন্য এক খণ্ড সূতা বা সরু ফিতা।

(৩) শিশুর চক্ষু মুছিবার জন্য স্পঞ্জ বা বোরিক (Boric) তুলা।

(৪) কয়েকখানা পরিষ্কার ন্যাকড়া, কাপড় ও কিছু তুলা।

(৫) এক খানা ছোট কাঁচি বা ধারাল অস্ত্র।

গ্রামের শিক্ষয়িত্রীর নিকটে দাইগণ এই সকল দ্রব্যের ব্যবহার প্রণালী শিখিতে পারে; কিম্বা পরিবারের যে কোনও অভিজ্ঞ স্ত্রী বা পুরুষ সহজে এই বিষয় শিক্ষা দিতে পারেন। এই শিক্ষয়িত্রী দ্বারা গ্রামের আরও মহদুপকার সাধিত হইতে পারে। তিনি গ্রামে প্রতি গৃহস্থের অন্তঃপুরে যাইয়া স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারেন। স্ত্রীলোক সহজেই স্ত্রীলোকের সহিত মিশিতে পারেন।

নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হইলেই শিশুর বিঘ্ন শেষ হইল না। সূতিকা-গৃহে উপযুক্ত পরিচর্য্যার অভাবে অনেক শিশু মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। শিশুর নাড়ীকাটা ও বাঁধা হইতে শিশুর স্নান ও গাত্র মুছান, মলমূত্র ত্যাগ প্রভৃতি

প্রত্যেক কার্য্যের সহিত তাহার স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ আছে। অভিজ্ঞতা ও সতর্কতার সহিত এই সকল কার্য্য সম্পন্ন না হইলে শিশুর জীবন বিপন্ন হয়।

এই সকল কার্য্যের জন্য আমরা দায়ী। ইচ্ছা করিলেই ইহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পৃথিবীর কুত্রাপি এদেশের ন্যায় শিশু মৃত্যুর আধিক্য নাই। দরিদ্রতা ইহার অন্যতম প্রধান কারণ সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা যদি স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন করি, তাহা হইলেও শিশুমৃত্যুর অনেক লাঘব হয়। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, এক একটী ক্ষুদ্র শিশু সমাজের অশেষ শক্তির আধার। এই বীজকে সযত্নে রক্ষা করিতে পারিলে কালে উহা মহা মহীরুহে পরিণত হইতে পারে। শিশুর মঙ্গলামঙ্গলের উপর সমাজের শুভাশুভ নির্ভর করে। পল্লীগ্রামের শিশুকে অবহেলার চক্ষে দেখা উচিত নহে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশের সুদূর পল্লীতে গৃহস্থ গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তি স্বীয় ক্ষমতায় ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিয়া কালের অঙ্কে আপনার পদচিহ্ন রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই কোলাহলপূর্ণ ও সভ্যতাভিমানী নগর হইতে সুদূরে অজ্ঞানান্ধকারময় নীরব গ্রামেই জন্ম গ্রহণ করিয়া লালিত পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক শিশুর জীবনই অমূল্য। কে জানে, অতি দীন-হীন গৃহস্থ পরিবারের অবস্থাসম্ভূত শিশু একদিন বিদ্যাসাগর বা জর্জ্জ ওয়াশিংটনের মত না হইবে! ইহা বুঝিতে পারিলেই শিশুর প্রতি আমাদের দায়িত্ব বুঝিতে পারিব।

ম্যালেরিয়ায় আত্মরক্ষা।

লেখক—ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী

বর্ষা-বৃষ্টির সমাগমে অনেক পল্লীতেই ম্যালেরিয়া, সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বীয় প্রভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই অন্ন বস্ত্র সমস্যার সময় পল্লীমাতার দরিদ্র সন্তানগণ ম্যালেরিয়ার প্রকোপে শয্যাশায়ী হইতেছেন। তাহাদের মধ্যে হাহাকার শব্দ উত্থিত হইয়াছে। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, শয্যা নাই, ঔষধ নাই, পথ্য নাই, চিকিৎসক নাই, উপদেষ্টা নাই, সাহায্যকারী নাই, তাহারা অসহায় অবস্থায় রোগ শয্যায় হাহাকার করিতেছে। ক্ষেত্রে পাট, জলে পাট ও ভাদই ধান্য ক্ষেতে পচিতেছে। কে কাহার সাহায্য করে? কৃষক ছেঁড়া কাথা গায়ে কাঁপিতেছে উত্থান-শক্তি নাই। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া ও ভাবিয়া সহজেই মনে হয় পল্লীগ্রাম বুঝি ধ্বংস হয়।

এবার পূর্ব্ববঙ্গে সুচারু রূপে বর্ষা না হওয়ায়, অনেক স্থানেই এই ভরা ভাদ্রে জলের অভাব হইয়াছে। বৃষ্টিতে ডোবা ও খালে যে জল জমিয়াছে তাহাতে পাট পচাইয়া তাহা দুর্গন্ধযুক্ত ও মশকের আবাস ভূমি করিয়াছে। বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট কর্দ্দমাক্ত হইয়া যাতায়াতের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। মিছরি, চিনি অগ্নিমূল্য। ভাল সাগু বার্লি গ্রামে মেলে না। ভুঁইফোড় হাতুড়ে চিকিৎসকগণ স্বীয় প্রতিভা দেখাইবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছে। মশার অত্যাচারে শুইবার বসিবার উপায় নাই। সুতরাং ম্যালেরিয়া নিজ প্রভাব প্রকাশ করিবার বেশ সুযোগ পাইয়াছে।

এই সময়ে এই দুর্দ্দান্ত ম্যালেরিয়া হইতে আত্ম-

রক্ষার কতকগুলি উপায় প্রত্যেক পল্লীতে প্রচার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধে স্বাস্থ্য-সমাচারের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি। স্বাস্থ্য-সমাচার এই দুর্দ্দিনে অনেক পল্লীতেই স্বাস্থ্য সমাচার প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্বাস্থ্য-সমাচারের সহৃদয় স্বদেশ হিতৈষী পাঠকগণ প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে ইহা প্রচার করিয়া দেশের ও দশের উপকার করিবেন।

সহরে অনেক শিক্ষিত লোক ও চিকিৎসক, ঔষধ ও পথ্য মেলে। কিন্তু পল্লীগ্রামে সেগুলির নিতান্ত অভাব। সেজন্য এই প্রবন্ধে পল্লীগ্রামের ব্যবস্থাই বিশেষ ভাবে লিখিত হইল।

১। রসায়নবিদ্ পণ্ডিতগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে ম্যালেরিয়া প্রধানতঃ হাইড্রোজেন গ্যাস অর্থাৎ দহনজান বাষ্প ও অঙ্গারক বাষ্পের মিশ্রণোদ্ভূত। সূর্য্য কিরণ দ্বারা পৃথিবীর উপরি ভাগ হইতে ইহা প্রচুর পরিমাণে উদ্গত হইয়া দিবাভাগে বায়ুরাশির অভ্যন্তরে বিকীর্ণ থাকে; এবং সূর্য্যাস্তের পর বায়ুর উষ্ণতার লাঘব হইলে, ঘনীভূত আকারে অধঃক্ষিপ্ত হয়। দিবাভাগে সূর্য্যকর যত প্রখর এবং বায়ুর শীতলতা ও আর্দ্রতা যত বেশী হয়, ম্যালেরিয়ার বিষও সেই পরিমাণে বাড়িয়া থাকে। শ্রাবণ, ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক এই কয়েক মাসেই বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয়। এজন্য এদেশে সাধারণ লোকে, এই কয়েক মাসকে "জ্বরের জন্ম মাস" বলিয়া থাকে।

আর্দ্রভূমিই ম্যালেরিয়ার ক্রীড়া ক্ষেত্র। বায়ুস্তরের সহিত মিশিয়া থাকিতে পাইলে, উহার উগ্রভাগ অনেকটা হীনশক্তি হইয়া পড়ে। নিম্নস্তরের বায়ুতে ইহার প্রকোপ কিছু বেশী। এজন্য বাস গৃহ ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব উত্তমরূপে বায়ু সঞ্চালনের উপযোগী করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। মেঝেতে শয়ন, খোলা স্থানে নিদ্রা যাওয়া প্রভৃতি কার্য্য নিতান্ত অবৈধ।

২। অর্দ্রতাই ম্যালেরিয়ার মূল কারণ। সেঁতো বা আর্দ্রভূমি ম্যালেরিয়ার জন্ম ক্ষেত্র। বর্ষা ও বৃষ্টির জলে ভূমি আর্দ্র করে। উদ্ভিদাদি জলে পচিয়া বায়ুকে বিষাক্ত করে। স্বল্প জলপূর্ণ অপরিষ্কার পঙ্কময় পুষ্করিণী, জলপ্লাবিত আর্দ্র বালুকাময় ভূমি, নদীতট প্রভৃতি স্থানে এই সকল কারণে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এজন্য যে গৃহে বাস করা যায়, তাহার পোতা (ভিটা) উচ্চ করিয়া প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। গৃহ যাহাতে শুষ্ক থাকে তজ্জন্য গৃহ মধ্যে অগ্নি রাখা প্রয়োজন। গৃহ মধ্যে বিশুদ্ধ ও তপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখা উচিত।

৩। গলিত উদ্ভিদ, জান্তব পদার্থ ও পচনশীল অন্যান্য পদার্থ হইতে ম্যালেরিয়া বিষ উৎপন্ন হয়। সেজন্য ঐরূপ পচন যাহাতে বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে না হইতে পারে তজ্জন্য যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। বর্ষার পূর্ব্বেই বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বের বনজঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার রাখা উচিত। এবং সেগুলি যাহাতে বর্ষা ও বৃষ্টির জলে পচিতে না পারে তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। বাড়ীর নিকট পাট পচাইতে দেওয়া কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে।

৪। মশক দ্বারা ম্যালেরিয়া বিষ মানব দেহে প্রবেশ করে ও বিস্তারিত হয়। জীব শরীরের শোণিত মশার প্রিয় খাদ্য। গো, অশ্ব মহিষ প্রভৃতি ইতর প্রাণী ও শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর জীব মনুষ্য, সকলেরই দেহের রক্ত শোষণ পূর্ব্বক এই অনিষ্টকারী জীব আত্মপুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। এবং এক স্থানের বিষ অন্য স্থানে বহন করে। সকল প্রকার মশক দ্বারাই ম্যালেরিয়ার বিষ বিস্তার লাভ করে না। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, এনোফিলিস নামক পুংজাতীয় মশক এই বিষ বহন করিয়া মানব দেহে প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইহারা নিম্নভূমিতে ডোবার জলে, পয়োনালার জলে, স্বল্পজলপূর্ণ পঙ্কময় পুষ্করিণীর জলে, পথিপার্শ্বস্থ নর্দ্দমার জলে, গলিত উদ্ভিদাদি পূর্ণ পচা জলে, বিশেষতঃ পাট-পচা জলে, এই জাতীয় মশক প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এই সকল মশক ম্যালেরিয়াক্রান্ত রোগীর বিষ এক শরীর হইতে

অন্য শরীরে প্রবেশ করাইয়া তাহাকেও ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত করিয়া ফেলে। এই রূপে ক্রমে সমস্ত গ্রামবাসী ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়।

এক্ষণে এই মশক ও তাহার জন্ম ও আবাস স্থান সংস্কার ও বন্ধ করা প্রয়োজন। পল্লীগ্রামের অবস্থা যাঁহারা বিশেষ রূপে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এরূপ কল্পনা এক প্রকার অসম্ভব। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর পার্শ্বেই এক একটী ডোবা, তাহাতে আবার তাহাদের অর্থাগমের একমাত্র সম্পদ পাট পচান হয়। সুতরাং মশক বংশ ধ্বংস করা এক প্রকার অসম্ভব কল্পনা মাত্র। আমাদের বিবেচনায় নিম্নলিখিত উপায় সকল দ্বারা কতক পরিমাণে সিদ্ধি লাভ করা যাইতে পারে।

১ম। ধূম প্রদান—সন্ধ্যাকালেই মশককুল ভোঁ ভোঁ শব্দে সর্ব্বগ্রাসী রাক্ষসের ন্যায় মনুষ্য ও গো মহিষাদিকে আক্রমণ করে। ঐ সময় বাড়ীর আঙ্গিনায় ও ঘরে ধূম প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ ধূমে মশক অন্ধ হয়; সে জন্য কতক নষ্ট কতক পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। বাড়ীর প্রাঙ্গণে খড় কুটা আবর্জ্জনা দ্বারা ধূম প্রদান ও ঘরে গন্ধক ও ধুনার ধূম প্রদান করা কর্ত্তব্য। গন্ধকের গন্ধ ঐ সকল মশকের অসহ্য এই জন্য তাহারা পলায়ন করে। এবং ধুনার ধূমে আঠা হয় বলিয়া, অনেক মশকের পক্ষ আঠায় বদ্ধ হইয়া তাহারা মরিয়া যায় ও কতক পলাইয়া যায়।

২য়। ডোবাগুলিতে আলকাতরা অথবা কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ঐ সকল দ্রব্যের গন্ধ ও উগ্র শক্তিতে মশক ডিম্ব নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া তাহা হইতে শাবক জন্ম গ্রহণ করিতে পারে না।

৩য়। বাড়ীতে কোন ব্যক্তি জ্বরাক্রান্ত হইলে তাহাকে ভিন্ন ভাবে রাখার ব্যবস্থা করা উচিত।

৪র্থ। গবাদি পশুকে বাড়ী হইতে, অন্ততঃ শয়ন গৃহ হইতে, দূরে রাখিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

এ কার্য্য গুলি সহজ সাধ্য। এরূপ উপদেশ পল্লীতে পল্লীতে প্রদান করার ভার সরকারী ও বেসরকারী গ্রাম্য চিকিৎসকদিগের উপর অর্পিত হওয়া কর্ত্তব্য।

৫। গাত্রে তৈল মর্দ্দন করিলে ম্যালেরিয়া বিষ শরীর মধ্যে মশক দ্বারা নীত হইতে পারে না। কারণ দেখা যায়, তৈলাক্ত স্থানে মশক দংশন করে না। তৈল ও তৈলাক্ত দ্রব্য এই সময় অধিক পরিমাণে সেবন করিলে ম্যালেরিয়া বিষ শরীর মধ্যে পুষ্ট হইতে পারেন।

৬। প্রভাত ও সন্ধ্যায় গাত্রে বস্ত্র ঢাকা দিয়া ও মুখ ও নাসিকা বস্ত্রাবৃত করিয়া ভ্রমণ করা উচিত। তাহা হইলে ঐ সময়ের সঞ্চালিত ম্যালেরিয়া বিষ দেহ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

৭। শরীর কোন কারণে দুর্ব্বল হইলেই ম্যালেরিয়া বিষ শরীর মধ্যে সহজে প্রবেশ করে; তজ্জন্য ম্যালেরিয়ার কয়েক মাস শরীর যাহাতে সবল থাকে এরূপ খাদ্য ও কার্য্য করা কর্ত্তব্য। এই সময় পাচক রস দুর্ব্বল হয়, পিত্ত প্রবল হয়; সে জন্য পরিপাক শক্তি ক্ষীণ হয় ও খাদ্য দ্রব্য সহজে হজম হয় না; সুতরাং লঘুপাক দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য।

৮। নিদ্রিতাবস্থায় ম্যালেরিয়া বিষ শরীর মধ্যে সহজে প্রবেশ লাভ করিবার সুযোগ পায়; সেজন্য অনাবৃত স্থানে ও গাত্রে শয়ন করা উচিত নহে। যাঁহারা মশারি সংগ্রহ করিতে পারেন তাঁহাদের মশারি ব্যবহার করা উচিত।

৯। ম্যালেরিয়া বিষের আপেক্ষিক গুরুত্ব বোধ হয় বায়ু অপেক্ষা অধিক; এজন্য নিম্ন স্তরের বায়ুতেই ম্যালেরিয়ার বিষ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। সেজন্য নিম্নে বা মেজেতে শয়ন করা উচিত নহে। খাট চৌকী বা অবস্থা বিশেষে মাচা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শয়ন করা কর্ত্তব্য।

১০। কুয়াশার মধ্য দিয়া ম্যালেরিয়ার বিষ পরিচালিত হয়। এজন্য কুয়াশার সময় অনাবৃত অবস্থায় ভ্রমণ করা উচিত নহে।

১১। পানীয় জল উষ্ণ করিয়া পান করা উচিত। বাসি কিংবা পচা দ্রব্য আহার করা উচিত নহে। কোন প্রকারে পাকাশয় দুর্ব্বল হইলেই, ম্যালেরিয়া বিষ দেহ অধিকার করে। সেজন্য যাহাতে পেট খারাপ

না হয় তজ্জন্য লঘুপাক ও টাট্‌কা গরম দ্রব্য আহার করা উচিত।

১২। প্রায়ই দেখা যায়, ম্যালেরিয়া জ্বর হইলে দেহে পিত্তের আধিক্য হয়। রোগী পিত্ত বমন করে ও পিত্ত ভেদ হয়। সে জন্য যাহাতে পেটে পিত্ত জমিতে না পারে তজ্জন্য শূন্য উদরে অধিক ক্ষণ থাকা ও রৌদ্রে অধিক কাজ করা উচিত নহে। সাধ্যানুসারে প্রাতে কিছু আহার করা উচিত।

১৩। আর্দ্রতাই ম্যালেরিয়ার একটী প্রধান কারণ। সে জন্য গৃহাদি যাহাতে শুষ্ক থাকে তজ্জন্য যত্নবান হওয়া উচিত। ম্যালেরিয়ার সময় অবগাহন স্নান না করাই ভাল। শরীরে ঠাণ্ডা লাগিলেই ম্যালেরিয়ার আক্রমণের ভয় থাকে।

১৪। ম্যালেরিয়া জ্বর বিষজ। কুইনাইন তাহার বিষঘ্ন। ম্যালেরিয়া জ্বর নষ্ট করিবার একমাত্র মহৌষধ কুইনাইন সেবন করিতে পারিলেই জ্বর বন্ধ হয়। ডাক্তার কবিরাজেরা ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন যথোপযুক্ত রূপে প্রয়োগ করেন। ম্যালেরিয়া জ্বরের যত প্রকার পেটেণ্ট ঔষধ আছে প্রত্যেকের মধ্যেই কুইনাইন বর্ত্তমান আছে। ম্যালেরিয়ার সময় সুস্থাবস্থায় প্রতি রোজ ৪ গ্রেণ মাত্রায় প্রাতে কুইনাইন সেবন করিলে, ম্যালেরিয়া জ্বর সহজে আক্রমণ করিতে সক্ষম হয় না। কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন। কোষ্ঠ অপরিষ্কার হইলেই বুঝিতে হইবে বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়াছে। তৎক্ষণাৎ রেচক ঔষধ সেবন করিয়া কুইনাইন সেবন করিবে।

১৫। দেশীয় কতকগুলি ঔষধ কুইনাইনের ন্যায় কতক পরিমাণে ম্যালেরিয়ানাশক। যথা, নাটা, আতিশ, নিম, তুলসি প্রভৃতি। নাটার ডগা বা ফলের শাঁস, গোলমরিচ ও সৈন্ধব লবণ সহ প্রতি রোজ সেবন করিলে, ম্যালেরিয়া জ্বর হয় না ও হইলে সেবন করিলেই জ্বর সারিয়া যায়। ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ দেশী ঔষধ।

পল্লী-স্বাস্থ্য

এবার মফস্বলের সংবাদপত্রগুলিতে স্বাস্থ্য-সংবাদ খুবই কম। ইহা অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। দেশ কি আবার আগেকার মত স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে, আনন্দময়ীর আগমন-সূচনায় রোগ শোক কি দেশ হইতে একেবারে দূর হইয়া গিয়াছে? তাহা হইলে ত আমাদের আনন্দের সীমা থাকিত না; কিন্তু—না, তাহা হইবার নহে। আমাদের অদৃষ্ট কখনই এতটা সুপ্রসন্ন নহে। তবে মফস্বল সহযোগীরা যে স্বাস্থ্য প্রসঙ্গের আলোচনায় বিরত হইয়াছেন, তাহার অন্য কারণ আছে। এখন চারিদিকে স্বায়ত্ত-শাসন রূপ মাকাল ফলের লোভে সকলেই উদ্বাহু হইয়া উঠিয়াছেন। দেশময় নির্ব্বাচনের জগঝম্প বাজিয়া উঠিয়াছে। এখন আর স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার কাহারও অবসর নাই। যাহা হউক, ইহারই মধ্যে আমরা যেটুকু স্বাস্থ্য-সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিলাম, তাহা হইতেই পাঠকেরা, দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা এখন কেমন, তাহা বুঝিয়া লউন।

বিগত বন্যায় মেদিনীপুর জেলায় যে কি ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, ভাষায় তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব, এবং ঐ জেলার অবস্থা পাঠকগণেরও এখন আর অজ্ঞাত নহে। এইরূপ দৈব দুর্ব্বিপাকের প্রত্যক্ষ ফল ত আছেই; তাহা ছাড়া, পরোক্ষ ফলও আছে।

সেটা সার্ব্বজনীন স্বাস্থ্যহীনতা। দুর্ভিক্ষে লোকে প্রথমে কুখাদ্য খাইতে আরম্ভ করে। তাহা না জুটিলে অনাহারে মরে। তার পর মহামারী আসিয়া দেশ উজাড় করিয়া দিয়া যায়। জলপ্লাবনের পরিণামও প্রায় এইরূপ। প্রথমে লোকের নানা প্রকার অসুবিধা উপস্থিত হয়। তাহাদের আর্থিক ক্ষতি হয়; সম্পত্তি-হানি ঘটে। গৃহপালিত পশু ভাসিয়া যায়। এ সকল মুখ্য অসুবিধার পর, দেশ অনেক দিন জলে প্লাবিত থাকিলে, নানা প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া থাকে। মেদিনীপুরেও প্রায় তাহাই ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। এখনও লোকে প্লাবনের প্রত্যক্ষ অসুবিধায় কষ্ট পাইতেছে। পরে বোধ হয়, জেলাটী সমগ্র ভাবে অস্বাস্থ্য-কর হইয়া উঠিবে। আপাততঃ "মেদিনীপুর হিতৈষী" পত্রে দেখা যাইতেছে—

মফস্বলে স্বাস্থ্য—মেদিনীপুর জেলায় বন্যাপীড়িত স্থানসমূহের স্বাস্থ্যের কথা আর কি বলিব? জ্বর, নিউমোনিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগে শত শত লোক দেহত্যাগ করিতেছে সে কথা কেমন করিয়া বর্ণন করিব? না দেখিলে সে ভীষণ দৃশ্য বুঝান যায় না। একদিনের জ্বরেই ডাক্তার কবিরাজ না ডাকিতে ডাকিতেই প্রাণান্ত হইতেছে! একে উদরে অন্ন নাই, কাজ কর্ম্ম নাই, দুশ্চিন্তায় শরীর জর জর! তাহার উপর রোগের আক্রমণ যে সহজ ও সুলভ তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই! হায় হায়! কি সর্ব্বনাশ!

দাসপুর থানার অন্তর্গত স্থান সমূহে কি ভীষণ ইনফ্লুয়েঞ্জা তাহা দেখিলে মহামারী ভিন্ন কিছুই বলা যায় না। ক্ষেপুত প্রভৃতি অঞ্চলে বন্যায় লতা পাতা ও গুল্মাদি পচিয়া চারিদিক দুর্গন্ধময় হইয়া উঠিয়াছে। এবং জ্বরে বোধ হয় কোন বাড়ীর একজনও শয্যাশ্রয় না করিয়া সুস্থ শরীরে নাই। জ্বরের এমন ভীষণতা কখনও দেখা যায় নাই। কতলোক মরিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

জেলাবোর্ড যদি কিছু প্রতিকার করিতে পারেন ত অবিলম্বে চেষ্টা করুন।

কেবল ইহাই নয়। অন্যান্য অসুবিধাও বিস্তর। "মেদিনীপুর হিতৈষী"তে একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন—

মেদিনীপুর জেলার অধীন ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানার অন্তর্গত দুঃখাসপুর সার্কিটে বিহারীচক গ্রামে একটী মাত্র জল-নিকাশী পুল আছে। উহার কবাটটী জীর্ণ হইয়া যায়, উহার মেরামত না হওয়ায় পুনঃপুনঃ বন্যার জল মাঠে প্রবেশ করে এবং ১৭... হাজার বিঘা জমির উপস্থিত ফসল নষ্ট করিয়া দিয়াছে ও গ্রাম্য যাতায়াতের পথগুলির উপর কোথাও ৪ হাত কোথাও বা ৩ হাত জল হইয়াছে।

কোন যায়গায় যাইতে হইলে ডোঙ্গা ভিন্ন যাতায়াতের উপায় নাই। তার উপর প্রত্যেক বাড়ীতে ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব, ডাক্তার কবিরাজ আসিবার ভয়ানক কষ্ট। সকলের বাড়ীতে ডোঙ্গা নাই। যাহাদের ডোঙ্গা আছে, তাহারা ডাক্তারের বাড়ী যাইতে সমর্থ হইলেও, ডোঙ্গাবিহীনদের ভয়ানক কষ্ট হইতে লাগিল। চিকিৎসার অভাবে রোগী সকল যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতে লাগিল। এইরূপ প্রায় একমাস কাল চলিতে লাগিল। ক্রমশঃ বাড়ীর ভিতর জল প্রবেশ করিতে চলিল, কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট কোন প্রতিকারের আশা নাই।

মেদিনীপুরের দুরবস্থার কথা এখনও শেষ হয় নাই। সহযোগী "মেদিনী-বান্ধব" লিখিয়াছেন—

স্বাস্থ্য:—

সহরে এখন যদিও কোন মারাত্মক সংক্রামক পীড়ার আক্রমণ নাই; কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ খুবই দেখা দিয়াছে। মফঃস্বলেও জ্বর পেটের পীড়ার প্রকোপ খুব দেখা দিয়াছে।

চিকিৎসক ও চিকিৎসাগারের প্রশংসা শুনিলে স্বভাবতঃই আমাদের মনে অত্যন্ত আনন্দ হয়। সহযোগী "ঢাকা প্রকাশ" এবার আমাদিগকে এই আনন্দ লাভের সুযোগ দিয়াছেন। "ঢাকা প্রকাশ" একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন—

দাতব্য চিকিৎসালয়—আজ নাতিদীর্ঘ ১২ বৎসর কাল যাবৎ আমাদের "চুড়াইন দাতব্য চিকিৎসালয়টী স্থাপিত হইয়াছে। তদানীন্তন জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের সুজন-সুলভ সহানুভূতিতেই এই ডাক্তারখানার ভিত্তি স্থাপিত হয়। রোগীর বাৎসরিক হিসাবে দেখা যায়, এ ডাক্তারখানায় দৈনিক যত রোগী হয়, ঢাকা জেলায় ২।৩টী ডাক্তারখানা ব্যতীত অন্য কোথাও এরূপ রোগী হয় না। নিঃস্বার্থ পরদুঃখকাতর ডাক্তার মৌলবী কমরলহক্‌ই ইহার মূল কারণ।

বিগত ২৮শে শ্রাবণ শুক্রবার বিক্রমপুর ইচ্ছাপাড়া নিবাসী উচ্চ বংশোদ্ভব ব্রাহ্মণ শ্রীযুত রণদাকান্ত মুখোপাধ্যায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ ও ১৬।১৭ বৎসর বয়স্কা নাতনী আশালতা দেবীকে সঙ্গে করিয়া নবাবগঞ্জ থানার এলাকাধীন গালীমপুর গ্রামে এক

রাজীয়ের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। বাড়ীতে প্রত্যাগমন কালে চুড়াইনের অর্দ্ধ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে অকস্মাৎ ঐ কন্যার মাথাব্যথা হয় এবং নাক দিয়া ২।১ ফোটা করিয়া রক্ত পড়িতে আরম্ভ করে। দেখিতে দেখিতে ঐ রক্ত নাক দিয়া দরদর করিয়া পড়িতে থাকে। ইহাতে কন্যাটীও অধীরা হ'ন। পথ-পার্শ্বে কয়েকজন নৌকারোহী ইঁহাদের অবস্থা দেখিয়া অবিলম্বে চুড়াইন ডাক্তারখানায় যাইতে বলায়, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ডাক্তার-খানায় চলিয়া আসিলেন। তখন বেলা ১॥ ঘটিকা হইবে। ডাক্তার সাহেব তাঁহার কাজ শেষ করিয়া তখন বিশ্রাম করিতে-ছিলেন। ঐ সময় মেয়েটীর নাক দিয়া অবিশ্রান্ত রক্ত পড়িতে-ছিল। ২।৩ জন লোক কন্যাটীকে ডাক্তারখানার বারান্দায় আনিল। ডাক্তার সাহেব কন্যাটীর এরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাহাকে স্ত্রীলোকদের চিকিৎসা কামরায় লইয়া গেলেন। বালিকার পরিধেয় বস্ত্র ও শরীর রক্তে মাখা ছিল; তখনকার দৃশ্য দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। তখন বালিকার সর্ব্বাঙ্গ শীতল ও নাড়ী লোপ হইয়াছিল। ক্ষিপ্রকারিতা ও চিকিৎসা-নৈপুণ্যে বালিকার প্রাণরক্ষা পাইয়াছে। অনেক চেষ্টার পর ঐ রক্তপড়া বন্ধ হয়। রক্ত অনুমান /৫ সের পড়িয়াছিল। বালিকাটী প্রায় ৪ ঘণ্টাকাল নিশ্চল ও নিস্পন্দ ভাবে ছিল। স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রসন্তানের সেবাশুশ্রূষায় ও নানারূপ সাহায্যে এবং ডাক্তার সাহেবের সুচিকিৎসাগুণে কন্যাটী উত্তরোত্তরই ভাল হইতে থাকে। ১৮ দিন এই ডাক্তারখানায় চিকিৎসার পর কন্যাটী আত্মীয়স্বজন সঙ্গে বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। চিকিৎসার এরূপ সুবিধা না থাকিলে বালিকা নিশ্চয়ই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। যাহাতে দেশে স্থানে স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয় এবং বিপন্ন নরনারী অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তজ্জন্য সদাশয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি প্রার্থনীয়। বশম্বদ—শ্রীপ্রিয়নাথ চৌধুরী, প্রেসিডেণ্ড-পঞ্চাইত, ১৪নং চুড়াইন ইউনিয়ন, ঢাকা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

লেখক—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু।

(১) মনুষ্যদেহে সর্ব্বসুদ্ধ দুইশত চল্লিশখানি অস্থি আছে। ওজনে তাহারা প্রায় সাতসের।

(২) খুব ভাল "ওক" কাষ্ঠ যে পরিমাণ মালের ভার সহিতে পারে, ঠিক সেই প্রকার মোটা মানুষের দেহের একখানি অস্থি তাহার অপেক্ষা দেড়গুণ বেশী ওজনের মালের ভার বহন করিতে পারে।

(৩) হস্তের কবজী হইতে মধ্যমাঙ্গুলীর শেষ পর্য্যন্ত যত দীর্ঘ, স্বাভাবিক মনুষ্যের দৈর্ঘ্য তাহার দশগুণ বেশী।

(৪) মনুষ্যের পা যত দীর্ঘ, তাহার দেহের দৈর্ঘ্য তদপেক্ষা ছয়গুণ বেশী।

(৫) মানব দেহে যত প্রকারের ব্যারাম হয়, তাহার সংখ্যা সর্ব্বসমেত দুই হাজার চারি শত। ইহার মধ্যে সাধারণতঃ সতেরটি রোগই মানুষকে আক্রমণ করিয়া থাকে।

(৬) মানুষের দেহে যে রক্ত বহে, তাহার ভার চৌদ্দ সেরের বেশী নয়।

(৭) মানুষের গায়ে যে সকল আঁচিল বা তিল জন্মায়, সেগুলি তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। কারণ সেক্ষেত্রে প্রায়ই কষ্টকর চর্ম্মরোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(৮) স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক পূর্ণ পরিণতি লাভ করে পঁচিশ বৎসর বয়সে, আর পুরুষের পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে।

(৯) অলস ব্যক্তির পক্ষে দিবসে অর্দ্ধ সের অর্দ্ধ ছটাক ওজনের আহার্য্যই যথেষ্ট। যাঁহারা কঠোর পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের পক্ষে দিবসে তিন পোয়া তিন ছটাক আহার্য্য গ্রহণ প্রশস্ত। যাঁহাদিগকে অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়, দিবসে দেড় সের অর্দ্ধ ছটাক ওজনের আহার্য্য গ্রহণ করিলেই তাঁহাদের পক্ষে প্রচুর হয়।

আলোচনা।

সর্প-দংশনের ঔষধ।—

ভাগলপুর জেলার বাঁকা গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সিংহ আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার এক ভাই ৺ গোরাচাঁদ সিংহ ডাক্তার ছিলেন। তিনি যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত সাহারাণপুর, হরিদ্বার, সাজাহানপুর ফৈজাবাদ প্রভৃতি স্থানে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার হাতের লেখা কতকগুলি নোট শ্রীযুক্ত শশীবাবু প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাতে সর্প দংশনের নিম্নলিখিত ব্যবস্থা আছে। শ্বেত আকন্দ মূল, শ্বেত অপরাজিতা মূল, শ্বেত জবা মূল, শ্বেত করবী মূল সমান ভাবে ও গোলমরিচ অর্দ্ধমাত্রায় একত্রে পিষিয়া মটরের মত বড়ি প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ বড়ি জলের সহিত গুলিয়া সেবন করাইলে শীঘ্র সর্প দংশনের প্রতিকার হয়। একটী রোগীকে তিনটি পর্য্যন্ত গুলি খাওয়াইয়া আরোগ্য করা হইয়াছে। শরীরের কোন স্থান কাটিয়া রক্ত বাহির হইলে, ঐ স্থানে ঐ গুলি লাগাইলে উপকার হয়। এই ঔষধের কোনও বৈজ্ঞানিক সত্য আছে কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। সাধারণের অবগতির জন্য এই সংবাদ প্রকাশ করিলাম। তবে অনেক টোটকা ঔষধে সাপে-কাটা রোগী আরোগ্য হইতেও শুনা যায়।

গো রক্ষা।—

গতবারে গোহত্যা প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখিতেছি, গোরক্ষার জন্য বিরাট উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। কংগ্রেস মণ্ডপে, কংগ্রেসের অংশ স্বরূপ বলিতে গেলে, একটী বিরাট সভা হইয়াছিল। তাহাতে গোরক্ষার সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। অর্থাৎ, বিশেষ ভাবে গোরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণের জন্যই এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল, এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এই সভায় যোগ দিয়াছিলেন। এ ছাড়া, অন্যান্য সাধারণ সভা-সমিতিতেও গোরক্ষার কথার আলোচনা চলিতেছে, এবং এ সম্বন্ধে প্রস্তাবও গৃহীত হইতেছে। এদিকে মুসলমান সমাজের খেলাফৎ আন্দোলনে হিন্দুগণ সহানুভূতি প্রকাশ করায় এবং যোগদান করায় কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ মুসলমান সম্প্রদায় গোহত্যায় বিমুখ হইয়াছেন। কেবল কথায় নহে,—তাঁহারা কার্য্যেও তাহা প্রদর্শন করিতেছেন; গত বখরিদ পর্ব্বের সময় অনেক স্থলে গরুর পরিবর্ত্তে মেষ কোরবানি করিয়া মুসলমান সমাজ ধর্ম্মের অনুশাসন মান্য করিয়াছেন। ইতিমধ্যে আবার নিখিল ভারতীয় গোরক্ষা সমিতির একটী বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতেও গোহত্যা নিবারণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কংগ্রেস মণ্ডপে গোরক্ষা কল্পে হিন্দু-মুসলমানের যে সম্মিলিত সভা হইয়াছিল, তাহার ফলে এক কোটী টাকা মূলধন সংগ্রহ করিয়া গোরক্ষা করিবার ব্যবসার উদ্দেশ্যে একটী সমবায় সমিতি গঠনের আয়োজন হইতেছে। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে মাড়োয়ারীর ব্যবসায় বুদ্ধি খেলিতেছে। নিখিল ভারতীয় গোরক্ষা সুমিতি না কি আরও একটা কাজ করিয়াছেন। তাঁহারা ভারতের যত মিউনিসিপ্যালিটীকে অনুরোধ করিয়াছেন যে তাঁহারা যেন দুগ্ধবতী গাভী ও গোবৎস হত্যা করিতে না দেন। সংবাদপত্রে যেন পড়িতেছিলাম যে, কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটী সমিতির অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন; দুগ্ধবতী গাভী ও গোবৎস হত্যা নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন।

এ সমস্তই দেখিতে শুনিতে খুব ভাল। হয় ত এই আন্দোলনের ফলও খুব ভালই হইতে পারে। কিন্তু তথাপি আমরা কেমন সম্পূর্ণরূপে আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না। মনে হইতেছে, গোরক্ষা পেশাদারী

ব্যাপার নহে। শ্রদ্ধাবুদ্ধি ব্যতীত গোরক্ষার প্রয়াস নিষ্ফল। আজ খেলাফৎ আন্দোলনের খাতিরে জন কতক মুসলমান ভদ্রলোক রাজনীতি-ক্ষেত্রে হিন্দুর মন রাখিবার জন্য গোরক্ষার সমর্থন করিতে পারেন, গো-কোরবানিতে বিরত থাকিতে পারেন; কিন্তু এই ভাব যে স্থায়ী হইবে, সে বিশ্বাস আমাদের নাই। তাহার কয়েকটী অতি অকাট্য কারণ এই যে, গোমাংস এক শ্রেণীর লোকের খাদ্য; আজ পৃথিবীব্যাপী খাদ্যাভাব উপস্থিত; গোমাংস সুলভ খাদ্য। গোখাদক সম্প্রদায় কেবল রাজ-নীতির খাতিরে এই খাদ্যাভাবের দিনে এমন সুলভ খাদ্য হইতে কতদিন নিজেদের বঞ্চিত রাখিতে সমর্থ হইবেন, গোমাংসের লোভ কতদিন সংবরণ করিতে পারিবেন সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। বিশেষতঃ তাঁহাদের ধর্ম্মে গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ত নহেই; বরং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করেন, গোমাংস আহার তাঁহাদের ধর্ম্মানুসারে খুবই প্রশস্ত। তবে যদি তাঁহারা এই কথাটি বুঝিতে পারেন যে, যেভাবে এখন গোহত্যা হইতেছে, সে ভাবে গোহত্যা হইতে থাকিলে অচিরে গোজাতি সবংশে নির্ম্মূল হইবে,—তখন চাষ বাস চলিবে না, দুধ-ঘি খাওয়া চলিবে না, এমন কি গোমাংসও দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য খাদ্য হইয়া উঠিবে, তবেই কিছু সুবিধা হইতে পারে। যদি তাঁহারা এই কথাটি বুঝেন যে, একেবারে প্রচুর স্বর্ণডিম্বের লোভে স্বর্ণডিম্বপ্রসূ হংসীর প্রাণনাশ করিলে লাভেমূলে হা-ভাত হইতে হইবে, তবেই গোরক্ষার আন্দোলন সফল হইতে পারে।

আর, হিন্দুর এই গোরক্ষার আন্দোলন দেখিয়া আমাদের হাসি পাইতেছে; মনে হইতেছে,—থাক্, মনের কথা আর খুলিয়া বলিব না। বাঙ্গলা দেশে, অথবা কেবল বাঙ্গলা দেশে কেন, সমস্ত ভারতেই বলিতে গেলে, যত গোহত্যা হয়, সে পাপের প্রধান ভাগী হিন্দু—যে হিন্দু একদিন গরুকে মা বলিয়া পূজা করিত। ভারতের গোধন ত হিন্দুরই সম্পত্তি ছিল; এখনও যাহা আছে, তাহা প্রায় হিন্দুরই। সেই হিন্দু কসাইকে গরু বিক্রয় না করিলে এত গো-হত্যা হয় কেমন করিয়া? মুসলমান বা ইয়োরোয়াপীনরা গরু পুষিলে, কসাইকে বিক্রয় করার পক্ষে তাঁহারা খুবই সাবধান। আমরা যে কয়জন মুসলমান ও ইয়োরোপীয়ান বা এ্যাঙ্গলোইণ্ডিয়ানকে গরু পুষিতে দেখিয়াছি, তাঁহারা গরুকে এত যত্ন করেন যে হিন্দু এখন গরুকে যত্ন করা তাঁহাদের কাছে শিখিতে পারে। ইয়োরোপীয়ানদের পোষা গরুগুলি অবশ্য মূল্যবান ও তাহাদের দুগ্ধের পরিমাণও খুব বেশী। হয় ত তাঁহারা মূল্য ও দুগ্ধের খাতিরেই গরুকে খুব যত্ন করেন। তাহা হইলেও, তাঁহারা পালিত গরুকে যত্ন করেন ত। অথচ, গোমাংস তাঁহাদের সর্ব্ব প্রধান খাদ্য। আর, গোমাংস হিন্দুর খাদ্য নয়; অথচ হিন্দুর অযত্নে, হিন্দুরই অবহেলায় ভারতীয় গোবংশ নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছে। সম্প্রতি এক কোটী টাকা মূলধন লইয়া গোরক্ষা করিবার প্রস্তাব শুনিয়া গরিব যধ্যবিত্ত লোকগণ ভীত হইয়াছেন। সত্য সত্যই যদি এরূপ প্রস্তাব হইয়া থাকে, এবং বাস্তবিকই ইহা কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে হয় ত কতকগুলি গরু রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে গরিব গৃহস্থের সর্ব্বনাশ নিঃসন্দেহ। কারণ, তাহা হইলে তাহাদিগকে দুধ ঘিয়ের আশা একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে। ব্যবসা বুদ্ধির আদর্শ জননায়কগণের দ্বারা পরিচালিত কোম্পানি যদি বাঙ্গলার এক কোটী টাকার গরু ক্রয় করিয়া লন, তাহা হইলে গৃহস্থকে দুধ ঘিয়ের জন্য তাহাদের হাত-তোলা হইয়া থাকিতে হইবে। তাহারা দুধ ও ঘি বলিয়া যাহাই দিবে, গৃহস্থকে তাহাই হাত পাতিয়া লইতে হইবে। আর তাহার জন্য কোম্পানি যে দাম চাহিবে, বেওজোর সেই দামই তাহাকে দিতে হইবে।

এই জন্য আমাদের মনে হয়, বাঙ্গলায় গোরক্ষার একটী মাত্র উপায় আছে। সে উপায়—পূর্ব্বে যেমন প্রতি গৃহস্থের ঘরেই দুই একটী করিয়া গরু থাকিত,

বাঙ্গালী গৃহস্থদিগকে আবার সেই ভাবে গোপালন করিতে হইবে। গোয়ালার উপর দুধের জন্য আর নির্ভর করা চলিবে না। ইহাতে কিছু কষ্ট আছে, কিছু অর্থব্যয়ও আছে। কিন্তু নাচার। বাঙ্গালী জাতিকে আত্ম রক্ষা করিতে হইলে গোপালন করিতেই হইবে। সহরে হয় ত সকলের গোপালনের সুবিধা হইবে না; সেই জন্য বাঙ্গালী গৃহস্থগণকে সহরবাসের সুখ সুবিধা ও প্রলোভন ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ পল্লীভবনে ফিরিয়া যাইতে হইবে। প্রত্যেক গ্রামে একটী করিয়া গোচারণের মাঠ রাখিতে হইবে। কসাইকে গোরু বিক্রয় করা একদম বন্ধ করিতে হইবে। প্রাচীন কালের মত গোমাতাকে যত্ন এমন কি পূজা পর্য্যন্ত করিতে হইবে। এইরূপে শ্রদ্ধাবুদ্ধির উপর গোপালন প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত না হইলে বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব লোপ বহু বিলম্বিত হইবে না। বাঙ্গালী জাতি যে আজ লাখে লাখে মরিতেছে, খাদ্যাভাব, —শিশুর ভোজ্য গোদুগ্ধের অভাবই তাহার প্রধান কারণ। খাদ্যাভাবেই আজ বাঙ্গালী জাতি মরিতে বসিয়াছে—রোগ শুধু একটা উপলক্ষ মাত্র। অতএব বাঙ্গালী, সাবধান! যদি বাঁচিতে চাও, তবে তোমার সেই প্রাচীন কালের আচার ব্যবহার পুনঃ প্রবর্ত্তন কর! আবার গৃহী হও। সহরবাসী হইয়া লক্ষ্মী ছাড়া হইও না। পল্লীবাসী হও, গোলক্ষ্মীকে আদর যত্ন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার উপায় কর; পল্লীগৃহে লক্ষ্মীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা কর।

জাপানে ঔষধের ব্যবসায়।—

জাপানীরা অতি উদ্যমশীল জাতি। জাপানী সভ্যতা, জাপানের উন্নতির বয়স যেমন অল্প, জাপানীদের উদ্যমশীলতাও তদ্রূপ সেই বয়সের উপযোগী। আমরা একখানি জাপানী সাময়িক পত্র হইতে জাপানীদের এই গুণের একটুখানি পরিচয় সঙ্কলন করিয়া দিলাম। পাঠকেরা দেখিবেন, জাপানের নিকট আমাদের শিক্ষনীয় অনেক বিষয় রহিয়াছে। যুদ্ধের সময় চারিদিকের বাণিজ্যে যখন ব্যাঘাত উপস্থিত হইল, তখন জাপানী গবর্ণমেণ্ট চিন্তান্বিত হইয়া উঠিলেন। জার্ম্মানী হইতে জাপানে প্রচুর ঔষধ আমদানী হইত। যুদ্ধ বাধিবা মাত্র জার্ম্মানী হইতে সকল প্রকার পণ্য দ্রব্যের বিদেশে রপ্তানী বন্ধ হইয়া গেল। জার্ম্মানী হইতে জাপানে ঔষধের আমদানী বন্ধ হইলে, এবং সাধারণ ভাবে ঔষধাদির মূল্য বৃদ্ধি হইলে, জাপানী জাতির স্বাস্থ্য তদ্দ্বারা কি পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধানের জন্য জাপানী গবর্ণমেণ্ট একটী কমিটির নিয়োগ করিলেন। এই কমিটির কার্য্যে সাহায্যের জন্য, কমিটিকে সমস্ত তথ্য যোগাইয়া দিবার জন্য টোকিয়ো এবং ওসাকা নগরের প্রধান প্রধান ঔষধ ব্যবসায়ীরা ঔষধের ব্যবসায় সংক্রান্ত সকল বিবরণ সংগ্রহের জন্য নিজেরা একটী কমিটি গঠন করিলেন। তার পর সরকারী কমিটির কার্য্য শেষ হইল; গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগৃহীত হইল। কিন্তু বেসরকারী কমিটির কার্য্য তখনও শেষ হইল না। সরকারী কমিটিকে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিবার পরও ঔষধের ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনোপযোগী সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য এই বেসরকারী কমিটি স্থায়ী হইয়া গেল। কমিটির কার্য্যের সুবিধার জন্য ঔষধ ব্যবসায়ীরা অবিলম্বে এক লক্ষ ইয়েন চাঁদা তুলিয়া দিলেন। কমিটি এখন খুব ভাল কাজ করিতেছেন। জাপানীরা কেবল নিজ দেশের ঔষধের ব্যবসায় সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়াই নিশ্চিত হন নাই। বড় বড় জাপানী কার্ম্মের প্রতিনিধিরা জার্ম্মানী, ফ্রান্স, আমেরিকা সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে গিয়া ঔষধ ব্যবসায় সংক্রান্ত সকল তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। একজন জাপানী প্রতিনিধি প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঔষধ প্রস্তুত সম্বন্ধে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য দেশ সুইজারল্যাণ্ড খুব অগ্রসর হইয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে ঔষধ প্রস্তুত বিষয়ে জার্ম্মানী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহার পরেই সুইজারল্যাণ্ডের স্থান। সকল দেশের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া জাপানীরা নিজেদের দেশের ঔষধ প্রস্তুত করার ব্যাপারের উন্নতি করিতে উৎসুক হইয়াছেন; সকল জাপানী ঔষধ ব্যবসায়ীরা মিলিত হইয়া প্রচুর মূলধন সরবরাহ করিয়া বড় বড় ঔষধের কারখানা স্থাপনে উদ্যত হইয়াছেন।

স্বাস্থ্য-সমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৯ম বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ সাল { ৮ম সংখ্যা

ধূমপানের অপকারিতা।

লেখক—শ্রীযোগেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মদ্যের ন্যায় গঞ্জিকা চরসাদির ধূমপানেও এদেশের সহস্র সহস্র লোক বহুকাল হইতে বিশেষ ভাবে অভ্যস্ত। কি নগরে কি পল্লীতে সর্ব্বত্রই ধূমপায়ীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাও যে দেশ উৎসন্নের দিকে ধাবিত হওয়ার একটী কারণ, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ধূমপান নিবারণার্থ বিশেষরূপে চেষ্টিত হওয়া দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য; নতুবা দেশোন্নতিকর অন্যবিধ সকল কর্ম্মে আপ্রাণ চেষ্টা করিলেও, দেশের দুরবস্থা সম্পূর্ণরূপে অপনোদিত হইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

মদ্য-পায়ীদের মত গঞ্জিকা চণ্ডুসেবিগণও রোগ দৈন্যের হস্ত হইতে কখনও নিস্তার পায় না। এমন লোক আছে, যাহারা সকল প্রকার মাদক দ্রব্য সেবনেই বিশেষ পটু। আবার কেহ কেহ যখন সুরা-দেবীর অর্চ্চনায় অহরহঃ ইচ্ছানুরূপ অর্থব্যয় করিতে করিতে, অভাব পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা অল্প পয়সার নেশা গঞ্জিকাদি সেবনে অভ্যস্ত হইয়া থাকে। নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেই গঞ্জিকা-চরসাদি সেবীর সংখ্যাই অধিক বটে; কিন্তু এইরূপ নেশার বশবর্ত্তী উচ্চ শ্রেণীর লোকও কম দেখা যায় না। ধূমপানার্থ কত লোক যে কত অর্থ অপব্যয় করিয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ধূমপ-য়ীদের মধ্যে প্রায় সকলেই ভগ্নস্বাস্থ্য। যাহারা অর্থ ও স্বাস্থ্য উভয়ই এইরূপে বিনষ্ট করে, তাহা সদাসর্ব্বদাই অশেষ কষ্টে কালাত্যয় করিয়া থাকে।

গঞ্জিকা—এদেশে গাঁজার প্রচলন ক্রমশঃই যেরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে বাস্তবিকই আতঙ্কিত হইতে হয়। ইহা তামাকের ন্যায় সস্তা দরে বিক্রীত হইলে বুঝি গাঁজাখোরদের আহ্লাদের সীমা থাকিত না; কারণ, অতি সহজেই ও সত্বর তাহাদের দলপুষ্টি হইত। পঙ্গপালের ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে প্রতিনিয়ত কত লোক যে গাঁজার আড্ডায় মিশিয়া গাঁজার নেশায় মজগুল থাকিত ও দিন দিন আরও কত লোককে এই পথের পথিক করিত, তাহা কে বলিতে পারে? চড়া দরে বিক্রীত হওয়াতেও, গাঁজাখোরের অভাব নাই; সস্তা হইলে ইহা দ্বারা না জানি কতই অনর্থ সংঘটিত হইত!

বাঙ্গালী গৃহস্থদিগকে আবার সেই ভাবে গোপালন করিতে হইবে। গোয়ালার উপর দুধের জন্য আর নির্ভর করা চলিবে না। ইহাতে কিছু কষ্ট আছে, কিছু অর্থব্যয়ও আছে। কিন্তু নাচার। বাঙ্গালী জাতিকে আত্ম রক্ষা করিতে হইলে গোপালন করিতেই হইবে। সহরে হয় ত সকলের গোপালনের সুবিধা হইবে না; সেই জন্য বাঙ্গালী গৃহস্থগণকে সহরবাসের সুখ সুবিধা ও প্রলোভন ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ পল্লীভবনে ফিরিয়া যাইতে হইবে। প্রত্যেক গ্রামে একটী করিয়া গোচারণের মাঠ রাখিতে হইবে। কসাইকে গোরু বিক্রয় করা একদম বন্ধ করিতে হইবে। প্রাচীন কালের মত গোমাতাকে যত্ন এমন কি পূজা পর্য্যন্ত করিতে হইবে। এইরূপে শ্রদ্ধাবুদ্ধির উপর গোপালন প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত না হইলে বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব লোপ বহু বিলম্বিত হইবে না। বাঙ্গালী জাতি যে আজ লাখে লাখে মরিতেছে, খাদ্যাভাব, —শিশুর ভোজ্য গোদুগ্ধের অভাবই তাহার প্রধান কারণ। খাদ্যাভাবেই আজ বাঙ্গালী জাতি মরিতে বসিয়াছে—রোগ শুধু একটা উপলক্ষ মাত্র। অতএব বাঙ্গালী, সাবধান! যদি বাঁচিতে চাও, তবে তোমার সেই প্রাচীন কালের আচার ব্যবহার পুনঃ প্রবর্ত্তন কর! আবার গৃহী হও। সহরবাসী হইয়া লক্ষ্মী ছাড়া হইও না। পল্লীবাসী হও, গোলক্ষ্মীকে আদর যত্ন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার উপায় কর; পল্লীগৃহে লক্ষ্মীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা কর।

জাপানে ঔষধের ব্যবসায়।—

জাপানীরা অতি উদ্যমশীল জাতি। জাপানী সভ্যতা, জাপানের উন্নতির বয়স যেমন অল্প, জাপানীদের উদ্যমশীলতাও তদ্রূপ সেই বয়সের উপযোগী। আমরা একখানি জাপানী সাময়িক পত্র হইতে জাপানীদের এই গুণের একটুখানি পরিচয় সঙ্কলন করিয়া দিলাম। পাঠকেরা দেখিবেন, জাপানের নিকট আমাদের শিক্ষনীয় অনেক বিষয় রহিয়াছে। যুদ্ধের সময় চারিদিকের বাণিজ্যে যখন ব্যাঘাত উপস্থিত হইল, তখন জাপানী গবর্ণমেণ্ট চিন্তান্বিত হইয়া উঠিলেন। জার্ম্মানী হইতে জাপানে প্রচুর ঔষধ আমদানী হইত। যুদ্ধ বাধিবা মাত্র জার্ম্মানী হইতে সকল প্রকার পণ্য দ্রব্যের বিদেশে রপ্তানী বন্ধ হইয়া গেল। জার্ম্মানী হইতে জাপানে ঔষধের আমদানী বন্ধ হইলে, এবং সাধারণ ভাবে ঔষধাদির মূল্য বৃদ্ধি হইলে, জাপানী জাতির স্বাস্থ্য তদ্দ্বারা কি পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধানের জন্য জাপানী গবর্ণমেণ্ট একটী কমিটির নিয়োগ করিলেন। এই কমিটির কার্য্যে সাহায্যের জন্য, কমিটিকে সমস্ত তথ্য যোগাইয়া দিবার জন্য টোকিয়ো এবং ওসাকা নগরের প্রধান প্রধান ঔষধ ব্যবসায়ীরা ঔষধের ব্যবসায় সংক্রান্ত সকল বিবরণ সংগ্রহের জন্য নিজেরা একটী কমিটি গঠন করিলেন। তার পর সরকারী কমিটির কার্য্য শেষ হইল; গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগৃহীত হইল। কিন্তু বেসরকারী কমিটির কার্য্য তখনও শেষ হইল না। সরকারী কমিটিকে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিবার পরও ঔষধের ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনোপযোগী সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য এই বেসরকারী কমিটি স্থায়ী হইয়া গেল। কমিটির কার্য্যের সুবিধার জন্য ঔষধ ব্যবসায়ীরা অবিলম্বে এক লক্ষ ইয়েন চাঁদা তুলিয়া দিলেন। কমিটি এখন খুব ভাল কাজ করিতেছেন। জাপানীরা কেবল নিজ দেশের ঔষধের ব্যবসায় সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়াই নিশ্চিত হন নাই। বড় বড় জাপানী আর্ম্মের প্রতিনিধিরা জার্ম্মানী, ফ্রান্স, আমেরিকা সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে গিয়া ঔষধ ব্যবসায় সংক্রান্ত সকল তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। একজন জাপানী প্রতিনিধি প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঔষধ প্রস্তুত সম্বন্ধে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য দেশ সুইজারল্যাণ্ড খুব অগ্রসর হইয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে ঔষধ প্রস্তুত বিষয়ে জার্ম্মানী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহার পরেই সুইজারল্যাণ্ডের স্থান। সকল দেশের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া জাপানীরা নিজেদের দেশের ঔষধ প্রস্তুত করার ব্যাপারের উন্নতি করিতে উৎসুক হইয়াছেন; সকল জাপানী ঔষধ ব্যবসায়ীরা মিলিত হইয়া প্রচুর মূলধন সরবরাহ করিয়া বড় বড় ঔষধের কারখানা স্থাপনে উদ্যত হইয়াছেন।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৯ম বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ সাল { ৮ম সংখ্যা

ধূমপানের অপকারিতা।

লেখক—শ্রীযোগেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মদ্যের ন্যায় গঞ্জিকা চরসাদির ধূমপানেও এদেশের সহস্র সহস্র লোক বহুকাল হইতে বিশেষ ভাবে অভ্যস্ত। কি নগরে কি পল্লীতে সর্ব্বত্রই ধূমপায়ীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাও যে দেশ উৎসন্নের দিকে ধাবিত হওয়ার একটী কারণ, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ধূমপান নিবারণার্থ বিশেষরূপে চেষ্টিত হওয়া দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য; নতুবা দেশোন্নতিকর অন্যবিধ সকল কর্ম্মে আপ্রাণ চেষ্টা করিলেও, দেশের দুরবস্থা সম্পূর্ণরূপে অপনোদিত হইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

মদ্য-পায়ীদের মত গঞ্জিকা চণ্ডুসেবিগণও রোগ দৈন্যের হস্ত হইতে কখনও নিস্তার পায় না। এমন লোক আছে, যাহারা সকল প্রকার মাদক দ্রব্য সেবনেই বিশেষ পটু। আবার কেহ কেহ যখন সুরা-দেবীর অর্চ্চনায় অহরহঃ ইচ্ছানুরূপ অর্থব্যয় করিতে করিতে, অভাব পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা অল্প পয়সার নেশা গঞ্জিকাদি সেবনে অভ্যস্ত হইয়া থাকে। নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেই গঞ্জিকা-চরসাদি সেবীর সংখ্যাই অধিক বটে; কিন্তু এইরূপ নেশার বশবর্ত্তী উচ্চ শ্রেণীর লোকও কম দেখা যায় না। ধূমপানার্থ কত লোক যে কত অর্থ অপব্যয় করিয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ধূমপ-য়ীদের মধ্যে প্রায় সকলেই ভগ্নস্বাস্থ্য। যাহারা অর্থ ও স্বাস্থ্য উভয়ই এইরূপে বিনষ্ট করে, তাহা সদাসর্ব্বদাই অশেষ কষ্টে কালাতিপাত করিয়া থাকে।

গঞ্জিকা—এদেশে গাঁজার প্রচলন ক্রমশঃই যেরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে বাস্তবিকই আতঙ্কিত হইতে হয়। ইহা তামাকের ন্যায় সস্তা দরে বিক্রীত হইলে বুঝি গাঁজাখোরদের আহ্লাদের সীমা থাকিত না; কারণ, অতি সহজেই ও সত্বর তাহাদের দলপুষ্টি হইত। পঙ্গপালের ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে প্রতিনিয়ত কত লোক যে গাঁজার আড্ডায় মিশিয়া গাঁজার নেশায় মজগুল থাকিত ও দিন দিন আরও কত লোককে এই পথের পথিক করিত, তাহা কে বলিতে পারে? চড়া দরে বিক্রীত হওয়াতেও, গাঁজাখোরের অভাব নাই; সস্তা হইলে ইহা দ্বারা না জানি কতই অনর্থ সংঘটিত হইত!

সুলেখক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লিখিয়াছেন, গাঁজা ও অহিফেনের ব্যবহারও দিন দিন বাড়িতেছে বই কমিতেছে না; বিশেষতঃ এ বিষয়ে বঙ্গদেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিয়াছে; বৎসর বৎসর আবগারী বিভাগের আয় দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইতেছে। ইহা যে দেশের পক্ষে কিরূপ অশুভকর তাহা দেশহিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিবৃন্দ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন।

যাহারা গঞ্জিকা সেবনে বিশেষ পটু তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই হাঁপানি, রক্তামাশয় প্রভৃতি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া অশেষ কষ্টে কাল যাপন করিয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহা দেখিয়া শুনিয়াও অনেকে পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। যাহা সেবনে কোনও লাভ নাই, কেন যে তাহাতে লোকের অত্যাসক্তি জন্মে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণ তাহা বলিতে পারেন।

আজকাল এমন গ্রাম দেখা যায় না, যেখানে দুই একটা গাঁজার আড্ডা না আছে। এরূপ শুনা যায় যে, কোন কোন আড্ডায় গাঁজাখোরগণ সারারাত্রি বিকট চীৎকারে তান-লয়হীন অশ্রাব্য সঙ্গীতে নিরীহ পল্লীবাসীদের নিদ্রার ব্যাঘাত ও অন্যবিধ অসুবিধা জন্মাইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইদানীং কোন কোন ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট ব্যাপারেও গঞ্জিকা স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। অধিকাংশ ভণ্ড সন্ন্যাসীই গাঁজায় বিভোর হইয়া থাকে, ইহা অনেকেই জানেন; কিন্তু হরি-সংকীর্ত্তন কালেও যে গায়কদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই তামাক ও কেহ কেহ গঞ্জিকা সেবন করিয়া বক-ধার্ম্মিকের পরিচয় দিয়া থাকে, তাহা বোধ হয় অনেকেই বিদিত নন। গান হইতে থাকে, ঘন ঘন তামাক ও মাঝে মাঝে গাঁজা গায়ক ও শ্রোতাদের তৃপ্তি সাধন করিতে থাকে, গানের আসর তামাক গাঁজার দুর্গন্ধময় ধূমে ভরিয়া যায়। যিনি এইরূপ বীভৎস দৃশ্য দেখিয়াছেন, তিনিই মনঃকষ্ট পাইয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আজ কাল নিরীহ গ্রামবাসীগণ হরিলুট দিতে ইচ্ছা করিয়া গাঁজাখোরদিগকে গাঁজা-দিতে না চাহিলে, তাহাদের পক্ষে উক্ত কর্ম্ম সুচারু রূপে সম্পন্ন করা অসাধ্য হইয়া থাকে। ইহার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

একবার ধামরাই ৺ মাধবের আঙ্গিনায় সুগায়ক ও সদুপদেষ্টা শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় কীর্ত্তন গান করেন। সেই সময় দুইটী ভদ্রলোকের হুঁকায় তাম্রকূট সেবন ও জনৈক বালকের চুরুটের ধূমপান সন্দর্শনে তিনি বড়ই দুঃখ প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহারা লজ্জায় অধোমুখ হন এবং গান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সকলেই ধূমপানে বিরত থাকেন। সেই সময়ে যদি তিনি কাহাকেও গঞ্জিকা সেবনে প্রবৃত্ত দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে না জানি কতই মর্ম্মাহত হইতেন। এইরূপ সৎ প্রকৃতির লোক নগরে পল্লীতে বিদ্যমান থাকিলে, সম্ভবতঃ লোকের এই কুপ্রবৃত্তি অনেকাংশে লোপ পাইত।

গাঁজায় একবার আসক্তি জন্মিলে, উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আর সম্ভাবনা থাকে না। গাঁজাখোরগণ যদি সময়মত গাঁজা না পায়, তবে তাহারা হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে। একদা আমার স্বর্গীয় পিতামহ মহাশয় কোনও কার্য্য ব্যপদেশে তারাসের জমিদার বাটী রওনা হইয়াছিলেন, তাঁহার মোট-বাহক ছিল, ভাল লোক অভাবে, এক গাঁজা-খোর। উহার সঙ্গে সর্ত্ত ছিল, চাহিবামাত্রই গাঁজা দিতে হইবে। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে এক মেঠো পথে লোকটী হঠাৎ গাঁজা চাহিয়া বসে এবং তৎক্ষণাৎ উহা না পাইয়া পথের উপরেই শুইয়া পড়ে। তখন লোকটীকে লইয়া তিনি মহা মুস্কিলে পড়িলেন। ঠিক সেই সময়ে একটী বলিষ্ঠা স্ত্রীলোক গোময় সংগ্রহার্থ তথায় উপস্থিত হন। ঘটনা অবগত হওতঃ নানা কৌশলে লোকটীকে তাঁহার সঙ্গে পথ চলিতে বাধ্য করেন। গ্রাম্য বাজারে উপস্থিত হইয়া লোকটী তাঁহার নিকট হইতে গাঁজার দাম আদায় করে ও সন্নিহিত দোকান হইতে তাহা ক্রয় করিয়া পূর্ণ মাত্রায় এক ছিলিম খাইয়া হৃষ্ট চিত্তে তাঁহার সঙ্গে হাঁটিতে থাকে।

গঞ্জিকাসেবিগণ স্বাস্থ্যসুখ উপভোগে ত বঞ্চিত থাকেই, সাংসারিক অবনতি লক্ষ্য করিলেও কিছুতেই উহার

প্রতিবিধান করিতে পারে না। চালার খড়, পরিধানের বস্ত্র এবং সবচেয়ে বিশেষ প্রয়োজনীয় খাইবার চাউল-ডাইলের সংগ্রহ করাও এই শ্রেণীর লোকের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। ইহারা নিজেদের কিংবা পরিবারের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত ততটা চিন্তিত হয় না, যতটা গঞ্জিকার জন্য হইয়া থাকে।

সিদ্ধি—গঞ্জিকাসেবিগণ যখন গাঁজা না পায় তখন সিদ্ধিপাতার (ভাঙ্গের) ধূমপান করিয়া থাকে। ইহার নেশা আরও উৎকট। ইহাতে অল্পদিনেই শরীরের বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে।

চণ্ডু-চরস—কোন কোন অঞ্চলে চণ্ডু-চরসের রীতিমত প্রচলন আছে। যাহারা এরূপ বদ নেশার বশবর্ত্তী হইয়াছে, তাহারা একেবারে মনুষ্যত্ব-হীন হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাজকর্ম্মে লিপ্ত থাকা ইহাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। তবে দেশে গাঁজাখোরের তুলনায় চণ্ডু চরস-সেবীর সংখ্যা কম। কিন্তু তাই বলিয়া এবিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন বাঞ্ছনীয় নহে। এই পাপ যাহাতে দেশ হইতে চিরকালের নিমিত্ত বিদূরিত হয় তাহা করা দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তিবৃন্দের একান্ত কর্ত্তব্য।

তামাক—এদেশে সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের মধ্যে তামাকের প্রচলন খুব বেশী। তামাকের এমনি আশ্চর্য্য ক্ষমতা যে, যাহারা মদ গাঁজা ইত্যাদির বশীভূত, তাহার ত ইহার অনাদর কখনই করে না, যাহারা—অন্য কোন নেশায় আসক্ত নয়, তাহাদের মধ্যেও অনেকে ইহার পরম ভক্ত। ইহা মদ, গাঁজা প্রভৃতির ন্যায় অনিষ্টকর না হইলেও, তিল তিল করিয়া মানব দেহে বিষ ক্রিয়া করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, হুঁকার নলে (নৈচায়) যেরূপ ময়লা জমিয়া থাকে, তাম্রকূট-সেবীর গলনালীতেও তদ্রূপ ময়লা সঞ্চিত হয়। কথাটি কত দূর সত্য বিশেষজ্ঞগণ তাহা বলিতে পারেন।

বহুকাল হইতেই এদেশবাসী অতিথি-অভ্যাগত-দিগকে তামাক দেওয়া আদর-আপ্যায়নের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যাঁহার বাড়ীতে কেহই তামাক খায় না, তাঁহাকেও ভদ্রতার খাতিরে উহার সরঞ্জাম রাখিতেই হয়। কিন্তু তামাক খায় না এরূপ লোকের সংখ্যা এদেশে খুব কম।

অধিকাংশ তাম্রকূটসেবীকে এক হিসাবে উচ্ছিষ্ট-ভোজনকারী বলা যায়। বিশেষতঃ এক হুঁকায় ও এক চুরুটে বহুলোক ধূম পান করিলে একের মুখের লালা প্রভৃতি অন্যের মুখে সংক্রামিত হইয়া বহু রোগের সৃষ্টি করিতে পারে। অতএব এ প্রথা বিশেষ অনিষ্ট-জনক। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ সিংহ বর্ম্মা মহাশয়ও ঠিক এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন—"এক হুঁকায় ও এক চুরুটে বহু লোক ধূমপান করিয়া থাকেন,—ইহাতে যে কত রোগ সংক্রামিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তাই নাই। যথা, কাহারও হয় ত মুখে নানা প্রকার ঘা ও দাঁতে (gum) ব্যায়রাম আছে,—তাহাদের হুঁকায় তামাক খাইলে ঐ সমস্ত সাংঘাতিক ব্যায়রাম সংক্রামিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।" (স্বাস্থ্যসমাচার কার্ত্তিক ১৩২৬ সন)—একথা বর্ণে বর্ণে সত্য হইলেও, ইহার বিলোপসাধন অতিশয় কঠিন। সমাজের নেতাগণ এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে সুফল প্রাপ্তির আশা করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে ছাত্রদের মধ্যে তামাক-খোর কদাচিৎ দৃষ্ট হইত। আজ কাল তাহাদের মধ্যেও অনেকে গোপনে, কেহ কেহ প্রকাশ্যে, এবং কৃষকদের কচি কচি ছেলেরাও সর্ব্বসমক্ষেই নিঃসঙ্কোচে ধূমপান করিয়া থাকে। ভদ্র যুবক সম্প্রদায় বয়োবৃদ্ধগণের সমক্ষে ধূমপান করা লজ্জা জনক বিবেচনা করে বলিয়া কিংবা অন্য কোন কারণে, সিগারেট্ বিড়ির প্রতি বিশেষ রূপে আসক্ত। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু B. Sc. মহাশয় লিখিয়াছেন—"..... it (cigarette) is doing incalculable mischief among young people including large number of students ....." (Modern Review Sept. 1920) বাস্তবিক ইহা হুঁকায় তামাক খাওয়ার চেয়েও ঘোর অনিষ্টকর। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ছাত্রগণও এইরূপ কু-অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। হাঁপানি প্রভৃতি কঠিন ব্যাধি বাল্য কালে

ধূমপানে অভ্যস্ত হওয়ার ফলেও হয়। অতএব বালকদিগকে তামাক-সিগারেট প্রভৃতির ধূমপানে নিবৃত্ত করিবার জন্য সজ্জন মাত্রেরই বিশেষ যত্নশীল হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। দেশবাসী যে ভাবে তামাক ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাতে ইহার প্রচলন একেবারে বন্ধ করা অসম্ভব বটে, কিন্তু বালকদিগকে এই কু-অভ্যাসের হাত হইতে মুক্ত করা সাধ্যাতীত বলিয়া মনে হয় না।

যে অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইলে স্বাস্থ্য, সম্মান, অর্থ প্রভৃতি সকলই বিনষ্ট হয়, স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ যাহার অনিষ্টকারিতা তারস্বরে ঘোষণা করেন, তাহাতে আসক্ত হওয়া মানব মাত্রেরই একান্ত অকর্ত্তব্য। স্বাস্থ্যই সুখের মূল। তাহা যখন ধূমপানে নষ্ট হয়, তখন উহার বশবর্ত্তী হইয়া কষ্টে কাল যাপন করা ও পরিবারের দুঃখের কারণ হওয়া কাহারও উচিত নহে। যে সকল দেশহিতকামী লোক স্বাস্থ্যরক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা গাঁজা, চরস প্রভৃতি ধূমপানের প্রতিকারার্থ বিশেষ যত্নবান হ'ন, তাঁহাদের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

হিন্দু ডুবিল!

লেখক—ডাক্তার শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জনপদ ধ্বংসের কারণ ও লক্ষণ।

আমাদের প্রাচীন আর্য্য মহর্ষিগণ জনপদ ধ্বংসের কারণ ও লক্ষণ সম্বন্ধে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সকল অমূল্য তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কি আশ্চর্য্যের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে আমরা ঠিক সেই সেই কারণ ও লক্ষণগুলিই দেখিতে পাইতেছি। চরক সংহিতায় মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন :—

* * * তদ্‌যথা বায়ুরুদকং দেশঃ কাল—।" বিমানস্থান, ৩য় অধ্যায়। অর্থাৎ বায়ু, জল, দেশ ও কালের বৈগুণ্য বশতঃই জনপদ ধ্বংস হইয়া যায়।

"ঋতু বিষমমতি স্তিমিতমতি——"

ঋতুবিষম অর্থাৎ যে ঋতুতে যেরূপ বায়ু হওয়া উচিত তাহার অন্যথা গুণযুক্ত, অতিশয় গতিশীল, অতি শীতল, অতি উষ্ণ, অতি ভীষণ ধ্বনিবিশিষ্ট, অতি ঘূর্ণিত এবং অনুপকারী গন্ধ ধূলি ও ধুম দ্বারা উপহত।

উদকং খল্বস্যর্থ বিকৃত গন্ধ বর্ণরস স্পর্শবৎ——" ঐ

অর্থাৎ জল যদি অত্যন্ত বিকৃত গন্ধ, বর্ণ রস ও স্পর্শ বিশিষ্ট হয়, ক্লেদবহুল হয়, অপ্রতিকর হয়, তবে সেই জল গুণহীন অর্থাৎ পীড়াকর বলিয়া জানিবে।

দেশং পুনঃ প্রকৃতি বিকৃতবর্ণ গন্ধ রস স্পর্শং ক্লেদবহুল মুপসৃষ্টং সরীসৃপব্যালানসকশলভমক্ষিকামূষিকোলূক শ্মাশনিক শকুনি জম্বুকাদিভিস্তৃণোলুলোপঘন বন্তং——"

অর্থাৎ যে দেশের স্বাভাবিক বর্ণ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ বিকৃত হইয়া যায়, যে দেশে ক্লেদবহুল হয় সরীসৃপ, হিংস্রজন্তু, মশক, পতঙ্গ, মক্ষিকা, মুষিক, পেচক, কাক, শকুনি প্রভৃতি শ্মাশনিক পক্ষী ও শৃগালাদি যেখানে অত্যধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, তৃণ উলুবন, লতা ও গুল্মাদি দ্বারা যে দেশ ব্যাপ্ত হইয়া যায়, যে দেশের শস্যের অবস্থা পূর্ব্ববৎ না থাকিয়া শুষ্ক বা নষ্ট হইয়া যায়, যেখানে জনপদবাসিগণের ধর্ম্ম, সত্য, লজ্জা, আচার ও শীলতা প্রভৃতি গুণ নষ্ট হইয়া যায়, জলাশয় সমূহ শুকাইয়া যায়, যে দেশে উল্কাপাত, বজ্রাঘাত, ও ভূমিকম্প হয়, সেই দেশ অনিষ্টকর বলিয়া জানিবে।

"কালস্তু খলু যথর্ত্তু লিঙ্গান——"

অর্থাৎ কাল যদি নির্দ্দিষ্ট ঋতু-লক্ষণের বিপরীত

লক্ষণযুক্ত হয়, অথবা সেই ঋতু-লক্ষণ যদি অত্যধিক বা অতি অল্প লক্ষিত হয়, তবে সেই কাল অহিতকর বলিয়া বুঝিবে।

"ইমানেবংদোষযুক্তাংশ্চতুরোভাবান্—।" ঐ

অর্থাৎ উক্তরূপ দোষযুক্ত বায়ু, জল, দেশ ও কাল এই চারিটি বিষয়কে জনপদ ধ্বংসের কারণ বলিয়া জানিবে।

জনপদ ধ্বংসের বিষয়ে এই সমস্ত কারণ অবগত হইয়া, অগ্নিবেশ পুনর্ব্বার ভগবান্ আত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! বায়ু প্রভৃতির যে বিগুণতা দ্বারা জনপদ ধ্বংস হয়, সেই বৈগুণ্যের কারণ কি?

"তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ; সর্ব্বেষামপ্যগ্নিবেশ * * তদ্‌যথা যদা বৈ দেশনগরনিগমজনপদপ্রধানা ধর্ম্মমুৎক্রম্যাধর্ম্মেণ প্রজাং প্রবর্ত্তয়ন্তি, তদাশ্রিতোপাশ্রিতাং পৌর জনপদা ব্যবহারোপজীবিনশ্চ তম ধর্ম্মমভিবর্দ্ধয়ন্তি—" ঐ

ভগবান্ আত্রেয় তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, হে অগ্নিবেশ! বায়ু প্রভৃতি সকল পদার্থেরই যে বিগুণতা উপস্থিত হয়, তাহার কারণ অধর্ম্ম। সেই অধর্ম্মের কারণ অসৎ কর্ম্ম এবং সেই অধর্ম্ম ও অসৎ কর্ম্মের মূল কারণ প্রজ্ঞাপরাধ। যখন দেশ নগর নিগম ও জনপদের প্রধান ব্যক্তিগণ ধর্ম্ম অতিক্রম পূর্ব্বক অধর্ম্ম দ্বারা প্রজাপালন করেন, তখন তাঁহাদের আশ্রিত উপাশ্রিত পৌর ও জানপদবর্গ এবং ব্যবহারজীবিগণ সেই অধর্ম্মের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সেই অধর্ম্মের জন্য শীঘ্রই সে দেশ হইতে ধর্ম্ম অন্তর্হিত হয়। এই রূপে ধর্ম্মশূন্য অধর্ম্ম-প্রধান দেশবাসিগণের সম্বন্ধে ঋতুসমূহ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য যথা সময়ে বর্ষণ হয় না, অথবা একেবারেই বর্ষণ হয় না, বা অতিরিক্ত বর্ষণ হয়, বায়ু সম্যক রূপে প্রবাহিত হয় না, ভূমি বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, জল শুষ্ক হইয়া যায় এবং ওষধি সকল স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং স্পর্শ ও পানাহারের দোষে জনপদ ধ্বংস হইয়া যায়।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে উপরিউক্ত সমস্ত লক্ষণ ও কারণগুলিই দৃষ্ট হইতেছে। বায়ুর বিকৃতি হইয়া গিয়াছে ও বায়ু বিঘূর্ণিত হইয়া নানা স্থান সময়ে সময়ে উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে, দেশের সর্ব্বত্রই বিশুদ্ধ জলের অভাব দৃষ্ট হয়, জল দূষিত হইয়া গিয়াছে। দেশের উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাইতেছে। ঋতুর ও রীতিমত বিকাশ দৃষ্ট হয় না। এতদ্ভিন্ন দেশে মশক, মক্ষিকা, ইন্দুর ইত্যাদি দ্বারা ম্যালেরিয়া, আন্ত্রিক জ্বর, আমাশয়, ওলাউঠা এবং প্লেগ দিন দিন ভীষণ ভাবে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

ম্যালেরিয়া এবং তাহার প্রতিকার।

লেখক—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঘোষ বি-এ

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"; অর্থাৎ শরীরই ধর্ম্ম সাধনে সর্ব্বপ্রধান সোপান। ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে প্রথমেই তদ্বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

"স্বাস্থ্যং হি পরমং ধনম্।" স্বাস্থ্য মানব জীবনে দেবদত্ত ধন। শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে সংসার সুখের হয় এবং স্বাস্থ্যহীন মানব শুধু শরীরের ভার বহন করিয়া থাকে। স্বাস্থ্যহীন হইয়া সিংহাসনে বাস করার চেয়ে নীরোগ, সবল, সুস্থ দেহ লইয়া সামান্য অবস্থায় বাস করাও বাঞ্ছনীয়।

ম্যালেরিয়া শব্দটি ইটালিয়ান; অর্থ দূষিত বায়ু, পূতিগন্ধময় বাষ্প। ম্যালেরিয়া বিষ হইতে যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাকে ম্যালেরিয়া জ্বর বলে। বঙ্গদেশে এবং

ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে এই জ্বরের বিষয় অল্পাধিক সকলেরই জ্ঞান আছে। বঙ্গদেশের ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের সরকারী স্বাস্থ্য বিবরণে সে দিন দেখিলাম যে, ১৯১৩ অপেক্ষা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এই বিষম জ্বরে মৃত্যুসংখ্যা এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার বেশী। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুসংখ্যা ৯২৫৫৪৬ এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ১০৬১০৪১। প্রতি বৎসরে যদি মৃত্যুসংখ্যা এই হারে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে বঙ্গের এবং অন্যান্য ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থানের দশা কি ভয়াবহ, শোচনীয় হইবে, তাহার ধারণা করা সুকঠিন। আজ এই বঙ্গদেশ ম্যালেরিয়ার ডিপো। বঙ্গভূমি, এক কথায় এ "সোণার বাংলা", ম্যালেরিয়ায় আজি শ্মশানে, দৈত্য-দানবের বিলাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। বঙ্গের কোন কোন জায়গায় ম্যালেরিয়ার এত প্রকোপ, এত অত্যাচার, এত আক্রমণ যে ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। বঙ্গের সে সব স্থানে দেশের ভাবী উজ্জ্বল রত্ন যুবকগণের সুস্থ, সবল, তেজপূর্ণ, কমনীয় দেহ আজি ঘুণধরা কাঁচা বাঁশের ন্যায় জীর্ণ শীর্ণ, ম্লান, অকর্ম্মণ্য এবং অন্তঃসারশূন্য। ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপে আজি তাহাদের শরীর,—ঈশ্বরদত্ত স্বাস্থ্য—ব্যাধি-মন্দির। ক্রমান্বয়ে তাহাদের উচ্চাভিলাষ চলিয়া যাওয়ায় আজি তাহারা পরম সমাদরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেও অভিলাষী। তাহারা কোথায় আজি পূর্ণোদ্যমে, পূর্ণোৎসাহে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, সংসারের বিমলানন্দ উপভোগ করিবে—না, তাহারা আজ বৃদ্ধাবস্থা-প্রাপ্ত, হীনপ্রভ, নিরুৎসাহ, অশেষ যন্ত্রণার অধিকারী। ম্যালেরিয়ার এই ভীষণ প্রকোপ অল্পাধিক সকলেই অবগত আছেন। অলমতি বিস্তরেণ।

কিন্তু ম্যালেরিয়া কোথা হইতে আসে, তাহার প্রতিকার কি;—এক কথায়, ম্যালেরিয়া তত্ত্ব সম্যক্ শিক্ষা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। ইহার প্রতীকারের অনেক সহজ উপায় থাকা সত্ত্বেও, আমরা অনেকে তাহা অবগত নই। সুতরাং তদ্বিষয়ক প্রবন্ধ অনেকের হিতসাধন করিবে এই বিবেচনায় ইহার অবতারণা সঙ্গত মনে করিতেছি।

ম্যালেরিয়া-বিষ হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তি, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতঃপর ম্যালেরিয়া বিষটি কি তাহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়টি আজিও সম্যকরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। তবে ম্যালেরিয়া-বিষের সম্বন্ধে অনেক খ্যাতনামা চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানবিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত প্রচলিত আছে এবং এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অনেক মতদ্বৈধ আছে।

(১) গলিত উদ্ভিদ্ হইতে যে পূতিগন্ধময় বাষ্প উদ্গত হয়, তাহা এই জ্বরের প্রধান কারণ। অনেক স্থানে বিশেষতঃ জলাশয়ে যে বৃক্ষ লতা গুল্ম কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইতে বিশেষ নির্দ্দিষ্ট তাপে এবং বিশেষ জলীয় বাষ্পের সমাবেশে যে বাষ্প নির্গত হয়, তাহাই ম্যালেরিয়ার কারণ বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(২) Electric Theory (বৈদ্যুতিক মত)—স্থান বিশেষে বিশেষ বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভাবে এই জ্বরের আবির্ভাব।

(৩) Subsoil Water Theory—ভূগর্ভস্থ স্তর-সমূহে জল জমিয়া, পরে শুষ্ক হইয়া, তথা হইতে এক প্রকার বাষ্প নির্গত হয়—তাহাই এই জ্বরের কারণ।

(৪) Bacteria (ব্যাকটিরিয়া) নামক উদ্ভিদাণু এই জ্বরের কারণ।

(৫) Bacillus (ব্যাসিলাস্) নামক জীবাণু এই রোগের কারণ।

এ ভাবে অনেক মতদ্বৈধ দৃষ্টিগোচর হয়। তবে কোন্‌টা সমীচীন তাহা সুস্থির করা সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এই পর্য্যন্ত উপলব্ধি হয় যে, একপ্রকার জীবাণু গলিত পদার্থের সঙ্গে মিলিয়া একপ্রকার বিষের সৃষ্টি করে; তাহাই ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ।

এখন দেখা যাউক, ম্যালেরিয়া কোন কোন জায়গায় বহু পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

(১) পচা খানা, ডোবা এবং বিল (২) পুকুর হইতে জল নির্গত হইয়া শুষ্ক হইলে (৩) শুষ্ক ঘাস, খড়, জঙ্গলপূর্ণ স্থান বর্ষায় জলপ্লাবিত হইলে (৪) যে পর্ব্বতে

প্রস্তর সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থিত তদভ্যন্তর ভিন্নভিন্ন পরিপূর্ণ হইলে (৫) কোন ভূমি নূতন কর্ষিত হইবার সময় (৬) প্রস্তর ও বালুকাময় স্থান উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থে পূর্ণ থাকিলে (৭) এবং বর্ত্তমান প্রচলিত সিদ্ধান্ত অনুসারে যে স্থানে মশকের গতিবিধি অত্যন্ত বেশী, এইরূপ অবস্থাগত স্থানসমূহ ম্যালেরিয়া জ্বরের আবাস বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল, ম্যালেরিয়াক্রান্ত জল বায়ুই ম্যালেরিয়ার বিষে পরিপূর্ণ। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতমণ্ডলী ও বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বহু গবেষণার ফলে স্থির করিয়াছেন যে, এই মত ভ্রমাত্মক এবং এক প্রকার জীবাণুই ম্যালেরিয়ার উৎপাদক।

নানা পরীক্ষার পর Sir Ronald Ross (স্যর্ রোণাল্ড রস্) ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্বন্ধে তাঁহার প্রণীত পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, জীবাণুই ম্যালেরিয়ার হেতু। এই জীবাণু প্রথমতঃ anopheles (অ্যানো-ফেলিস্) জাতীয় মশক কুলকে এবং Culex (কিউলেক্স) জাতীয় অপর মশককুলকে আক্রান্ত করে। পরে প্রথম জাতীয় মশককুল মানব দেহ দংশন করিয়া এবং দ্বিতীয় প্রকার মশককুল পক্ষীদেহ দংশন করিয়া ম্যালেরিয়া বিষ চতুর্দ্দিকে বিস্তার করে। যেরূপে এক চারিদিকে প্লেগ বিস্তার করে, সেরূপে মশক ম্যালেরিয়া বিস্তার করে। ম্যালেরিয়াপূর্ণ নালা প্রভৃতিতে মশক বহু পরিমাণে দেখা যায়। শৈশবে ইহারা জলচর কৃষ্ণবর্ণ পোকা, বড় বড় পিলের ন্যায় দেখিতে, পরে বড় হইলে ইহারা চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়ায়। এই ম্যালেরিয়া বিষ আমরা নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি।

কি ভাবে ম্যালেরিয়া বিষের উৎপত্তি, কি করিয়া এই বিষ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়, তাহার যথাযথভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এখন ইহার প্রতীকারের কি উপায় আছে তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

অনেকে অনেক ভাবে ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা সাধারণের জ্ঞাত থাকা বিধেয়।

(১) স্বাস্থ্যবিদ্যাবিশারদ মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু সি-আই-ই মহোদয় বলেন যে, ম্যালেরিয়া বিষে পূর্ণ জলাশয় প্রভৃতিতে বাসক পাতা নিক্ষেপ করিলে মশকের ডিম্ব নষ্ট হইয়া যায়, অথচ জল নষ্ট হয় না।

(২) Salvation Army (মুক্তিসেনা) কমিশনার মিঃ বুথ টাকার বলেন যে, পরীক্ষা দ্বারা সুস্থির হইয়াছে, ইউক্যালিপ্‌টাস্ বৃক্ষের বায়ু ম্যালেরিয়া বিষ নষ্ট করে। আজ কাল এই বৃক্ষের তৈলের ঘ্রাণ লইতে অনেক চিকিৎসক পরামর্শ দেন।

(৩) হংস মশক-ডিম্ব খায়। কাজেই ম্যালেরিয়া-ক্রান্ত দেশে হংস-পালন ম্যালেরিয়ার হাত হইতে কথঞ্চিত রক্ষা পাওয়ার কারণ, সন্দেহ নাই।

(৪) অনেকের মতে ম্যালেরিয়ার দেশে উচ্চ খাটে মশারি খাটাইয়া শয়ন করা বিধেয়। তাঁহাদের ধারণা ম্যালেরিয়া বিষ মশারির ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না।

(৫) কুইনাইন সেবন করিলে ম্যালেরিয়া কীটাণু মরিয়া যায়।

(৬) সুবিখ্যাত Dr. Bentley (ডাক্তার বেণ্টলি) বলেন যে, ম্যালেরিয়াক্রান্ত দেশে সুপ্রশস্ত খাল বহু পরিমাণে কাটিলে ম্যালেরিয়া-মুক্ত হওয়া যায়। গভীর জলাশয় এবং বেগবতী স্রোতস্বতী ম্যালেরিয়া নিবারক।

এই ভাবে আমরা বহু উপদেশ শুনি এবং বন্ধু বান্ধবদিগকে দিয়া থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয় অল্প লোকেই ইহার প্রতিকার সাধনে তৎপর। রোগে বিষম যন্ত্রণা ভুগিতে থাকি, তথাপি আমরা অতি সহজ উপায়ও অবলম্বন করি না। শুধু দেখিতে পাই এবং শুনিয়া থাকি ম্যালেরিয়ার একমাত্র ব্যবস্থা কুইনাইন সেবন। ইহা একটী প্রতিকার তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কুইনাইন সেবন করার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি অতি সহজ উপায় অবলম্বন করা

আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। কুইনাইন ম্যালেরিয়া কীটাণু ধ্বংস করে সত্য; কিন্তু ম্যালেরিয়ার ডিপোগুলির নাশে যথাসাধ্য চেষ্টা না করিলে শুধু কুইনাইন সেবনে কি ফল? আমাদের 'গোড়ায় গলদ'। কুইনাইন সেবন করিয়া আমরা ম্যালেরিয়ার সাময়িক উপশমে রত থাকি; কিন্তু অন্যান্য কারণ নিরাকরণে নিশ্চেষ্ট। এটা কম দুঃখের কথা নহে। কতকগুলি উপায় এত সহজ সাধ্য যে, ধনী দরিদ্র আমরা সকলেই অনায়াসে তাহা সম্পাদন করিতে পারি। স্বাস্থ্য অমূল্য ধন; স্বাস্থ্যবিহনে সংসার মরুভূমি, অসার, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। সুতরাং ম্যালেরিয়াক্রান্ত দেশবাসীদের সর্ব্বদাই কয়েকটি অনায়াসলব্ধ বিষয়ে মনঃ সংযোগ করতঃ তদ্বিষয়ে সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

ম্যালেরিয়া কীটাণু নাশের যে কয়েকটি মত লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তন্মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় অবলম্বন করা সকলের পক্ষেই বোধ হয় সম্ভবপর। এতদ্ব্যতীত অনেক উপায় আছে, তাহা আমরা সকলেই অবলম্বন করিতে পারি। ম্যালেরিয়া-ক্রান্ত স্থানের জল প্রায়ই দূষিত। এই জল প্রত্যহ সুসিদ্ধ করিয়া সেবন বিধেয়। পরে এই জল রুচি অনুসারে উষ্ণ ও শীতল ভাবে পান করা যাইতে পারে; এবং যাহাদের পক্ষে সম্ভব, এই সুসিদ্ধ জল ফিল্টার করিয়া পান করা অতি সঙ্গত। বাড়ীর চারিপাশে যে ডোবা, নালা বিদ্যমান, তাহা বদ্ধ করাই কর্ত্তব্য। যদি সে গুলি রাখার বিশেষ কোন আবশ্যকতা থাকে, তাহা হইলে যথাসাধ্য সে গুলি পরিষ্কৃত রাখা কর্ত্তব্য। যাহাতে তথায় গলিত উদ্ভিদ্ সঞ্চিত না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বাড়ীর চারি পাশের জঙ্গল পরিষ্কৃত রাখা বিধেয়। আবদ্ধ জল কোথাও না দাঁড়ায়, সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ম্যালেরিয়াপূর্ণ স্থানে প্রাতঃকালীন এবং সান্ধ্য শিশির অত্যন্ত অনিষ্টকর। যাহাতে কেহ সে সময়ে শিশিরে বাহির না হয়, সে বিষয়ে অভিভাবকের দৃষ্টি রাখা বিধেয়। ম্যালেরিয়া-দুষ্ট স্থানে দিবা-নিদ্রা অত্যন্ত অনিষ্টকর। এ ই কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা সহজ-সাধ্য। এতদ্ব্যতীত উপযুক্ত পরিমাণে অন্যান্য উপায় গুলিও সাধ্যানুসারে অবলম্বনীয়।

আশা করি, ম্যালেরিয়াক্রান্ত দেশবাসিগণ রোগের তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শুধু কুইনাইন সেবন করিয়া সাময়িক উপশমে শান্ত ও স্থির হইবেন না। ম্যালে-রিয়া বিষের আধার দূরীকরণে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইবেন। কুইনাইন মানব-দেহের কীটাণু নষ্ট করিতে সমর্থ বটে; কিন্তু চতুর্দ্দিকে ম্যালেরিয়া-কীটাণুর আবাস-ভূমি বিদ্যমান। তাহারা ত মানবদেহে প্রবেশ করিবেই এবং কুইনাইন তাহাদের ধ্বংস সাধন করিবে। এ ভাবে শুধু কুইনাইনের সেবক হইয়া থাকিলে কত কুইনাইন সেবন করিতে হয় ভাবিয়া দেখুন। অতি-রিক্ত কুইনাইন সেবনে শরীর সুস্থ, সবল ও তেজঃপূর্ণ রাখে কি না, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সুতরাং কেবল কুইনাইনের সেবক না হইয়া, ম্যালেরিয়া কীটাণুর বাসস্থান দূরীকরণে সচেষ্ট হইবেন। "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ।"

কান্ত-দর্শনের মূল কোথায়?

জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রুসিয়া দেশে কোনি-গ্‌সবার্গ নগরে কান্ত (Kant) নামে একজন বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে বইগুলি পৃথিবীময় বিখ্যাত। বাঙ্গালা সাহিত্যেও মধ্যে মধ্যে কান্ত-দর্শনের আলোচনা হয়।

কান্ত একজন ভুবন-বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন, এ খবর অনেকেই রাখিয়া থাকেন; কিন্তু কেমন করিয়া তিনি এত বড় দার্শনিক পণ্ডিত হইয়াছিলেন,—এমন সব অমূল্য গ্রন্থরাজি পৃথিবীকে উপহার দিয়া গিয়াছেন, সে খবর বড় একটা কাহাকেও লইতে দেখা যায় না। কান্ত-দর্শনের আলোচনা অনেক হইয়াছে এবং হইতেছে; সে আলোচনা করিবার অন্য অনেক লোক আছেন, এবং তাহার উপযুক্ত স্থানও অনেক আছে। আমরা এখানে কান্তের দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিবও না,—এবং ইহা সে আলোচনার স্থানও নহে। কিন্তু কান্ত দর্শনের মূল কোথায়, আমরা কেবল তাহারই আলোচনা করিব; কারণ, কেবল তাহাতেই আমাদের প্রয়োজন।

বস্তুতঃ, কান্ত যেরূপ অবস্থায়, যেরূপ আবেষ্টনের মধ্যে জন্মিয়াছিলেন, শৈশবে যেরূপ অবস্থায় তিনি লালিত পালিত হইয়াছিলেন, তাঁহার পিতা তাঁহাকে যেরূপ কার্য্যের উপযুক্ত ভাবিয়া তদনুরূপ শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সে সকল কথা বিবেচনা করিলে, তাঁহার এত বড় দার্শনিক হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

প্রুসিয়া দেশের কোনিগ্‌সবার্গ নগরে একটী ছোট্ট রাস্তা আছে, তাহার নাম Philoso pher's Walk—দার্শনিকের বেড়াইবার পথ। দার্শনিক ইম্যানুয়েল কান্তের অনুসরণ করিয়া এই রাস্তার ঐ রূপ নাম-করণ করা হইয়াছে। কান্তের মত দার্শনিক, মৌলিক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহার সময়ে ত কেহই ছিলেন না—তাঁহার তিরোভাবের পরেও বেশী জন্মান নাই। রাস্তাটী যে তাঁহারই স্মৃতিচিহ্ন বহন করিতেছে, তাহার একটু বিশেষ কারণ আছে। কান্ত তাঁহার সমস্ত জীবিত কাল ধরিয়া নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ বিকাল বেলা ঐ রাস্তায় ভ্রমণ করিতেন, এবং দীর্ঘ-নিশ্বাস টানিতে অভ্যাস করিতেন। দীর্ঘনিশ্বাস টানা ব্যায়ামের হিসাবে অভ্যাস করিতে তিনিই পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টান্ত বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বে ঐ উদ্দেশ্যে কেহ যে দীর্ঘনিশ্বাস টানিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছিলেন, এমন কোন খবর পাওয়া যায় না।

ইম্যানুয়েল কান্ত ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। এখন বটে চিকিৎসকেরা নিয়মিত ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস টানা সুস্থ থাকার সর্ব্ব প্রধান উপায় বলিয়া স্বীকার ও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন,—সকলকে ব্যায়ামের হিসাবে দীর্ঘনিশ্বাস লইতে উপদেশ দিয়া থাকেন,—কান্তের সময়ে বা তৎপূর্ব্বে কিন্তু এ তত্ত্ব কাহারও জানা ছিল না। খোলা হাওয়ায় ভ্রমণ করিতে করিতে দীর্ঘনিশ্বাস টানিতে অভ্যাস করিলে যে অনেক রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হওয়া যায়, কান্তই সর্ব্বপ্রথমে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেন এবং নিজের জীবনে তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে দেখাইয়া দেন। তিনি কেবল যে এই তত্ত্বটুকু আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা নয়; তিনি দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে উহা পালন করিয়াছিলেন। তাই আজ পৃথিবী কান্তের মত এত বড় একজন দার্শ-নিক পণ্ডিতকে বক্ষে ধারণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। নচেৎ কান্তের দশা কি ঘটিত, কে বলিতে পারে? হয় ত তিনি পৃথিবীতে চির অজ্ঞাত থাকিয়া অকালে জীবলীলা সংবরণ করিতেন। বাল্য

কালে তাঁহার স্বাস্থ্য মোটেই ভাল ছিল না,—দীর্ঘজীবী হইবার কোন লক্ষণই তাঁহার দেহে বিদ্যমান ছিল না। একমাত্র দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিতে অভ্যাস করার ফলেই তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন; কেবল মাত্র এই গুণেই তিনি চিন্তাশীল হইতে পারিয়াছিলেন, এবং নূতন নূতন মৌলিক দার্শনিক মতবাদের প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিতে অভ্যাস করার ফলে তাঁহার দেহ, মস্তিষ্ক, মন—সকল ইন্দ্রিয়ই পরিণতি লাভ করিতে পারিয়াছিল।

কান্তের পিতামাতা অতি সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন। জাতিতে মূলে তাঁহারা প্রুসিয়ান ছিলেন না। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষরা আদৌ স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী এবং জাতিতে স্কচ ছিলেন। তাঁহাদের বংশের নামও Kant ছিল না, ছিল Cant। দার্শনিক Emmanuel Kantই পূর্ব্ব Cant নাম পরিত্যাগ করিয়া Kant নাম গ্রহণ করেন।

কান্তের পিতা মুচির পেশা অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাহাও স্বাধীন ভাবে নহে—যাহারা ঘোড়ার চামড়ার সাজ তৈয়ার করিত, কান্তের পিতা সেই সকল দোকানে চামড়া কাটিয়া দিতেন।

তাঁহার সাত পুত্রের মধ্যে কান্ত একজন। তিনি ছাড়া অপর সকলেই বেশ সুস্থ, দৃঢ়কায় ও বলবান ছিলেন; তিনি একাই কেবল ছিলেন দুর্ব্বল ও রুগ্ন। জন্মের সময়ে কান্তের ওজন মাত্র আড়াই সের (পাঁচ পৌন) ছিল। তাঁহার দুর্ব্বল, রুগ্ন চেহারা দেখিলে সকলের চোখে জল আসিত। সকলেই বলিত, আহা! এ ছেলে কি বাঁচবে! প্রাচীন কালে গ্রীস দেশের অন্তর্গত স্পার্টা নগরে এই নিয়ম ছিল যে, কাহারও দুর্ব্বল রুগ্ন সন্তান জন্মিলে, তাহাকে লালন-পালন করা হইত না; মাতৃ ক্রোড় হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নগর হইতে কিছু দূরে একটা নির্দ্দিষ্ট পাহাড়ের চূড়ায় ঐ নবজাত শিশুকে ফেলিয়া দিয়া আসা হইত। সেখানে অনেক শকুনী, গৃধিনী, শিয়াল, কুকুর তৎক্ষণাৎ ঐ শিশুটিকে সাবাড় করিয়া ফেলিত। স্পার্টানদের বিশ্বাস ছিল যে, এরূপ রুগ্ন দুর্ব্বল শিশুর বাঁচিয়া থাকিবার কোন দরকার নাই; তাহারা দেশের ও সমাজের কোন কাজে লাগিবে না, কেবল অন্নধ্বংস করিয়া সমাজের পক্ষে ভার স্বরূপ হইয়া থাকিবে। যে সময়ে স্পার্টায় ঐ নিয়ম প্রচলিত ছিল, সে সময়ে কান্ত যদি স্পার্টা দেশে জন্মিতেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ যে তাঁহার শিশু-লীলা শেষ হইত সে কথা না বলিলেও চলে। তাঁহার মাথাটা ছিল প্রকাণ্ড—ধড়ের সঙ্গে কোন মতেই খাপ খাইত না। তাঁহার পা দুইটী ছিল অত্যন্ত সরু, বক্ষস্থল অতি দুর্ব্বল। আর তাঁহার একদিকের কাঁধ অন্য দিকের কাঁধের চাইতে এতটা উঁচু ছিল যে, তাঁহার এই অসমান কাঁধের দরুণ কুঁজোর মত তাঁহাকে বিকলাঙ্গ বলিলেও কোন দোষ হইত না।

পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহার এইরূপ চেহারা দেখিয়াই ত পিতামাতার চক্ষুস্থির হইয়া গেল। কিন্তু কি করেন,—নিজের সন্তানকে ত আর ফেলিতে পারেন না; কাজেই তাহাকে লালন-পালন করিতে হইল। কিন্তু সে ছেলের উপরে বাপ-মা বিশেষ কোন ভরসা করিতে পারিলেন না—মনে করিলেন, যত দিন তাঁহারা জীবিত থাকিবেন, ততদিন তাঁহাদের অবশেষে তাহার ভাইদের গলগ্রহ হইয়াই তাহাকে জীবন কাটাইতে হইবে।

কান্তের পিতামাতা দেখিলেন, তাহার দেহখানি এত ছোট যে, কোনরূপ ব্যবসা-বাণিজ্য করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব তাঁহারা স্থির করিলেন, কান্তকে ব্যবসায় শিক্ষা করিতে দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। বরং সে পাদরী হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা কান্তকে গ্রাম্য ইস্কুলে পড়িতে পাঠাইলেন।

ইস্কুলের পড়া সাঙ্গ করিবার কান্ত উচ্চশিক্ষা লাভার্থ এলবার্টিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করিলেন। অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে তিনি কিন্তু পাদরী হইলেন না; ঐ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিলেন। ক্রমে তাঁহার চিন্তাশীলতা, অধ্যাপনা প্রভৃতি গুণে তিনি পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন।

কান্তের বয়স যখন ২০ বৎসর, তখন তাঁহার দেহের ওজন ছিল ১০০ পাউণ্ড এবং দৈর্ঘ্য পাঁচ ফিটের কম। তাঁহার মস্তকের পরিধি ২৪ ইঞ্চি। তাঁহার দেহে মাংস বেশী ছিল না; তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন চর্ম্মাবৃত মনুষ্য-কঙ্কাল। সামান্য অঙ্গসঞ্চালনেই তিনি বেদনা বোধ করিতেন। আর, তাঁহার মাথাধরা চব্বিশ ঘণ্টা লাগিয়াই থাকিত। তাঁহার মাথাধরা উপলক্ষে একজন রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিলেন, তোমার অত বড় প্রকাণ্ড মাথা যদি ধরে, তাহা হইলে সে কষ্ট জিরাফের গলার ঘায়ের অপেক্ষা অনেক বেশী নিশ্চয়ই।

শরীর সর্ব্বদা এইরূপ অসুস্থ থাকায়, প্রতিকার চিন্তা করিতে করিতে কান্ত ক্রমে বুঝিলেন, এত বড় মাথা লইয়া কাজ করিতে হইলে গায়ে যথেষ্ট জোর থাকা আবশ্যক। তাঁহার দেহ যেরূপ ক্ষুদ্র, এবং শরীর যেরূপ দুর্ব্বল, তাহার উপর এত বড় মাথা লইয়া চলা-ফেরাই কত কষ্টকর—কাজ করা ত দূরের কথা। তিনি বলিতে লাগিলেন, মস্তিষ্ক যেন ইঞ্জিন, আর ফুসফুস ও পাকযন্ত্র যেন বয়লার। এই দুইয়ের সম্মিলিত কার্য্যের ফলে মানুষ চিন্তা করিতে সমর্থ হয়। এ সকল কথা লোকের কাণে উদ্ভট বলিয়া বোধ হইত; তাহারা তাঁহাকে ঠাট্টা তামাসা বিদ্রূপ করিত,—ভ্যাঙ্-চাইত। ক্রমে তাঁহার মনে বিশ্বাস জন্মিল যে, তিনি যদি খুব দীর্ঘ, পূর্ণ নিশ্বাস লইতে অভ্যাস করেন, তাহা হইলে তিনি পরিষ্কার রূপে চিন্তা করিতে সমর্থ হইবেন এবং চির দিনের জন্য মাথাধরা রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিবেন। তিনি বলিয়াছিলেন, দীর্ঘনিশ্বাসের উপর মানুষের জীবনটাই নির্ভর করিতেছে। যাহাদের নিশ্বাস যত অল্প, তাহারা ততটা ক্ষীণজীবী। পরিষ্কার ভাবে চিন্তা করিতে হইলে দীর্ঘনিশ্বাস টানিতে অভ্যাস করিতেই হইবে।

কান্ত মুখে যাহা বলিলেন, কাজেও তাহা দেখাইয়া দিলেন। তিনি স্বয়ং মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ ও মুখ বুজিয়া দীর্ঘনিশ্বাস টানিতে অভ্যাস করায়, কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার শরীরের সমস্ত পীড়া দূর হইল। ক্রমশঃ তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে লাগিল। একটী প্রবন্ধে তিনি তাঁহার স্বাস্থ্য লাভের ইঙ্গিত করেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, নির্ম্মল বায়ু তাঁহার মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হওয়ায়, তাঁহার মাথাধরা, শরীরের বেদনা সারিয়া গিয়াছে, এবং তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিয়াছে। পরে তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া একটী বক্তৃতায় ভ্রম সংশোধন করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, মানুষ অনেক সময়ে কাজ ঠিকমত করিতে পারে, কিন্তু কার্য্য কারণের সম্বন্ধ নির্ণয়ে ভুল করিয়া বসে।

ডাক্তারেরা তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন—তোমার শরীর দুর্ব্বল; এ দুর্ব্বল শরীরে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার এত মানসিক শ্রম সহিবে না,—তুমি পড়াশুনা ছাড়িয়া দাও। কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণের অভ্যাসের ফলে যথেষ্ট উপকার পাইয়া তিনি চিকিৎসকগণের পরামর্শ আমলে আনেন নাই। এমন কি, তিনি যে অসুস্থ, তাঁহার শরীরে যে কোন রকম পীড়া আছে, এ কথাই তিনি স্বীকার করিতে চাহিতেন না। রাত্রে কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া তিনি অর্দ্ধোচ্চারিত কণ্ঠে বলিতেন, আমি খুব সুখে, খুব স্বচ্ছন্দে আছি।

তাঁহার বাড়ীর কাছে একটী অপ্রশস্ত রাস্তা ছিল। রাস্তাটি ঠিক অর্দ্ধমাইল দীর্ঘ। তিনি এই রাস্তার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিতেন। এই সময়ে তিনি চেষ্টা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস টানিতেন, এবং মুখ বুজিয়া থাকিতেন—কাহারও সহিত একটীও কথা কহিতেন না। তাঁহার হাতে একটী মোটা বেতের লাঠি থাকিত। লাঠিগাছটি তিনি ঘুরাইতে ঘুরাইতে যাইতেন,—অভিপ্রায়, লাঠি ঘুরোনোর ফলে তাঁহার হাতে রক্ত-চলাচল বৃদ্ধি পাইবে। ইহাতে কিন্তু তাঁহার অজ্ঞাতসারে আরও একটী কাজ হইত—পাছে তাঁহার ঘূর্ণায়মান লাঠি গায়ে লাগে এই ভয়ে কেহ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইত না; কাজেই তাঁহার মৌন ব্রত অক্ষুণ্ণ থাকিত।

প্রথম প্রথম তিনি প্রত্যহ একবার মাত্র সেই সঙ্কীর্ণ প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিতেন। কষ্টসাধ্য;

এক মাইল ভ্রমণ করা হইত। এক বৎসর পরে, তিনি সেই রাস্তাটি আটবার যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রত্যহ চার মাইল ভ্রমণের কাজ হইত।

প্রত্যহ বেলা ঠিক সাড়ে তিনটার সময় তিনি বেড়াইবার জন্য সাজিয়া-গুজিয়া বাসা হইতে বাহির হইয়া আসিতেন। তিনি এমন নিয়মিত সময়ে বাহির হইতেন যে, কোন দিন এক মিনিটও এদিক-ওদিক হইত না। ক্রমে তাঁহার এই নিয়মিত ভ্রমণ লোকের চক্ষে এমন অভ্যস্ত হইয়া গেল যে, তাঁহাকে ভ্রমণে বাহির হইতে দেখিলে লোকে তখন সময় কত তাহা বুঝিতে পারিত; কাহারও ঘড়িতে সময় ঠিক না থাকিলে সে তাঁহার ভ্রমণে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত সময় নির্ণয় করিয়া নিজের ঘড়ি ঠিক করিয়া লইত!

ভ্রমণের সময়ে কান্ত খুব গম্ভীর থাকিতেন। মুখ বুজিয়া রাখাটা তিনি অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন; নচেৎ, দীর্ঘনিশ্বাসের অভ্যাস নিষ্ফল, ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। এ জন্য তিনি যতক্ষণ ভ্রমণ করিতেন, ততক্ষণ একটীও কথা কাহারও সহিত কহিতেন না; কেহ কোন কথা কহিলে বা কোন প্রশ্ন করিলে, তিনি তাহার উত্তর পর্য্যন্ত দিতেন না। ক্রমে লোকেও তাহা বুঝিল। সেই জন্য তাঁহার ভ্রমণের সময়ে কেহ তাঁহাকে কোন কথা বলিতে বা কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিত না। মুখ বুজিয়া থাকা,—কেবল নাক দিয়া নিশ্বাস টানা,—ইহা তিনি অতি পবিত্র কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন; এ পবিত্রতা কোন রকমেই তিনি লঙ্ঘিত হইতে দিতেন না। তাঁহার বেড়াইবার সময়টিও তিনি ঈশ্বরোপাসনার সময়ের মত পবিত্র বলিয়া মনে করিতেন। লোকেও ক্রমে তাহা বুঝিয়া লইয়াছিল। সে জন্য এ সময়ে কেহ তাঁহাকে কোনরূপে উত্যক্তও করিত না।

কান্ত চেষ্টা পূর্ব্বক দীর্ঘনিশ্বাস টানিতেন বটে, আসা হং তিনি মনে মনে ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, কুকুর তৎক্ষণ তাঁহার কর্ত্তব্য; কিন্তু তাঁহার ধারণা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সম্মত নহে, যদিও প্রকৃত ফল লাভে কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কান্ত ঠিক বুঝিতে পারিতেন না,—এ কথা তাঁহার মনেও উঠিত না যে, তিনি চেষ্টা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস টানিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার পথ চলার দরুণ অঙ্গ সঞ্চালনের ফলে দীর্ঘ নিশ্বাস টানার কার্য্যে অনেকটা সাহায্য হইতেছে,—কম চেষ্টা লাগিতেছে। না চলিয়া, স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, যদি তিনি দীর্ঘনিশ্বাস টানা অভ্যাস করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যতটা চেষ্টা করিতে হইত, ভ্রমণ করার দরুণ তদপেক্ষা কম চেষ্টায় সে কাজ সম্পন্ন হইত। বস্তুতঃ, দীর্ঘনিশ্বাস টানা স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম বটে, কিন্তু সেটা চেষ্টার ফলে মূল ব্যায়াম হওয়া কর্ত্তব্য নহে—অন্য ব্যায়ামের ফলে গৌণ ভাবে সেটা সম্পন্ন হওয়াই ঠিক। একটু দ্রুত ভ্রমণ করিলেই স্বতঃই দীর্ঘনিশ্বাস টানিতে হয়,—তাহাতেই সহজে দীর্ঘনিশ্বাস টানার সমস্ত ফল পাওয়া যায়; অথচ, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বশরীর সঞ্চালিত হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়-গুলিকে সবল ও পুষ্ট করে। সমতল ক্ষেত্রে দ্রুত ভ্রমণে, এবং পার্ব্বত্য পথে ধীর ভ্রমণেও লোকে যে হাঁপাইয়া পড়ে এবং দীর্ঘনিশ্বাস টানিতে থাকে, তাহাই যথার্থ ব্যায়াম। এই ব্যায়ামের সময় কিন্তু মুখ বুজিয়া থাকা খুব দরকার; কথা কহিতে গেলেই দীর্ঘ শ্বাসের ফল পাওয়া যায় না। লোক সঙ্গে থাকিলে সময়ে সময়ে দুই একটা কথা কওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়ে; সেই জন্য কান্ত একলা ভ্রমণ করিতে ভালবাসিতেন। তাহাতে তাঁহাকে কাহারও সহিত কথা কহিতে হইত না।

কান্ত যে রাস্তায় ভ্রমণ করিতেন, সে রাস্তাটি এখনও আছে। সেটী এখন তীর্থ ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ, এখানে পৃথিবীর একজন বিখ্যাত দার্শনিক নিয়মিত ভাবে ভ্রমণ করিতেন; এজন্য দর্শন শাস্ত্রের ভক্ত ব্যক্তিরা এই রাস্তাটিকে পবিত্র বলিয়া মনে করে। আর, যাহারা স্বাস্থ্যকামী, তাহাদের কাছেও এই রাস্তাটি অতি পবিত্র; কারণ, কান্তের মত অমন হীন-

স্বাস্থ্য ব্যক্তি এখানে ভ্রমণ করিয়া অটুট স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিলেন।

লোকে কোনিগ্‌সবার্গে ভ্রমণ করিতে গেলে, এই রাস্তা একবার না দেখিয়া ফিরিতে পারে না। গাড়োয়ানরা আরোহীকে জানাইয়া দেয়, এই রাস্তার নাম The Philosopher's Walk; এবং তাহার ইতিহাসটিও শুনাইয়া দিতে ছাড়ে না! আমরা আশা করি, পাঠকেরাও এই রাস্তার কথা মনে রাখিবেন। তাহা হইলে এ কথাও তাঁহাদের মনে থাকিবে যে, কেমন করিয়া দৃঢ় অধ্যবসায়ের ফলে লোকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার রত্ন-স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে।

কান্ত এই রাস্তাটি দিয়া নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ আটবার যাতায়াত করিতেন। এক দিন নয়, দুই দিন নয়, এক সপ্তাহ নয়, এক মাস নয়, এক বৎসর নয়—২০ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া, মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (৮০ বৎসর বয়সে কান্তের মৃত্যু হয়) ৬০ বৎসর কাল তিনি এই পথে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে ভ্রমণ করিয়াছিলেন; একটী দিনের জন্যও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

কান্তের নিজের উপর বিশ্বাস ছিল,—আত্মনির্ভর-শীলতা ছিল। অভিজ্ঞতার ফলে তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যেও পরিণত করিয়াছিলেন। কাহারও কথা তিনি গ্রাহ্য করেন নাই—কোন বাধা বিঘ্ন তাঁহাকে তাঁহার সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। স্পার্টানরা যাহাকে শকুনী, গৃধিনী, শৃগাল, কুকুরের খাদ্য স্বরূপ পাহাড়ের উপর ফেলিয়া দিবার যোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারিত,—সেই ব্যক্তি যে সুস্থ শরীরে ৮০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে, ইহা কে কল্পনা করিতে পারিত? কিন্তু যাহা কল্পনার অতীত বিষয়, তাহা কিরূপে সম্ভব হইল? ইহার মূলে দীর্ঘনিশ্বাস, নিয়মিত ভ্রমণ,—আর কিছুই নহে। কান্তের চিত্তের দৃঢ়তা, অধ্যবসায়ই তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়াছিল।

কান্তের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। কোনিগসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি মেট্যাফিজিক্স, লজিক, ম্যাথেম্যাটিকস ন্যাচারাল ফিলজফি, ন্যাচারাল ল, মর‍্যাল ফিলজফি, ন্যাচারাল থিয়োলজি, ও ফিজিক্যাল জিওগ্র্যাফি সম্বন্ধে অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থরাজি জগদ্বিখ্যাত। নব্য দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিতে গেলেই, কান্তের দর্শন শাস্ত্রের উল্লেখ না করিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ, অঙ্গহীন হইয়া পড়ে।

কিন্তু কান্তের এত পাণ্ডিত্যের, তাঁহার স্বনামখ্যাত দর্শন শাস্ত্রের মূল কোথায়? পাঠকেরা বুঝিলেন কি?—আচ্ছা, বলুন দেখি!

পাঁউরুটী।

লেখিকা—মিসেস এল, জি, মুখার্জ্জি।

গত ভাদ্র সংখ্যার "স্বাস্থ্য সমাচারে" শ্রীযুক্ত চক্রধর সাহা নামক কোন ভদ্রলোকের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমি এই বিষয়ে পুনরায় লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। উক্ত প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত চক্রধর সাহা মহাশয় গৃহে পাঁউরুটী প্রস্তুত কার্য্যে সুফল পাইবার জন্য যেরূপ অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিয়াছেন, সে জন্য তিনি প্রশংসার্হ। তিনি লিখিয়াছেন যে, "স্বাস্থ্য সমাচারে" আমার উপদেশের অনুসরণ করিয়া অনেক কষ্ট ও অর্থ ব্যয়ের পর তিনি উত্তম রুটী প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সে যাহাই হউক, তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে উল্লিখিত উপদেশগুলি পালন করা অতিমাত্র কষ্টসাধ্য;

এজন্য তিনি রুটী প্রস্তুত করিবার কোন সহজ ও সরল উপায়ের প্রার্থী। এবার আমি সরল ভাবেই রুটী প্রস্তুত প্রণালী লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

যাঁহারা পাঁউরুটী প্রস্তুত করিতে আদৌ জানেন না,—পূর্ব্ব প্রবন্ধে, তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সরল ভাবে পচনক্রিয়ার ব্যাপারটা বুঝাইয়া দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল। পচন ক্রিয়ার বীজাণুবাদ সম্বন্ধে উত্তমরূপ জ্ঞান না জন্মিলে, এবং পচন ক্রিয়া কতদূর পর্য্যন্ত চলিতে দিবার পর বন্ধ করিয়া দিতে হইবে তাহা না জানিলে, পাঁউরুটী প্রস্তুত করা সম্ভব নহে। একবার এই জ্ঞান জন্মিলে, এবং একটু অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিলে, এবং হাতের কাছে উত্তম ময়দা, উত্তম ঈষ্ট, উপযুক্ত তুন্দুর এবং যথোচিত ধৈর্য্য থাকিলে, পাঁউরুটী প্রস্তুত-কার্য্য অতি সহজ হইয়া আসে। পচন ক্রিয়া উৎপাদনোপযোগী বীজাণু সকল তাহাদের কার্য্য সম্পাদন করিতে কিঞ্চিৎ সময় লইয়া থাকে; অতএব খুব তাড়াতাড়ি পাঁউরুটী প্রস্তুত করিবার উপায় নাই। পেইসলী ফ্লাওয়ার, এবং বেকিং পাউডারের দ্বারা পাঁউরুটী প্রস্তুত করা যায় না। উহাদের সাহায্যে কেবল কেক প্রস্তুত করিতে পারা যায় মাত্র। কেবল মাত্র ঈষ্টের দ্বারাই পাঁউরুটী প্রস্তুত করা যায়—ঈষ্ট ছাড়া আর কোন জিনিসের দ্বারাই পাঁউরুটী প্রস্তুত করা যায় না।

১৩২৭ সালের ভাদ্র মাসের স্বাস্থ্য সমাচারের প্রবন্ধ লেখক মহাশয় যদি নিম্নলিখিত প্রণালীটি পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে, আমার মনে হয়, তিনি কৃতকার্য্য হইবেন; কেন না, একবার পাঁউরুটী তৈয়ার করিতে গিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, সেই অভিজ্ঞতা লব্ধ শিক্ষা অপর কোন উপায়েই লাভ করিতে পারা যায় না।

রাত্রিতে, শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে, টেবল চামচের পূর্ণ এক চামচ আলু ও হপ ঈষ্ট লইয়া তিন পেয়ালা (একপোয়া আন্দাজের পেয়ালা) ঈষদুষ্ণ (প্রায় ৯০ ডিগ্রি ফারেনহীট) জলের সহিত মিশ্রিত করুন। এই ঈষ্ট মিশ্রিত জলে এই পরিমাণ ময়দা মিশাইয়া নাড়িয়া দিন যেন একটু ঘন কাদার মত হয়। পাত্রটিকে ঢাকা দিয়া পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ তাপে সমস্ত রাত্রি রাখিয়া দিন। ভোর বেলা উঠিয়া উহার সহিত যথেষ্ট ময়দা মিশাইয়া এমন তাল প্রস্তুত করুন, যাহা ঠাসা যাইতে পারে। তার পর সেই তালটিকে উত্তম রূপে ঠাসিয়া লইয়া (৯০ ডিগ্রি ফারেনহীট) তাপে ঢাকা দিয়া স্থির ভাবে রাখিয়া দিন। ইহাতে তালটি ফুলিতে থাকিবে। দুই ঘণ্টা বাদে দেখিবেন, তালটি যথেষ্ট পরিমাণে ফুলিয়া উঠিয়াছে। তখন তাহা বেশী না ঘাঁটিয়া, অর্থাৎ যত কম ঘাঁটিয়া পারেন, পাঁউরুটীর আকারে গড়িয়া লউন; তার পর ঘৃত বা তৈল মাখানো টীনের ছাঁচের ভিতরে রাখিয়া ঢাকা দিন, এবং পূর্ব্বোক্ত গরম স্থানে আরও ফুলিবার জন্য রাখিয়া দিন। এখন এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টার মধ্যে উহা আরও খানিকটা ফুলিয়া উঠিবে। যখন দেখিবেন ঐ তালটির গায়ে ফাট ধরিয়াছে, তখন বুঝিবেন, উহা উনানে দিবার উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এইবার তাহাকে উনুনের ভিতর স্থাপন করুন। উনুনের ভিতরের তাপ যেন ৪০০ ডিগ্রি ফারেনহীট পর্য্যন্ত হয়। উনুনে এক ঘণ্টা ধরিয়া সেঁকিতে হইবে। অন্ততঃ আধ ঘণ্টা সেঁকা হইবার পূর্ব্বে উনুনের দরজা খুলিবেন না। পাঁউরুটী প্রস্তুত করা অভ্যস্ত হইয়া গেলে, রুটী পূর্ণ ভাবে সেঁকা হইবার পূর্ব্বে উনুনের দরজা খোলার দরকার হইবে না; অর্থাৎ অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝিতে পারিবেন, কোন সময়ে পাঁউরুটী উত্তমরূপে সেঁকা হইয়াছে,—এখন উনুনের দরজা খোলা যাইতে পারে।

উপরে যে মশলার ভাগ দেওয়া হইল, তাহা একখানি পাঁউরুটীর জন্য।

খুব টাটকা অবস্থায় শুষ্ক ঈষ্ট যোগাড় করিতে পারিলে, নিজের ঘরে আলু ও হপ হইতে ঈষ্ট তৈয়ার করিয়া লওয়ার অপেক্ষা অনেক বেশী সুবিধা হয়। কিন্তু ভারতের জলবায়ুতে শুষ্ক ঈষ্ট শীঘ্রই খারাপ হইয়া

যায়। সুতরাং শুষ্ক ইষ্টের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা চলে না। আমি কলিকাতার আর্ম্মি এণ্ড নেভি ষ্টোর হইতে রয়েল ঈষ্ট ক্রয় করিয়া সুফলও পাইয়াছি, আবার সময়ে সময়ে উহা খারাপও হইয়াছে। কয়েক সপ্তাহ ভাণ্ডারে মজুত থাকাতে হয় ত উহার অবস্থা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, এমন অবস্থায় হয় ত উহা কেনা হইয়াছিল। যদি শুষ্ক ঈষ্ট ব্যবহার করা হয়, তবে ঈষ্টের কেকের সিকি ভাগ একখানি পাঁউরুটী প্রস্তুত করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে। এই শুষ্ক ঈষ্ট ব্যবহার করিতে হইলে, উহা তিন পেয়ালা জলে মিশাইবার পূর্ব্বে এক চামচ ঈষৎ গরম জলে গুলিয়া তরল করিয়া লইতে হয়।

শ্রীহট্ট জেলার জন্ম মৃত্যু বিবরণ।

লোক সংখ্যা ২৪৭২৬৭১

	জন্ম	প্রতিহাজারে জন্ম	মৃত্যু	প্রতিহাজারে মৃত্যু
১৯১৭ ইং	৭০৪৬১	২৮·৪৯	৫৯২৫৪	২৩·৯৬
১৯১৮ ইং	৮৬০৬১	৩৪·৮০	৯৮৩৯৬	৩৯·৭৯
১৯১৯ ইং	৬৯৫৮৮	২৮·১৪	১৩০৯৩২	৫২·৯৫

প্রতি হাজারে জাতি অনুসারে মৃত্যু

	হিন্দু	মুসলমান	খৃষ্টান	বৌদ্ধ	অন্যান্য	মোট
১৯১৭ ইং	২২·০৩	২৪·৯৬	৫·৯৫	„	১২৮·১৮	২৩·৯৬
১৯১৮ ইং	৩৪·৩৮	৪৩·১৮	৯·৯২	৫০·৬০	২২২·৯৪	৩৯ ৭৯
১৯১৯ ইং	৪৭·৭১	৫৫·৫০	২৫·১৩	১০০·২০	৩৬২.৯৫	৫২·৯৫

জাতি অনুসারে লোক সংখ্যা।

হিন্দু	১০৯৮৯৫০
মুসলমান	১৩৬৪৭৩৯
খৃষ্টান	১৫১২
বৌদ্ধ	২০
অন্যান্য	৭৪৫০
	২৪৭২৬৭১

বয়স অনুসারে মৃত্যু-সংখ্যা

		একবৎসরের নীচে	১হইতে ৫বৎসরের নীচে	৫হইতে ১০বৎসরের নীচে	১০হইতে ১৫বৎসরের নীচে
১৯১৭	পুং	৭৮০৩	৩৯৬১	২১২৮	১২৪৩
	স্ত্রী	৬৩৭৪	৩৫৯৭	১৮৯০	৭৬৫
১৯১৮	পুং	১০০১৫	৭১৯৬	৪৩১৬	২৫০০
	স্ত্রী	৮০৮৩	৬৯৬৫	৩৮২৫	১৭৫২
১৯১৯	পুং	১০৩৩৩	৮৪০৩	৬৫৪১	৩৬৮৯
	স্ত্রী	৮৬৮৬	৮৬০০	৫৭১৫	২৬৭৬

ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

লেখক—শ্রী সুরেশচন্দ্র মিত্র এল-এম-এস।

Fever (malarial) is a euphemism for insufficient food, scanty clothing and unfit dwelling.

মনুষ্য দেহে যত প্রকার রোগ উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বরই সর্ব্বপ্রধান। যদিও আক্রমণের অনুপাতে এই রোগে মৃত্যুসংখ্যা অনেক কম (১৩৩ জনের মধ্যে ১ জন); কিন্তু তাহা হইলেও ইহা দেশ ব্যাপী হইয়া বহু লোককে আক্রমণ করে।

ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর প্রতি হাজার লোকের মধ্যে ৫ জন এই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হিসাব করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, সমগ্র ভারতে প্রতি বৎসর ১১৩০০০০০ লোক এক ম্যালেরিয়া জ্বরে শমন ভবনে গমন করে।

মহামারী (Plague) যখন এদেশে অতি প্রবল ভাবে আত্ম প্রকাশ করিয়াছিল তখনও উহাতে মৃত্যুর হার এত অধিক হয় নাই। কলেরা, আমাশয় ও উদরাময়েরও এক যোগে মৃত্যুর হার ম্যালেরিয়ার সমতুল্য নহে। সেদিন ইয়োরোপে যে মহাসমর হইয়া গেল, তাহাতেও উভয় পক্ষে এত লোকক্ষয় হয় নাই।

মৃত্যুর কথা ছাড়িয়া দিলেও, এই রোগে কত লোক অর্দ্ধমৃত অবস্থায় অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিয়াছে, তাহা ভাবিলে ভীত হইতে হয়। ইহার উৎপাতে দেশের ধনাগমের যে কত ক্ষতি হইতেছে, তাহা বলা যায় না। এই ব্যাধি বয়স ধর্ম্ম-জাতি প্রদেশ-নির্ব্বিশেষে সকলকেই আক্রমণ করিয়া ব্যাপক রূপে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য ইহাকে নিঃসঙ্কোচে "Political disease" বলা যাইতে পারে।

রাজ্যের সমৃদ্ধিই রাজার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। এই ব্যাধিই যখন সমৃদ্ধি লাভের একটী প্রবল অন্তরায়, তখন কি রূপে এই ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর গ্রাস হইতে দেশকে রক্ষা করা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা রাজা প্রজা সকলেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

এ সম্বন্ধে সদাশয় গভর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আশানুরূপ ফল হয় নাই। তাহার কারণ, বোধ হয় এই দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার সহিত প্রচলিত শিক্ষা প্রথা, সমাজ-নীতি, অর্থ-নীতি ও বাণিজ্য-নীতির বিশেষ ঘনিষ্টতা আছে। এই বিষয়গুলির আবশ্যক পরিবর্ত্তন না করিয়া দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূরীকরণের চেষ্টা বৃথা।

যে সকল স্থানে লোকাভাব ও বহু পতিত জমি আছে, সেই সকল স্থানেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশী দেখা যায়। পক্ষান্তরে যে স্থানে বহু লোকের বাস, পতিত জমির অভাব, সে স্থানে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ অনেক কম। অতএব ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত স্থানে যদি কোন প্রকারে উপযুক্ত পরিমাণ লোকের বসতি হয়, তবে সে স্থান ম্যালেরিয়াশূন্য হইতে পারে। এখন বিবেচ্য, কি প্রকারে এই রূপ ম্যালেরিয়াদুষ্ট স্থানে লোকের ঘন বসতি হইতে পারে।

ইহার দুইটি উপায় আছে;—

(১) যদি সুযোগ ও সৌভাগ্য ক্রমে বহু সরকারী আফিসাদি স্থাপিত হইয়া স্থানটি হঠাৎ সহর হইয়া যায়;
(২) যদি স্থানটী একটি বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হয়।

যখন ম্যালেরিয়া আমাদের দেশে "Political disease" আকারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া

বসিয়াছে, তখন উহাকে বিদূরিত করিতে হইলে, Political measure গ্রহণ পূর্ব্বক চির প্রচলিত শিক্ষা-প্রথা ও বাণিজ্য-নীতির সংস্কার করিয়া ম্যালেরিয়ার মূল কারণ দরিদ্রতা ও জনলোপের প্রতিবিধান করিতে হইবে।

বাণিজ্যের উন্নতি করিতে পারিলেই দেশে ধনাগম হয়; দেশের অর্থ দেশে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। পতিত জমিগুলি বাস স্থান নির্ম্মাণ ও গবাদির চারণ-ভূমিতে পরিণত হয়। কাজে কাজেই ম্যালেরিয়ার কারণ দূরীভূত হইয়া যায়।

কুইনাইন সেবন, মশারি ব্যবহার, কেরোসিন্ বা ফরমালিন্ (Formaline) দ্বারা মশকী-শাবক (anopheles-larvæ) নাশ, পয়ঃ প্রণালী সংস্কার ও অন্য রূপে পারিপার্শ্বিক অবস্থার দোষ (faulty environment) অপনয়ন প্রভৃতি উপায় অবলম্বনে ম্যালেরিয়া কিয়ৎ পরিমাণে কমিতে পারে বটে, কিন্তু উহার মূলোৎপাটন হইবে না। কারণ ম্যালেরিয়ার মূল কারণ অন্তর্নিহিত মর্ম্মগত দরিদ্রতা। এ দরিদ্রতা দূর করিবার প্রধান উপায় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি।

যদি কখন শিল্প বাণিজ্যের আশানুরূপ উন্নতি সাধন হয়, তখন ভারত পুনরায় শ্রীসম্পদ ও স্বাস্থ্য লাভ করিয়া শান্তি ও গৌরব ভোগ করিবে।

শিক্ষা-প্রথা ও বাণিজ্য-নীতির আবশ্যক সংস্কার সম্বন্ধে বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

স্বাস্থ্য ও পথ্য সম্বন্ধে বিচার।

মনুষ্যের স্বাস্থ্য সাধারণতঃ কেবল মাত্র আহার ও নিয়মিত পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে। অনেকের ধারণা কেবলমাত্র পেট পুরিয়া খাইয়া গেলেই শরীর খুব ভাল থাকে, কিন্তু তাহা বিষম ভুল। খাওয়ার সঙ্গে নিয়মিত পরিশ্রম না করিলে সে খাদ্য হজম না হইয়া অজীর্ণ রোগ উপস্থিত করে। একবার যদি অজীর্ণ রোগ নিজ শরীরের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তাহা হইলে তাহাকে বিতাড়িত করা বড়ই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু নব্য যুগের বঙ্গ সম্প্রদায়ের মধ্যে শারীরিক পরিশ্রম একেবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়।

সেই জন্য আজ কাল পেট মোটা হাত সরু বাঙ্গালী যুবক অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশবাসীগণ শারীরিক পরিশ্রমকে নীচ ব্যক্তির কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু তাঁহারা যদি একবার ইহার আস্বাদ লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অবগত হইবেন যে, এতাবৎ কাল তাঁহারা কিরূপ ভ্রমে পতিত ছিলেন।

আমাদের সমস্ত শরীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের দ্বারা গঠিত এই সমস্ত কোষ হইতে নিয়তই শরীরের দূষিত পদার্থ সমূহ ঘর্ম্মাকারে বহির্গত হইতেছে। কায়িক পরিশ্রমে ঘর্ম্ম সঞ্চালন হইলে এই দূষিত পদার্থ সমূহ অধিক পরিমাণে ঘর্ম্মের সহিত নির্গত হইয়া যায়। কায়িক পরিশ্রম রুদ্ধ গৃহের মধ্যে করা কর্ত্তব্য নহে। যেস্থানে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ অম্লজান (oxygen) পাওয়া যাইবে এইরূপ মুক্ত স্থানে ব্যায়াম করা উচিত। যাঁহারা অন্য রূপ পরিশ্রম করিতে দ্বিধা বোধ করেন তাঁহারা যদি প্রতিদিন অন্ততঃ দুই মাইল বেগের সহিত ভ্রমণ করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট হয়। কিন্তু কেবল মাত্র আহার ও পরিশ্রমের উপরেই যে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় তাহা নহে। ইহার সহিত আরও কিছু চাই। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পরিচ্ছন্নতা। বহু ব্যক্তি আছেন যাঁহারা পরিশ্রমের পরে বস্ত্র পরিবর্ত্তন আবশ্যক বোধ করেন না। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। কারণ শারীরিক পরিশ্রমের পর শরীর হইতে যে ঘর্ম্ম নির্গত হয়

তাহা অত্যন্ত দূষিত, সেই নির্গত দূষিত ঘর্ম্ম যদি শরীরে পুনঃ প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহার ফল যে বিপরীত হইবে তাহা কে না জানে? কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও বোকা সাজিলে তাহার উপায় নাই।

প্রতিদিন দুইবার স্নান করা উচিত। Exerciseএর পর অন্ততঃ ১ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া তবে হস্ত পদ ধৌত করা উচিত। কারণ গরমের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিলে সর্দ্দীগর্ম্মী হইতে পারে। রাত্রির পরিহিত বস্ত্র প্রাতেঃ পরিবর্ত্তন করা উচিত। প্রতিদিন প্রাতেঃ ও সন্ধ্যায় দন্ত মার্জ্জন করা উচিত। কারণ উত্তম রূপে দন্ত মার্জ্জনা না করিলে মুখে দুর্গন্ধ ও ঘা হয় ও পাথুরী হইয়া অকালে সমস্ত দন্ত নির্ম্মূল হয়। গ্রীষ্মকালে মুক্ত বায়ুতে দেহ বস্ত্রাবৃত করিয়া শয়ন করা উচিত। শীতকালেও দরজা জানালা ইত্যাদি বন্ধ করা উচিত নহে। শয়ন গৃহে দরজা বন্ধ করিয়া কেরোসিন লণ্ঠন রাখিলে অনেক সময় প্রাণহানি ঘটে।

এইবার আমার পথ্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। পথ্য যত লঘু হয় ততই ভাল। গুরুপাক পথ্য রুগ্নের নিমিত্ত নহে। দিনরাত্রির মধ্যে ৪ বার খাওয়া উচিত। একেবারে বেশী পরিমাণে খাওয়া উচিত নহে, একেবারে বেশী খাইলে পাকস্থলীর ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায়। নিম্ন লিখিত মত খাইলে শরীর রক্ষা পক্ষে যথেষ্ট হয়।

প্রাতে	বিকালে	রাত্রিতে
৭ টা		৯ টা ভাত।
কিছু লঘু খাদ্য	কিছু লঘু খাদ্য	
১০ টা—ভাত		

নিম্নলিখিত তালিকায় কোন খাদ্য কত সময়ে হজম হয় তাহা জানা যাইবে।

ভাত—	১ ঘণ্টা	
জল বারলী—	১ ,,	৩০ মিনিট
সাগু—	১ ,,	৫৫ ,,
দুগ্ধ—	১ ,,	০
ময়দার রুটি—	৩ ,,	৩০ ,,
মাখন—	৩ ,,	৩০ ,,
ঘি—	৩ ,,	৩০ ,,
আলু—	৩ ,,	৩০ ,,
সুসিদ্ধ ডিম—	৩ ,,	৩০ ,,
কপি—	৪ ,,	
মুর্গীরোষ্ট—	৪ ,,	

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার এন, কে, ঘোস বলেন "রুগ্ন ব্যক্তিকে এমন পথ্য দিতে হইবে যাহা অতি সহজে জীর্ণ হয়। পীড়িত অবস্থায় যখন রোগীর ক্ষুধা থাকে না তখন তাহাকে কোন খাদ্য না দিয়া পাকস্থলীকে বিশ্রাম দেওয়াই কর্ত্তব্য। ইহাতে পাকস্থলীর যন্ত্র সমুদায় খাদ্য পরিপাকে ব্যস্ত না থাকিয়া শরীরস্থিত বিষ শীঘ্র বাহির করিতে পারে।" স্বাস্থ্য রক্ষার আর একটী অঙ্গ সুনিদ্রা। রাত্রিতে সুনিদ্রা না হইলে প্রাতঃকালে কিছুই প্রীতিপ্রদ হয় না। প্রসিদ্ধ কবি Wordy বলিয়াছেন "Without this what is all the morning wealth".

যাঁহারা অনিদ্রায় ভুগিতেছেন তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই সুফল পাইবেন। রাত্রিতে নিদ্রার পূর্ব্বে একটী ফুটন্ত গরম জল পূর্ণ বোতলের উপর আধ ঘণ্টা পা রাখিবেন। তার পর একটী রুমাল অর্দ্ধেক পরিমাণে জল ও rectified spiritএ ডুবাইয়া দুই রগে ফেলিয়া শয়ন করিবেন, ও আলো শয়ন গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবেন। ইহাতে নিশ্চয়ই সুনিদ্রা হইবে। পরিণত বয়স্কদিগের পক্ষে ৭ ঘণ্টা নিদ্রা যথেষ্ট; কিন্তু বৃদ্ধ ও শিশুগণের নিদ্রা ১০ ঘণ্টা বার ঘণ্টার কম হওয়া উচিত নহে। আমাদের দেশবাসিগণের মঙ্গলের নিমিত্তই কতকগুলি অপ্রিয় কথা বলিতে হইল। ইহাতে তাঁহারা কোনরূপ কষ্ট অনুভব না করিয়া যদি নিয়মগুলি পালন করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সমস্ত শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

প্রাপ্ত পত্র।

ডাক্তারের অভাব

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত স্বাস্থ্য-সমাচার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়

পাবনা জেলার অন্তর্গত ও পাবনা সহর হইতে দুই মাইল পশ্চিমে কতকগুলি গ্রাম লইয়া নাজিরপুর ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নে পল্লী-সমিতি নামক একটী সভা আছে। ঐ সভার একটী শাখায় স্বাস্থ্য সংস্থানের বন্দোবস্ত আছে। এবং স্বাস্থ্য সংস্থানাধ্যক্ষ ঐ সকল পল্লীর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। দুস্থঃ দরিদ্র পীড়িতদিগকে এই সমিতি হইতে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে উপদেশ প্রদান করা হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই ইউনিয়নের ৮টী গ্রামে প্রায় ১৬।১৭ হাজার লোকের জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক নাই। হাতুড়ে ডাক্তার ও কবিরাজের এবং পেটেণ্ট ঔষধের দ্বারা এই সকল স্থানের পীড়িত ব্যক্তিগণের জীবন মরণ লইয়া খেলা হইয়া থাকে। এই কয়েক গ্রামের মধ্যে মাত্র একজন ডিপ্লোমাধারী রেজিষ্টার্ড ডাক্তার আছেন। তাঁহার দ্বারা এতগুলি গ্রামের চিকিৎসা হওয়া অসম্ভব। এ জন্য আমরা পাবনা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সাহায্য প্রার্থনা করি। এ বৎসর ভাল বর্ষা ও বৃষ্টি না হওয়ায় এখনই ঘরে ঘরে জ্বর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখনও সম্মুখে ভীষণ দিন আসিতেছে। শীঘ্রই ইহার একটা সুব্যবস্থা হইলে ভাল হয়।

বিনীত

শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী,

(ডাক্তার)।

বালিতে ম্যালেরিয়া

শ্রীযুক্ত স্বাস্থ্য-সমাচার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

আমি স্বাস্থ্য সমাচার পাঠ করিয়া আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বেশী দূর পল্লীগ্রামে যাইতে হইবে না,—কলিকাতার অতি সন্নিকটে ছোট ছোট সহরগুলি দেখুন, যে স্থানে এম-এ, বি-এ পাশ করিয়া চেয়ারম্যান ও কমিশনার হইয়াছেন,—তথায় ম্যালেরিয়ার জ্বালায় বাস করা দায়। আরও দূর পল্লীগ্রামে তো হইবেই—তাহার আর আশ্চর্য্য কি। যাঁহারা চেয়ারম্যান ও কমিশনার হইয়াছেন তাঁহাদের কাজ—যখন কমিশনার হইবেন তখন প্রতি লোকের বাটী বাটী গিয়া খোসামোদ করিয়া কোন রকমে একবার কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিলে হয়। তাহার পর তাঁহারা আর দুস্থঃ প্রজার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। দেশের অবস্থা শুনুন। ড্রেণে জল নিকাশ হয় না। এই বর্ষাতে জল হইতেছে; ড্রেণে এক কোমর জল। সেই জল চৈত্র মাসে শুকাইবে আর জঙ্গল জমী সেঁতসেঁত করিতেছে। মোটে রৌদ্র প্রবেশ করে না। প্রত্যেক বাড়ীতে সমস্ত লোক বিছানাতে শয্যাগত—কে কাহার মুখে জল দেয়। কর্ত্তৃপক্ষকে বলা হইল যে, ড্রেণের জল যাহাতে নিকাশ হয় তাহার ব্যবস্থা করুন; তাহা না হইলে লোকের গ্রামে বাস করা দায়। ম্যালেরিয়াতে মারা যাইতেছি। তাহার উত্তরে তাঁহারা বলেন, গ্রামের ওদিকে প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া হয়; উহাদের জ্বরে ভোগা অভ্যাস আছে; উহারা ভুগিবেই। আর যদি বলা হয় 'মহাশয়গণ একবার স্বচক্ষে দেখিবেন চলুন', উত্তরে তাঁহারা বলেন, ওদিকে যে ম্যালেরিয়া, ওদিকে যাইলেই আমাদের ম্যালেরিয়াতে ধরিবে। যে গ্রামের

কথা লিখিতেছি, তাহা গঙ্গার ধারে। গঙ্গার ধারে তত ম্যালেরিয়া নাই, গ্রামের ভিতরে যত। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, কিরূপে দেশের লোকের উন্নতি হইবে। যাঁহারা নিজেরা যেখানে বাস করেন, সেই স্থানের স্বাস্থ্য ভাল করিতে পারেন না—কি করিলে গ্রামের উন্নতি হইবে তাহা ভাবিয়া যাঁহাদের ঘুম হয় না, তাঁহারা আবার সমস্ত দেশের ভাল করিতে চান। এই তো শিক্ষা! হায় হায়, নিজের দেশের লোক যে রোগের জ্বালায় অস্থির—চিকিৎসা বিহনে ভবপারে যাইতেছে—তাহার খোঁজ রাখিবার সময় তাঁহাদের নাই। আমি যে গ্রামের কথা লিখিতেছি তাহার নাম বালী। হাবড়া জেলার মধ্যে অবস্থিত।

বিনীত

শ্রীঅস্থিচর্ম্মসার ম্যালেরিয়া পীড়িত।

প্রশ্ন ও উত্তর।

প্রশ্ন—

দীর্ঘ কাল হইতে Dumbbell exercise, বুক ডন্, বইঠকী প্রভৃতি করিয়া আসিতেছি। এতৎ সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত। কোন সময় এই সমস্ত ব্যায়ামের প্রশস্ত সময়?

উত্তর—

প্রাতঃকালে কোন কিছু খাইবার পূর্ব্বে ব্যায়াম করা উচিত।

প্রশ্ন—

এই সমস্ত ও এতজ্জাতীয় অন্যান্য ব্যায়ামের পরই স্নান করা কর্ত্তব্য কি না? কর্ত্তব্য না হইলে ব্যায়ামের কতক্ষণ পরে স্নান করা যুক্তি ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্মত?

উত্তর—

ব্যায়ামের অব্যবহিত পরে স্নান করা উচিত নহে। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল বিশ্রাম করিয়া স্নান করিলে শরীর স্নিগ্ধ হয়। স্নান দ্বারা ত্বক্ পরিষ্কার হয় বলিয়া লোমকূপগুলি স্বাভাবিক ভাবে শরীর হইতে দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া দেয়।

প্রশ্ন—

ব্যায়াম কতক্ষণ করা কর্ত্তব্য? শরীরে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতে থাকিলে বন্ধ করা উচিত, না কখন? স্বভাবতঃ যাহার সর্ব্বদাই ঘর্ম্মপাত হইতে থাকে, তাহার পক্ষে কিরূপ ও কতক্ষণ কি ভাবে ব্যায়াম কর্ত্তব্য?

উত্তর—

নিজের ক্ষমতা অনুসারে ১০ মিনিট হইতে ২০।২৫ মিনিট পর্য্যন্ত ব্যায়াম করিলেই যথেষ্ট হয়। ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইলেই যে যথেষ্ট ব্যায়াম হইয়াছে মনে করিতে হইবে, এমন নহে; কারণ, গ্রীষ্মকালে অল্প ব্যায়ামেই ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইয়া থাকে। যখন ব্যায়াম করিয়া ক্লান্তি বোধ হইবে এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হইবে, তখন ব্যায়াম স্থগিত রাখা উচিত।

প্রশ্ন—

চোখ উঠে কেন? এবং ইহার ফলপ্রদ ঔষধই বা কি?

উত্তর—

নানা প্রকার দূষিত বীজাণু হইতে সাধারণতঃ চোখ উঠিয়া থাকে। ধূলা ধোঁয়া প্রভৃতি দূষিত পদার্থ

হইতেও চোখ উঠিতে পারে। চোখ উঠা বড় সংক্রামক রোগ। সেইজন্য রোগীর ব্যবহৃত গামছা বা তোয়ালে হইতে চোখ উঠিতে পারে। ভাল গোলাপ জল বা বোরিক এসিড্ লোসন ১০০ ভাগে জলে ৪ ভাগ পরিমাণ 4 (per cent) দিয়া চোখ ধৌত করিবেন।

চক্ষে যদি বেশী পিঁচুটি পড়ে তাহা হইলে দিবসে দুইবার নিম্নলিখিত ঔষধ চোখে দুই চার ফোঁটা দিতে পারেন।

Solution Protragal (4-5 per cent) বা Solution of Zinc Sulphate (½ per cent).

তৎপরে চক্ষুতে কাল চশমা (Smoked glass) কিংবা কোনরূপ ঠুলি দিয়া আবৃত রাখিবেন। চোখের পাতা যদি জুড়িয়া যায় তাহা হইলে রাত্রিকালে চোখের পাতায় অল্প পরিমাণ Boro vaseline মলম লাগাইয়া দিলে সকালে চোখের পাতা খুলিতে কোন কষ্ট হয় না।

প্রশ্ন—

আধ-কপালি বা আধ-মাথাধরার কারণ কি? এবং ইহার ঔষধই বা কি?

উত্তর—

অনেক সময় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ও দন্তরোগ হইতে আধকপালে হইয়া থাকে। এই সকল স্থলে তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যে স্থলে কোনই রোগ দেখা যায় না সেখানে কিজন্য আধকপালে হয় তাহা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু এইরূপ অনুমান হয় যে শরীর মধ্যে দূষিত পদার্থ প্রবেশ করিয়া আধ-কপালের উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য।

প্রাতঃকালে স্নানান্তে ভালচিনি চন্দনের ন্যায় ঘষিয়া কপালে প্রলেপ দিলে আধকপালের ব্যথা কমিয়া যায়। চোখে কাল চশমা পরিলে আরাম পাইতে পারেন।

প্রশ্ন—

নখকুণি হওয়ার কারণ কি? এবং ঔষধই বা কি?

উত্তর—

যে কারণে অন্যান্য স্থলে ফোড়া হইয়া থাকে সেই কারণে নখকুণি হইতে পারে। কোনরূপ কাঁটা কিংবা নখের কোণের ময়লা ত্বক্‌নিম্নে প্রবেশ করিলে নখকুণি হইয়া থাকে। গরম জলের কিংবা নূনের পুঁটলির তাপ দিলে নখকুণি ভাল হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে যদি না কমে তাহা হইলে ডাক্তার ডাকিয়া অস্ত্র করাইয়া লওয়া উচিত।

প্রশ্ন—

চুল উঠা নিবারণের কোনও সহজ উপায় আছে কি? বাজারের সুদীর্ঘ বিজ্ঞাপন সম্বলিত অনেক তেলই পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে তাহাতে উপকারের পরিবর্ত্তে বরং স্বাস্থ্য নষ্ট ও চুল উঠা বৃদ্ধির আরোও সাহায্য করিয়াই থাকে। একাধারে স্বাস্থ্যরক্ষক অথচ চুল উঠা নিবারক কোনও কেশতৈল আপনার জানা আছে কি?

উত্তর—

আমাদের এরূপ কোন কেশ তৈলের কথা জানা নাই। অনেক সময় শরীরগত রোগ যথা সিফিলিস্ বা পারার রোগ, কালাজ্বর হইতে চুল উঠিয়া যায়; সেই স্থলে এই সকল রোগের চিকিৎসা করিলে পুনরায় চুল উঠিতে থাকে।

প্রশ্ন—

আজ কাল অনেকেরই হাত এবং পায়ের তলা ২৪ ঘণ্টা স্বভাবাতিরিক্ত গরম থাকে; কখন কখনও প্রায়ই হাত পা জ্বালা করে। সাধারণ ভাবে ইহার জন্য কেহই কোনও ঔষধ ব্যবহার আবশ্যক মনে করেন না। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে কিরূপ অপকারী? এবং ইহা নিবারণের কোনও প্রক্রিয়া আপনার জানা থাকিলে লিখিবেন।

উত্তর—

পিত্তাধিক্য হইতে হাত পা জ্বালা করিয়া থাকে। নিয়মিত সময়ে আহার করিলে এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিলে হাত পা জ্বালা কমিয়া যায়। তিক্ত পদার্থ বা ত্রিফলার জল খাইলে পিত্ত নাশ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—

কাজের সুবিধা বিবেচনায় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া দিনে ৯।১০ টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী কি? রাত্রি জাগরণ সাধারণতঃ অপকারী এবং দিবা নিদ্রাও স্বাস্থ্যনষ্টকারী; কিন্তু ইহা অভ্যাসাধীন করিয়া ফেলিলেও অপকার সাধিত হয় কি?

উত্তর—

অবশ্য যাহার এইরূপ অভ্যাস তাহার কোন স্বাস্থ্যহানি হয় না। কিন্তু সাধারণতঃ রাত্রি জাগরণে ও দিবা নিদ্রায় স্বাস্থ্যের হানি হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—

আমার একজন ডাক্তার বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, বাম হাতের তলার ঘ্রাণ লইলে বমি হয় না। ইহা কতদূর সত্য? এ সম্বন্ধে কোনও বৈজ্ঞানিক যুক্তি আপনার জানা আছে কি?

উত্তর—

এরূপ কিছু শুনি নাই।

আলোচনা।

গ্রীসের রাজার মৃত্যু।—

বানরের কামড়ে গ্রীসের রাজার মৃত্যু হইয়াছে। বানরের দংশনের ফলে সাধারণতঃ মানুষ মরে না। কিন্তু এক্ষেত্রে গ্রীসের রাজার যে মৃত্যু হইল সে সম্বন্ধে চিকিৎসকেরা বিচিত্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন চিকিৎসক বলিয়াছেন যে, বানরটি ক্ষিপ্ত ছিল। সে স্বাভাবিক ভাবে এই রোগাক্রান্ত হয় নাই। কুচক্রী লোকে ক্ষেপা কুকুরের দেহের বিষ লইয়া ঐ বানরটির গায়ে টিকা দিয়াছিল,—উদ্দেশ্য, গ্রীসের রাজা ঐ ক্ষেপা বানরের দ্বারা দংশিত হইয়া প্রাণ হারাইবেন। ফলেও হইল তাহাই। অথচ, এই দুর্দ্দান্ত অপরাধী লোকটার কেহ কোন সন্ধান পাইল না। এমন একটা মহাপাপ করিয়াও সে নিরাপদ রহিল। আর, ইয়োরোপীয় রাজনীতি কি ভয়ানক জটিল! সেখানকার রাজনীতিকদের চক্রান্তের বহর কি গভীর!

লণ্ডনে মহামারী।—

লণ্ডনে এবার হঠাৎ ডিপথেরিয়া ও স্কারলেট ফিভার এত প্রবল হইল কেন? অন্যান্য বৎসর এই সময়ে এই দুই রোগে যত লোক আক্রান্ত হয়, এবার তাহার দ্বিগুণ লোক এই দুই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। হাসপাতালসমূহে এখন সাতহাজার পাঁচশত রোগী অবস্থান করিতেছে—আর রোগীকে আশ্রয় দিবার স্থান নাই। ব্যাপারখানা কি? তবে আশ্বাসের কথা এই যে, রোগ যেমন বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, ততটা মারাত্মক হইতে পারে নাই। সে যাহাই হউক লণ্ডনের মত সহরে এ রকম ব্যাপার ঘটে কেমন করিয়া, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। লণ্ডনের দশাই যখন এইরূপ, তখন কলিকাতায় কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা মধ্যে মধ্যে প্রবল হইয়া বিলক্ষণ লোকক্ষয় করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

কর্কের মেয়র।—

আয়ারল্যাণ্ডের অন্তর্গত কর্ক নগরের লর্ড মেয়র রাজনীতিক অভিযোগে বন্দী হইয়াছিলেন; জেলে অবস্থান কালে তিনি অন্ন ত্যাগ করেন; ইচ্ছা, প্রায়োপবেশন করিয়া দেহত্যাগ করিবেন। তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে,—৭৪ দিন উপবাসের পর তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই ৭৪ দিন তিনি কেবল জল ছাড়া আর কিছুই গলাধঃ করেন নাই। ইহাতে জনসাধারণ এবং চিকিৎসকেরা পরম বিস্মিত হইয়াছেন। কেবল মাত্র জলপান করিয়া যে মানুষ এতদিন জীবিত থাকিতে পারে, ইহা কেহ সহসা বিশ্বাস করিতে চাহিতেছেন না। প্রসঙ্গ ক্রমে আরও অন্যান্য যে সব লোক উপবাস করিয়াও দীর্ঘকাল জীবিত ছিল, এমন অনেক লোকের বিবরণ প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, কর্কের মেয়রের উপবাস করিয়াও ৭৪ দিন জীবিত থাকা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কারণ, কেবল মাত্র জল পান করিয়া তাঁহার অপেক্ষাও বেশী দিন জীবিত ছিল, এমন লোকের বিবরণ জানিতে পারা গিয়াছে। সে যাহাই হউক, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সেবকগণের মধ্যে এই রহস্য অনুসন্ধানের চেষ্টা হইতেছে। ভারতের অনেক যোগী যোগ অভ্যাসের ফলে দীর্ঘকাল ভূগর্ভে অবস্থান করিতেন। এই সময়ে তাঁহারা যোগ নিদ্রায় অভিভূত থাকিতেন; কোন খাদ্য, পানীয়, এমন কি নিশ্বাস পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন না। অতএব, ঠিক কোন কারণে মানুষ এরূপ অবস্থায় বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা হইতেছে। অনেকের মত এই যে, কর্কের মেয়র এই ৭৪ দিন অসাড় ভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতেন। কিছু মাত্র অঙ্গ-সঞ্চালন না করায় তাঁহার শরীরের ক্ষয় হইত না; এবং তাহা পূরণের নিমিত্ত খাদ্য গ্রহণের আবশ্যকতাও ছিল না। কিন্তু এই মত সর্ব্ববাদীসম্মত নহে। এখনও এ সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই।

গোরু রপ্তানী।—

কথা উঠিয়াছে, ভারতবর্ষ হইতে বহু গাভী ভারতের বাহিরে রপ্তানী হইতেছে। এই গাভী রপ্তানীর উদ্দেশ্য কি,—গোমাংস ভক্ষণ, কিম্বা গো-পালন পূর্ব্বক গব্য উৎপাদন,—তাহা প্রকাশ পায় নাই। উদ্দেশ্য যাহাই হউক, কিছু কিছু গোরু যে রপ্তানী হইতেছে তাহা সত্য বলিয়াই মনে হয়। এই বিষয় লইয়া সংবাদপত্রে জোর আন্দোলন চলিতেছে; সভাসমিতিতে তীব্র প্রতিবাদ হইতেছে; লাট কাউন্সিলে আলোচনা চলিতেছে এবং রপ্তানী বন্ধ করিবার জন্য সরকারের নিকট প্রার্থনা এবং উপরোধ অনুরোধও করা হইতেছে। আমাদের মনে হয়, দেশবাসীর এই আন্দোলন অন্যায় নহে; এবং বেশী পরিমাণে গোরুর রপ্তানী হইলে তাহা আতঙ্কের বিষয় বটে। কারণ, এদেশে গোমাংস ভক্ষক লোকের অভাব নাই; সে জন্য বর্ষে বর্ষে কত লক্ষ গোরু যে বধ করা হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। তাহার উপর যদি গোরু রপ্তানী করা হয়, তাহা হইলে লোকে কি খাইয়া বাঁচিবে? চাউল ও গমের মূল্য অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ার দরুণ লোকের কষ্টের সীমা নাই। মৎস্যও বিলক্ষণ দুষ্প্রাপ্য। বাকী দুগ্ধ ও ঘৃত—এই দুই গব্য আমাদের প্রধান খাদ্য। কিন্তু গোহত্যার জন্য এই দুইটী জিনিস এমন দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে যে, সাধারণের পক্ষে তাহা সংগ্রহ করা কঠিন। ইহার উপর রপ্তানীর ধাক্কা এ দেশবাসী কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারিবে না। কোথায় গোহত্যা সংযত করিয়া গোজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যোন্নতি করিয়া যাহাতে গব্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া সুলভ ও সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে সহজ লভ্য হয় তাহার চেষ্টা করা হইবে, না, বিদেশের প্রয়োজনে আমাদের এই অতি প্রয়োজনীয় সহায়কে রপ্তানী হইতে দেওয়া হইতেছে। ইহা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়; এবং ইহাতে ভারতবাসীর আতঙ্কিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। গোরু ভারতবর্ষ হইতে অন্যদেশে

রপ্তানী করা ত দূরের কথা, যেখানে উত্তম দুগ্ধবতী ও স্বাস্থ্য সম্পন্ন গোরু সুলভ ও প্রচুর সেই সব দেশ হইতে ভারতে গোরুর আমদানী করিয়া ভারতীয় গোধন বৃদ্ধি এবং গোজাতির উন্নতির চেষ্টা করা উচিত। আমরা আশা করি, কর্ত্তৃপক্ষ প্রজার উচিত দাবী মঞ্জুর করিবেন,—ভারতবর্ষ হইতে গোরুর রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিবেন।

পাটে স্বাস্থ্যনাশ।—

বাঙ্গলার মফস্বলে যে যে কারণে স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়া থাকে, তন্মধ্যে যেখানে সেখানে পাট পচানো একটা প্রধান কারণ। দৈনিক প্রভাতী সহযোগিনী অমৃত বাজার পত্রিকা অভিযোগ করিতেছেন যে, কপোতাক্ষী নদীটি ঝিকরগাছার উত্তর হইতে বহু দূর পর্য্যন্ত পাট পচানোর ফলে অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। এই নদীর জল উভয় তীরবর্ত্তী গ্রামের বহু সহস্র লোক স্নান ও পান এবং রন্ধনার্থ ব্যবহার করিয়া থাকে। এ অঞ্চলে অন্য কোন জলাশয় নাই। এই কপোতাক্ষীর জলই লোকের একমাত্র অবলম্বন। তথাপি পাট পচাইয়া ইহার জল নষ্ট করা হয় কেন? প্রকাশ যে, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড নদীর এই অংশ পানীয় জলের জন্য রিজার্ভ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন; তাহা সত্ত্বেও চাষারা এখানে পাট পচায় কেন? নিরীহ গ্রাম বাসীদের কি মা বাপ নাই? পাট পচানোর দরুণ জলে দুর্গন্ধ হইয়াছে; জলের রং লাল হইয়া উঠিয়াছে। ফলে জল একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। জল এমন পচিয়া উঠিয়াছে যে মাছেরা পর্য্যন্ত মরিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে। উঃ! কি ভয়ানক অবস্থা! ইহার ফলে যদি ঐ অঞ্চলে কলেরা ও অন্য রোগে হাজার হাজার লোক মরে তবে সে জন্য কে দায়ী? মরিতে ত যাহারা পাট পচাইতেছে সেই চাষারাই আগে মরিবে! শুধু এ বৎসর নয়—বৎসর বৎসরই এইরূপ কাণ্ড হইয়া আসিতেছে। এরূপ অবস্থায় পল্লীগ্রামগুলি যে ক্রমে জনশূন্য হইয়া পড়িবে, তাহা আর বিচিত্র কি? জেলাবোর্ড কপোতাক্ষীকে রিজার্ভ বলিয়া ঘোষণা করিয়াও যদি ইহার প্রতিকার করিতে না পারেন তবে তাহার থাকা না থাকা সমান কথা। গতিক দেখিয়া মনে হয়, পাটই যেন দেশের সর্ব্বস্ব, মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য যেন কিছুই নয়। পাট পচাইয়া দেশের স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলা হইতেছে। অথচ পাট বেচিয়া চাষা তেমন অর্থও পাইতেছে না। চাষাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া পাটের মহাজন ও কলওয়ালারা তাহার সমস্ত লাভ ভোগ করিতেছে। বোকা চাষাদের এই কথাটি বুঝাইয়া দিবার কি কোন উপায় নাই? পাট পচাইবার অন্য কোন রূপ ব্যবস্থা করিয়া দেশের স্বাস্থ্যরক্ষা করা অতীব আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৯ম বর্ষ | পৌষ, ১৩২৭ সাল | ৯ম সংখ্যা

ছেলেদের দুষ্টামি।

জন্মাবধি কোন কোন ছেলে শান্ত, শিষ্ট, সুবোধ বলিয়া সকলের প্রশংসা লাভ করে; আবার কোন কোন ছেলে জন্মাবধিই দুষ্ট বলিয়া লোকের বিরাগভাজন হয়ে উঠে। অনেক সময়েই আঁতুড়ের খোকা-খুকিদের সম্বন্ধেও লোকের মুখে এই রকম মন্তব্য শুনা যায়,—"আহা, ছেলেটি কি শান্ত! মা ছেলেকে যেমন ভাবে শুইয়ে রেখে দিয়েছে, চুপটি করে শুয়ে আছে। কাঁদে না, মাকে একটুও কষ্ট দেয় না। আহা! কি শান্ত ছেলে, দেখলে চোখ জুড়োয়!" অথবা,—"কি দুষ্টু ছেলে রে বাবা! মা ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে রেখে একবারটি নড়েছে, আর ওমনি, চোখের পাতা ফেল্‌তে না ফেল্‌তে, ছেলে চীৎকার যুড়ে দিয়েছে,—'ওঁয়া'! এমন দুষ্টু ছেলে আমাদের বাপের জন্মেও কখনও দেখিনি! বাবা—বাবা!"

কিন্তু ছেলেদের শান্ত ও দুষ্টু স্বভাবের উপলক্ষে আমরা সচরাচর একটা মস্ত ভুল করে থাকি। আঁতুড় ঘর থেকেই যে ছেলে শান্ত-শিষ্ট বলে' প্রশংসা লাভ করে, তার স্বভাবটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। কেন না, দুষ্ট হওয়াই ছেলেদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। এমন অস্বাভাবিক যে, ছেলে দুষ্টু না হয়ে শান্ত হলে' তার কারণ অনুসন্ধান করা দরকার হয়ে পড়ে, এবং ছেলেদের খুব শান্ত হওয়ার পিছনে একটা মস্ত বড় গুরুতর কারণও থাকা সম্ভব। সে কারণটা হচ্চে, তার জীবনী-শক্তির অভাব বা অল্পতা। কারণ, যে ছেলের মধ্যে জীবনী-শক্তি যতটা বেশী পরিমাণে থাকে, সে ছেলে ততটাই দুষ্টু ও হয়ে থাকে। ছেলেদের ভিতরের জীবনী-শক্তি দুষ্টামির আকারেই বাহিরে প্রকাশ পেয়ে থাকে। সুতরাং যখন দেখা যায়, ছেলেদের পক্ষে যেটা খুব স্বাভাবিক—দুষ্টামি করা, কোন ছেলে আদৌ সে রকম দুষ্টামি করিতেছে না, তখন তার স্বভাব খুব শান্ত মনে করে উৎফুল্ল হওয়ার পরিবর্ত্তে, তার জীবনী-শক্তির অভাবের বা অল্পতার কথা চিন্তা করে, তার হিতৈষী আপনার জনের পক্ষে উদ্বিগ্ন হওয়াই উচিত; এমন কি, কোন বহুদর্শী সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়াও দরকার হতে পারে।

কিন্তু সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং। ছেলেরা দুষ্টু হবে বলেই যে অতিমাত্রায় দুষ্টামি করে বেড়াবে, এটাও ঠিক স্বাভাবিক নয়। দুষ্টামির মাত্রাধিক্যও কম

উদ্বেগের কারণ নয়। যে হেতু, ছেলেদের দুষ্টামি মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে, বুঝতে হবে, সেটা অস্বাভাবিক এবং তাহার একটা কারণও আছে। সেটাও তাহাদের মানসিক স্বাস্থ্যের অভাব। এটি মনস্তত্ত্ব-ঘটিত ব্যাপার। এই অস্বাভাবিক দুষ্টামির গোড়া হইতে প্রতিকার না হইলে, ক্রমে তাহা তাহার স্বভাবে দাঁড়াইয়া যাইবে। তাহার ফলে, পরিণত বয়সে সে ঘোর দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিবে, নানারূপ অপরাধের অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে, সমাজের পক্ষে ভীতির কারণ হইয়া উঠিবে, সর্ব্বদা আইন লঙ্ঘন করিবে, এবং ধরা পড়িলে দণ্ডিত হইতে বাধ্য হইবে।

লোকে আইন লঙ্ঘন করিয়া যে সকল অপরাধ করে, তাহাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (১) সাময়িক; (২) স্বাভাবিক। সাময়িক উত্তেজনার ফলে লোকে খুন জখম করিয়া ফেলিতে পারে; দারিদ্র্য, অভাবজনিত ক্ষুধার তাড়নায় লোকে মুহূর্ত্তের দৌর্ব্বল্য বশতঃ চুরি ডাকাতিও করিতে পারে। এই রকম অপরাধগুলিকে প্রথম শ্রেণীর কোটায় ফেলা যায়। আর, চুরি ডাকাতি যাহাদের পেশা, নরহত্যার পর নরহত্যা করিতে যাহারা একটুও কুণ্ঠিত হয় না, সে রকম অপরাধীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথম শ্রেণীর অপরাধীরা প্রথম অপরাধ অনুষ্ঠান করিবার সময় যথেষ্ট ইতস্ততঃ করে, অথবা অপরাধ অনুষ্ঠানের পর মনে মনে যথার্থই অনুতপ্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অপরাধীদের সে সকল বালাই মোটেই নাই। যাঁহারা অপরাধ অনুষ্ঠান প্রবৃত্তির আলোচনা করেন, তাঁহারা অনেক গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন যে, স্বভাবতঃ সচ্চরিত্র লোকেরা সাময়িক দৌর্ব্বল্য বশতঃ কোন অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়া বসিলে তাহাদের সংশোধন করা কঠিন নয়। একটু আধটু শাস্তি (না হইলেই ভাল), অথবা কিছু সদুপদেশ দিলে তাহারা অল্পেই শোধরাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রায় দেখা যায়, অনেক লোক এমন আছে কারাদণ্ডের ফলেও তাহাদের স্বভাব সংশোধিত হয় না। তাহারা পুনঃ পুনঃ একই রকম অপরাধের অনুষ্ঠান করে থাকে। এ রকম অপরাধীদের মনের অবস্থার এমন শোচনীয় অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে তাদের শৈশব জীবনটা পর্য্যন্ত টান দিতে হয়। দেখা যায়, তাদের মনে অপরাধ করিবার প্রবৃত্তির বীজ সেই শৈশব কালেই আঁতুড় ঘরেই উপ্ত হয়েছিল। সময়ে সে বীজ নষ্ট করা হয় নি—অঙ্কুরেই তা তাদের মন থেকে উপড়ে ফেলা হয় নি। কাজেই এখন তারা সংশোধনের বাইরে গিয়ে পড়েছে।

আজকাল ইয়োরোপময়—ইয়োরোপের প্রায় সকল দেশের উপর দিয়েই একটা অপরাধের ঢেউ (crime wave) বয়ে যাচ্চে। যুদ্ধের পর থেকেই এটা বেশী পরিমাণে লক্ষ্য করা যাচ্চে; কিন্তু, আমাদের মনে হয়, এটার আরম্ভ হয়েছিল যুদ্ধের আগে থেকেই; কারণ, এতগুলো দেশের এত লোক যে এতদিন ধরে এক একটা জাতির পক্ষে এমন জীবন মরণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, এটাকে কিছুতেই স্বাভাবিক ব্যাপার বলা যেতে পারে না। এটাকে ঠিক অপরাধ প্রবৃত্তি বলতেই যে হবে তার কোন মানে নেই; কিন্তু এটা যে স্বাভাবিকও নয়, সে কথাটাও খুব সত্য। কারণ, স্বাভাবিক হলে ত লোকে চিরদিনই যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়েই থাকত। যাই হোক, এখন ইয়োরোপে অন্য সময়ের চাইতে অনেক বেশী পরিমাণে লোকে অপরাধের অনুষ্ঠান করচে। তারা সমাজ শাসন মানতে চায় না, দেশের আইনের উপরও তাদের এতটুকু ভক্তি শ্রদ্ধা নেই। কেবল ব্যক্তিগত ও বিচ্ছিন্ন ভাবে নয়—দল বেঁধে, এমন কি জাতিগত সম্মিলিত ভাবেও লোকে নানারকম অপরাধের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েছে। রুষিয়া দেশ ত এখন অরাজক—সেখানে সমাজ নেই, আইন কানুন নেই। লোকের যা খুসী তারা তাই করচে, কেউ মানা করবার, বাধা দেবার নেই। অন্যান্য দেশের অবস্থাও বড় আশাপ্রদ নয়।

ব্যাপার দেখে, চিন্তাশীল, সমাজহিতৈষী লোকেরা বড় বিচলিত হয়ে পড়েছেন। এক সময়ে দেশের

অধিকাংশ লোকের মন কেমন করে এত বিগড়ে গেল, মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা তার কারণ অনুসন্ধান করতে লেগে গেছেন, এবং যেমন আশা করা যায়,—তাঁরা সেই গোড়া থেকে টান দিচ্চেন; অর্থাৎ, শৈশব জীবনের অবস্থা থেকে অনুসন্ধান সুরু করে দিয়েছেন। সম্প্রতি The Child নামক সাময়িক পত্রে এই বিষয়ে The Psychology of the Delinquent Child নামে একটী সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি একটু বড়। সেই জন্য আমরা অল্প অল্প করে তার মর্ম্মটুকু আমাদের পাঠকদের শুনিয়ে রাখব।

প্রবন্ধের লেখক ডাক্তার A. R. Abelson, D.Sc., M.R.C.S., L.R.C.P., এখানে Delinquent কথাটি একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন—আলোচনার সুবিধার জন্যে। অপরাধ দুই রকম; যেমন, চুরি, ডাকাতি, খুন, জখম, লুটপাট, ঘরে আগুন দেওয়া, পরস্ত্রীহরণ প্রভৃতি যেগুলা আইনের আমলে আসতে পারে; আর, মিথ্যা কথা, অলসতা, ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তি, পিতা মাতার, গুরুজনের বা প্রভুর কথার অবাধ্য হওয়া, খারাপ কথা কওয়া প্রভৃতি যেগুলা সচরাচর আইনের আমলে আসে না, অথচ নৈতিক হিসাবে যেগুলাকে অপরাধ শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায়। এই দুই শ্রেণীর অপরাধের কারণ সম্বন্ধেই প্রবন্ধে আলোচনা হয়েছে। আর, শিশু বালক ও যুবক সবাই এই প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়ীভূত হয়ে পড়েছে।

মনস্তত্ত্বের সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধানের পর স্থির হয়েছে যে, দাগী বদমায়েস যারা, তাদের বদমায়েসী আরম্ভ হয়েছে সেই অতি শৈশব কাল থেকেই। অতএব, দেশে অপরাধের মাত্রা কমাতে হলে, আইন অনুসারে কেবল আদালত থেকে দণ্ড দেওয়ালে চলবে না; শৈশব কাল থেকেই প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করতে হবে—কোন শিশুর চরিত্রে অস্বাভাবিক রকম দুষ্টামি ফুটে উঠলে, তার শরীর ও মন ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় আছে কি না, সেটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সোজা-সুজি দুষ্টামি ছাড়া, অনেক শিশু অতি শৈশব কাল থেকেই মিথ্যা কথা বলতে, কিম্বা চুরি চামারি করতে শেখে। এর কারণ অনুসন্ধান করে' গোড়া থেকেই সাবধান হতে পারলে পরিণামে সে দুর্দ্দান্ত অপরাধী হয়ে উঠবে না। কারণ, শিশুচিত্ত অত্যন্ত নমনীয় (কাঁচায় নয়না [নমনীয়] বাঁশ, পাকলে করে ট্যাসট্যাস)। চেষ্টা করলে, তাকে মনের মতন করে গড়ে তুলতে পারা যায়—পরিণামে সে সাধুচরিত্র লোক হতেও পারে।

এটী করতে হলে ছেলেদের মনস্তত্ত্ব ভালরকম করে অধ্যয়ন করতে হয়—এক একটী শিশুর সকল সময়ের মানসিক ভাব ও তাহার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে যেতে হয়। তখন দেখা যায়, অধিকাংশ স্থলেই, ছেলে মেয়েরা শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার দরুণই অপরাধ করিয়া বসে। অনেক পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের পর এই তত্ত্বটুকু নিশ্চিতরূপে স্থির সিদ্ধান্ত হয়েছে। বড় বড় নামজাদা অপরাধীদের শৈশব কালের ইতিহাস অনুসন্ধান করেও এটা জানতে পারা গেছে যে, ছেলে বেলায় তাদের মন সুস্থ ছিল না, কাজেই তারা রীতিমত নীতিশিক্ষা লাভ করতে পারে নি—মানসিক অসুস্থতার দরুণ করবার ক্ষমতাই ছিল না তাদের। যদি ঠিক সময়ে তাদের মনের চিকিৎসা হ'ত, তা হলে হয় ত তারা বেশী বয়সে মন্দ লোক নাও হতে পারত। এ কথাটা আরও সত্য এই কারণে, যে, মানসিক সুচিকিৎসার ফলে অনেক শিশুর অস্বাভাবিক দুষ্টামি করিবার প্রবৃত্তি ঘুচে গিয়ে, সে ভাল ছেলে হয়ে উঠেছে। এমন অনেক সময়ে দেখা গিয়েছে যে, খুব কড়া শাসনে, বা খুব কঠোর দণ্ড দিয়েও যে সব ছেলের বদস্বভাব সংশোধন করতে পারা যায় নি, মানসিক সুচিকিৎসার গুণে সেটা অনেক স্থলে একেবারে সেরে গেছে, আবার কোন কোন স্থলে অনেক উন্নতি হয়েছে।

ছেলেদের দুষ্টামি কেবল মনের অসুস্থতার ফল মনে করলেও ভুল হবে। তাদের শারীরিক অবস্থাও একটা কারণ হ'তে পারে; এবং সে সব জায়গায়

মনের সঙ্গে শরীরেরও চিকিৎসা করা আবশ্যক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এটা প্রত্যক্ষ দেখা গেছে যে, কোন ছেলে টনশিল বা এডেনয়েড রোগে ভুগছিল, আর তার স্বভাবও প্রশংসনীয় ছিল না। ঐ রোগের চিকিৎসা করে আরাম করে দেওয়ার পর থেকে তার দুষ্ট স্বভাবেরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হয়েছে।

পল্লী-সংস্কার

লেখক—শ্রীচক্রধর সাহা।

মল মূত্র।

পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির যে সমস্ত উপায় আবশ্যক তাহার মধ্যে মল মূত্র প্রভৃতি আবর্জ্জনা রাশি স্থানান্তরিত করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা একটী প্রধান। কারণ ঐ সমস্ত আবর্জ্জনাজাত দূষিত বাষ্প ও দুর্গন্ধ বশতঃই পল্লীবাসী নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। পানীয় জলে মল মূত্র প্রভৃতির সংযোগ হেতু জল দূষিত ও বিষাক্ত হয়। বায়ুর সহিত গলিত মল মূত্র ও অন্যান্য আবর্জ্জনাজাত দূষিত বাষ্প মিশিলেই বায়ু দূষিত হয়। খাদ্য দ্রব্যে মল মূত্রের দূষিত ও গলিত অংশের মিশ্রণ বা সংস্পর্শে খাদ্য দ্রব্যও বিষাক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং সেই দূষিত জল, বায়ু ও খাদ্য গ্রহণ করিয়া পল্লীবাসী ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া পড়ে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে সহর অপেক্ষা পল্লী অঞ্চলে লোক সংখ্যার অল্পতা ও ঘন-সন্নিবিষ্ট বাস স্থানের বিরলতা প্রযুক্ত জল, বায়ু ও খাদ্য দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। সর্ব্বত্রই বিস্তৃত মাঠ ও বহু বৃক্ষ, লতা, গুল্ম বর্ত্তমান থাকাতে বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব পল্লী অঞ্চলে প্রায়ই হয় না। লোক সংখ্যার অনুপাতে বিস্তৃত ও মুক্ত স্থান পল্লী অঞ্চলে অনেক রহিয়াছে। মানুষের প্রশ্বাস বায়ু ও মল মূত্রের দূষিত বাষ্প ও দুর্গন্ধের দ্বারা বায়ু যতটা দূষিত হয়, পল্লী অঞ্চলে বায়ুর শোধন কার্য্য প্রাকৃতিক নিয়মেই তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। তথাপি মল মূত্রের দ্বারা যে পরিমাণে পল্লীভূমির জলবায়ু ও খাদ্য দূষিত ও বিষাক্ত হইয়া থাকে, ততটাও যাহাতে না হইতে পারে তাহাই তো আমাদের সর্ব্ব প্রযত্নে করা কর্ত্তব্য।

স্বাস্থ্যের অনুকূল বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত পাইখানা ও মূত্রত্যাগের স্থান নির্ম্মাণ করিয়া লইতে পারিলে ও যেখানে সেখানে মল মূত্র ত্যাগ করিতে নিবৃত্ত থাকিলেই পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য বিষয়ে বহু উন্নতি সাধিত হইতে পারে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, কি প্রণালী অবলম্বন করিলে পাইখানা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অনুমোদিত হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে পল্লী অঞ্চলের অনেক স্থানেই মুক্ত বায়ুতে মাঠে ঘাটে ও রাস্তার পার্শ্বে ও জলাশয়ের তীরে এবং বাসস্থানের গলি ঘুঁজিতে যথেষ্ট রূপে পল্লীবাসী স্ত্রী পুরুষ মল মূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে। কেবল সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে, বিশেষতঃ অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদিগের মলত্যাগের জন্য লোকে আপনার অবস্থানুসারে পাইখানা প্রস্তুত করিয়া থাকে। ধনবান লোকেরা ইট চুণ সুরকি যোগে পাকা পাইখানা, মধ্যবিত্ত লোকেরা টিন, প্রভৃতি দ্বারাও বেশ একপ্রকার স্থায়ী পাইখানা প্রস্তুত করে ও গরীব ভদ্র লোকেরা বাঁশ কাঠ প্রভৃতি উপকরণে কোনরূপে পাইখানার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে গরীব দুঃখী অপর সাধারণ লোকে পাইখানা প্রস্তুত করিতে না পারিয়া যে মাঠে, ঘাটে যেখানে সেখানে মলত্যাগ করিয়া ভূমি ও বায়ু দূষিত করিয়া থাকে, তদপেক্ষা উপরোক্ত রূপ পাইখানা দ্বারাও বিশেষ

কিছুই লাভ হয় না। বরং এক স্থানে ক্রমাগত বহু লোক বহু কাল মলত্যাগ করাতে পুঞ্জীকৃত মল পচিয়া সেই সব পাইখানার চারিদিকে অনেক ভূমি ও বায়ু মণ্ডল অধিকতর দূষিত ও বিষাক্ত করিয়া ফেলে। সেই মলের রাশিতে কত অসংখ্য কৃমি জন্মে তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। সে দৃশ্য কল্পনার চক্ষে দেখিতেও ধিক্কার উপস্থিত হইয়া থাকে। সেখানকার গলিত বহু কালের মলরাশি হইতে দূষিত বাষ্প উঠিয়া বায়ু দূষিত করে ও কৃমি, মক্ষিকা পিপীলিকা প্রভৃতি দ্বারা সাক্ষাৎভাবে সেই মলের অণু পরমাণু গৃহে খাদ্য দ্রব্যে নীত হইয়া খাদ্য দূষিত হইয়া পড়ে। বায়ু প্রবাহে ধূলিকণার আকারেও সেই বিষ নিশ্বাস পথে লোকের শরীরস্থ হয়। কোন কোন গৃহে এরূপ পাইখানার মল অদৃশ্য করিবার জন্য কূপের উপরে পাইখানা প্রস্তুত করে। সাক্ষাৎভাবে ও কল্পনার চক্ষে সেই কূপের ভিতরের দৃশ্য অবলোকন করিলে কেমন ধিক্কারজনক ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা ভুক্তভোগী সকলেই জানেন।

এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট স্থানে অবাধে ও অবিচারে সর্ব্বদা মল মূত্র ত্যাগ অথবা পরিত্যক্ত মলরাশির কোন সুব্যবস্থা না করিয়া উক্তরূপ পাইখানা প্রস্তুত করা উভয়ই স্বাস্থ্যের পক্ষে সমধিক বিঘ্ন ও হানিজনক। তবে এরূপ উভয়-সঙ্কটে পল্লীবাসীর উপায় কি? কোন্ পথে চলিলে এই অনিবার্য্য প্রয়োজন সিদ্ধি,—প্রকৃতির আহ্বানে যথা সময়ে সাড়া প্রদান—অথচ মল মূত্রের দ্বারা জল, বায়ু ও খাদ্য দূষিত না হইতে পারে সেরূপ সুব্যবস্থা হইতে পারে? যদি আমাদের সরকারী বড় বড় স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারীরা পল্লীগ্রামের জন্য সহজ, সুলভ ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর পাইখানা নির্ম্মাণের পথ ও কৌশল প্রদর্শন করেন, অথবা আমাদের দেশীয় নেতারা এ বিষয়ে মনোযোগী হন, তবে এক দিনে না হইলেও ক্রমশঃ এই সমস্যার একটা সমাধান হইতে পারে। যত দিন সেরূপ কিছু না হইতেছে, ততদিন যাহাতে পল্লীবাসীরা আপনাদের পরিবারের মল মূত্রের এখন কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন যাহাতে প্রতি দিনের প্রতি পরিবারের পরিত্যক্ত মল মূত্র আপন আপন গৃহ সংলগ্ন উদ্যান ও ক্ষেত্র সমূহের ভূমিতে প্রোথিত ও অদৃশ্য হইতে পারে, তবেই বহু কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। ইহাতে আর একটী লাভ এই হইবে যে এক দিকে মল মূত্রও যেমন জল বায়ু ও খাদ্য সাক্ষাৎভাবে দূষিত করিতে পারিবে না, অপর দিকে জমিতে ঐ সমস্ত দ্রব্য প্রোথিত হইলে জমিও ক্রমশঃ অধিকতর উর্ব্বর ও ফলপ্রসূ হইবে। শিক্ষিত ভদ্র লোকেরা অশিক্ষিত জন সাধারণকে এই বিষয়ে উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা পথ প্রদর্শন করিলে ক্রমেই আশানুরূপ ফল দেখিতে পাইবেন। শুনিয়াছি, দক্ষিণ ভারতে এইরূপ মলের ব্যবস্থা করিয়া অনেক স্থানে সার প্রস্তুত ও তাহা বিক্রয় করিয়া লোকে লাভবান হইয়া থাকে। আমাদের স্থিতিশীল বঙ্গদেশে ততটা গতি-শীলতা শীঘ্র আশা করা যাইবে না, এইটী দুঃখের বিষয়। বাঙ্গালী জাতি এত শীঘ্র এরূপ জাগ্রত হইলে এই যে দেশব্যাপী রোগ বাহুল্য ও বিকট অকাল-মৃত্যু আমাদের জাতিকে গ্রাস করিতে উদ্যত তাহাও অনেক পরিমাণে নিবৃত্ত হইতে পারে।

বর্ত্তমান বর্ষের ভাদ্র সংখ্যার "স্বাস্থ্য সমাচার" পত্রে "হুক ওয়ারম্" প্রবন্ধের শেষ ভাগে যে "একোঁয়া প্রিভি" ও ডাঃ গ্রিকেন আবিষ্কৃত "কমনসেন্স্ পিট প্রিভির" উল্লেখ আছে, উক্ত উভয় প্রকার পাইখানার বিশেষ বিবরণ, মূল্য ও প্রাপ্তি স্থানের উল্লেখ উক্ত প্রবন্ধের লেখক মহাশয় অথবা অন্য কেহ স্বাস্থ্য সমাচারে বিস্তৃত ভাবে করিলে অনেকেই পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইতেন। এতদ্ব্যতীত গত ১৯১৮ খ্রীঃ ৩০শে ডিসেম্বরের "অমৃতবাজার পত্রিকার" বিজ্ঞাপনে যে একপ্রকার "Anti-mether Privy"র বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল, Mr. G. Gupta B. E. 5, Gupta's Lane, Calcutta, ঠিকানায় খোঁজ করিয়া আমরা তাহার কতক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াও বিষয়টীর আর কোন পরীক্ষা করিতে পারি নাই। দুঃখের বিষয় উক্ত বিষয়ে গত দুই বৎসরে আর কোন বিজ্ঞাপন বা

আলোচনাও আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে না। হুক পোকা রোগ নিবারণ কল্পে যে ক্ষুদ্র পুস্তিকা বঙ্গদেশের স্যানিটারী ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও উক্ত রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় রূপে উল্লিখিত হইয়াছে যে "লোকে যাহাতে মলত্যাগ করিয়া মাটী দূষিত করিতে না পারে তাহা করা। যথা নিয়মে নির্ম্মিত পায়খানা ছাড়া অন্য কোন স্থানে যেন কাহাকেও মলত্যাগ করিতে দেওয়া না হয়।" আশা করি আমাদের "ইউনিয়ন বোর্ড" সমূহ এই সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিবেন।

হিন্দু ডুবিল।

লেখক—ডাক্তার শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাতির মৃত্যু হয় কিসে?

জাতির মৃত্যু বলিলে আমরা কি বুঝিতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা তিনটী বিষয় দেখিতে পাই। যথা :—

(১) যদি কোন জাতির জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু-সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সে জাতি অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

(২) যদি কোন জাতির উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞানী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের সংখ্যা হ্রাস পায়, তাহা হইলে সে জাতিও ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে, ইহা মনে করা উচিত।

(৩) যদি কোন জাতির লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির হার স্বাভাবিক নিয়ম অপেক্ষা (জগতের অন্যান্য জাতির তুলনায়) হ্রাস পায়, তবে সেই জাতিও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে উক্ত তিনটী কারণই বিদ্যমান দৃষ্ট হয়। সুতরাং বঙ্গীয় হিন্দুগণ যে অচিরে ইহজগৎ হইতে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে, ইহাতে কিছু মাত্রও সন্দেহ নাই। আমরা বিস্তারিত ভাবে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

১। বঙ্গে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক দৃষ্ট হয়। বিগত ১৯১৮ সনে জন্ম সংখ্যা ছিল ১৬, ২৭,১৭৩ এবং মৃত্যু-সংখ্যা ১৭, ২৭,৩৩১। সুতরাং প্রায় ১লক্ষ মৃত্যু সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হয়। এই হারে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইলে, আমাদের সমাজ যে অচিরেই ডুবিয়া যাইবে, তাহাতে ত আর কোনই সন্দেহ নাই।

(২) বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতির সংখ্যা দিন-দিনই (প্রত্যেক সেন্‌সাসেই) হ্রাস পাইতেছে। ১৮৭২ সন হইতে ১৮৮১ সন পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে ব্রাহ্মণগণ শতকরা ১২ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তৎপরে তাহার পরবর্ত্তী ২০ বৎসরে অর্থাৎ ১৮৮১ সন হইতে ১৯০১ সন পর্য্যন্ত মাত্র ২জন হিসাবে বৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়াছিল। ১৯০১ সন হইতে ১৯১১ সন পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে সেই ২জনও হ্রাস পাইয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু-সংখ্যা অধিক হইয়াছে। এইরূপ কায়স্থগণ ১৮৭২ সন হইতে ১৮৮১ সন পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে ৩জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী সেন্‌সাসে ১জন হিসাবে বাড়িয়াছিল মাত্র। তৎপরে ১৮৯১ সন হইতে ১৯০১ সন পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে বৃদ্ধির হার একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া শতকরা ৮জন হিসাবে ন্যূন হইয়াছে। কি ভীষণ অবস্থা!!

বঙ্গের শিল্পীরাও অর্থাৎ তাঁতি, কর্ম্মকার, বেণে, সদ্গোপ, মালাকার, কুম্ভকার প্রভৃতি মধ্যম শ্রেণীর হিন্দু সন্তানগণও প্রতি দশ দশ বৎসর অন্তর অন্তর ক্রমেই হ্রাসের দিকে নামিয়া যাইতেছে। কেবল নমঃশূদ্র, বাগদী, চামার ও মুচী ইত্যাদি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ ও বঙ্গের বহু অনার্য্য জাতীয় ব্যক্তিগণের (যাহারা হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে) সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

বঙ্গের নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ নিম্ন লিখিত হারে বৃদ্ধি পাইতেছে।

বর্ণ	১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১
নমঃশূদ্র ...	১৫০৩৫১৮	১৫৭৬০৭৬	১৭৬৮১১৯	১৮৬০৯১৪
মালো ...	৯৪১৬	১৯৪৫৪	৮৮৪৪৩	২২৭৯৮৫
বাগদী ...	৬৯৫২৫৯	৭৫৬৮৭০	৮০৪৯৬০	১০১২৩৩
চামার ও মুচী ...	১১৭৭২৩৪	১৪০৮০৩৭	১৪৯৭২৬৭	১৬২৬৭৩৭

উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের সংখ্যা কিরূপ ভাবে হ্রাস পাইতেছে, তাহাও দেখুন। নিম্নে বঙ্গের কায়স্থদিগের সংখ্যা প্রদত্ত হইল।

জিলা	সন ১৮৯১	সন ১৯০১
মেদিনীপুর ...	৮২৫২৬	৪১৬৮৬
নদীয়া ...	৩৩৬১৪	৩০৫৭৮
যশোহর ...	৫৯৩৩৯	৫৫৪০৯
২৪-পরগণা ...	৪৬৪৩৬	৩৪১৭৭
মুরশিদাবাদ ...	১৩৫৬৬	১২৩৮২
হুগলী ...	২৯১৭৭	২৩৬১০
রাজসাহী ...	৬৭৪৭	৬৩৩১
রঙ্গপুর ...	১০০২০	৮৫৬৫
বগুড়া ...	৩৮২৯	৩৮০২
পাবনা ...	৩২১৫৬	৩০৪৪৭
ঢাকা ...	৮৯৫৮৭	৮৫৯৬৩
বাখরগঞ্জ ...	৯৫৯২২	৭৮১৬৮
ময়মনসিংহ ...	৯৭৫০৭	৯০১৮০
চট্টগ্রাম ...	৭৪২০৬	৭১৪২১
নোয়াখালি ...	৪৫২৫১	৩৪০১৮
ত্রিপুরা ...	৭২৫৫৪	৭০৪১৩

এই হারে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ ক্রমাগতই হ্রাস পাইলে, আর দুই শত বৎসরের মধ্যেই বঙ্গের হিন্দু সমাজ অতল জলে ডুবিয়া যাইবে!!

(৩) ১৮৮১ সন হইতে ১৮৯১ সন এই দশ বৎসরে বঙ্গের হিন্দু শতকরা ৩জন মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জগতের অন্যান্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও, কেবল ভারতের অন্যান্য স্থানের সহিত তুলনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, বঙ্গীয় হিন্দুগণের জন্মের হার নিতান্ত কম।

ইংলণ্ডে শতকরা ১২·৮জন হিসাবে লোক সংখ্যা (যুদ্ধের পূর্ব্বে বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইংলণ্ডে হাজারকরা ২৫ কি ২৬ জন জন্ম গ্রহণ করিত ও হাজারকরা ১৫ জন মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইত। সুতরাং বিলাতে মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম সংখ্যা ১১জন বেশী ছিল। আর আমাদের দেশে জন্ম সংখ্যা হাজারকরা ৪৫ এবং মৃত্যুসংখ্যা হাজার করা ৪০ জন। সুতরাং আমাদের দেশে জন্ম সংখ্যা মাত্র ৫জন বেশী। এই সংখ্যাও হ্রাস পাইয়া এক্ষণে হাজার করা ১·২জন ন্যূন দৃষ্ট হইতেছে। হায়! জগতের সর্ব্বত্রই মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম সংখ্যা বেশী, আর এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু অত্যধিক। মৃত্যুর হার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

ফলতঃ, যে দিক দিয়া যে ভাবে আলোচনা করা যায়, সেই দিক দিয়াই আমরা পরিষ্কার দেখিতে পাই যে, বঙ্গের হিন্দুগণ ক্রমেই ধ্বংসের দিকে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। এক্ষণে কি কি কারণে আমরা ধ্বংসের দিকে যাইতেছি তাহা নির্ণয় করিয়া তাহার প্রতিকার করার জন্য প্রাণপণে যত্ন-চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা আমরা যে অচিরেই আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের ন্যায় এই ধরাধাম হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইব। এই ধ্বংস নিবারণের উপায় কি? উপায় যথেষ্ট আছে। এখনও যদি শিক্ষিত হিন্দু সন্তানগণ প্রাণপণে যত্ন-চেষ্টা করেন, তবে এখনও হিন্দু সমাজ রক্ষা পাইতে পারে। হিন্দু সন্তানগণ যদি

তাঁহাদের জাতীয় ধর্ম্ম, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, ঔষধ, পথ্য, পোষাক, পরিচ্ছদ ইত্যাদির প্রাচীন কালের ন্যায় সুদৃঢ় ভাবে অনুসরণ করেন, তবে এখনও হিন্দু সমাজ আসন্ন মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা পাইবে, সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই।

কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে "হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রথা নাই, ও হিন্দু সমাজের বহু লোক অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে, ইহার ফলে হিন্দু সমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে না এবং হ্রাস পাইতেছে।" আমরা এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিব।

১। আমরা ইতি পূর্ব্বে যে সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছি, তাহা মনোযোগের সহিত চিন্তা করিলে পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি যে, বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে মৃত্যুর সংখ্যা অত্যধিক হওয়ার ফলেই সমাজ ধ্বংসের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। অতএব আমাদের সমাজে যাহাতে মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস পায়, তাহার জন্যই প্রাণপণে সকলের চেষ্টা করা উচিত। বিধবা বিবাহ সমাজে প্রচলন করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিলে সমাজের কোনই কল্যাণ সাধিত হইবে না, বরং আরও দুঃখ দৈন্য বৃদ্ধি পাইবে। অতএব বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলন না করিয়া, যাহাতে মৃত্যুর হার হ্রাস পায় তাহাই করা একান্ত কর্ত্তব্য।

২। কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—"মুসলমান সমাজে ১০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের মধ্যে শতকরা ৩৮ জন বিধবা আছে, হিন্দু সমাজে এই দুই বয়সের মধ্যে বিধবার সংখ্যা শতকরা ৪৮ জন।" অথচ উক্ত কর্ণেল মহাশয়ই তাঁহার হিন্দু সমাজ, ১ম খণ্ড ৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, বিধবা বিবাহের জন্য মুসলমান সমাজের যে বংশ বৃদ্ধি হয় তাহা অতি সামান্য।"

৩। হিন্দু সমাজে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে বিধবা বিবাহ কোন কালেও ছিল না। অথচ হিন্দু সমাজে লোক সংখ্যা অগণিত ছিল। পাশ্চাত্য দেশের প্লিনি প্রভৃতি মহাত্মগণ লিখিয়া গিয়াছেন যে "হিন্দুরা সংখ্যায় অগণিত, বালুকণার ন্যায় গণনা করা যায় না।" (১) সুতরাং বিধবা বিবাহ হিন্দু সমাজে প্রচলন না করিলেও হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধির অনেক উপায় রহিয়াছে।

৪। হিন্দু সমাজে বর্ত্তমান সময়ে কুমারীগণের বিবাহ একটী কঠিন সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। উপযুক্ত পাত্র প্রায় পাওয়া যায় না। ইহার ফলে সুপাত্রের দর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই অবস্থায় বিধবা বিবাহ প্রচলন করিলে কুমারীদিগের পাত্র পাওয়াই ভার হইয়া পড়িবে। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের জনৈকা বিদুষী ও সমাজ-হিতৈষিণী শ্রীমতী ওয়াল্টার টিবিট্‌স্ মহোদয়া লিখিয়াছেন :—"পাশ্চাত্য দেশে বিধবাদের পুনঃ বিবাহ হওয়ার ফলে কুমারী কন্যার সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে, আর কুমারীগণ পুরুষের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিতেছে।"(২)

৫। মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ মহোদয়ও ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন—"এক একটীর এক একটী পাত্র মিলাই কঠিন, এক একজনের ২।৩টি পাত্র কোথায় পাওয়া যাইবে? কাজেই যে একবার পতি পাইয়াছে তাহাকে আর পতি দেওয়া উচিত নয়, দিলে একটী কুমারীও পতি পাইবে না। পাশ্চাত্য দেশে ঐ কারণে কুমারীদের পতি পাওয়া বড়ই সঙ্কট হইয়াছে।" (পত্রাবলী ১ম খণ্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা)।

৬। হিন্দু বিধবাদের সম্বন্ধে বঙ্গের উজ্জ্বলতম রত্ন, স্বধর্ম্মানুরাগী ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—"হিন্দু বিধবার দুঃখ কষ্টের কথা ভাবিতে গেলে হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়। কিন্তু তাঁহার অলোকসামান্য কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও অসাধারণ স্বার্থত্যাগের প্রতি দৃষ্টি করিতে

(1) "The Hindus are innumerable like grains of sand free from all deceit and violence." (See Mehren. Paris, Leroux, Page 391).

(2) "In the West the re-marriage of widows contributes largely to the surplus of spinsters who wage war upon men." (See Amrita Bazar Patrika—The Position of Women in India, 15-12-13).

বলে মন যুগপৎ বিস্ময় ও ভক্তিতে পরিপ্লুত হয়। হিন্দু বিধবাই সংসারে পতি প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাহার উজ্জ্বল ছবি নানা দুঃখ-তমসাচ্ছন্ন হিন্দু গৃহকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার দীপ্তিমান শান্ত হিন্দু নরনারীর জীবন যাত্রার পথ প্রদর্শক স্বরূপ হইয়াছে। তাঁহার পবিত্র জীবন পৃথিবীতে দুর্লভ পদার্থ। তাহা যেন পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত না হয়। হিন্দু বিধবার চির-বৈধব্য প্রথা হিন্দু সমাজের দেবী-মন্দির।"

৭। বিধবা বিবাহ বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। বিধবার শরীরাভ্যন্তরে এমন বিষাক্ত পদার্থ থাকে, যাহার ফলেই তাহাদের পতির অকাল মৃত্যুর কারণ উপস্থিত হয়। এ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র ও জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বহু তত্ত্বই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই দেখুন, আমেরিকার বিখ্যাত-নামা ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ এম-ডি মহোদয় কি লিখিয়াছেন :—

"যে সকল বিধবা এক বা একাধিক পতি গ্রহণ করিয়াছে, এমত বিধবাদিগকে বিবাহ করিতে বিরত থাকাই কর্ত্তব্য। কারণ, তাহাদের মধ্যে এমন কতক-গুলি সহজাত বৃত্তি নিহিত থাকা সম্ভব, যদ্দ্বারা পতির স্বাভাবিক জীবনীশক্তি ক্ষয় করিয়া ত্বরায় তাহার (পতির) শারীরিক দৌর্ব্বল্য বিধানক্রমে অকাল মৃত্যু আনয়ন করে। সুবিজ্ঞ সেমুয়েল ওয়ালারের মতে—বিধবা বিবাহ হইতে দূরে থাকাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিরাপদ।"(৩)

(3) " It is best to avoid marrying widows, * * they are likely to possess qualities inherent in them, that in their exercise use up the husband's stock of vitality, rapidly weakening the system and so causing premature death. It is best, with Saminel Weller, to beware of widows." (See The Science of a New Life, by Dr. J. Cowan, M.D., Page, 104).

(4) "The children of a woman by a second husband resemble her first husband." (See Dr. Nichol's Human Physiology, Page 289).

"A woman may have, by a second husband, children who resemble a former husband, and this is particularly well-marked in certain instances by the colour of the hair and eyes. (See Sexual Physiology and Hygiene, by R. T. Trall, M.D., Page, 195).

"A widow who marries a second time bears children strongly resembling her first husband." (See Dr. Carpenter's Human Physiology, Page 990.)

৮। বিধবা বিবাহ সুনীতি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ। বিজ্ঞানপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভগবান রমণী-হৃদয় এক আশ্চর্য্য উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিধবা দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিলে তাহার দ্বিতীয় পতির ঔরসজাত সন্তানও প্রথম পতির ছায়া প্রাপ্ত হয়।(৪) অতএব বিধবারা যে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করে, সে কেবল ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার জন্য, সুতরাং বিধবা বিবাহ ধর্ম্ম ও সুনীতি বিরুদ্ধ। এক পতির প্রতিকৃতি তাহার কোমল হৃদয়ে সুদৃঢ় ভাবে অঙ্কিত থাকিতে দ্বিতীয়বার কিরূপে সে পতি গ্রহণ করিতে পারিবে? এ সম্বন্ধে আমরা বারান্তরে সবিস্তার আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান সময়ে অতি অল্প সংখ্যক হিন্দুই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন। এ দিকে নদীয়া প্রভৃতি স্থানের গোস্বামী-গণ অসংখ্য অনার্য্যদিগকে হিন্দুধর্ম্মে (বৈষ্ণবধর্ম্মে) দীক্ষিত করিয়াছেন।

দন্ত সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তব্য।

লেখক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার আর, আমেদ।

ভূমিকা।

সভ্যজগতে সচরাচর যে সমুদয় পীড়া দেখা যায়, তন্মধ্যে দন্তপীড়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে বর্ত্তমান। প্রকৃতপক্ষে অধুনা দন্তপীড়া এরূপভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, একটী শিশুর একটী অথবা ততোঽধিক দূষিত দন্ত থাকা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া বিবেচিত হয়। মার্কিণদেশে গণনা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, তথায় শতকর আশীটি শিশু দন্তপীড়াগ্রস্ত। মুখবিবরে ব্যাধি হইলেই বুঝিতে হইবে যে দেহ অসুস্থ। বর্ত্তমান শিশুদিগের স্বাস্থ্যের উপরই জাতীয় ভবিষ্যৎ নির্ভর করে; সুতরাং চিকিৎসাশাস্ত্রে দন্তচিকিৎসার একটী পৃথক বিভাগ হওয়ার প্রয়োজন সহজেই উপলব্ধি করা যায়। যেহেতু দন্তপীড়া পূর্ব্ব হইতে নিবারণ করা যায়। জাতীয় জনমণ্ডলীর দন্ত রক্ষণের নিমিত্ত সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ, বিশেষতঃ পিতামাতা দায়ী। দন্তের ক্রিয়া ও দন্ত আমাদিগের দেহে যে প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে, তাহার আলোচনা করিলে বর্ত্তমানের বিপন্ন অবস্থা অধিকতর সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

দন্তের ক্রিয়া।

দন্তের প্রধান ক্রিয়া খাদ্য চর্ব্বণ। খাদ্য জীর্ণ হইবার পূর্ব্বে যে সকল পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া যায়, তন্মধ্যে ইহা প্রথম অবস্থা; জীবন ধারণের নিমিত্ত ইহা অত্যাবশ্যক। মস্তিষ্ক হইতে স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনা নিম্নচোয়ালে প্রেরিত হইয়া চর্ব্বণক্রিয়া সম্পন্ন করে। মাংসপেশীগুলির পুনঃ পুনঃ সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণের ফলে নিম্ন পংক্তির দন্তগুলি উচ্চ পংক্তির দন্তগুলির সংঘর্ষে আসে, এবং পুনরায় পৃথক হইয়া যায়; এইরূপে ইহাদের চাপে অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য চর্ব্বিত হইয়া যায়। এই সময়ে লালা গ্রন্থি (Salivary glands) হইতে লালা নিঃসৃত হইতে থাকে; এবং জিহ্বা, গাল ও ঠোঁটের সাহায্যে খাদ্য দ্রব্য কোমল মণ্ডে পরিণত হয়: তৎপরে খাদ্যের শ্বেতাংশ (Starch) চিনিতে পরিণত হয়; ইহা পরিপাকের প্রথম অবস্থা। অনন্তর খাদ্য উদর হইতে অন্ত্রে চলিয়া যায় ও পরিপাক ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়।

নীরোগ দন্তের প্রয়োজন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, খাদ্য ভাল রূপে চর্ব্বিত না হইলে পরিপাক ক্রিয়া ভাল রূপে সম্পন্ন হয় না। ইহাতে সাধারণ স্বাস্থ্যের অতিশয় হানি হয়। মুখগহ্বর নীরোগ সুস্থ থাকিলে, চর্ব্বণ করিতে কোন প্রকার ক্লেশ হয় না। কিন্তু মুখগহ্বরে ব্যথা হইলে, চর্ব্বণ-ক্রিয়া আপনা হইতেই যথাসম্ভব কমিয়া আসে। যদিও কোন কোন স্থলে লালা দূষিত হইয়া থাকে, সাধারণতঃ দন্তের দূষিত অবস্থাকেই উহার হেতু বলিয়া নির্ণয় করা হইয়া থাকে।

দন্ত এরূপ প্রধান যন্ত্র দেখিয়া স্বতঃই মনে প্রশ্ন উদিত হয়, "দন্ত কি? এবং কিরূপেই বা উহাদিগকে উত্তম অবস্থায় রাখা যায়?" এই প্রশ্নের প্রথম অংশটী আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব। যদিও অধিকাংশ লোকই দন্তের প্রতি যত্ন ও মনোযোগের প্রয়োজন অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করেন, তথাপি অনেকে মনে করেন যে, দন্তের গঠন, পরিবর্দ্ধন বা উহার সম্বন্ধে অপর কিছু শিক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন; ইহা তাঁহাদিগের কৌতূহল উদ্রেক করে না। ইহার উত্তরে বলিতে চাই যে, আমাদিগের বিশ্বাস যে, যত দিন যাবৎ সমাজস্থ প্রতি ব্যক্তি দন্ত-চিকিৎসার প্রয়োজন ভালরূপে বুঝিতে না পারিবেন, তত দিন দন্তের যথোচিত চিকিৎসার নিমিত্ত কেহ অগ্রসর হইতে পারিবেন না। মূর্খতা ও পীড়া চিরকাল পরস্পরের হস্ত ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। দন্ত সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিলেই দন্তের উপকারিতা বুঝিতে পারিব ও তদনুযায়ী সতর্কতার সহিত দন্তের ব্যবহার করিব।

প্রকার ভেদ।

মনুষ্যের দন্ত দেখিলে আমরা এরূপ সহজে চিনিতে পারি যে উহার কোন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। কিন্তু ইতর প্রাণীর রাজ্যে আসিলে দেখিতে পাই যে উহাদের সব ওরূপ অনায়াসে চিনিতে পারি না; কোন কোন স্থলে পদার্থটী দন্ত কি না তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। দন্তের পরিচয় দিতে হইলে বলা যায় যে উহা চর্ব্বণার্থ খাদ্যবহা নালীর (Alimentary canal) সম্মুখভাগে অবস্থিত একপ্রকার কঠিন পদার্থ।

ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে এক প্রকার জন্তুর দন্তের গঠন, আকৃতি ও সংযোগ অপর প্রকার জন্তুর দন্তের আকৃতি, গঠন ও সংযোগ হইতে ভিন্ন প্রকারের। কোন কোন জন্তুর দন্তের গঠন সহজে বোধগম্য হয় না, যথা হস্তীর মাড়ির দন্ত। আবার কোন কোন প্রাণীর দন্ত কেবল মাড়ের ন্যায় কঠিন পদার্থে গঠিত। প্রকৃতি প্রতি প্রাণীকেই তাহার প্রয়োজন অনুসারে দন্ত দান করিয়াছেন। চরাচর দন্ত দ্বারা যেরূপ ক্রিয়া সাধিত হয়, জলহস্তীর দন্ত উহা হইতে ভিন্ন প্রকারের কার্য্য করিয়া থাকে; দন্তদ্বারা খাদ্যাদি মুখগহ্বরে প্রবেশ করাইয়া দেয়। বানরের ও মনুষ্যের দন্ত অনেকাংশে একরূপ। বৃহদাকার বানরের দন্ত ও মনুষ্যের দন্তের পার্থক্য অতি সামান্য। উভয়ের দন্তের সংখ্যা, অবস্থিতি ও সাধারণ আকৃতি সম্পূর্ণ এক প্রকারের।

মনুষ্য-দন্তের গঠন।

বর্ণনার সুবিধার নিমিত্ত মনুষ্যের দন্তকে তিনটী ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা (১) Crown, (২) Root, এবং (৩) Neck। মাড়ির উপরিস্থ অংশটীকে Crown বলে; যে অংশটি মাড়ির ভিতরে অবস্থিত, তাহাকে Root এবং উভয়ের মধ্যস্থলটীকে Neck বলে। Crownএর চতুঃপার্শ্ব উচ্চ ও মধ্যস্থল নিম্ন। ইহাতে এক চোয়ালের দন্ত অপর চোয়ালের দন্তের উপর চাপ প্রদান করিতে পারে, সুতরাং অনায়াসে চিবাইতে পারা যায়।

Rootগুলি চোয়ালস্থিত গর্ত্ত মধ্যে প্রোথিত। Root সংখ্যায় এক হইতে তিন অবধি হয়। সম্মুখের দন্তের একটী, নিম্নচোয়ালের মাড়ির দন্তের দুইটী, ও উচ্চ চোয়ালের মাড়ির দন্তের তিনটী Root আছে।

একটী দন্তকে লম্বালম্বি ভাবে কাটিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, মধ্যস্থলে একটী গর্ত্ত আছে, সেই গর্ত্তটীর চতুর্দ্দিকে নীরেট হাড় রহিয়াছে। এই গর্ত্তটীকে দন্ত-মজ্জাস্থান (Pulp chamber) বলে। ইহাতে দন্তমজ্জা (Dental Pulp) থাকে। এই মজ্জা সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া যাইলে দন্তকে মৃত বলা যায়। দন্তমজ্জা প্রকৃতপক্ষে একপ্রকার তরল সংযোজক পেশী, ইহাতে শাখাযুক্ত বহু ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ও জালের ন্যায় বিস্তৃত বহু ধমনী আছে। স্নায়ুগুলি Rootএর অগ্রভাগে অবস্থিত একটী ক্ষুদ্র নালীর ভিতর দিয়া দন্তে প্রবেশ করে। নির্গমপথ এরূপ ক্ষুদ্র হওয়ায় ও দন্তমজ্জা কঠিন পদার্থ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় অতি সামান্য পদার্থও দন্তমজ্জার উপর সঞ্চিত হইলে উহার স্নায়ুর উপর চাপ পড়িতে থাকে; এই নিমিত্তই দন্তশূল পীড়ায় উৎকট যন্ত্রণা হয়।

এখন দন্তের নীরেট অংশটীর আলোচনা করা যাউক। ইহাতে তিনটী পৃথক অংশ আছে। ইহার অধিকাংশই হস্তীদন্তের ন্যায় একপ্রকার কঠিন পদার্থে নির্ম্মিত। তাহাকে Dentine বলে। ইহা দন্তক্ষয় (Caries) রোগের সহিত বিশেষ রূপে সংশ্লিষ্ট। এই Dentine শাখাযুক্ত কতকগুলি ক্ষুদ্র নালী; Pulp chamberএ স্থিত Pulpএর এক একটী অগভীর কোষ হইতে এক একটী নালী নির্গত হইয়াছে। ইহাদিগকে Dentinal fibril বলে। এই fibrilএর ভিতর দিয়াই দন্ত তাহার অধিকাংশ পুষ্টি গ্রহণ করে। দন্তপ্রণালী গুলি তাহাদের সমগুণসম্পন্ন Dentineএ প্রোথিত; তাহাতে উহারা পরস্পরের সহিত দৃঢ় রূপে সংলগ্ন থাকে।

শ্বেত অথবা ঈষৎ নীলাভ একপ্রকার পদার্থ Crown এর Dentineকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে; ইহাকে Enamel বলে। Crownএর যে অংশ দ্বারা চর্ব্বণ করিতে হয়, সেইস্থানে Enamel সর্ব্বাপেক্ষা পুরু;

Neckএর দিকে ক্রমশঃ পাতলা হইয়া আসিয়াছে। ঘর্ষণের ফলে Enamel ক্ষয় হইতে থাকে; ইহাতে প্রচুর পরিমাণে Salt of Lime আছে ও ইহা সামান্য অম্লতার সংস্পর্শে গলিয়া যায়।

দন্ত গঠনের উপাদানসমূহের মধ্যে তৃতীয় পদার্থটীর নাম Cementum। কোন কোন প্রাণীর দন্তের Crown ইহা দ্বারা আবৃত; কিন্তু মনুষ্যের দন্তে ইহা কেবল Rootএ দেখিতে পাওয়া যায়। Rootএর শেষ দিকে ক্রমশঃ ঘন ও Neckএ অতিশয় পাতলা। বয়োবৃদ্ধির সহিত ইহা অধিকতর ঘন হইতে থাকে ও তথায় অস্থিময় একপ্রকার পদার্থ সঞ্চিত হয়; বৃদ্ধদিগের দন্তে ইহা প্রায়ই দৃষ্ট হয়।

গঠন ও রাসায়নিক উপকরণে অস্থির সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

নবোদ্গত দন্তে Crown অতি সূক্ষ্ম চর্ম্ম আবরণে আবৃত থাকে; এই চর্ম্মকে Nasmyth's membrane বলে। ইহার কার্য্য সহজে প্রতীয়মান হয় না; কারণ, যদিও ইহা দন্তের Neckএর চতুঃপার্শ্বে কিছুকাল থাকে, তথাপি দন্তের যে অংশগুলির ব্যবহার দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা সেই সকল স্থান হইতে অচিরে ক্ষয়িত হইয়া যায়। অধিক পরিমাণ অম্লতাও উহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না; সম্ভবতঃ Enamelকে অম্লতার সংস্পর্শজনিত হানি হইতে রক্ষা করাই ইহার কার্য্য। কখন কখনও এই সূক্ষ্ম চর্ম্মটী বীজাণুদ্বারা আক্রান্ত হয়। এরূপ স্থলে দন্তে একপ্রকার সবুজ বর্ণের পদার্থ জন্মে; শিশুদিগের দন্তে ইহা প্রায়ই দেখা যায়।

মনুষ্যের দন্ত চোয়ালের গর্ত্তমধ্যে প্রোথিত থাকিলেও স্বাভাবিক অবস্থায় হাড়ের সহিত সাক্ষাৎভাবে উহার সংযোগ নাই। উভয়ের মধ্যে একটী সূক্ষ্ম চর্ম্ম আছে, তাহাকে Peridental membrane বলে। দন্তের ভার বহন করাই ইহার কার্য্য। এই চর্ম্মটী না থাকিলে চর্ব্বণ-ক্রিয়া অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হইত; কারণ, প্রতিবার দন্তের উপর যে চাপ পড়িত, তাহা নিম্নস্থিত গর্ত্তের উপর পড়িত। Peridental membrane যেমন দন্তকে যথাস্থানে থাকিতে সাহায্য করে, সেইরূপ আঘাত নিবারণের গদির ন্যায় কার্য্য করে। এই চর্ম্ম-দন্তের যে সকল সাংঘাতিক পীড়া আছে, তন্মধ্যে একটী—Pyorrhœa alveotarisএর বাসস্থান।

গর্ভাবস্থায় সতর্কতা।

আমাদের দেশে নব-বিবাহিতা যুবতীরা প্রথম গর্ভবতী হইলে, তাঁহাদের বর্ষিয়সী, সুপ্রবীণা শ্বাশুড়ী শ্রেণীর মহিলারা বধূর সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন; এবং কিসে বধূ ও তাহার গর্ভস্থ শিশু সুস্থ থাকিবে, এবং বিনা কষ্টে সুস্থদেহ শিশু ভূমিষ্ঠ হইতে পারিবে, সে বিষয়ে নানা সতর্কতাসূচক উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। বধূর শ্রমের মাত্রা ক্রমে ক্রমে অনেক কমাইয়া দেন, তাহার আহারাদির বিষয়ে অনেক বিধি-নিষিধের প্রবর্ত্তন করেন, তাহার চলাফেরার স্বাধীনতা অনেকটা সঙ্কুচিত করিয়া দেন, এমন কি তাহার স্বামীর সহিত আলাপের সময়ও সংযত করিয়া দেন। চঞ্চল-স্বভাব নববধূ এই সকল বিধি-নিষেধ যে সব সময়ে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। কাজেই, তিনি সুযোগ পাইলেই তাহা লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার অভিভাবিকারা তাহা জানিতে পারিলেই, অমঙ্গলাশঙ্কায় উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হইয়া উঠেন।

প্রবীণা হিন্দু মহিলাদের এইরূপ অতি-সাবধানতা আজকাল বাড়াবাড়ি বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে। নবীনারা তাঁহাদের গুরুজনের আদেশ-উপদেশ অধুনা

তেমন শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা বরং যথেষ্ট অবজ্ঞাই প্রকাশ করিয়া থাকেন। কাজেই, তাঁহারা যে ঐ সকল উপদেশ পালন করিয়া চলিবেন, এরূপ আশা করা আজকাল বিড়ম্বনা। কিন্তু এই অশ্রদ্ধা অবজ্ঞার ফলও আজকাল তাঁহাদিগকে হাতে হাতে ভোগ করিতে হইতেছে! তবে তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, অথবা মানিতে চান না, এই যা কথা।

কিন্তু ইয়োরোপীয় গৃহিণীরা এবং বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা ইদানীং বাঙ্গালী হিন্দু মহিলা-সুলভ সতর্কতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। তাঁহারা আজকাল ইহা স্বীকার করিতেছেন, শিশুর গর্ভাশ্রয় গ্রহণ করিবার দিবস হইতেই (its prenatal existence) তাহার স্বাস্থ্য গঠন ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা আরম্ভ করা উচিত।

গর্ভবতী নারীর নাড়ীর সহিত গর্ভস্থ ভ্রূণের সংযোগ থাকে, এবং সেই নাড়ীর মধ্য দিয়া মাতার শরীরের রক্ত শিশুর দেহে সঞ্চালিত হয়। সুতরাং জননীর আচার ব্যবহারের, চালচলনের, উপর শিশুর পুষ্টি, বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য—এ সকলই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। এ ক্ষেত্রে জননীর আহার-বিহারে সংযম যে কতখানি আবশ্যক তাহা অতি স্থূলবুদ্ধির লোকেও বুঝিতে পারে। তথাপি, আজকালকার শিক্ষিতাভিমানী নরনারীরা কেন যে ইহা উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাহাই আমাদের বুদ্ধির অগোচর। গর্ভবতী নারী যে খাদ্য গ্রহণ করেন, তাহা তাঁহার নিজের ও তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানের পালনের জন্য রক্তে পরিণত হয়। অতএব তাঁহার খাদ্য দ্রব্য সুনির্ব্বাচিত হওয়া উচিত, এবং তাঁহার পরিপাকশক্তি যাহাতে কোন রকমে বিকৃত না হয় সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের এবং আত্মীয় স্বজনের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যে খাদ্য তিনি হজম করিতে পারিবেন না, যাহা তাঁহার শরীরে সহ্য হইবে না, যে খাদ্য গ্রহণে গর্ভস্থ শিশুর পীড়িত হইবার সম্ভাবনা, এমন খাদ্য সুখাদ্য বা উপাদেয় মুখরোচক খাদ্য হইলেও, তাহার লোভ তাঁহাকে সংবরণ করিতেই হইবে, সে প্রকার খাদ্য সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা অতীব আবশ্যক। আর যে খাদ্য তিনি পরিপাক করিতে পারিবেন, যাহাতে তাঁহার ও তাঁহার শিশুর শরীরের পুষ্টি হয়, এরূপ খাদ্যই তাঁহার পক্ষে উত্তম। দুইজনের শরীর পোষণের জন্য জননীকে অন্য সময়ের অপেক্ষা যে বেশী খাদ্য ভোজন করিতে হইবে, তাহা নহে; অথবা তিনি সচরাচর যেরূপ খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহার যে কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইবে তাহাও নহে। কেবল, তাঁহার খাদ্য পুষ্টিকর ও সুপাচ্য হওয়া আবশ্যক। এই বিষয়টির উপর লক্ষ্য রাখিয়া তিনি তাঁহার নিত্য অভ্যস্ত খাদ্যও গ্রহণ করিতে পারেন। অথবা তাঁহার পরিপাকের ব্যাঘাত না ঘটে বা শরীর অপর কোনরূপে অসুস্থ না হয় এমন কোন খাদ্য খাইতে যদি তাঁহার ইচ্ছা হয় তবে তাহা, অথবা সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা যে সকল খাদ্য পছন্দ করেন, তাহা তিনি স্বচ্ছন্দে খাইতে পারেন।

দুগ্ধ, পায়স প্রভৃতি গর্ভিণীর পক্ষে সুখাদ্য। গর্ভের পঞ্চম মাস হইতে দুধ তিনি একটু বেশী পরিমাণে খাইতে পারিলেই ভাল হয়। তবে যাহাতে কোষ্ঠ-কাঠিন্য না ঘটে সে পক্ষে সাবধান থাকিতে হইবে। টাট্‌কা তাজা ফলমূল, আনাজ তরকারী এবং (whole meal bread) লাল আটার রুটী যথেষ্ট পরিমাণে ভক্ষণ করিলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য ঘটিবার কম সম্ভাবনা। প্রত্যহ অন্ততঃ একবার কোষ্ঠ পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। খাদ্য নিয়মিত ভাবে গ্রহণ করিলেই প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যায়। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইবে। আবশ্যক হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া এক আধবার জোলাপ লওয়াও যাইতে পারে। কিন্তু ঘন ঘন জোলাপ লওয়া আবশ্যক হইলে বুঝিতে হইবে গর্ভিণীর পাকযন্ত্র পীড়িত হইয়াছে। তখন কেবল জোলাপের উপর নির্ভর করা সঙ্গত নহে—রীতিমত চিকিৎসা করানো আবশ্যক। মোট কথা, সুনির্ব্বাচিত খাদ্য নিয়মিত সময়ে ও নিয়মিত ভাবে এবং নিয়মিত

পরিমাণে গ্রহণ করিলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য ঘটিতেই পারে না—প্রত্যহ স্বভাবতঃই কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যায়—নির্ব্বাচনগুণে খাদ্যই উত্তমরূপে জোলাপের কার্য্য করিতে পারে এবং করিয়া থাকে।

আমাদের প্রাচীনা গৃহিণীরা গর্ভিণীদিগের পরিশ্রমের মাত্রা কমাইয়া দিবার জন্য তাঁহাদিগকে সাংসারিক শ্রমসাধ্য অনেক কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কিছুমাত্র পরিশ্রম না করিয়া একেবারে নিষ্ক্রিয় ভাবেও থাকিতে দেন না। বস্তুতঃ গর্ভিণীদের পক্ষে অল্পমাত্রায় পরিশ্রম অনিষ্টকর ত নহেই, বরং তাহাতে উপকারই হইতে পারে। গর্ভাবস্থায় প্রত্যহ দুই এক ঘণ্টা শারীরিক পরিশ্রমজনক গৃহকর্ম্ম করা সুপ্রসবের অন্যতম সদুপায়। সম্পূর্ণরূপে শ্রমবিমুখ হইয়া গর্ভাবস্থা অতিবাহন করিলে, প্রসবকালে গর্ভিণীকে অত্যন্ত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়; পরিশ্রম করা অভ্যাস থাকিলে এটা ঘটিতে পারে না—সহজেই প্রায় বিনা যন্ত্রণায় প্রসব হইয়া যায়।

গর্ভিণী বিশুদ্ধ বায়ু যতটা পারেন উপভোগ করিতে পারিলে খুব ভাল হয়। দিবারাত্রি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকা গর্ভের পক্ষে সুসঙ্গত ত নহেই; বরং তাহা ঘোর অনিষ্টকর। সমস্ত দিন বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া কাটাইয়া দেওয়া যে গর্ভিণীর পক্ষে কত অনিষ্টকর তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসাধ্য। ইহার অপেক্ষা নিত্য গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। মনে রাখিতে হইবে, কঠোর শ্রমসাধ্য কার্য্য গর্ভিণীর পক্ষে যতটা অনিষ্টকর, সম্পূর্ণ আলস্য তদপেক্ষা সহস্রগুণে অনিষ্টকর। নিয়মিত ভাবে জীবন যাপন করাই গর্ভিণীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কার্য্য। রাত্রি জাগরণ করিয়া থিয়েটার, বায়স্কোপ দেখিয়া বেড়ানো, সামাজিক নিমন্ত্রণাদিতে যোগ দিয়া অত্যধিক আমোদ প্রমোদে মত্ত হওয়া গর্ভিণীর পক্ষে অকর্ত্তব্য।

গর্ভিণীকে নিজেকে ত সতর্ক থাকিতে হইবেই—তাঁহার বাড়ীর লোকদেরও যথেষ্ট সতর্ক থাকিতে হইবে! বরং এ পক্ষে স্বয়ং গর্ভিণী অপেক্ষা তাঁহাদের কর্ত্তব্যের ভার আরও গুরুতর। প্রথমতঃ, গর্ভিণী যাহাতে শান্ত সংযত ভাবে, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন, কোনরূপ দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, আশঙ্কা যাহাতে তাঁহাকে বিচলিত করিতে না পারে, এ বিষয়ে বাড়ীর লোকদের যত্নবান হইতে হইবে। গর্ভিণীকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখা, মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে সরল বিশুদ্ধ আমোদ দেওয়ার ব্যবস্থা করা, তাঁহার প্রীতিকর দ্রব্যাদি মাঝে মাঝে তাঁহাকে উপহার দেওয়া, বাড়ীর লোকদের কর্ত্তব্য কার্য্য। সন্তান গর্ভে ধারণ করা, সন্তানের জননী হওয়া যে অতীব সুখের ও আনন্দের ব্যাপার—বাড়ীর লোকদের আচরণে ও ব্যবহারে গর্ভিণীর মনে এরূপ ধারণা জন্মিলে, তাঁহার পক্ষে সেটা খুবই শুভজনক। বাড়ীর কোন বধূ প্রথম গর্ভিণী হইয়াছেন, বা কোন কন্যা প্রথম গর্ভিণী হইয়া বাপের বাড়ী মায়ের কাছে স্নেহ, যত্ন, সেবা-শুশ্রূষা পাইবার জন্য আসিয়াছেন—ইহাতে বাড়ীর সকলেরই আনন্দের কারণ ঘটিয়াছে—এরূপ ভাব সকলেরই প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। গর্ভস্থ সন্তানকে সুস্থ রাখিবার ও সুখপ্রসবের এমন সদুপায় আর নাই। ইহাতে কোন ব্যয় নাই, কোন কষ্ট নাই,—ধনী, দরিদ্র সকলেরই ইহা আয়ত্তাধীন। সুতরাং এ বিষয়ে কৃপণতা করিতে নাই।

অনেক বাড়ীতে শ্বাশুড়ী-বধূতে বনে না, স্বামী-স্ত্রীতে বনে না; মাতা পুত্রে বনে না বলিয়া জননী পুত্রবধূর উপর প্রসন্না নহেন। এরূপ ক্ষেত্রে গর্ভিণীদের তেমন যত্ন হয় না। কিন্তু সকলেরই এই কথাটি মনে রাখা উচিত যে, নবীন আগন্তুক,—বহু সাধনার ধন,—অনাহূত অতিথি—দেবতার দান—গর্ভস্থ শিশুটি সাংসারিক সকল তুচ্ছ ঝগড়াবিবাদের অতীত নিরপরাধ প্রাণী। তাহার কথা মনে করিয়া, অন্ততঃ তাহার খাতিরেও, সে যতদিন গর্ভবাস করিবে, ততদিন তাহার জননীর চিত্ত যাহাতে প্রফুল্ল থাকে, শরীর যাহাতে সুস্থ থাকে, তাহা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। সকল ঝগড়া বিবাদের মীমাংসক মধ্যস্থের শুভাগমন সম্ভাবনার কল্পনা করিয়া, সকলেরই মানসিক অসন্তোষ দূর করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

গর্ভিণীর পোষাক পরিচ্ছদ গর্ভাবস্থার সম্যক উপযোগী হওয়া উচিত। কোমরে কাপড় খুব আঁটিয়া পরা উচিত নয়। যাহাতে রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত হইতে পারে এমন টাইট জামা গায়ে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ঋতু ভেদে বস্ত্রাদি ঋতুর উপযুক্ত হওয়া উচিত। জামা কাপড় গায়ে যতটা আল্গা ভাবে থাকিবে ততই ভাল। হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় সঞ্চালনে অসুবিধা হয় এমন ভাবে বস্ত্র পরিধান করা অনুচিত।

বিশুদ্ধ, প্রবহমান হাওয়া গর্ভিণীর পক্ষে অপরিহার্য্য। মনে রাখিতে হইবে, বিশুদ্ধ বায়ু রক্ত পরিষ্কার রাখে এবং তাহা গর্ভস্থ শিশুর খাতিরে গর্ভিণীর পক্ষে অত্যাবশ্যক। বদ্ধ হাওয়ার মত শিশুর পক্ষে অনিষ্টকর পদার্থ আর কিছুই নাই। যে সকল কক্ষে গর্ভিণীকে বেশীক্ষণ থাকিতে হয়, সেই সকল কক্ষে বিশেষতঃ শয়নকক্ষে, যাহাতে অবাধে বায়ু চলাচল করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিয়া দিতে হইবে।

গর্ভিণীর দন্ত সর্ব্বদা সুস্থ ও পরিষ্কার রাখিতে হইবে। দাঁতে ময়লা লাগিয়া পচিয়া থাকিলে খাদ্য বিষাক্ত হইয়া শিশুর ঘোর অনিষ্ট করিয়া থাকে। গর্ভিণীর প্রায় বমনোদ্রেক হয়। প্রত্যেকবার বমনের পর মুখ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

অজীর্ণতা।

অজীর্ণতা যে কি তাহা বোধ হয় আজকাল আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। আমরা সাধারণতঃ যে সকল ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হই, তাহার অধিকাংশই এই অজীর্ণতা হইতে উৎপন্ন।

আজকাল গ্রাম অপেক্ষা সহরেই এই রোগের প্রকোপ বেশী দেখা যায়; এবং মুটে, মজুর, চাষা প্রভৃতি অপেক্ষা, ভদ্রনামধারী লোকগণই বেশী আক্রান্ত হন। সহরের বিশুদ্ধ জল পান এবং সময়মত মিতাহার সত্ত্বেও, সহরবাসী এই রোগে আক্রান্ত হয়, এবং অসময়ে অখাদ্য আহার করিয়াও, গ্রামবাসী পরিশ্রমী চাষার দল এই রোগ হইতে মুক্ত—ইহার কারণ কি? সহরবাসী শিক্ষিত ভদ্রগণ সর্ব্বদা মানসিক পরিশ্রম করেন সত্য, কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম মোটেই করেন না; এবং বিশুদ্ধ জল পান করেন সত্য, কিন্তু বিশুদ্ধ বায়ু এবং ভেজাল ভিন্ন বিশুদ্ধ খাদ্য ইহাদের ভাগ্যে ঘটে না। এতদ্ব্যতীত বেলা ৯টায় ৯½টায় স্নান করিয়া মাথা মুছিতে মুছিতে খাইতে বসা এই অজীর্ণের আর একটী প্রধান কারণ বলিয়া আমাদের মনে হয়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আছে যে, স্নান করিবামাত্র বহিরঙ্গ সকল শীতলতা প্রাপ্ত হয়, এবং সেই সময় অন্তরস্থ জঠরাগ্নি, শারীরিক তাপের সমতা রক্ষার্থ বহির্দ্দেশে আগমন করে। এই সময় আহার করিলে, জঠরাগ্নির ন্যূনতা হেতু, ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক না হইয়া অজীর্ণতা উৎপন্ন করে। এইজন্যই বোধ হয় শাস্ত্রকারগণ স্নানান্তে আহ্নিকের এবং যৎসামান্য জলযোগের ব্যবস্থা দিয়াছেন। পরন্তু আহারান্তেই কার্য্যে প্রবৃত্তি এই অজীর্ণের আর একটী কারণ; কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ সহরবাসীই এই কারণের হাত হইতে মুক্ত নহেন। সকাল সকাল অর্থাৎ ১১টার পূর্ব্বে (অর্থাৎ শ্লেষ্মার প্রকোপের সময়) আহার এবং ভেজাল দ্রব্য ভক্ষণ, অজীর্ণতার অন্যতম কারণ।

যাহা হউক, অসময়ে অখাদ্য এবং অপরিমিত আহারই যে অজীর্ণতার কারণ তাহা নিঃসন্দেহ।

সহজ-প্রাপ্য কতকগুলি ঔষধ দ্বারা অজীর্ণতার প্রতীকার কল্পে আমরা আয়ুর্ব্বেদ হইতে কতকগুলি শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা সাধারণ্যে প্রচারার্থ উদ্ধৃত করিলাম।

১। পনসে কদলং কদলে চ ঘৃতং
ঘৃতপাক বিধাবপি জম্বুরসং।
তদুপদ্রব শান্তি করং লবণং
লবণেঽপি চ তণ্ডুল বারিপরঃ॥

কাঁঠাল সেবন করিয়া অজীর্ণ বা কোন উপদ্রব হইবার আশঙ্কা হইলে, কলা ভক্ষণ করিবে। সেইরূপ কলা জন্য অপকার হইলে ঘৃত, ঘৃতজন্য হইলে গোঁড়ালেবু গোঁড়ালেবু জন্য হইলে লবণ, লবণ জন্য হইলে চাউলানী জল সেবন করিবে।

২। তালঞ্চ রম্ভা ফল কণ্টা ফোলকং
ক্ষীরী পিয়ালঞ্চ পক্কষকস্তথা।
জীর্ণং হ্যিন্যনং মরিচেন গচ্ছতি॥

তাল, কদলী, কাঁঠাল, ক্ষীরী, পেয়ারা, ফল্‌সা এই সমস্ত ফল গোলমরিচ চূর্ণে জীর্ণ হয়।

৩। আমাম্র বীজং পনসস্য পক্কৌ
পলাশ পক্কৌ ঘন বীর মূলং।
অপূপ পক্কৌ সকণা যমানী
সা কৈশ্চিদুক্তা পৃথুকস্য পাকে

কাঁঠাল জীর্ণ করিতে অপক্ক আম্রফলের বীজ ভক্ষণ করিবে। পলাশ (?) পাচনার্থ বিন্যার মূল বা মুথা কিম্বা উভয় ভক্ষণ করিবে। পিঠা এবং চিড়া পাক করিতে পিপ্পলীযুক্ত যৈন ভক্ষণ করিবে।

৪। অম্লেন কেনাপ্যথবোষ্ণেনম, ফোঞ্চাম্বুনা বা ঘৃতমেতিপাকং। তিলাদি তৈলান্যপি কাঞ্জিকেন॥

অম্লরস, গোলমরিচ অথবা ঈষৎ উষ্ণজল ঘৃতজনিত অজীর্ণ দূর করে। কাঁজি তিলাদি তৈল জীর্ণ করে।

৫। মাংসানি সর্ব্বান্যপি যান্তি পাকং। ক্ষারেণ সদ্যস্তিল নালজেন॥

তিলের ডাঁটা ভস্ম ভক্ষণে সকল প্রকার মাংস পরিপাক হয়।

৬। গোধুম মাষৌ হরিমন্থ মুদ্গ যবান্ সতীনো নিতরাং নিহন্তি। ফলঞ্চ হেমন্ত তু পাক মেতি তদেব নিত্যং লবনাগ্রভাবৈরঃ॥

গম, মাষকলাই, বুট, মুগ, যব, মটর, এই সকল এবং অন্যান্য কলাই ধুতুরা ফলে জীর্ণ হয়। লবণ এবং আম্র একত্র করিয়া খাইলে ধুতুরাফল জীর্ণ হয়।

৭। ব্যোষেণ নিম্বুফলকেন বাপি। তক্রেন বা সর্পি রুপৈতি পাকং॥

ত্রিকটু (শুঠ, পিপুল, মরিচ) লেবু, ঘোল এই সকল বস্তু দ্বারা ঘৃত জীর্ণ হয়।

৮। পিশিত পন সয়োঃ স্যাদাম্র বীজেন পাকঃ
কুশর মহিষযোষিৎ ক্ষীরয়োঃ সৈন্ধবেন।
চিপিট পুরিণতিঃ স্যাৎ পিপ্পলী দীপ্যকাভ্যাং
অপহরতি তুষাম্ভো বৈদলানামজীর্ণং॥

আমের বীজ মাংস এবং কাঁঠাল জীর্ণ করে। সৈন্ধব লবণ খিচুড়ী এবং মহিষ দুগ্ধ জীর্ণ করে। যৈন সংযুক্ত পিপ্পলী চিড়া জীর্ণ করে।

৯। কিমত্র চিত্রং বহু মাংস মৎস্য ভোজী সুখী স্যাৎ পরিপীয় শুক্তং। ইত্যদ্ভুতং কেবল মগ্নিপক্কঃ মাংসেন মৎস্যঃ পরিপাক মেতি॥

মৎস্য এবং মাংস ভক্ষণ করিয়া যদি কাঞ্জিক পান করা যায় তবে উহা জীর্ণ হয়। অগ্নিপক্ক মাছ মাংস সহ ভক্ষণ করিলেও জীর্ণ হয়।

১০। কোষ্ণেণ মণ্ডেণ গবাং পয় স্তু।
ঈষৎ উষ্ণ ভাতের মাড়ে গোদুগ্ধ জীর্ণ হয়।

১১। জরামিরা চন্দন গৈরিকাভ্যাম ভ্যেতি শীঘ্রং।
মদ্যজনিত অপকার রক্তচন্দন এবং গিরিমাটী মিশ্রিত করিয়া সেবনে নষ্ট হয়।

১২। শমাং পর্পটাশীগ্রু বীজেনযাতি।
কণামূলতা লড্ডুকা পূপ সক্তুকাদিং, বিপাকো
ভবেচ্ছক্তুলী মণ্ড আহ॥

রোটী সাজীনা ভীজ ভক্ষণে, লাড়ু, পিঠা ইত্যাদি পিপ্পলী মূলে এবং লুচি ভাতের মাড় ভক্ষণে জীর্ণ হয়।

১৩। জীর্য্যন্তেব পায়সং মুদ্গমুষাৎ।
মুগের যুষ ভক্ষণে পরমান্ন জীর্ণ হয়।

১৪। বিনা লবণ তোয়েন দধি মাসেন জীর্যতি।
দগ্ধন্ত পাকো গুড়েনৈব ন্যূনং॥

লবণ এবং জল ব্যতীত দধি সহজে জীর্ণ হয় না। গুড় সংযোগে দধি শীঘ্র জীর্ণ হয়। অজীর্ণ অন্ন এবং পিষ্টক শীতল জল পানে জীর্ণ হয়। কাহারও কাহারও মতে গরম জলেও জীর্ণ হয়। জল জন্য অজীর্ণে মধু হিতকারী। আম্র ফল মৎস্য ও দুগ্ধকে জীর্ণ করে। তিল তৈল পান করিলে সমস্ত ফল জন্য অজীর্ণ নাশ হয়।

পল্লী-স্বাস্থ্য

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে। এ যুগে ৺মহাপূজার সময়ে বাঙ্গালার পল্লীভূমি স্বাস্থ্যসম্পন্ন থাকিবে, ইহার সম্ভাবনা কোথায়—ইহার প্রত্যাশা করাই বিড়ম্বনা। ৺মহাপূজায় বাঙ্গলার কোন পল্লী কেমন স্বাস্থ্য-সুখ সম্ভোগ করিয়াছিল, আমরা একে একে তাহার পরিচয় লইবার চেষ্টা করিব। সহযোগী "মেদিনী বান্ধব" লিখিয়াছেন,

মহরের স্বাস্থ্য :—

সহরে এ বৎসর ভয়ানক ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দিয়াছে। এমন বাড়ী নাই যাহাতে দুই চারিটী করিয়া রোগী নাই। ম্যালেরিয়া জ্বরের সঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া প্রভৃতি কঠিন মারাত্মক রোগেরও আক্রমণ যথেষ্ট দেখা দিয়াছে। নিউমোনিয়া রোগের আক্রমণে অনেকের প্রাণহানিও ঘটিতেছে।

এক সংখ্যা "বাঁকুড়া দর্পণে" মাত্র দুইটী সংবাদ; তন্মধ্যে একটী—

এ বৎসর বাঁকুড়া সহরে এবং বহু পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। "দর্পণ" কার্য্যালয়ের কর্ম্মচারীগণ প্রায় সকলেই অসুস্থ। আজ মাসাধিককাল বহু কষ্টে "দর্পণ" প্রকাশিত হইতেছে; আমরা এই ত্রুটির জন্য গ্রাহকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

ইহা হইতেই পাঠক বাঁকুড়ার অবস্থা বুঝিয়া লউন।

"ত্রিপুরা হিতৈষী"র এস্‌রাজের তারগুলিও ঐ একই সুরে বাঁধা—

রোগের প্রাদুর্ভাব—অন্নাভাবের সহচর নানাবিধ রোগের সর্ব্বত্রই প্রাদুর্ভাব। জ্বর রোগ তো দেশকে তাহার চারণভূমি করিয়া তুলিয়াছে। এ জেলার স্বাস্থ্য পূর্ব্বে অন্যান্য জেলা হইতে উৎকৃষ্ট ছিল; কিন্তু এখন ম্যালেরিয়ার সর্ব্বত্রই প্রাদুর্ভাব। এরূপভাবে যদি ম্যালেরিয়ার বিস্তৃতি ঘটিতে থাকে তবে ত্রিপুরাও ম্যালেরিয়াপ্রধান অন্যান্য স্থানের ন্যায় জনশূন্য হইয়া পড়িবে। রেলওয়ে ও জল নিকাশের সুবন্দোবস্তের অভাবই ইহার কারণ বলিয়া আমাদের মনে হয়। গভর্ণমেণ্ট ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত ইহার প্রতিকার হওয়া সম্ভবপর নয়। এ বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হইবে কি?

বনগ্রামের অবস্থাও তথৈবচ—

বনগ্রাম টাউনে দুই একটি কলেরা রোগ দেখা দিয়াছে। অন্য কোনও সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ নাই।—পল্লীবার্ত্তা।

তবে "পল্লীবার্ত্তা" একটা সুখের সংবাদ এই দিয়াছেন যে—

যশোহর জেলাবোর্ড গাইঘাটা থানার অধীন ঝাউডাঙ্গা ও বনগ্রাম থানার অধীন বাগদহা গ্রামে এক একজন ডাক্তার রাখিবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল ডাক্তার জেলা বোর্ড হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন।

ফরিদপুরের ভগ্নদূত "সঞ্জয়ের" দৌত্য আরও ভীষণ—

জ্বরের প্রতাপ। গত আশ্বিন মাস হইতে সর্ব্বত্রই জ্বররোগের ভীষণ আক্রমণ-বার্ত্তা শুনা যাইতেছে। এ জ্বর কোন স্থলে টাইফয়েড, কোন স্থলে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, কোন স্থলে বা ম্যালেরিয়া নামে কথিত হইতেছে। ইহার প্রতাপ অতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। যেস্থলে ডাক্তার কবিরাজ আছেন, তথায় চিকিৎসা কোন প্রকারে চলিতেছে। যে গ্রামে ইহাঁদের অবস্থান নাই, তথাকার অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, ইহা অনুমেয়। বহুলোক বিনা চিকিৎসায় ধীরে ধীরে প্রাণবিসর্জ্জন করিতেছে। জ্বরের প্রকোপ এরূপ ভীষণ হইয়াছে যে চিকিৎসালয়ের ঔষধদাতাগণও জ্বরাক্রান্ত হইয়া ঔষধ দিতে অপারগ হইতেছে। মোট কথা, এ-জ্বর কাহাকেও আক্রমণ করিতে ভ্রুক্ষেপ করিতেছে না। সমস্যা অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

কোন্ জেলার কথা রাখিয়া কোন্ জেলার কথা কহিব? সকল জেলার অবস্থা সমান। যশোহর জেলা ত ম্যালেরিয়ার সুরক্ষিত দুর্গ। তাহার উপর "যশোহর" কি বলিতেছেন দেখুন—

এবার যশোরের বহুপল্লীতেই কলেরার আক্রমণ হইয়াছিল, ফলে বহুলোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে; এমন কি বহুস্থানে একবিন্দু ঔষধ মুখে দিবারও সুযোগ ঘটে নাই।

জেলা যশোহরের অপর একদিকের অবস্থাও দেখুন—

রোগে অত্যাচার।

এবার ব্যারামপীড়ার প্রকোপ বেশী। স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়-গুলিতে শিয়ালদহের পূজার ভিড় হয়। যে সমস্ত ফারমেস বাজারে আছে তাহাদের কার্য্যের অবসর নাই। স্থানীয় শ্মশান-গুলি প্রায়ই হরিবোল শব্দে মুখরিত হইয়া গৃহস্থ ও পথিকবর্গের মনে ভীতির সঞ্চার করিতেছে। যমদূতগণের মরশুম পড়িয়া গিয়াছে। চিত্রগুপ্তের হিসাব রাখা দায় হইবে সন্দেহ নাই।—কল্যাণী।

গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের সহযোগী "বঙ্গরত্ন" এক যায়গায় লিখিয়াছেন—

স্বাস্থ্য:—আজকাল সরকারী হাঁসপাতালে রোগীর সংখ্যা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছে। সহরের স্বাস্থ্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এ বৎসর অনেকটা ভাল বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। আজকাল জ্বরজাড়ি কিঞ্চিৎ আয়ত্ত হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রোগ কম যাইতেছে।

এইটুকু পড়িয়া মুখে একটু আশ্বাসের হাসি ফুটিয়া উঠিল যে, অন্ততঃ একটা জায়গারও স্বাস্থ্যের অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল। কিন্তু পরক্ষণেই হরিষে বিষাদ! ইহার পরবর্ত্তী স্তম্ভে "বঙ্গরত্ন" যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে একেবারে চক্ষুস্থির!—

মহাপূজা অবসানে দেশবাসী নিরানন্দ বটে; তদপেক্ষা অধিক নিরানন্দ অন্নবস্ত্রের অভাবে। চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি। তাহার উপর পল্লীগ্রামে এখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপে অনেক গ্রাম শ্মশানে পরিণত হইতে বসিয়াছে। আনন্দময়ীর শুভাগমনে এখন চারিদিকে নিরানন্দের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বে এমন নিরানন্দ ছিল না,—এখনকার মতন অর্থস্বাচ্ছল্য না থাকিলেও কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ সর্ব্বত্র বিরাজিত হইত তাহা প্রকাশ করা যায় না। হায় সে দিন আর কবে ফিরিয়া আসিবে!

সমগ্র ভারতবর্ষে প্লেগে প্রতি সপ্তাহে কত লোক মরে, সপ্তাহে সপ্তাহে তাহার নিয়মিত রিপোর্ট বাহির হয়। এক সপ্তাহের রিপোর্ট এইরূপ—

গত সপ্তাহে নিখিল ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ১৪৫০ জনের প্লেগ রোগে মৃত্যু হইয়াছে।—যশোহর।

প্লেগ রোগকে কর্ত্তৃপক্ষ, এবং সাধারণতঃ ইয়োরোপীয়ানরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রোগ বলিয়া মনে করেন। তাই তাহার প্রতি এত অনুগ্রহ—সাপ্তাহিক রিপোর্ট বাহির করিবার ব্যবস্থা। প্রতি সপ্তাহে প্লেগে গড়ে ১৫০০ লোকের মৃত্যু ধরিলে সমগ্র ভারতে বৎসরে প্লেগ রোগে মৃত্যু সংখ্যা পূরা এক লক্ষও হয় না; অর্থাৎ, পৌণে এক লক্ষের অপেক্ষা সামান্য বেশী। ইহাতেই এত ভয়! আর, সমগ্র ভারতে প্রতি সপ্তাহে কলেরা, বসন্ত, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া রোগে যত লোক মরে তাহার সাপ্তাহিক হিসাব লইবার ব্যবস্থা থাকিলে দেখা যাইত, এই সকল রোগে মৃত্যু সংখ্যা প্লেগের অপেক্ষা কতগুণ বেশী। ভারতবাসীর বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের উপর কাপুরুষতার অভিযোগ করা হয়। কিন্তু তাহারা সত্য কি কাপুরুষ? তাহারা কি মরিতে ভয় পায়? কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, প্লেগে তাহারাই ত মরে—লাখে লাখে মরে। ইহা কি কাপুরুষতার লক্ষণ? তাহারা মরিতে ভয় পাইলে আগেই ইহার প্রতিকার করিত, এবং সরকারকেও প্রতিকারের উপায় অবলম্বনে বাধ্য করিত। তাহারা অবলীলাক্রমে মরিতে পারে বলিয়াই না তাহারা চুপ করিয়া থাকে?

জ্বর ত তাহাদের নিত্য সহচর। লোকে যেমন নিত্য নিয়মিত ভাবে আহার বিহারাদি করে, অনেক স্থলে লোকে সেইরূপ নিয়মিত ভাবে জ্বর ভোগও করিয়া থাকে! যশোহর জেলা জ্বরের জন্য বিখ্যাত। "যশোহরে"ই স্থানীয় স্বাস্থ্যের অবস্থা এইরূপ—

যশোহরে জ্বরজ্বালা সমভাবেই চলিতেছে। কলের জল হইলে সহরের স্বাস্থ্য উন্নত হইবে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া জলের কল প্রতিষ্ঠা হইল; কিন্তু সহরের স্বাস্থ্য কিছুমাত্র উন্নত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পরন্তু টাইফয়েড এবং কলেরার প্রাদুর্ভাব অধিক হইয়াছে ইহাই সাধারণের ধারণা। এদিকে কিন্তু জলের ট্যাক্স দিতে দরিদ্র "সহরবাসীর" প্রাণান্ত হইতেছে।

ফরিদপুর জেলার অন্যতম সংবাদপত্র "সঞ্জয়ের" ইস্তাহার ও বিজ্ঞাপন বাদে এক সংখ্যায় যে সংবাদটুকু প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এই—

সংক্রামক জ্বর—গত আশ্বিন মাস হইতে বাঙ্গালায় এক প্রকার

জ্বরের আবির্ভাব হইয়াছে। উহা সংক্রামক। এমন গ্রাম নাই যে এই সংক্রামক জ্বর প্রবেশ করে নাই। ইহাতে আক্রান্ত হইয়া এবার বহু লোক প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে। কুইনাইন এই জ্বরের অবসানে প্রদত্ত হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যে কুইনাইন আজকাল ব্যবহৃত হইতেছে, উহার শক্তি কমান হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কারণ, ৫০।৬০ গ্রেণ কুইনাইন সেবন করিয়াও রোগী দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হইতেছে। পুনরায় কুইনাইন সেবন করিতেছে। আবার জ্বর আসিতেছে। পূর্ব্বে ৫০ গ্রেণ ব্যবহারে জ্বর আটকাইয়া যাইত। যাহা হউক, এ জ্বররোগ নিবারণের উপায় কি? প্রতিদিন প্রতি গ্রামে ৩।৪জন লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে। এমন অনেক গ্রাম আছে, যে গ্রামে ডাক্তার বৈদ্য কি ঔষধ পত্র আদৌ মিলে না। নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রাম, ফরিদপুরের সদরদী প্রভৃতি গ্রাম ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। আমাদের বিশ্বাস, সকল সংক্রামক রোগের উৎপত্তি হয় বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে। আবর্জ্জনা পচিয়া কার্ব্বনিক গ্যাসের সৃষ্টিতে, পুষ্টিকর আহার্য্য দ্রব্যের অনাটনে, উপযুক্ত বাসগৃহ ও বসনের অভাবে—বহুদিন হইতে আহারীয় দ্রব্যের মূল্য অতিশয় বাড়িয়া যাওয়াতে, শতকরা নিরেনব্বই জন পীড়াগ্রস্ত হইয়া সহজে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ঔষধ সেবনেও শরীরের উপর উহার তেমন ক্রিয়া হইতে পারিতেছে না। দেশের লোকের এদিকে আদৌ দৃষ্টি নাই। যে সকল লোক লাট-সভার সদস্য হইবার জন্য লালায়িত, আকুলিত—তাঁহাদের অর্থ ও সামর্থ্য দীন-দরিদ্র রোগাক্রান্ত লোকের উদ্ধারে নিয়োজিত হইলে, এই পদ অপেক্ষা—এই কার্য্য প্রকৃতই গৌরবময় বলিয়া লোকে মনে করিবে। কিন্তু বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য, এসব চিন্তায় অতি অল্প লোকেরই হৃদয় আন্দোলিত হয়। আজ কেউ কো-অপারেশনে, কেউ নন্-কো-অপারেশনে প্রকৃত কার্য্য নষ্ট করিতেছে,—প্রকৃত লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে। ভারতের লোকের একটা আকাঙ্ক্ষা আছে, কান্দি না ধরিতেই পাকা কদলি ভক্ষণ করিয়া রসনা তৃপ্ত করিবে। এও কি সম্ভব?

এমন কি, "সঞ্জয়" নিজেও বিপন্ন—

"সঞ্জয়ে"র বিলম্বে মুদ্রণ--প্রেসের কর্ম্মচারীদিগের অনেকে জ্বররোগে শয্যাশায়ী হইয়াছে। তন্নিবন্ধন "সঞ্জয়" বিলম্বে মুদ্রিত হইল। পাঠক মহাশয় তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

বাঙ্গলায় পল্লী গ্রাম সমূহের সকল স্থানের অবস্থাই প্রায় একই রকম। কোথাও একটু স্বাস্থ্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। সহযোগী "হিন্দুরঞ্জিকা" রাজসাহী জেলার এবং এইরূপ সংবাদ দিতেছেন—

ম্যালেরিয়া।—গোদাগাড়ীর সকল স্থানেই প্রত্যেক পাড়ার সকলেই ম্যালেরিয়া জ্বরে ভয়ানক ভুগিতেছে। এমন কি গোদাগাড়ী চেরিটেবল ডিসপেন্সারিতে প্রতিদিন দুই শতের অধিক রোগী উপস্থিত হইতেছে। যে রকম ব্যাপার তাহাতে সকল ডিসপেন্সারী অপেক্ষা অত্যধিক রোগীর আমদানী এই ডিসপেন্সরিতে। ঔষধের ডবল ষ্টক আবশ্যক।

বাঙ্গালা দেশ ত ম্যালেরিয়ায় জরজর। একমাত্র ভরসা কুইনাইন। সেই কুইনাইন দুষ্প্রাপ্য হইলে লোকে বাঁচে কি করিয়া? সহযোগী "বাঁকুড়া দর্পণে"র অভিযোগ খুবই ন্যায়সঙ্গত—

কুইনাইন বাস্তবিকই জ্বরের মহৌষধ বলিয়া গভর্ণমেণ্ট কুইনাইন বিক্রয় করিতেছেন। প্রত্যেক ডাকঘরে কুইনাইন বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সকল সময়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। যখন যে স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি হয় তখন সেই স্থানে পোষ্ট আফিসে কুইনাইনের অভাব হইয়া থাকে। লোকে একবারে এক টিউবএর অধিক কিনিতে পায় না এবং কলিকাতা হইতে যথাসময়ে কুইনাইন পোষ্ট অফিসে আসিয়া পঁহুছে না। জুডিসিয়াল জেল পাঠাইতে বিলম্ব করেন। শুনিলাম ব্রাঞ্চ আফিসে একবারে পাঁচ বাক্সের বেশী পাঠাইবার নিয়ম নাই। যে ঋতুতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি হয় সেই ঋতুতে ব্রাঞ্চ আফিসে প্রচুর পরিমাণে কুইনাইন বিক্রয়ের বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক। গভর্ণমেণ্ট পোষ্টমাষ্টার ভিন্ন অন্য লোককে কুইনাইন বিক্রয় করেন না। মফঃস্বলে দোকানদারগণকেও নগদ মূল্যে কুইনাইন পিলের বাকস বিক্রয়ের বন্দোবস্ত থাকিলে প্রজা সাধারণের কুইনাইন পাইবার আরও সুবিধা হয়।

মেদিনীপুরের স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ। একসংখ্যা "মেদিনীপুর হিতৈষী"তে যেটুকু সংবাদ আছে, তাহার সবটুকুই জেলার অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সংবাদ। আমরা তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিলাম প্রথমেই সহযোগী তাঁহার গ্রাহকগণের প্রতি নিম্নলিখিত নিবেদন করিয়াছেন—

মেদিনীপুরে জ্বরের প্রবল প্রকোপে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জ্বরাসুরের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পায় নাই। ডাক্তার সাহেবের রিপোর্ট যে মেদিনীপুর জেলার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা মেদিনীপুর সহরেই জ্বর আদি হইতেছে বেশী। যাহা হউক এই আক্রমণে আমাদের কর্ম্মচারীবর্গ এবং আমরাও আক্রান্ত

হইয়াছিলাম। কর্ম্মচারীবর্গের এখনও অনেকে স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে নাই। সেই জন্য পত্র প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে।

ইহার মধ্যে একটু সুখের কথা এই যে—

কম্পাউণ্ডারী স্কুল—মেদিনীপুর হাসপাতালে, মেদিনীপুরের সিভিল সার্জ্জেন মহোদয়ের উদ্যোগে একটী কম্পাউণ্ডারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আপাততঃ ২৫ জন ছাত্র হওয়া হইবে।

মেদিনীপুরে কুষ্ঠ রোগ অতি প্রবল তাহার জন্য

কুষ্ঠগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের চিকিৎসা ব্যবস্থা—মেদিনীপুর সহরে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ভিখারীর সংখ্যা প্রচুর। তাহারা রক্তাপ্লুত ক্ষত লইয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। লোকের বাড়ী গিয়া ক্ষত নিঃসৃত কতকটা রক্ত-মাংসও ফেলিয়া যায়। উহা ভয়ানক সংক্রামক রোগ। এজন্য আমরা প্রায় একাদশবর্ষ পূর্ব্বে এবং তাহার পরেও ক্রমাগত এ বিষয়ে মিনিসিপ্যালিটির দৃষ্টি অকর্ষণ করিয়া আসিতেছি। জন সাধারণের নিকটও ইহার ভীষণতার প্রতিকারের ব্যবস্থা চাহিয়াছি। মিউনিসিপ্যালিটি জবাব দিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন আমাদের কিছুই করিবার সাধ্য নাই। জন সাধারণ ভীষণতা বুঝিয়াও নীরব ছিলেন। বড়ই আনন্দের বিষয় আমাদের বর্ত্তমান সিবিল সার্জ্জেন মহোদয় এ বিষয়ের ভীষণতা ও গভীরতা উপলব্ধি করিয়া ইহার প্রতিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শালবনী অঞ্চলে ইহাদের জন্য বিস্তৃত স্থানে গৃহ নির্ম্মিত হইবে। উচ্চ রাজকর্ম্মচারীবর্গ মেদিনীপুর আসিয়া স্থান পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কুষ্ঠগ্রস্তদিগকেও যে পরিদর্শন না করিয়াছেন এমন নহে। আমরা ইহাকে শীঘ্র কার্য্যে পরিণত দেখিতে চাই। এবং এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে আমরা ডাক্তার সাহেবের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইব।

মেদিনীপুরের জেলাবোর্ড সম্প্রতি তিনশত টাকা বেতনে একজন হেলথ অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন। মেদিনীপুর হিতৈষীর তাহা মনঃপুত হয় নাই। সহযোগী এই নিয়োগের দোষ দেখিতেছেন-

বোর্ডের স্বাস্থ্যরক্ষক বা হেলথ্ অফিসার—একজন এম-বি ৩০০ শত টাকায় নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার অধীনে ৪ জন স্যানিটারী ইনেস্পেক্টর নিযুক্ত হইবেন। তাঁহাদের বেতনও প্রায় ১৫০ শত পর্য্যন্ত। এজন্য বোর্ডকে ৫০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হইবে। ইহার ফল কি হইবে তাহা ভগবানই জানেন। এগ্রিকলচারল অফিসারের মত যদি কেবল ঘুরিয়া বেড়ান ও পাথেয় আদায় করাই কাজ হয় তাহা হইলে ঘাড়ে যে বিরাট ভূত চাপিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। যে একজন এগ্রিকলচারল অফিসার বা একজন অভিজ্ঞ বড় কৃষক ছিলেন, যাঁহার কাজ কৃষকগণকে উপদেশ দেওয়া—তিনি জেলার কোথায় কি কাজ করিয়াছেন? কোন কৃষকের নিকট গিয়া তাহাকে কি উপদেশ দিয়াছেন? তাঁহা দ্বারা জেলার কি উপকার হইয়াছে? অথচ এজন্য বোর্ডকে প্রায় ৫০০০ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে। বন্যার সময় তিনি যে ধান্য বীজ জন সাধারণের জন্য আনিয়াছিলেন তাহা শুষ্ক ও পচা; তাহার মূল্য স্থানীয় বীজের প্রায় দেড়গুণ—দ্বিগুণ! এই ত সাহায্য।

হেল্‌থ অফিসারের দুই একটা কার্য্যের সন্ধান আমরা পাইয়াছি। তিনি সহরে সহরে বেড়াইয়া "এখানে একটা পুষ্করিণী খনন আবশ্যক" এরূপ বলিয়া রিপোর্ট দিতেছেন। তিনশত টাকা বেতনের একজন হেলথ অফিসারের কি প্রয়োজন? হেলথ অফিসার গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিয়া পথিপার্শ্বের বন জঙ্গল কাটাইবার এবং বিষ্ঠা মূত্রাদি ত্যাগ নিবারণের ব্যবস্থা করুন। পুষ্করিণীর পচা পানা আবর্জ্জনা দূরীকরণের উপদেশ দান ও তাহার ব্যতিক্রমে বিশেষ শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন। গ্রাম্য রাস্তাঘাট ও স্বাস্থ্যের সুবন্দোবস্ত করুন। তবেই বুঝিব তাঁহার নিয়োগে বোর্ডের পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় সার্থক।

আলোচনা।

পাটে সর্ব্বনাশ।—

পাটে দেশের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে;—ম্যালেরিয়ায় দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে—এই কথা লইয়া দেশব্যাপী আন্দোলন চলিতেছে; কিন্তু, ইহার প্রতিকার হওয়া ত দূরের কথা—পাটের চাষ দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। দেশের যেন মা-বাপ নাই—দেশের স্বাস্থ্য যেন কাহারও ভাবনা-চিন্তার বিষয় নয়। পাট পচাইয়া কেবল দেশের স্বাস্থ্য-

নিই যে হইতেছে, তাহা নয়; ইহার দ্বারা economyর দিক দিয়াও কম অনিষ্ট হইতেছে না। কিন্তু সে কথা বড় একটা কেহ বুঝিয়া দেখিতেছেন না—ইহাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। শুনিলাম, যশোহর, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলের চিনির কারখানাগুলি patronageএর অভাবে উঠিয়া গিয়াছে কিম্বা যাইতেছে। সুতরাং খেজুর গুড়ের খরিদ্দারের অভাবে চাষারা খেজুর গাছগুলি কাটিয়া ফেলিয়া তাহার স্থলে পাটের চাষ আরম্ভ করিতেছে। যশোহর, খুলনা একেই ম্যালেরিয়ার আস্থানা। তাহার উপর, পাটের চাষ বাড়িয়া গেল, পাট পচাইবার উপলক্ষে এই দুই জেলার গ্রামগুলি আরও ম্যালেরিয়া-পীড়িত হইয়া উঠিবে। তখন লাট বাহাদুরের সমস্ত সদনুষ্ঠান ব্যর্থ হইয়া যাইবে। নদ-নদীর সংস্কার জন্য, এবং অন্য উপায়ে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য সরকারী ও বেসরকারী যে অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা হইতেছে—এক পাটের কল্যাণে সে সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে। পাটের চাষের অনিষ্টকারিতা চাষাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া পাটের চাষ কমাইবার চেষ্টা করিবার জন্য কি কেহই নাই?

গোহত্যা নিবারণ।—

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকার মধ্যে যাহাতে আর গোহত্যা না হয়, সেই উদ্দেশ্যে কর্পোরেশনের সভায় একটী প্রস্তাব হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, এমন প্রস্তাবেও সভায় মতভেদ ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ, পাল্টা প্রস্তাব হইয়াছিল যে, একেবারে গোহত্যা বন্ধ করিয়া কাজ নাই—কেবল দুগ্ধবতী গাভীর হত্যা রহিত করা হউক। যাহা হউক, বিষয়টির সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা করিবার ভার একটী কমিটির হাতে দেওয়া হইয়াছে। কমিটির সিদ্ধান্ত কিরূপ হয় তাহা দেখিয়া এ বিষয়ের বিস্তৃত ভাবে আলোচনার আরও অবসর পাওয়া যাইতে পারিবে।

গোহত্যা নিবারণে নিম্ন শ্রেণীর উৎসাহ।—

কলিকাতার ন্যায় সহরের উচ্চশিক্ষিত, ধনী, সম্ভ্রান্ত, প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ যে বিষয়ে এখনও মনস্থির করিতে পারিতেছেন না,—আদরার নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা এক কথায় সে বিষয়ে কিরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব প্রকাশ করিতেছে দেখুন। আদরা ই, আই, আর ও বি, এন, আর রেলপথের একটী বড় জংসন ষ্টেসন। রেলওয়ে সংক্রান্ত কর্ম্ম উপলক্ষে এখানে অনেক লোকের বাস। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেল যে, রেলের নিম্ন শ্রেণীর ভৃত্যেরা, এবং গৃহস্থ লোকদের চাকর বাকররা আদরার কসাইখানা তুলিয়া দিয়া গোহত্যা নিবারণের জন্য পণ করিয়া বসিয়াছে; তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিয়াছে যে, যতক্ষণ না তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইবে, ততক্ষণ তাহারা কাজে যোগ দিবে না। গোহত্যা নিবারণকল্পে এই সাধু সঙ্কল্প করিবার পূর্ব্বে তাহারা একটী সভায় সমবেত হইয়া গোহত্যা নিবারণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিল। একটী সভার আলোচনার ফলে তাহারা গোহত্যার অনিষ্টকারিতা, গোরক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া লইয়াছে; এবং একবার যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছে, তাহা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। তাহাদের চেষ্টার ফল যাহাই হউক না কেন, আমরা তাহাদের সাধু সঙ্কল্পের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না।

বাঙ্গলার স্বাস্থ্য রিপোর্ট।—

সম্প্রতি প্রকাশিত বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের একটী রেজোলিউসনে বাঙ্গলার বার্ষিক স্বাস্থ্যের অবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই রিপোর্ট পড়িয়া স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইবার কোন অবসর নাই। এই রেজোলিউসনের যে টুকু অংশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই মাত্র আমাদের অবলম্বন। তাহাতে দেখিতে পাইতেছি যে, গতবর্ষে শিশু-মৃত্যু সংখ্যা

৫৫০০০ কম হইয়াছে; কিন্তু ইহাও দেখা যাইতেছে যে, জন্মের সংখ্যাও বহু পরিমাণে কমিয়াছে। সুতরাং জন্ম-মৃত্যুর অনুপাত হিসাব করিয়া—স্বাস্থ্যের কোনরূপ উন্নতি হইয়াছে কি না তাহা বুঝা গেল না। শিশু-মৃত্যুর হার কমাইবার এবং শিশুদিগের মঙ্গল সাধনের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য ১৯১৯ অব্দের মে মাসে সকাউন্সিল গবর্ণর বাহাদুর একটী কমিটি গঠন করিয়া দিয়াছেন। ঐ কমিটির কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই, সুতরাং শেষ রিপোর্টও বাহির হয় নাই। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের অবস্থা যথাপূর্ব্বং। এই সকল বিষয়ের প্রতিকার করিবার মূলে যে লোকশিক্ষা, তাহার যতদিন না রীতিমত ব্যবস্থা হইতেছে, ততদিন কর্ত্তৃপক্ষের বা বোর্ড প্রভৃতির চেষ্টা তেমন ফলপ্রদ হইবে বলিয়া মনে হয় না। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য গত বৎসর যে চারিটি মতলব গড়া হইয়াছিল, তাহাদের কার্য্য সবে আরম্ভ হইয়াছে—ফলাফল ভবিষ্যতের গর্ভে। মফঃস্বলের জলাভাব দূর করিবার জন্য কিছু কিছু চেষ্টা হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে পুষ্করিণী খনন, পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার এবং কূপ খনন প্রভৃতি বাবদে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা খরচ করা হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের পক্ষে ইহা খুব কম হইলেও, মন্দের ভাল বলিতে হইবে।

ইটালীতে ম্যালেরিয়া নিবারণের ব্যবস্থা।—

বাঙ্গলা দেশের ম্যালেরিয়া নিবারণের ব্যবস্থা করিবার জন্য লোকের চীৎকার করিয়া গলা চিরিয়া গেল, অথচ, বিশেষ কোন ফল দেখা যাইতেছে না; ওদিকে ইটালীতে ম্যালেরিয়া নিবারণের কেমন সুন্দর ব্যবস্থা হইতেছে। ইটালীতে Pontine Marshes নামে একটী জলাভূমি আছে। সেখানে ম্যালেরিয়া খুব বেশী। সেই ম্যালেরিয়া দমন করিবার জন্য উহার নিকটবর্ত্তী Terracina নামক স্থানে radio-therapeutic clinic নামে একটী চিকিৎসাশালা স্থাপিত হইয়াছে; এবং তথায় রোঁৎগে আলোকের (X-rays) সাহায্যে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা হইতেছে। তা' ছাড়া, সেখানে এক বৎসর হইল জলাভূমির জল বাহির করিয়া দিয়া তথায় চাষবাসের বন্দোবস্ত করিবার উদ্দেশ্যে পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আশা করিতেছেন যে, ১০ বৎসরের মধ্যে ঐ স্থানটি ম্যালেরিয়াশূন্য হইয়া শস্যক্ষেত্রে পূর্ণ হইবে, এবং জলাভূমিতে ভুট্টা, শন, তামাক ও শাকশব্জি উৎপন্ন হইবে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের অবস্থা এমনই যে, এখানে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য, কিম্বা অপর কোন সংক্রামক রোগ নিবারণের জন্য, অথবা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোন কার্য্যের জন্য কেহ কোনরূপ চেষ্টা করিতে গেলেই—যাহাদের উপকারের জন্য—জীবন রক্ষার জন্য এই সব অনুষ্ঠানে হাত দেওয়া যায়—তাহারা স্বয়ং এই সকল ব্যবস্থায় বাদী হইয়া উঠে। প্রাচীন পুষ্করিণীগুলির পঙ্কোদ্ধার করিবার যো নাই;—পুকুরগুলি বহু সরিকের সম্পত্তি—একজন রাজী হয় ত অপর জন রাজী হয় না; আর, এজন্য একটী পয়সাও খরচ ত কেহই করিতে চায় না। হয় অর্থ ব্যয়ের সামর্থ্য নাই; আর না হয় অর্থস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও সেদিকে কাহারও প্রবৃত্তিই নাই। অর্থাভাবে নূতন পুষ্করিণী খনন করা গ্রামবাসীদের সাধ্যায়ত্ত নহে; কেহ কষ্টেসৃষ্টে কিছু অর্থব্যয় করিয়া পুকুর কাটাইয়া দিলেও, গ্রামশুদ্ধ লোকে এমন ভাবে সেই পুকুর সরিতে আরম্ভ করিবে, যে, দুইদিনে তাহার জল অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিবে। কাহারও তাহাতে বাধা দিবারও যো নাই—অমনি দলাদলির সৃষ্টি—এবং যে বাধা দিতে সাহস করিবে তাহার উপর সামাজিক অত্যাচার—তাহার হুঁকা, ধোপা, নাপিত বন্ধ। কেহ আগাছা কাটাইয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া গ্রাম্য স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করিতে গেলেই লোকে—তাহাদের চিরন্তন অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইল—বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিবে। ফলতঃ, লোকশিক্ষার বিস্তৃতি সাধন

ভিন্ন গ্রাম্য স্বাস্থ্যোন্নতির আর কোন উপায় দেখা যাইতেছে না।

পথের ধারের ভোজনাগার।—

কলিকাতা সহরে ছোট বড় সকল রাস্তার ধারেই এখন অসংখ্য ভোজনাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ইহা এদেশে সম্পূর্ণ নূতন আমদানী। এই সকল ভোজনাগার দুই শ্রেণীর; এক শ্রেণীতে কেবল চা, বিস্কুট, কেক প্রভৃতি থাকে; অপর শ্রেণীতে ঐ গুলি ত থাকেই,—চপ, কাটলেট, মাটন, কারি প্রভৃতি আমিষজাত খাদ্য ও থাকে। এই সকল খাদ্য ও তাহাদের উপাদানসমূহের বিশুদ্ধতা এবং অন্যান্য দোষ গুণের আলোচনা মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে; আজ আমরা সে সকলের আলোচনা করিব না; কিন্তু এই সমস্ত ভোজনাগারের অন্য একটা বিষম ত্রুটির বিষয়ই অদ্য আমাদের প্রধান আলোচ্য।

এই শ্রেণীর ভোজনাগার প্রায় সামান্য পুঁজির ব্যবসায়; অথচ ইহাতে লাভ বিস্তর—এই ভোজনাগার-গুলি প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই খরিদদারে পূর্ণ থাকে। ইহাদের dead stock বেশী কিছু নয়—গোটা কয়েক ডেকচি, হাঁড়ি, হাতা, কেট্‌লী, tea pot, চায়ের পেয়ালা, প্লেট, ডিস প্রভৃতি। খরিদদারের সংখ্যার অনুপাতে কিন্তু এই সকল উপকরণের পরিমাণ অতি কম। আপনি যদি এক পেয়ালা চা পান করিবার অজুহাতে আধঘণ্টাটাক কোন একটী ভোজনাগারে বসিয়া থাকেন তাহা হইলে অতি বিচিত্র ব্যাপার সব দেখিতে পাইবেন। প্রথমতঃ দেখিতে পাইবেন, বহু চা-খোর এক পেয়ালা চা পান করিবার প্রত্যাশায় বহুক্ষণ হাঁ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন; বার বার চা চাহিয়াও পাইতেছেন না; অথচ চায়ের নেশায় দোকান ছাড়িয়া যাইতেও পারিতেছেন না। চা না পাইবার কারণ কি? কারণ আর কিছু নয়,—একই সময়ে যত লোক চা পান করিবার জন্য দোকানে উপস্থিত থাকেন, সে সকল লোককে একই সময়ে serve করিবার মত যথেষ্ট সংখ্যক পেয়ালার অভাব। যে কয়েক শেট পেয়ালা আছে সে সমুদায়ই ধোওয়া। কেহ চা খাইয়া পেয়ালা ছাড়িয়া না দিলে অপর খরিদদারকে চা দিবার উপায় নাই। এইরূপে যখন একটী পেয়ালা আজাড় হইল, তখন একজন চাকর আসিয়া চায়ের পেয়ালা এবং চায়ের মূল্য বাবদ দুইটা কি চারিটা পয়সা তুলিয়া লইয়া, একটা ভিজা ন্যাকড়া লইয়া টেবিলের খানিকটা মুছিয়া লইয়া চলিয়া গেল। তারপর সেই পেয়ালা ও ডিস একটব জলে একবার ডুবাইয়া তুলিয়া লইয়া তাহাতে পুনরায় চা ঢালিয়া অপর একজন খরিদদারকে serve করিল। আপনি যদি খুঁত খুঁতে লোক হ'ন, তাহা হইলে ঐ পেয়ালায় চা খাইতে নিশ্চয়ই আপনার মন আপত্তি করিবে—মনে একটা ঘৃণার ভাব আসিবে নিশ্চয়ই। আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে আপনি দেখিতে পাইবেন, প্রতি মিনিটে পাঁচ সাতটা পেয়ালা ও ডিস ঐ টবের জলে ঐ রকমে একবার ডুবাইয়া তুলিয়া লইয়া তাহাতেই অপর খরিদদারকে চা দেওয়া হইতেছে। সমস্ত দিনের মধ্যে ঐ টবের জল আর বদলানো হইবে কি না, সন্দেহ। ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় ইহার আরম্ভ এবং রাত্রি ১২টা কি ১টার সময় ইহার পরিসমাপ্তি। আপনি যদি রাত ৯টা কি ১০টার সময় ঐরূপ কোন দোকানে চা পান করিতে যান, তাহা হইলে আপনাকে কত লোকের উচ্ছিষ্ট যে ভোজন করিতে হইবে, তাহার কল্পনা করিতে পারেন কি? আর, আপনি যদি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হ'ন, অথচ আপনার চা খাওয়া অভ্যাস থাকে এবং অন্য উপায়ান্তরের অভাবে আপনি যদি কোন সময়ে একটু বেশী রাত্রে ঐরূপ ভোজনাগারে চা পান করিতে বাধ্য হ'ন, তাহা হইলে আপনাকে কত জাতের উচ্ছিষ্ট যে ভোজন করিতে হইবে, তাহা আপনি অনুমান করিতে পারেন কি?

কেবল চা নয়, এই ধরণের ভোজনাগারে নানাবিধ আমিষজাত খাদ্যও serve করা হইয়া থাকে। এক্ষেত্রেও প্রায় ঐ নিয়মে কার্য্য হইয়া থাকে। বেশীর ভাগ একটা অপরিষ্কার ন্যাতা গোছের ভিজা ন্যাকড়া করিয়া বাসনে লিপ্ত ঘৃত, চর্ব্বি, মসলা প্রভৃতি মুছিয়া লইয়া পরিচ্ছন্নতার ছলনা করা হয়। ঐ ন্যাতা সমস্ত দিন ধরিয়া ব্যবহৃত

হয়। সমস্ত দিন রাত্রি ধরিয়া ঐ খাতায় বাসনাদি মুছিয়া লওয়া হয়,—ইহার মধ্যে একবারও উহা জলকাচা করিয়া লইবারও অবসর পাওয়া যায় না—এমন খরিদদায়ের ভিড়। বলুন দেখি ইহাতে সাধরেণের স্বাস্থ্য কেমন সুন্দর ভাবে রক্ষিত হইয়া থাকে;—infections এর ইহাতে কতখানি সুবিধা!

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-সম্মত ভাবে কাজ করিতে হইলে বাসনগুলি প্রত্যেক বার ফুটন্ত গরম জলে অন্ততঃ দুই মিনিট কাল রাখিয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। আপনি যদি হিন্দু হ'ন, তাহা হইলে আপনার পুরমহিলাগণের বাসনাদি মাজিয়া লইবার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। সকড়ি বাসনাদি উত্তমরূপে মাজিয়া লওয়া শুচি-বায়ুগ্রস্ততার লক্ষণ নহে—এই শুচিতা-বুদ্ধি বিলক্ষণ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সম্মত।

Public ভোজনাগারের এই বিষম ত্রুটির অবিলম্বে সংশোধন হওয়া অতীব আবশ্যক। মিউনিসিপ্যালিটীর খাদ্য-পরীক্ষকগণ বোধ হয় খাদ্যের উপকরণগুলির দোষগুণের বিচার করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন—এদিকে দৃষ্টিপাত করিবার বোধ হয় তাঁহাদের অবসর হয় না, এবং মনে হয়, ইহা তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়াও মনে করেন না। কিন্তু আমরা বিবেচনা করি, ইহাও তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণের অন্যতম বিষয় হওয়া উচিত। তবেই তাঁহারা তাঁহাদের পদোচিত—কেবল food inspector নহে—sanitary inspectorএরও কর্ত্তব্য উত্তম ও যথোচিত ভাবে পালন করিতে পারিবেন।

কিন্তু কাজটা তাঁহাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে না; কারণ এরূপ করিতে হইলে সর্ব্বক্ষণ ভোজনাগারেই কাটাইতে হয়; অন্ততঃ খুব ঘন ঘন ঐ সকল চায়ের দোকানে পদধূলি প্রদান করিতে হয়। এতটা সময় বোধ হয় তাঁহারা ইহার জন্য ব্যয় করিতে পারিবেন না। কাজেই, মনে হয়, প্রতিকারের ভার খরিদ্দারগণকেই নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে হইবে। সকল খরিদ্দারই যদি এক জোট হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, যেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে যথোচিত ভাবে লক্ষ্য না রাখা হইবে, বাসনাদি স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানানুমোদিত ভাবে মাজিয়া ঘসিয়া ধৌত করিয়া লওয়া না হইবে, শুচিতার দিকে লক্ষ্য রাখা না হইবে, সেখানে তাঁহারা কখনই পদার্পণ করিবেন না, তাহা হইলে দোকানদাররা ইহার ব্যবস্থা করিতে নিশ্চয়ই বাধ্য হইবে। তাহারা এই ব্যবসায়ে যেরূপ ভয়ঙ্কর লাভ করে, তাহাতে ইহা করা তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। কেবল লাভের পয়সার খাতিরে নহে, সাধারণের প্রতি কর্ত্তব্যের হিসাবেও ইহা তাহাদিগকে করাইতে বাধ্য করিতেই হইবে। নচেৎ, প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও, পরোক্ষ ভাবে জাতীর স্বাস্থ্যহানি অনিবার্য্য। আমরা জনসাধারণকে, বিশেষতঃ চা-খোর এবং চপ-কাটলেট-বিলাসীদিগকে সতর্ক করিতেছি—তাঁহারা যদি নিজেদের মঙ্গল চান, নিজেদের স্বাস্থ্যে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে অবিলম্বে প্রতিকারের ব্যবস্থা করুন।

ব্রঙ্কাইটিস সর্দ্দির একটা প্রকার-ভেদ; ঠাণ্ডা হইতে উহার উৎপত্তি—ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু, গত যুদ্ধের সময় সৈন্যগণের শিবিরে নিশ্চিত ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ঠাণ্ডা হইতে ততটা উৎপন্ন হয় না, যতটা হয় জনতা হইতে। অনেক লোক এক জায়গায় বাস করিতে থাকিলে—ঠাণ্ডা না লাগিলেও তাহাদের মধ্যে অনেকের ব্রঙ্কাইটিস রোগ হয়। প্লেগও কতকটা এই ধরণের। অতএব জনতা বা ঘেঁসাঘেঁসি বাস পরিহার করিতে পারিলে এই দুই রোগের হাত হইতে অনেক সময়ে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে।

কমলা লেবুতে যথেষ্ট পরিমাণে ভাইটামাইন থাকে। অতএব কমলা লেবুর রস কেবল মুখরোচক খাদ্য নয়, অতি পুষ্টিকর খাদ্যও বটে। কচি ছেলে মেয়েদেরও কমলা লেবুর রস খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকার আছে।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৯ম বর্ষ } মাঘ, ১৩২৭ সাল { ১০ম সংখ্যা

অনিদ্রা।

সমস্ত দিন কাজ কর্ম্ম করিবার পর রাত্রিতে, বিশ্রামের সময়, যিনি নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে পান না, তাঁহার মত দুর্ভাগ্য লোক পৃথিবীতে খুব কমই আছে। যাঁহারা রাত্রিতেও কাজ করিতে বাধ্য হ'ন, কাজের জন্য যাঁহারা রাত্রিতে ঘুমাইতে পান না, তাঁহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁহাদের রাত্রিতে কোন কাজ করিতে হয় না, বিশ্রামের যথেষ্ট সময় থাকে—তাঁহারা যদি সুখ শয্যায় শয়ন করিয়াও ঘুমাইতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অবস্থা বড়ই খারাপ বলিতে হইবে। বস্তুতঃ এরূপ অনিদ্রা একটা রোগ মাত্র। ইংরেজীতে ইহার নাম Insomnia। ইহার চরম পরিণতি উন্মাদ রোগ। সুতরাং এই অনিদ্রা বা Insomnia রোগের সময় থাকিতে সুচিকিৎসা করা আবশ্যক। নচেৎ তাহার পরিণাম বড়ই ভীষণ হইতে পারে।

অনিদ্রা রোগ দুই প্রকার আছে। এক, স্থায়ী; অপর, অস্থায়ী। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অনিদ্রা রোগ তত মারাত্মক নহে। কিন্তু তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা না করিলে, তাহাই অবশেষে স্থায়ী অনিদ্রা রোগে পরিণত হইতে পারে।

অস্থায়ী অনিদ্রা রোগ সাময়িক উত্তেজনার ফল। ইহার চিকিৎসাও তেমন কঠিন নয়। রোগের কারণ—উত্তেজনা দূর করিতে পারিলেই, রোগও আরাম হইয়া যায়। কিন্তু রোগ ঠিক আরাম হইল কি না, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। অর্থাৎ, ঠিক কি কারণে অস্থায়ী অনিদ্রা রোগ জন্মে, তাহা সব সময়ে ধরিতে পারা যায় না। কাজেই আন্দাজি একটা কারণ খাড়া করিয়া, তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া, অনেকে মনে করিয়া থাকেন, যথেষ্ট করা হইল। তাঁহারা নিদ্রা যান বটে, কিন্তু সুনিদ্রা তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। তাঁহাদের নিদ্রা তন্দ্রার নামান্তর মাত্র—রাত্রিতে অনেক বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, কিম্বা সমস্ত নিদ্রার সময়টাতেই তাঁহারা নানারূপ উৎকট স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা এইরূপ অনিদ্রা রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের আবিষ্কৃত এক একটী করিয়া নিজস্ব এবং বিশিষ্ট চিকিৎসা প্রণালী আছে; অর্থাৎ, যতগুলি রোগী, ততগুলি চিকিৎসা প্রণালী। এবং প্রত্যেকেরই চিকিৎসা প্রণালী, তাঁহার

নিজের মতে একেবারে অব্যর্থ। অপর কাহারও অনিদ্রা রোগ হইয়াছে শুনিলে, তাঁহারা তাঁহাদের নিজস্ব চিকিৎসা প্রণালীটি prescribe করিয়া থাকেন; এবং ভরসা দেন যে, তাঁহার কথা শুনিলে রোগ যে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে, তাহাতে আর লেশ মাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

স্থায়ী বা দীর্ঘকাল ব্যাপী অনিদ্রা রোগ যেমন কঠিন, তাহার চিকিৎসাও সেইরূপ কঠিন। স্থায়ী অনিদ্রা রোগ নানা কারণে ঘটিতে পারে। তন্মধ্যে কয়েকটি সাধারণ কারণ এই—যাঁহাদিগকে প্রত্যহ অত্যধিক পরিমাণে মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাঁহারা অনেক সময়ে অনিদ্রা রোগে কষ্ট পাইয়া থাকেন। অলসতা, শারীরিক শ্রমবিমুখতা অনিদ্রা রোগের অপর একটী কারণ। দুশ্চিন্তাও যথেষ্ট পরিমাণে সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইয়া থাকে। গোপনে পাপের অনুষ্ঠান করিলেও লোকে মনে মনে বৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে, এবং নিদ্রাসুখ ভোগে বঞ্চিত হয়। দারিদ্র্যজনিত মানসিক উদ্বেগ—স্ত্রীপুত্র পরিবারাদির ভরণ পোষণে অসমর্থতা নিদ্রাহীনতার অন্যতম কারণ। সুচিকিৎসার দ্বারা, এবং ক্ষেত্র বিশেষে রোগের কারণ দূর করিয়া, এই শ্রেণীর অনিদ্রা রোগ নিবারণ করা যাইতে পারে।

কোন কোন চিকিৎসক পরামর্শ দেন যে, যাঁহারা প্রতি রাত্রিতেই অনিদ্রার কষ্ট ভোগ করেন, তাঁহারা, অন্ততঃ তাঁহাদের মধ্যে কতক লোকে, চেষ্টা করিলে নিজেকে সম্মোহিত (hypnotize) করিয়া কৃত্রিম নিদ্রা আনয়ন করিতে পারেন; এবং ক্রমে তাহা অভ্যাসে পরিণত হইয়া স্বাভাবিক সুনিদ্রায় পরিণত হইতে পারে। কিন্তু সকলের পক্ষে এই একই নিয়ম খাটে না। অনেকে নিজেকে সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করিতে গেলে, উল্টা ফলের উৎপত্তি হইতে পারে—তাঁহারা চির দিনের জন্য নিদ্রায় বঞ্চিত হইতে বাধ্য হইতে পারেন। অতএব এরূপ অস্বাভাবিক চেষ্টা না করাই ভাল।

অনেকে আবার বলিয়া থাকেন, মনকে একাগ্র করিতে পারিলে নিদ্রা আসিতে পারে। এক্ষেত্রেও কিন্তু hypnotize করিবার চেষ্টার মত উল্টা ফল ফলিতে দেখা যায়। মনকে একাগ্র করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ঘুমের দফায় একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে হয়।

চিকিৎসা শাস্ত্রে নিদ্রাকারক অনেক ঔষধ আছে। কিন্তু হিসাব মত ধরিতে গেলে, সেই সকল ঔষধ নিদ্রা আনয়নে সমর্থ নহে। তদ্দ্বারা শারীর যন্ত্রের কার্য্য স্থগিত থাকিয়া নিদ্রার মত একটা অবস্থা হয় মাত্র; তাহা প্রকৃত নিদ্রা নহে। বিশেষ গুরুতর কারণ ব্যতীত এরূপ ভাবে ঔষধের সাহায্যে কৃত্রিম নিদ্রার সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে। অপর কোন কঠিন রোগের দরুণ রোগীর নিদ্রা না হইলে, এবং রোগীকে নিদ্রিত করা সেই রোগের চিকিৎসার জন্যই বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিলেই কেবল নিদ্রাকারক ঔষধের দ্বারা কৃত্রিম নিদ্রার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু কেহ অন্য সকল রকমে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিলে, এবং কেবল অনিদ্রা তাহার এক মাত্র পীড়া হইলে, তাহার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হয়।

অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিলে বেশী পরিমাণে রক্ত মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়। এ রকম স্থলে রক্তের গতি মস্তিষ্ক হইতে শরীরের অপর অংশে ফিরাইতে পারিলে, মস্তিষ্ক শীতল হইয়া সুনিদ্রা হইতে পারে। স্বাভাবিক উপায়ে রক্তের গতির পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিলে তাহার ফল অতি শুভ হইয়া থাকে।

সে উপায় কি? উপায়টি অতি সহজ। সকলেই এই উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন। শয়নের পূর্ব্বে সামান্য ভাবে একটু অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া (অর্থাৎ ব্যায়াম করিয়া) শয়ন করিলে অচিরে গাঢ় সুখনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইতে পারা যায়। ব্যায়ামের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ গরম জলে (সামান্য একটু অডিকোলন মিশাইয়া লইলে

আরও ভাল হয়) মুখ, হাত, পা উত্তম রূপে ধৌত করিয়া লইতে হইবে। এই হাত মুখ ধৌত করিলেই শরীর এমন স্নিগ্ধ হইবে যে, তাহাতে এক ঘণ্টা সুনিদ্রার কাজ হইবে। তার পর মিনিট কুড়ি ধরিয়া চুলগুলি একবার বুরুষে করিয়া আঁচড়াইয়া লইলে, মস্তিষ্কের শ্রান্তি অনেকটা পরিমাণে দূর হইবে। তার পর ব্যায়াম করিবেন। ব্যায়াম এমন ভাবে করিবেন, যেন সকল অঙ্গই অল্প পরিমাণে সঞ্চালিত হইতে পারে। তাহাতে মস্তিষ্ক হইতে অতিরিক্ত রক্ত সর্ব্ব শরীরে সঞ্চালিত হইয়া মস্তিষ্কের উপর রক্তের চাপ কমিয়া আসিবে। ব্যায়ামের পর শরীর উত্তম রূপে আচ্ছাদিত করিয়া এক গ্লাস গরম দুধ—অভাবে অন্ততঃ এক গ্লাস গরম জল পান করিবেন। তৎসহ সামান্য কিছু জল যোগ করিতে পারিলে আরও ভাল।

ইহার সঙ্গে আরও দুই একটী কাজ করিতে হইবে। শয়ন করিবার কিছুক্ষণ (অন্ততঃ ঘণ্টা খানেক) পূর্ব্ব হইতে গৃহমধ্যে বিশুদ্ধ বায়ুর অবাধ সঞ্চালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুনিদ্রা আনয়নের পক্ষে ইহা অতীব আবশ্যক—অনিবার্য্য বলিলেও চলে। শয়ন করিবার পরও যেন ঘরের দুইটী, অন্ততঃ একটী জানালা সমস্ত রাত খোলা থাকে। কি শীত, কি গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই জানালা খোলা রাখিয়া শয়ন করা সুনিদ্রার পক্ষে ত বটেই,—সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষেও পরম হিতকর। ইহাতে কোনই অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, বরং সমধিক উপকারই আছে। তবে অভ্যাস বশতঃ, শীতকালে ঘরের জানালা খোলা রাখিয়া শয়ন করিলে, হিম লাগিয়া যাঁহাদের সর্দ্দি হইবার সম্ভাবনা আছে, তাঁহারা নাসিকা, কিম্বা মুখ খালি রাখিয়া, আপাদ-মস্তক গরম শীত-বস্ত্রে আবৃত করিয়া নিদ্রা যাইতে পারেন। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল ঘরের মধ্যে আসিয়া ঘরদ্বার ভিজাইয়া দিবার সম্ভাবনা থাকিলে, যে দিকে বৃষ্টির ঝাট আসিতে পারিবে না, সেই দিকের জানালা খুলিয়া রাখিবে না। কিন্তু বর্ষাকালের সজল বায়ু যাঁহাদের সহ্য না হইবে, তাঁহারা কেবল মুখের সম্মুখভাগ খোলা রাখিয়া, দেহের অপর সকল অংশ একখানি মোটা চাদরে আবৃত করিয়া রাখিয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারেন। মোটের উপর, দিবারাত্রি ঘরের জানালা দরজা খোলা রাখিয়া, ঘরের মধ্যে মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিলে, অপকারের অপেক্ষা উপকারই অনেক বেশী। তবে অভ্যাসবশতঃ অনেকের হিম, বা বর্ষার ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া সহ্য হয় না। সে ক্ষেত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া শয়ন করা যাইতে পারে। তবে নিশ্বাস প্রশ্বাস যেন অব্যাহত থাকে। নচেৎ জানালা খুলিয়া রাখিবার উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া যাইবে।

শয়ন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা শয়ন করিবার পর ১০।১৫ মিনিট ধরিয়া চেষ্টা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করিলে, অর্দ্ধেক ব্যায়ামের কাজ হইবে। এই দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ একটু চেষ্টা-সাপেক্ষ। ধীরে ধীরে দীর্ঘ নিশ্বাস টানিবেন, এবং যতটা পারেন, নাসিকা পথে বায়ু টানিয়া লইবেন। এবং যেটুকু বায়ু শ্বাস কালে গ্রহণ করিবেন, তাহার সমস্তটুকু প্রশ্বাস কালে ত্যাগ করিবেন। দীর্ঘ নিশ্বাস টানিবার সময় সমস্ত শরীর ঋজু ভাবে রাখা কর্ত্তব্য। শয়নের পূর্ব্বে হইলে, সোজা ভাবে দাঁড়াইয়া মাথা খাড়া রাখিয়া শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিবেন। এ সময়ে যেন শরীরের কোন অংশ বাঁকিয়া বা কোঁচকাইয়া না থাকে—পিঠ যেন কুঁজো হইয়া না থাকে। শয়ন করিবার পর হইলে, মাথার বালিশ সরাইয়া রাখিয়া, কেবল বিছানার উপর ঋজু ভাবে পড়িয়া থাকিবেন। ১০।১৫ মিনিট অভ্যাস করিতে বলা গেল বটে, কিন্তু কিছু দিন নিয়মিত ভাবে এই ব্যায়াম করিলে, কতক্ষণ দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করা উচিত তাহা নিজেই স্থির করিয়া লইতে পারিবেন;—সহজেই বুঝিতে পারিবেন, সমস্ত শরীরে বেশ একটু স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব আসিয়াছে—রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সর্ব্বশরীরে সুন্দর ও সুনিয়মিত ভাবে হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এইটী বুঝিতে পারিলেই জানিবেন, যথেষ্ট ব্যায়াম হইয়াছে।

তার পর, শারীরিক ব্যায়াম কি ভাবে করিতে হইবে, তাহাও এখানে বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া যাইতেছে। যখন বুঝিবেন, দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, সর্ব্ব শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন বা প্রাণবায়ু সরবরাহ করা হইয়াছে, তখন বুঝিবেন, শারীরিক ব্যায়াম করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতঃপর দেহের এক একটী অঙ্গ পৃথক ভাবে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিবেন, এবং যখন যে অঙ্গের সঞ্চালন করিবেন, তখন সেই অঙ্গের উপরই অখণ্ড মনোযোগ স্থাপন করিবেন।

প্রথমে মস্তক হইতে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। সমস্ত মাথা, মাথার পিছন দিক, ঘাড়, গলার পিছন দিক দুই হাতে উত্তম রূপে মর্দ্দন করিবেন এবং মস্তক ইতস্ততঃ এমন ভাবে সঞ্চালন করিবেন, যেন গলা, ঘাড় প্রভৃতির মাংসপেশীগুলি উত্তমরূপ নাড়া চাড়া পায়। গাজনের সন্ন্যাসীরা যে ভাবে মাথা চালে, সেই ভাবে মস্তক সঞ্চালনও করিতে হইবে। পঁচিশ বার মস্তক ও ঘাড় সঞ্চালন করিলেই যথেষ্ট হইবে।

তার পর পিঠের ব্যায়াম। শুইয়া শুইয়া পিঠের ব্যায়াম কিরূপে করিতে হইবে? এই রকম—সাপেরা যে ভাবে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে, কেঁচোর মুখে নুন দিলে সে যেমন ভাবে ছটফট করে, সেই ধরণে পিঠের ব্যায়াম করিতে হইবে। খুব ভারি একটা জিনিস তুলিতে হইলে গা হাত পা যে ভাবে শক্ত করিতে হয়, সেই ভাবে পিঠের মাংসপেশীগুলিকে কুঁচকাইয়া আবার আলগা দিতে হইবে। এই ব্যায়াম করিবার সময়ে কেবল ইহার দিকেই অখণ্ড মনোযোগ দিতে হইবে—যেন ইহাতে কোনরূপ খুঁত না থাকে। এইরূপে, এক একটী করিয়া সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যায়াম করিতে হইবে। এই ভাবে নামিতে নামিতে পা পর্য্যন্ত গিয়া ব্যায়াম শেষ হইবে। ধনী লোকেরা মধ্যে মধ্যে চাকর বাকরকে দিয়া গা হাত পা ইত্যাদি টিপাইয়া লন। ইহা নিছক আয়েস নয়—ইহাতে ব্যায়ামের কাজ হয়। গা টেপানো যাঁহাদের নিত্য অভ্যাস, তাঁহাদের গা টেপাইবার সময় হইলে একটু আলস্য ভাব ধরে—ঠিক সময়ে, অথবা আগে, গা টেপান না হইলে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হয়।

পায়ের ব্যায়াম একটু বিশেষ ভাবে করা আবশ্যক। পায়ের আঙ্গুলগুলির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে গেলে যে ভাবে পা শক্ত করিয়া রাখিতে হয়, সেই ভাবে পা ছড়াইয়া শক্ত করিয়া দিয়া, প্রথমে ডান পা, পরে বাঁ পায়ের আঙ্গুলগুলির দ্বারা যত বড় ক্ষমতায় কুলায়, ততবড় বৃত্ত শূন্যে অঙ্কিত করিতে থাকুন। প্রত্যেক পায়ের দ্বারা ২৪—২৫ বার এই ভাবে শূন্যে বৃত্ত অঙ্কিত করিলে পায়ের উত্তম রূপ ব্যায়াম হইবে। তার পর প্রথমে এক পা, পরে অপর পা ঊর্দ্ধে তুলুন, এবং নামাইয়া লউন। এই ভাবে বার কতক করিতে হইবে। পরে পা গুটাইয়া এবং ছড়াইয়া আরও বার কতক ব্যায়াম করা চাই।

তার পর হাতের ব্যায়াম। প্রথমে হাত দুইটী দেহের দুই পাশে যথা সম্ভব ছড়াইয়া দিন। পায়ের মত হাতও শক্ত ও নরম করিবেন। ১০। ১২ বারের পর হাত তুলিয়া বুকের উপর আনুন, যেন হাত বুককে স্পর্শ না করে। ইহাও সাধ্যমত ১২বার হইতে ২৪ বার করা আবশ্যক।

প্রথম প্রথম শুইয়া শুইয়া এরূপ ভাবে ব্যায়াম অভ্যাস করিতে একটু একটু লজ্জা করিবে—হয় ত একটু কষ্টও হইতে পারে। কিন্তু, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়—তিন থাকিতে নয়। লজ্জা করিতে গেলে কোন ভাল কাজই করা চলে না। তার পর অভ্যাস হইয়া গেলে আর লজ্জা করিবে না; এবং ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারিলে, ইহাতে আরও আগ্রহ জন্মিবে।

ব্যায়াম হইয়া গেলে, ডান দিক চাপিয়া শুইয়া পড়িবেন এবং দেখিবেন, চোখের পাতা ফেলিতে না ফেলিতে আপনি নিদ্রিত হইয়া পড়িবেন—অনিদ্রার লেশমাত্র থাকিবে না। আরও দেখিবেন, এই ত্রিশ ব্যায়াম শুধু অনিদ্রার ঔষধ নয়—ইহার ফলে আপনার

স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে, ক্ষুধা বৃদ্ধি হইতেছে—গায়ে, বিশেষতঃ মাংসপেশীগুলিতে শক্তির সঞ্চার হইতেছে।

বিনামূল্যে, মাত্র একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া, এতগুলা উপকার পাওয়া হইতে আপনি কি নিজেকে বঞ্চিত রাখিবেন?

ছেলেদের দুষ্টামি।

যে সব ছেলের শারীরিক ও মানসিক অসুস্থ অবস্থা গোড়ায় স্পষ্ট ধরিতে পারা যায় না, তাহাদের দুঃখই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ছেলেটি দেখিতে শুনিতে বেশ,—কোনরূপ রোগ আছে বলিয়া বোধ হয় না, অথচ তাহার স্বভাব দুষ্ট। এ ক্ষেত্রে তাহাকে দুষ্ট মনে করিয়াই তাহার সঙ্গে তদনুরূপ ব্যবহার করা হয়, তাহাকে খুব কঠোর ভাবে শাসন করা হয়। কিন্তু সে শাসনে কোন ফল হয় না; দুষ্টামি না কমিয়া বরং বাড়িয়াই যায়। কিন্তু বোধ হয় তাহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিলে দেখা যাইতে পারে যে, সে সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ নয়, তাহার মানসিক অবস্থা ঠিক স্বাভাবিক নয় (abnormal)। তবে তাহাকে পাগলও বলা যায় না। এই কারণে তাহার স্বাস্থ্য উপেক্ষিত হইয়া থাকে। ইহারাই বড় হইয়া ভবিষ্যতে জেলখানায় কয়েদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। অপরাধীদের শাস্তিদানের উদ্দেশ্য তাহাদের অপরাধ প্রবৃত্তির সংশোধন করা। কিন্তু তাহা এমন অসময়ে প্রযুক্ত হয়, যখন তাহাদের অবস্থা সংশোধনের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। অপরাধ প্রবৃত্তির সংশোধন করিতে হইলে সেই ছেলেবেলা হইতেই তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহা সাধারণতঃ হয় না বলিয়াই, বেশী বয়সে লোক চোর, ডাকাত, খুনে, বদমায়েস হইয়া থাকে; অথচ সময়ে সুচিকিৎসা হইলে বোধ হয় অপরাধের পরিমাণ ও অপরাধীর সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইতে পারিত; এখনও সুব্যবস্থা হইলে যাইতে পারে। কিন্তু সকল বালকের মানসিক স্বাস্থ্যের এই abnormal অবস্থা ধরিতে পারা সোজা কথা নয়। পিতামাতা বা অভিভাবক, যাঁহারা চিকিৎসা শাস্ত্র বা মনস্তত্ত্বের কোন ধার ধারেন না, তাঁহাদের পক্ষে ইহা ধরিতে পারা অসম্ভব। বহুদর্শী বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অনেক দিন ধরিয়া এই সকল বালকের স্বভাব, চালচলন পরীক্ষা করিলে তবে ইহা ধরিতে পারেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দুষ্টামি করা ছেলেদের পক্ষে স্বাভাবিক; তবে তাহার মাত্রাধিক্য ঘটিলেই বুঝিতে হইবে যে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল নয়। এই স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক দুষ্টামির মাত্রা নির্ণয় করিয়া তাহাদের পার্থক্য সাধনই কঠিন ব্যাপার। মনস্তত্ত্বের বেশী পরিমাণে আলোচনা না হইলে ইহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মনস্তত্ত্বের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারা যাইবে, এই শ্রেণীর দুষ্টু ছেলেদের কেহ কেহ hysteria, কেহ বা anxiety neurosis, আবার কেহ হয় ত obsessional neurosis রোগে ভুগিতেছে; অথচ, বাহিরের লক্ষণ দেখিয়া সাধারণ লোকের সেটুকু বুঝিবার উপায় নাই। প্রকৃত রোগ নির্ণীত হইলে তবে তাহার সুচিকিৎসা হইতে পারিবে; নচেৎ, কেবল শাসনে দুষ্টু ছেলের দুষ্ট স্বভাবের সংশোধন সকল ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। শাসনের ফলে ঠিক স্বভাব না শোধরাইলেও, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ছেলেটি আর দুষ্টামি করিতেছে না; কিন্তু তাহার উৎসাহ একেবারে নির্ব্বাপিত, মুখখানি বিষণ্ণ, খাওয়া পরা বা লেখাপড়া কোন কাজেই আর আগ্রহ নাই। এরূপ অবস্থা দেখিলে বুঝিতে হইবে,

শাসনের ফল ভাল না হইয়া মন্দই হইতেছে। ইহা শাসন নয়, কুশাসন। ইহাতে ছেলের স্বভাব আরও বিগড়াইয়া যাইতে পারে। শাসনের ভয়ে সে হয় ত প্রকাশ্যে দুষ্টামি করিতে বিরত হইবে; কিন্তু গোপনে দুষ্টামি, অন্যায় কাজ করিতে শিখিবে, এবং ক্রমে সংশোধনের বাহিরে গিয়া পড়িবে। বলা বাহুল্য, এরূপ ভাবের শাসন বাঞ্ছনীয় নহে। তবে দুষ্টু ছেলেদের শোধরাইবার উপায় কি? সে উপায় মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের হাতে। তাঁহারা শিশু-চিত্তের গতির পর্য্যালোচনা করিয়া যে উপায় নির্দ্দেশ করিবেন, তদনুসারে কাজ করিতে হইবে।

অনেক ছেলের স্বভাব খিটখিটে, চঞ্চল; স্কুলে পড়াশুনায় একটুও মনোযোগ নাই; অলস। ডাক্তার হীলি (Healy) বিবেচনা করেন, যে সকল ছেলের স্বভাব এইরূপ, তাহাদের স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই ভাল নয়; খুব সম্ভবতঃ তাহারা স্নায়ুঘটিত পীড়ায় (nervous disorders) কাতর। ইহারা কোন বিষয়ে গভীর মনোযোগ দিতে পারে না—অল্পেতেই উত্তেজিত হইয়া উঠে। নিদ্রিত অবস্থায় শয্যায় প্রস্রাব করিয়া ফেলা, ইহাদের শারীরিক অসুস্থতার আর একটা লক্ষণ। পরীক্ষা করিলে হয় ত দেখা যাইবে, ইহাদের টনসিল বড়, কিম্বা ইহারা adenoid রোগে ভুগিতেছে। বাড়ীর অবস্থা যাহাদের ভাল নয়, অর্থাৎ যাহারা ভালরূপ খাইতে পায় না, রাত্রে ঘুমাইতে পায় না—তাহারা এই রকম স্বভাবের হইয়া থাকে।

কিন্তু তাহাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের ঘাড়ে এই দোষ চাপানো হয় যে, তাহারা দুষ্ট, বজ্জাত, অলস। ফলে, তাহাদের ভাগ্যে কেবল শাসনই লাভ হইয়া থাকে। যে সকল কারণে তাহাদের অবস্থা এমন অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে, তাহার প্রতিকারের কোন চেষ্টা হওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের দুষ্টামির যে একটা স্বাস্থ্যঘটিত কারণ থাকিতে পারে, ইহা সচরাচর কাহারও খেয়ালই হয় না। স্কুলেও তাহাদের নিগ্রহের অন্ত নাই। বাড়ীতে পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অথবা অন্য অভিভাবকের শাসন, আর স্কুলে শিক্ষকগণের তাড়না—এই দুইয়ের পেষণে বেচারীর প্রাণ 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক ছাড়িতে থাকে। কিন্তু যদি ছেলেদের মনস্তত্ত্বের আলোচনা করা হয়, তাহাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের অবস্থার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়, এবং সময় থাকিতে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে অপরাধের মাত্রা অনেক কমিয়া যায়,—অনেক মানবাত্মা মহা মহা পাপের অনুষ্ঠান হইতে রক্ষা পায়।

হীলি আরও বলেন যে, chorea (স্নায়ু-স্পন্দন) রোগে বালকগণের মানসিক বিকার ঘটে—তাহাদের চিত্ত অব্যবস্থিত হইয়া পড়ে, ধারণাশক্তি ক্ষুণ্ণ হয়। ইহার ফলেও তাহাদের অপরাধ করিবার প্রবৃত্তি প্রবল হয়। ছেলেদের স্কুল পালানো রোগ, মিথ্যা ভাষণ, দুর্নীতিপ্রবণতা এই chorea রোগের ফল।

শিশু চরিত্রে এই অস্বাভাবিকতা—ইহা যে কি পরিমাণে বংশগত, এবং কতটাই বা পারিপার্শ্বিক পরিবেষ্টনের ফল, সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। তবে, কোন কোন স্থলে বংশানুক্রম, কোথাও বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আবার ক্ষেত্র বিশেষে এই উভয়ই ছেলেদের দুঃস্বভাবের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়। বরং বংশানুক্রমকে এ বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া যায়। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের দৃষ্টান্ত অতি বিরল; দৈত্যকুলে দৈত্যের জন্মই স্বাভাবিক। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভাল হইলে বংশগত দুষ্টামির প্রবৃত্তি অনেকটা সংযত থাকিতে পারে। আর যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা খারাপ হয়, তাহা হইলে দুষ্ট বংশের ছেলেরা ত খারাপ হইবেই। পক্ষান্তরে, সদাচারসম্পন্ন বংশের সন্তান মন্দ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়িলেও সহজে খারাপ হয় না—অনেকটা আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে পারে। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। তবে ইহারও ব্যতিক্রম যে ঘটে না, তাহাও নহে; কিন্তু সেরূপ দৃষ্টান্ত কম। তাই সদ্বংশের ছেলেদেরও অসৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থার

মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায় না। বরং 'সাবধানের মার নাই', হিসাবে—কুদৃষ্টান্ত, কুসঙ্গী, কুৎসিত পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে সৎ ও অসৎ উভয় বংশের ছেলেদেরই তফাতে রাখা 'শ্রেয়ঃ; এবং তাহা অসম্ভব হইলে, অসৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত; তাহাতেও যথেষ্ট সুফল দর্শে।

স্বভাব-দুষ্ট ছেলেদের প্রকৃতি বড় বিপরীত-ধর্ম্মী; ভাল কাজের বেলায় তাহারা বোকার একশেষ; কিন্তু কুকর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাহাদের মাথা বেশ খেলিয়া থাকে। সৎ বালক যে সকল দুষ্ট বুদ্ধির কল্পনা করিতে পারে না, ইহারা অতি সহজেই তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। ছেলেরা যখন দল বাঁধিয়া কোন অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হয়, তখন ইহারা তাহাদের দলপতির কার্য্য করে; এবং নানা দুষ্ট মতলব খাটাইয়া দলের অন্যান্য বালকগণকে পরিচালিত করিয়া থাকে। বাল্যকালে ইহাদিগকে সংযত রাখা অসম্ভব নয়; ইহাদের চাল চলনের উপর নজর রাখিলে অনেক সময়ে ইহারা ঠাণ্ডা থাকে; কিন্তু, ন্যায়ান্যায়ের পার্থক্য বুঝিবার ক্ষমতা ইহাদের কম। কাজেই, ইহারা একবার ছাড়া পাইলে, ইহাদিগকে সামলানো কঠিন।

"পাগলা সাঁকো নাড়িস নি" বলিয়া পাগলকে সাঁকো নাড়িতে নিষেধ করিলে যেমন তাহাকে ঐ কাজটির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া উহা করিতে তাহাকে প্রবৃত্তি দেওয়া হয়,—সেইরূপ অনেক সময়ে দেখা যায় ছেলেদের কোন কাজ করিতে নিষেধ করিলে সে সেই কাজটি আগে করিয়া বসিবে। অন্ততঃ, অভিভাবকের বা শিক্ষকের সাক্ষাতে সে কাজ করিতে যদি সাহস না হয়, তবে অসাক্ষাতে প্রথম সুবিধাতেই সেই নিষিদ্ধ কাজটি করিয়া বসিবে। দুষ্ট ছেলের ত কথাই নাই—অনেক সময়ে সৎ-স্বভাব ছেলেদেরও উপর কোন কর্ম্ম-বিশেষের অনুষ্ঠানে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিলে, যেন তাহাদিগকে প্রকারান্তরে সেই কাজ করিতেই উপদেশ দেওয়া হয়। এরূপ ক্ষেত্রে একটু diplomacy অবলম্বন করিলে ভাল হয়। অর্থাৎ, সেই অন্যায় কাজটি করিতে সোজাসুজি নিষেধ না করিয়া, যাহাতে সে সে কাজ না করে অথবা করিতে না পারে অর্থাৎ সেই কাজ করিবার দিকে প্রবৃত্তি না যায়, এমন ব্যবস্থা করাই ভাল। কেবল বালক নয়—বয়স্ক ব্যক্তিদেরও এই দৌর্ব্বল্যটুকু বিলক্ষণ আছে। আবার সমাজের ব্যবস্থাও ইহার খুব পরিপোষক। যথা, মদ খাইয়া মাতলামি করিলে জরিমানা বা শাস্তির ব্যবস্থা; অথচ, সহরের রাজপথের মোড়ে মোড়ে মদের দোকান। আবার ষোল বৎসরের কম বয়সের ছেলেদের ধূমপান আইন অনুসারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ঠিক যে উপায়টি অবলম্বন করিলে আইনের উদ্দেশ্য নিশ্চিত সফল হইতে পারিত, সেই উপায়টি, অবহেলা করিয়া, অবলম্বন করা হয় নাই। ধূমপান নিবারণ করা যদি যথার্থই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাহার উপকরণ সংগ্রহ করিবার পথগুলির সঙ্কোচ সাধনই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য ছিল। দণ্ডের ভয় দেখাইয়া যদি দোকানদারদের নিষেধ করা হইত যে, তাহারা ষোল বৎসরের কম বয়সের ছেলেদের সিগারেট, বিঁড়ি প্রভৃতি বিক্রয় করিবে না, তাহা হইলে সিগারেট সংগ্রহ করিতে না পারিয়া ছেলেরা ধূমপানের অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু, উপকরণ সংগ্রহের পথ যখন খোলা রহিল, তখন তাহাদিগকে ধূমপানে নিবারণ করে কাহার সাধ্য। সিগারেট বিঁড়ি বিক্রয়ের পথ খোলা রাখিয়া, পুলিশ কিম্বা স্কুলের শিক্ষকদের উপর ছেলেদের হাত হইতে সিগারেট বিঁড়ি কাড়িয়া লইবার ভার দেওয়া, আর গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা সমান কথা। সেইজন্য, আইন রচিত হইবার পরও পথে ঘাটে মানবগণকে সিগারেট বিঁড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে পথ চলিতে দেখা যাইতেছে। উহাদের হাত হইতে সিগারেট বিঁড়ি কাড়িয়া লইবার ভার প্রাপ্ত পুলিশই বা কোথায়, আর স্কুলের হেড মাষ্টারই বা কোথায়? এরূপ যোগাযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা খুবই কম। তার চাইতে যদি দোকান-

দারদিগকে নিষেধ করা হইত, তাহা হইলে বরং অধিকতর সুফল ফলিতে পারিত। কারণ সিগারেট বিঁড়ি কিনিবার জন্য ছেলেদের দোকানে আসিতেই হইবে—এরূপ যোগাযোগের সম্ভাবনাই খুব বেশী। ছেলেরা যদি গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া সিগারেট কিনিবার সুবিধাই পায়, তাহা হইলে তাহার সদ্ব্যবহারও করিবার সুবিধা তাহারা নিশ্চিয়ই করিয়া লইতে পারিবে, এবং লইতেছে ও।

আমিষ আহারের বিপদ।

আজকাল কলিকাতা সহরের প্রায় প্রত্যেক বড় রাস্তাতেই, প্রতি দুই তিনখানা বাড়ী অন্তর চপ-কাটলেটের দোকান হইয়াছে। এই সকল দোকান বেশ চলে—ইহাদের খরিদ্দারের কখনও অভাব হয় না। কাজেই বলিতে হয়, সহরবাসীরা আজকাল বড় বেশী মাংসখোর হইয়া উঠিয়াছেন। উক্ত চপ-কাটলেটের দোকানগুলির বেশীর ভাগ খরিদ্দার বয়সে যুবক, এবং প্রধানতঃ ছাত্র। যুবকেরা—বিশেষতঃ ছাত্রেরা, দেশের ভাবী আশা ভরসার স্থল। অপর সকল লোকের অপেক্ষা সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা দেশের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং তাঁহারা যখন আজকাল খুব বেশী পরিমাণে মাংসাশী হইয়া উঠিয়াছেন, তখন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের খাতিরে খাদ্যের হিসাবে মাংসের দোষগুণগুলির বিশেষ করিয়া বিচার করিয়া দেখা দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া, বিশেষ বিশেষ দোষগুলির কথা এই স্বাস্থ্য সমাচারে বহুবার আলোচিত হইয়া গিয়াছে। এখানে সে সকল কথার পুনরালোচনা করিব না—আমরা অপর এক দিক দিয়া ইহার আলোচনা করিতে চাই।

সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে সংবাদ পড়া যায় যে, অমুক হোটেলে আহার করিয়া কতকগুলি লোক একই সময়ে একই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, আহার্য্য মাংস বিষাক্ত হইয়া ঐ রোগ উৎপন্ন হইয়াছে। এরূপ ঘটনার সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যায়। ইহার কারণ কি? কেমন করিয়া মাংস বিষাক্ত হয় এবং হইতে পারে? তাহাই আমাদের অদ্যকার প্রধান আলোচ্য বিষয়।

অন্যান্য খাদ্যের অপেক্ষা আমিষজাতীয় খাদ্যের বিষাক্ত হইবার আশঙ্কা খুব বেশী। পচা মাছ বা মাংস বা ডিম্ব যতটা অনিষ্টকর, পচা ফলমূল বা শাক-শব্জী, অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ খাদ্য তত অনিষ্টকর নহে।

মানুষ যেমন নিজ বুদ্ধিবলে স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া চলিতে পারে, অনেক রোগের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে পারে, পশুরা তাহা পারে না। পীড়িত হইলে মানুষ বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিকিৎসা করাইয়া রোগ নিবারণ করে। পীড়িত পশু তাহার জন্মগত সংস্কারের বলেই যাহা কিছু রোগের প্রতিকার করিতে পারে; যেখানে সংস্কারে কুলাইয়া উঠে না, সেখানে সে একেবারে অক্ষম। তার পর মানুষ রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অনেক রকম বৈজ্ঞানিক কৌশল অবলম্বন করিতে পারে; কিন্তু পশুরা আত্ম-রক্ষার এই বৈজ্ঞানিক সাঁজোয়ায় একেবারে বঞ্চিত। তবে পশুজাতি যে একেবারেই অসহায় ও দুর্ব্বল, তাহাও নহে। শ্রীভগবানের অনুগ্রহে প্রকৃতি দেবী তাহাদিগকে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়া থাকেন। পশুদিগের এই শ্রেণীর বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার একটা স্বাভাবিক উপায় আছে। সেটা তাহাদের

দুর্ভেদ্য চর্ম্ম, লোম, প্রতিষেধক শক্তি প্রভৃতি। নানা প্রকার রোগের বীজাণু পশুদের গাত্রস্থ লোম ও চর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বাস করে। কিন্তু চর্ম্মের দুর্ভেদ্যতা বশতঃ তাহারা দেহের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু যতক্ষণ তাহারা জীবিত থাকে, ততক্ষণই কেবল এই সকল স্বাভাবিক ব্যবস্থা তাহাদিগের মাংস অবিকৃত রাখিতে পারে। স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হইলে, কিম্বা মানুষ তাহাদের মাংস ভক্ষণার্থ তাহাদিগকে হনন করিলে, ঐ সকল প্রতিষেধক উপায় একেবারে নিস্তেজ ও ব্যর্থ হইয়া পড়ে। তখন তাহাদের মাংস অতি সহজেই বিষাক্ত হইতে পারে।

মাংস ভক্ষণের উদ্দেশ্যে মানুষ পশু পালন করিয়া থাকে; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই, তাহাদিগকে যেরূপ যত্নে রাখা উচিত, সেরূপ যত্নে রাখা হয় না। গোয়ালারা দুধের জন্য গো-পালন করে; কিন্তু তাহারা গোরুকে একটুও যত্ন করে না। গোয়ালা বাড়ীতে গোরুর যেরূপ যত্ন হয়, তাহা সকলেই দেখিয়া থাকিবেন—তাহার আর বিশেষ ভাবে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। এরূপ অযত্নে পালিত গোরুর দুগ্ধ যে কিরূপ দূষিত হইতে পারে, তাহাও বোধ করি কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। ভাগ্যে আমরা দুধ ফুটাইয়া লইয়া পান করি, তাই রক্ষা। দুধ জ্বাল দিয়া পান করাতে উহার অনেক দোষ কাটিয়া যায়। তবু দেখা যায়, অনেক দিনই গৃহস্থের শিশুদের পানীয় দুগ্ধ ছানা কাটিয়া নষ্ট হইয়া যায়। তখন আবার দোকান হইতে নগদ দুধ কিনিয়া আনিতে হয়; নয় ত শিশু অনাহারে থাকে। আমরা যদি সাহেবদের মত কাঁচা দুধ খাইতাম, তাহা হইলে কোন্ কালে আমাদের অস্তিত্ব লোপ পাইত।

মাংস ভক্ষণের জন্য যে সব পশু পালন করা হয়, তাহাদেরও যত্ন গোয়ালা বাড়ীর গোরুর অপেক্ষা একটুও বেশী হয় না। এরূপ অবস্থায় মাংস যে সহজেই বিষাক্ত হইয়া উঠিতে পারে, তাহা না বলিলেও চলে। মধ্যবিত্ত লোকে গাড়ী ঘোড়া ব্যবহার করেন। তাঁহাদের ঘোড়ার উপর যে স্নেহ মমতা দেখা যায়, তাঁহাদের সইস কোচম্যান ঘোড়াদের যেরূপ যত্ন করে—খাদ্যোপযোগী পশুকে তত টুকুও যত্নও করা হয় না। ফলে, তাহাদের দেহে সর্ব্বপ্রকার রোগের বীজাণু পূর্ণ থাকে। তবে যতদিন তাহারা জীবিত থাকে, ততদিন প্রকৃতি দেবীর কৃপায় ঐ সমস্ত রোগবীজাণু তাহাদের দেহের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু যেই তাহাদিগকে হনন করা হয়, অমনি প্রকৃতিদত্ত দুর্গ ভিন্ন হইয়া যায়—তাহাদের মাংস বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটে।

গোঁড়া হিন্দুরা বৃথা মাংস—কসাইদের দোকানের জবাই-করা মাংস ভক্ষণ করেন না। মাংস ভোজন করিতে হইলে তাঁহারা দেবতার কাছে উৎসর্গ করিয়া বলি দিয়া তবে সেই মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিলেও স্বাস্থ্যের দিক হইতে এই প্রথা ভাল বলিয়াই মনে হয়। কারণ, নিষ্ঠাবান হিন্দু দেবতার নিকটে যে পশুকে বলি দেন, তাহা সুলক্ষণযুক্ত পশু হওয়া দরকার। যে সে পশুকে দেবতার কাছে বলি দেওয়া যায় না। বলি দিবার পূর্ব্বে বলির পশুকে স্নান করাইয়া আনিতে হয়। এইরূপে বলির পশুর মাংস বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু কসাইরা এ সকল সতর্কতা অবলম্বন করে না। রুগ্ন, জীর্ণ কোন পশুই তাহারা বাদ দেয় না। এরূপ অবস্থায় আমরা মাংসভোজী ব্যক্তিগণকে একটু বিবেচনা করিয়া চলিতে অনুরোধ করি।

আজকাল অবশ্য মিউনিসিপ্যালিটী এ বিষয়ে একটু সতর্ক হইয়াছেন; আজকাল যত্র তত্র কসাইরা পশু বধ করিতে পারে না—মিউনিসিপ্যালিটীর নির্দ্দিষ্ট কসাইখানা ছাড়া অন্যত্র আহারার্থ কসাইদিগের দ্বারা পশুবধ নিষিদ্ধ হইয়াছে—এবং ঐ মিউনিসিপ্যালিটীর নিয়োজিত খাদ্য পরীক্ষক কর্ম্মচারীরা হন্তব্য পশুকে পরীক্ষা করিয়া 'পাশ' করিয়া না দিলেও কোন কসাই পশু বধ করাইতে পারে না,—তথাপি বৃথা মাংস এখনও সম্পূর্ণ দোষশূন্য হইতে পারে নাই; নচেৎ আমাদিগকে

দারদিগকে নিষেধ করা হইত, তাহা হইলে বরং অধিকতর সুফল ফলিতে পারিত। কারণ সিগারেট বিঁড়ি কিনিবার জন্য ছেলেদের দোকানে আসিতেই হইবে—এরূপ যোগাযোগের সম্ভাবনাই খুব বেশী। ছেলেরা যদি গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া সিগারেট কিনিবার সুবিধাই পায়, তাহা হইলে তাহার সদ্ব্যবহারও করিবার সুবিধা তাহারা নিশ্চিয়ই করিয়া লইতে পারিবে, এবং লইতেছে।

আমিষ আহারের বিপদ।

আজকাল কলিকাতা সহরের প্রায় প্রত্যেক বড় রাস্তাতেই, প্রতি দুই তিনখানা বাড়ী অন্তর চপ-কাটলেটের দোকান হইয়াছে। এই সকল দোকান বেশ চলে—ইহাদের খরিদ্দারের কখনও অভাব হয় না। কাজেই বলিতে হয়, সহরবাসীরা আজকাল বড় বেশী মাংসখোর হইয়া উঠিয়াছেন। উক্ত চপ-কাটলেটের দোকানগুলির বেশীর ভাগ খরিদ্দার বয়সে যুবক, এবং প্রধানতঃ ছাত্র। যুবকেরা—বিশেষতঃ ছাত্রেরা, দেশের ভাবী আশা ভরসার স্থল। অপর সকল লোকের অপেক্ষা সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা দেশের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং তাঁহারা যখন আজকাল খুব বেশী পরিমাণে মাংসাশী হইয়া উঠিয়াছেন, তখন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের খাতিরে খাদ্যের হিসাবে মাংসের দোষগুণগুলির বিশেষ করিয়া বিচার করিয়া দেখা দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া, বিশেষ বিশেষ দোষগুলির কথা এই স্বাস্থ্য সমাচারে বহুবার আলোচিত হইয়া গিয়াছে। এখানে সে সকল কথার পুনরালোচনা করিব না—আমরা অপর এক দিক দিয়া ইহার আলোচনা করিতে চাই।

সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে সংবাদ পড়া যায় যে, অমুক হোটেলে আহার করিয়া কতকগুলি লোক একই সময়ে একই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, আহার্য্য মাংস বিষাক্ত হইয়া ঐ রোগ উৎপন্ন হইয়াছে। এরূপ ঘটনার সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যায়। ইহার কারণ কি? কেমন করিয়া মাংস বিষাক্ত হয় এবং হইতে পারে? তাহাই আমাদের অদ্যকার প্রধান আলোচ্য বিষয়।

অন্যান্য খাদ্যের অপেক্ষা আমিষজাতীয় খাদ্যের বিষাক্ত হইবার আশঙ্কা খুব বেশী। পচা মাছ বা মাংস বা ডিম্ব যতটা অনিষ্টকর, পচা ফলমূল বা শাক-শব্জী, অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ খাদ্য তত অনিষ্টকর নহে।

মানুষ যেমন নিজ বুদ্ধিবলে স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া চলিতে পারে, অনেক রোগের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে পারে, পশুরা তাহা পারে না। পীড়িত হইলে মানুষ বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিকিৎসা করাইয়া রোগ নিবারণ করে। পীড়িত পশু তাহার জন্মগত সংস্কারের বলেই যাহা কিছু রোগের প্রতিকার করিতে পারে; যেখানে সংস্কারে কুলাইয়া উঠে না, সেখানে সে একেবারে অক্ষম। তার পর মানুষ রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অনেক রকম বৈজ্ঞানিক কৌশল অবলম্বন করিতে পারে; কিন্তু পশুরা আত্ম-রক্ষার এই বৈজ্ঞানিক সাঁজোয়ায় একেবারে বঞ্চিত। তবে পশুজাতি যে একেবারেই অসহায় ও দুর্ব্বল, তাহাও নহে। শ্রীভগবানের-অনুগ্রহে প্রকৃতি দেবী তাহাদিগকে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়া থাকেন; পশুদিগের এই শ্রেণীর বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার একটা স্বাভাবিক উপায় আছে। সেটা তাহাদের দুর্ভেদ্য চর্ম্ম, লোম, প্রতিষেধক শক্তি প্রভৃতি। নানা প্রকার রোগের বীজাণু পশুদের গাত্রস্থ লোম ও চর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বাস করে। কিন্তু চর্ম্মের দুর্ভেদ্যতা বশতঃ তাহারা দেহের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু যতক্ষণ তাহারা জীবিত থাকে, ততক্ষণই কেবল এই সকল স্বাভাবিক ব্যবস্থা তাহাদিগের মাংস অবিকৃত রাখিতে পারে। স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হইলে, কিম্বা মানুষ তাহাদের মাংস ভক্ষণার্থ তাহাদিগকে হনন করিলে, ঐ সকল প্রতিষেধক উপায় একেবারে নিস্তেজ ও ব্যর্থ হইয়া পড়ে। তখন তাহাদের মাংস অতি সহজেই বিষাক্ত হইতে পারে।

মাংস ভক্ষণের উদ্দেশ্যে মানুষ পশু পালন করিয়া থাকে; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই, তাহাদিগকে যেরূপ যত্নে রাখা উচিত, সেরূপ যত্নে রাখা হয় না। গোয়ালারা দুগ্ধের জন্য গো-পালন করে; কিন্তু তাহারা গোরুকে একটুও যত্ন করে না। গোয়ালা বাড়ীতে গোরুর কিরূপ যত্ন হয়, তাহা সকলেই দেখিয়া থাকিবেন—তাহার আর বিশেষ ভাবে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। এরূপ অযত্নে পালিত গোরুর দুগ্ধ যে কিরূপ দূষিত হইতে পারে, তাহাও বোধ করি কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। ভাগ্যে আমরা দুধ ফুটাইয়া লইয়া পান করি, তাই রক্ষা। দুধ জ্বাল দিয়া পান করাতে উহার অনেক দোষ কাটিয়া যায়। তবু দেখা যায়, অনেক দিনই গৃহস্থের শিশুদের পানীয় দুগ্ধ ছানা কাটিয়া নষ্ট হইয়া যায়। তখন আবার দোকান হইতে নগদ দুধ কিনিয়া আনিতে হয়; নয় ত শিশু অনাহারে থাকে। আমরা যদি সাহেবদের মত কাঁচা দুধ খাইতাম, তাহা হইলে কোন্ কালে আমাদের অস্তিত্ব লোপ পাইত।

মাংস ভক্ষণের জন্য যে সব পশু পালন করা হয়, তাহাদেরও যত্ন গোয়ালা বাড়ীর গোরুর অপেক্ষা একটুও বেশী হয় না। এরূপ অবস্থায় মাংস যে সহজেই বিষাক্ত হইয়া উঠিতে পারে, তাহা না বলিলেও চলে। বড়লোকেরা গাড়ী ঘোড়া ব্যবহার করেন। তাঁহাদের ঘোড়ার উপর যে স্নেহ মমতা দেখা যায়, তাঁহাদের সইস কোচম্যান ঘোড়াদের যেরূপ যত্ন করে—খাদ্যোপ-যোগী পশুকে ততটুকু যত্নও করা হয় না। ফলে, তাহাদের দেহ সর্ব্বপ্রকার রোগের বীজাণুতে পূর্ণ থাকে। তবে যতদিন তাহারা জীবিত থাকে, ততদিন প্রকৃতি দেবীর কৃপায় ঐ সমস্ত রোগবীজাণু তাহাদের দেহের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু যেই তাহা-দিগকে হনন করা হয়, অমনি প্রকৃতিদত্ত চর্ম্ম ভিন্ন হইয়া যায়—তাহাদের মাংস বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটে।

গোঁড়া হিন্দুরা বৃথা মাংস—কসাইদের দোকানের জবাই-করা মাংস ভক্ষণ করেন না। মাংস ভোজন করিতে হইলে তাঁহারা দেবতার কাছে উৎসর্গ করিয়া বলি দিয়া তবে সেই মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিলেও স্বাস্থ্যের দিক হইতে এই প্রথা ভাল বলিয়াই মনে হয়। কারণ, নিষ্ঠাবান হিন্দু দেবতার নিকটে যে পশুকে বলি দেন, তাহা সুলক্ষণযুক্ত পশু হওয়া দরকার। যে সে পশুকে দেবতার কাছে বলি দেওয়া যায় না। বলি দিবার পূর্ব্বে বলির পশুকে স্নান করাইয়া আনিতে হয়। এইরূপে বলির পশুর মাংস বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু কসাইরা এ সকল সতর্কতা অবলম্বন করে না। রুগ্ন, জীর্ণ কোন পশুই তাহারা বাদ দেয় না। এরূপ অবস্থায় আমরা মাংসভোজী ব্যক্তিগণকে একটু বিবেচনা করিয়া চলিতে অনুরোধ করি।

আজকাল অবশ্য মিউনিসিপ্যালিটী এ বিষয়ে একটু সতর্ক হইয়াছেন; আজকাল যত্র তত্র কসাইরা পশু বধ করিতে পারে না—মিউনিসিপ্যালিটীর নির্দ্দিষ্ট কসাইখানা ছাড়া অন্যত্র আহারার্থ কসাইদিগের দ্বারা পশুবধ নিষিদ্ধ হইয়াছে—এবং ঐ মিউনিসিপ্যালিটীর নিয়োজিত খাদ্য পরীক্ষক কর্ম্মচারীরা হন্তব্য পশুকে পরীক্ষা করিয়া 'পাশ' করিয়া না দিলেও কোন কসাই পশু বধ করাইতে পারে না;—তথাপি, বৃথা মাংস এখনও সম্পূর্ণ দোষশূন্য হইতে পারে নাই; নচেৎ আমাদিগকে

সংবাদপত্রে এখনও মধ্যে মধ্যে মাংস ভক্ষণ জনিত ঐরূপ পীড়ার সংবাদ পাঠ করিতে হইত না। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কসাইখানায় ছাগ-মেষ জবাই করিয়া বাঁকায় ভরিয়া মুটের মাথায় দিয়া যখন রাস্তা দিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তখন কাকেরা ঐ অনাবৃত মাংসের উপর বসিয়া ঠুকরাইয়া ঠুকরাইয়া মাংস ভোজন করিতে করিতে যায়। এখন, কাকে না খায় অথবা মুখ না দেয় এমন জিনিসই নাই। এরূপ স্থলে তাহাদের চঞ্চু দ্বারা দূষিত পদার্থ স্বচ্ছন্দে মাংসে নীত হইতে পারে এবং ফলে মাংসও দূষিত হইতে পারে। অতএব, আমাদের মতে বৃথা মাংস যত বর্জ্জন করিয়া চলিতে পারা যায়, ততই ভাল।

তাহা ছাড়াও কসাইখানার মাংসের আরও দোষ আছে। রোজ যত পশু কাটা হয়, রোজই যে সেই সমস্ত মাংসই বিক্রীত হইয়া যায়, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। বাসি বা পচা মাংস কসাইরা যে লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার ভয়ে ফেলিয়া দিবে, এতটা সাধুতা তাহাদের নিকট হইতে আশা করা যায় না। এক দিনের অবিক্রীত বাসি মাংস পর দিন টাটকা মাংসের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে চালাইয়া দিতে পারে এবং দিয়াও থাকে। পশু কাটা হইবার পর যত সময় যায়, মাংস তত খারাপ হইতে থাকে। সুতরাং বাসি পচা মাংস যে কতখানি অনিষ্টকর হইতে পারে, তাহাও সহজেই বুঝা যায়।

স্বাস্থ্য সমাচারে অনেকবার লেখা হইয়াছে,—শরীর ধারণের পক্ষে মাংস অপরিহার্য্য খাদ্য নহে। আমাদের অন্যতম প্রধান খাদ্য ডাল পুষ্টিকারিতার হিসাবে মাংসের অপেক্ষা বহুগুণে মূল্যবান—মাংসের অভাব ডালের দ্বারা স্বচ্ছন্দে মিটিতে পারে। তথাপি যাঁহারা নিতান্তই মাংস ভক্ষণের লোভ সংবরণ করিতে অসমর্থ, তাঁহারা একটু দেখিয়া শুনিয়া সাবধান হইয়া মাংস নির্ব্বাচন করেন, ইহাই আমাদের বক্তব্য।

ব্যায়ামের উপকারিতা।

লেখক শ্রী মং চিট টুন বি-এস-সি।

[কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত মং চিট টুন বি-এসসি ব্যায়ামের উপকারিতা প্রদর্শন করিয়া "হেলথ এণ্ড হ্যাপিনেস" মাসিক পত্রে একটী সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ব্যায়ামের সম্বন্ধে তাঁহার মতামত খুব মূল্যবান, তাঁহার নিজের সুগঠিত দেহই তাহার প্রমাণ। পাঠকেরা ছবিতে তাঁহার ব্যায়ামকালীন আকৃতি দেখিলেই তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন। নিয়মিত ও পরিমিত ব্যায়ামের ফলেই তাঁহার এই বীরোচিত দেহ গঠিত হইয়াছে। আমরা স্বাস্থ্য সমাচারের পাঠকগণকে তাঁহার প্রবন্ধের মর্ম্ম উপহার দিতেছি।]

এরূপ ধরণের প্রবন্ধ লিখিবার আমার ইহাই প্রথম চেষ্টা। এই প্রবন্ধে যে মতামত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা আমার নিজের অভিজ্ঞতার ফল। আমি নিজে ব্যায়ামের দ্বারা যে উপকার পাইয়াছি, তাহাই আমি এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়া চেষ্টা পাইয়াছি।

সুস্থ থাকা মানুষ মাত্রেরই জন্মগত অধিকার। এই অধিকার বজায় রাখিতে হইলে, প্রত্যেক মানবকেই ব্যায়াম অভ্যাস করিতে হইবে। যাঁহাদিগকে স্থিরভাবে এক জায়গায় বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কাজ করিতে হয়, তাঁহাদের মানসিক পরিশ্রম অত্যন্ত বেশী পরিমাণে হইয়া থাকে। ইহাতে তাঁহাদের জীবনী-শক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

এই শক্তিক্ষয়ের প্রতিকারের একমাত্র উপায়—ব্যায়াম। তাঁহারা নিয়মিত ভাবে অঙ্গচালনা না করিলে, তাঁহাদের দেহ দিন দিন ক্ষীণ হয়, স্নায়ু সকল দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, রোগ তাঁহাকে শীঘ্রই আক্রমণ করিতে পারে।

এ সম্বন্ধে সক্রেটিস যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনেক পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে। সক্রেটিস বলেন, শারীরিক শ্রম করিতে হয় এমন কোন কাজেই তোমার কোন অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, দৈহিক পরিশ্রমের ফলে তোমার শরীর সবল ও স্বাস্থ্য-সম্পন্ন হইবে। যেহেতু, মানুষকে যে সকল কাজ করিতে হয়, তাহার দেহ সেই সকল কার্য্যের সম্যক্ উপযোগী। অতএব শরীরকে যথাসাধ্য সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম অবস্থায় রাখা মানুষ মাত্রেই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

প্রাচীন কালের দার্শনিক এবং মহৎ ব্যক্তিগণের আরও কয়েকটি উক্তি আমি উদ্ধৃত করিতেছি।

প্লীনি বলেন,—অঙ্গচালনা এবং ব্যায়াম করিলে মন যে কতখানি সতেজ হইয়া উঠে তাহা বাস্তবিক আশ্চর্য্যের বিষয়।

ভগ্নদেহ ব্যক্তির যতই বিদ্যা থাকুক না কেন, তাহা ফাতল-ভাঙ্গা তরবারির ন্যায় অকর্ম্মণ্য।—বুকু।

সর্ব্বদাই স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখিতে হইবে। পৃথিবীর কোন ঐশ্বর্য্যই স্বাস্থ্যের সমতুল্য নহে।—কার্লাইল।

খুব দক্ষ সেনাপতি হইতে হইলে তাঁহাকে সর্ব্ব প্রথমে যে গুণ অর্জ্জন করিতে হয় তাহা অটুট স্বাস্থ্য।—নেপোলিয়ন।

স্বাস্থ্যের কথা উঠিলেই অনেককে বলিতে শুনা যায়—"আমার স্বাস্থ্য খুবই ভাল।" কিন্তু স্বাস্থ্য কথাটির প্রকৃত অর্থ কি তাহা তাঁহারা জানেন না। স্বাস্থ্য শব্দের অর্থ ইহা নয় যে কোন রকমে তুমি তোমার নিত্যকর্ম্ম-গুলি সম্পন্ন করিয়া যাইতে সমর্থ—হজমীগুলির সাহায্যে তুমি তোমার খাদ্য কোন রকমে জীর্ণ করিতে সমর্থ। প্রকৃত স্বাস্থ্য বলিতে ইহাই বুঝাইবে যে, এই কর্ম্মময় জগতে তুমি একজন কর্ম্মী—যে কোন এবং যত কঠিনই কর্ম্ম হউক না কেন, অক্লান্ত ভাবে তাহা সম্পন্ন করিবার উপযোগী অক্ষয় শারীরিক সামর্থ্য তোমার আছে। এক কথায়, জীবন সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিবার তুমি অধিকারী।

জীবনে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে হইলে কেবল জ্ঞানার্জ্জনই যথেষ্ট নয়। অর্জ্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগাইবার জন্য শরীরকেও তাহার উপযুক্ত অবস্থায় রাখিতে হইবে। রুগ্ন শরীর লইয়া শুষ্ক জ্ঞানকে কোনই কাজে লাগাইতে পারা যায় না। অতএব মানুষ মাত্রকেই তাহার দেহ যাহাতে সর্ব্বদা সুস্থ সবল সতেজ ও কর্ম্মক্ষম থাকে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহার একমাত্র সদুপায় ব্যায়াম।

এইবার আমরা ব্যায়ামের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব। অনেক অনেকে রকম ব্যায়ামের পরামর্শ দেন। যথা, যথেচ্ছ ব্যায়াম, সুইডিস ড্রিল; মুলারের "আমার নিজস্ব ব্যায়াম প্রণালী" প্রভৃতি। অধ্যবসায়ের সহিত নিয়মিত ভাবে এই সকল ব্যায়াম অভ্যাস করিলে নিশ্চয়ই সুফল পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া কতকগুলি ব্যায়াম আছে যাহা যন্ত্র সাহায্যে সম্পন্ন করিতে হয়; যথা: গ্রিপ্ ডাম্ববেল, বক্ষঃ প্রসারক, চেষ্ট-ওয়েটস, বার, ডেভেলপার ইত্যাদি। সর্ব্বশেষে, ভারী জিনিষ তুলিতে অভ্যাস করিয়া যে ব্যায়াম করিতে হয় তাহা উল্লেখযোগ্য। ইহা কিছু অগ্রসর ব্যায়াম। ইহাতে নিঃসন্দেহ যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। এমন কি, প্রচুর বল লাভ করিতে হইলে ইহাকে একমাত্র উপায় বলিলেও বলিতে পারা যায়। ইহার দ্বারা মাংসপেশীগুলি সম্যক্ পরিণত এবং সর্ব্ব শরীর সুগঠিত হইয়া উঠে। পৃথিবীর মধ্যে যে সকল লোক অসাধারণ দৈহিক বলের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, যথা হেকেনস্মিট, স্যান্ডন, স্যাণ্ডো, ষ্টানবাক, সেরাযোভা, গ্রাক, রণ্ডি প্রভৃতি—ইহারা সবাই ভার উত্তোলন অভ্যাস করিয়া এইরূপ বলের অধিকারী হইয়াছেন।

অধুনা যে সকল ব্যায়াম প্রণালী প্রচলিত, এবং যে সকল ব্যায়াম আমার জানা আছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে

সেই সকলগুলির পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। তবে মোটের উপর আমি যন্ত্র সাহায্যে ব্যায়ামের পক্ষপাতী। ব্যায়ামকালে এমনভাবে অঙ্গ চালনা বা যন্ত্র চালনা করিতে হইবে যেন শরীরের যথেষ্ট পরিশ্রম হয়। ব্যায়াম রীতিমত শ্রমসাধ্য ব্যাপার—উহা যাদুর গায়ে হাত বুলানো নহে। আর এই শ্রমের মাত্রা রোজই একটু একটু করিয়া বাড়াইতে হইবে—তবেই শীঘ্র শীঘ্র শরীরের উন্নতি হইবে—ব্যায়ামের প্রকৃত ফল পাওয়া যাইবে। কেহ হয় ত গ্রিপ ডাম্ববেল লইয়া ব্যায়াম করিয়া থাকেন। কেহ বা চেষ্ট এক্সপ্যাণ্ডার, (বক্ষঃ প্রসারক) ব্যবহার করেন। অভ্যাস করিতে করিতে তাঁহাদিগকে প্রত্যহই এই সব যন্ত্রের শক্তির পরিমাণ কিছু কিছু করিয়া বাড়াইয়া লইতে হইবে। দরকার হইলে স্প্রীংয়ের বা ষ্ট্র্যাণ্ডের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

এইবার আমি ব্যায়াম সংক্রান্ত কয়েকটা মোটা নিয়মের উল্লেখ করিব। ব্যায়াম যাহাতে তোমার পক্ষে প্রীতিকর হয় সেই জন্য একখানি আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া ব্যায়াম করিলে ভাল হয়। যখন যে অঙ্গের ব্যায়াম করিবে, তখন আয়নায় সেই অঙ্গের উপর দৃষ্টি রাখিবে, এবং তাহার মাংসপেশীগুলির কি ভাবে সঞ্চালন হয়, তাহা দেখিতে থাকিবে। বলা বাহুল্য প্রত্যেক অঙ্গের সঞ্চালনের সময়ে আয়নায় সেই অঙ্গের উপর অপলক দৃষ্টি এবং অখণ্ড মনোযোগ স্থাপন করিতে হইবে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর খুব মনোযোগ রাখিতে হইবে। শ্বাস গ্রহণ বা প্রশ্বাস ত্যাগ হঠাৎ করা উচিত নহে। খুব ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে। ব্যায়ামের সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাসের তাল বজায় রাখিতে হইবে। ব্যায়ামও ধীরে ধীরে নিয়মিত মাত্রায় করিতে হইবে—কোন রকমে হঠাৎ ঝাঁকানি দিয়া ব্যায়াম করা একেবারেই উচিত নয়। অঙ্গ সঞ্চালনের সময় গা-হাত-পা শক্ত করিয়া রাখা ভাল নয়—তাহাদের মাংসপেশীগুলি যেন সহজ অবস্থায় থাকে। প্রত্যেকবার অঙ্গ সঞ্চালনের পর মাংসপেশী-গুলিকে আল্‌গা দিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যায়াম বারকতক খুব সহজে করা ভাল—ইহাতে খুব উপকার আছে।

শরীর গঠনের পক্ষে নিয়মিত ভাবে ১৫ মিনিট হইতে আধ ঘণ্টা সময়ই যথেষ্ট। প্রতি সপ্তাহে একদিন ব্যায়াম বন্ধ রাখিয়া বিশ্রাম লওয়া খুব ভাল এবং দরকারও বটে।

ব্যায়াম সুনিয়ন্ত্রিত, সুপ্রণালীবদ্ধ, নিয়মিত এবং নিত্য হওয়া আবশ্যক। সমস্ত শরীরের সমস্ত অঙ্গের সকল মাংসপেশীর যাহাতে সম্যক্ চালনা হয়, ব্যায়াম-কালে সেইদিকে যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। পালা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যায়াম অভ্যাস করিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ব্যায়াম করিবার সময় যেন রীতিমত শ্রান্তি বোধ হয়। তবেই ব্যায়ামের প্রকৃত উপকার পাওয়া যাইবে। কিন্তু ব্যায়াম শেষ হইবার পর মাংসপেশী যেন শক্ত হইয়া না থাকে—যেন তাহা সহজ অবস্থায় আল্‌গা ভাবে থাকে। এমন কি, প্রয়োজন হইলে, ময়দা ঠাসিবার মত করিয়া সর্ব্বাঙ্গ মর্দ্দন করা ভাল।

ব্যায়ামের প্রসঙ্গে খাদ্যের বিচারের কথা অনিবার্য্য ভাবে আসিয়া পড়ে। অনেকে মনে করেন শরীর গঠনের জন্য ব্যায়ামের সঙ্গে অসাধারণ গুণসম্পন্ন খাদ্যও দরকার। ইহা অতি ভ্রান্ত ধারণা—এ ধারণা বর্জ্জন করিতে হইবে। কারণ, এই ধারণা সত্য হইলে ব্যায়ামের দ্বারা দেহ গঠন করা বহু লোকের পক্ষেই অসাধ্য হইত। আমার নিজের সম্বন্ধে বলিতে পারি আমার যেটুকু উন্নতি হইয়াছে, উহা কোন অসাধারণ খাদ্যের গুণে নহে; শুদ্ধ ব্যায়াম ও অধ্য-বসায়ের বলে আমি এই উপকার পাইয়াছি।

অটুট স্বাস্থ্য প্রত্যেক মানুষের কাছেই অমূল্য রত্নস্বরূপ। আমাদের যে মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার পিছনে সুস্থ দেহ সঞ্জাত জীবনীশক্তির সহায়তা থাকা আবশ্যক; নচেৎ শীঘ্রই আমাদের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। আজকালকার দিনে যখন

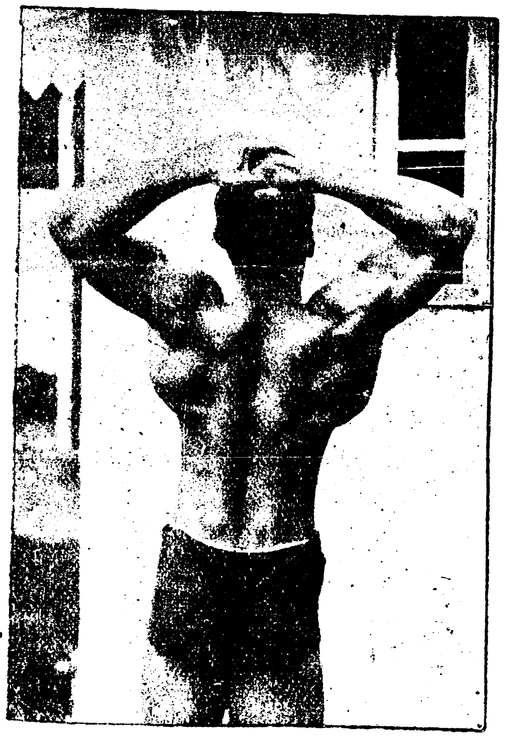

সফলতা লাভ করিবার জন্য ঘোর প্রতিযোগিতা চলিতেছে, তখন শারীরিক বল সঞ্চয় করিতে না পারিলে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে জয় লাভ করা সম্ভব নয়।

অতএব পাঠকপাঠিকাগণ, শরীর ও মনের সমান ভাবে শক্তি বৃদ্ধি করিয়া, আসুন, আমরা জীবনের পথে আমাদের লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হই। মিলটন বলিয়াছেন, প্রকৃতিকে দোষী করিও না—তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। এখন তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন কর। এ কথাটি মনে রাখিবেন। প্রকৃতি দেবী আমাদিগকে সুস্থ শরীরে পৃথিবীতে আনিয়া হাজির করিয়া দেন। সেই দেহকে সুস্থ, সবল ও কর্ম্মক্ষমরূপে রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করিলে চলিবে না।

খাদ্য।

লেখক—শ্রীকৃষ্ণবিহারী মজুমদার।

আমাদিগের চতুর্দ্দিকে প্রতিনিয়ত যে ভীষণ জীবন-সংগ্রাম দেখিতে পাই, তাহা সর্ব্বাংশে উদরান্ন সংস্থানের প্রবল প্রয়াস ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানব, পশুপক্ষী সকলেই নিজ শরীর রক্ষার প্রধান উপায় এই খাদ্য সংগ্রহে ব্যস্ত। রুচিভেদে ইহার পরিমাণ ও প্রকার ভিন্ন হইলেও, ইহা যে জীবন ধারণ পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। অনাহারে ও উপযুক্ত খাদ্যাভাবে সহস্র প্রাণী নিত্য মৃত্যু-পথে অগ্রসর হইতেছে। আবার খাদ্যের সংস্থান সত্ত্বেও অনেকে উহার পরিমাণ ও দোষগুণ নির্ব্বাচন করিতে না পারিয়া রোগগ্রস্ত হন। যাহা শরীরের অপচয় দূর করিয়া বলবান করিতে সমর্থ তাহাকেই খাদ্য বলা যায়।

শারীরিক উপাদান সমূহের মধ্যে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্ব্বন ও নাইট্রোজেনই প্রধান। উদ্ভিদই প্রাণী-সমূহের আদি খাদ্য। ইহা উপরোক্ত শারীরিক উপাদান সমূহ মৃত্তিকা এবং বায়ু হইতে সংগ্রহ করিয়া সকলের আহার্য্য যোগাইতেছে। আমিষ ও নিরামিষ-ভোজী সকলেই প্রকারান্তরে এই শারীরিক উপাদানসমূহ উদ্ভিদ হইতেই পাইয়া থাকেন।

আমিষ কিংবা নিরামিষ ভোজন প্রশস্ত—এই বিষয় লইয়া বিভিন্ন দেশে অনেক তর্ক চলিয়া আসিতেছে। উভয় পক্ষই নিজেদের অনুকূলে নানা যুক্তি দেখান। পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, উভয় দলের কথাতেই কিঞ্চিৎ সত্য আছে।

কেবল মাত্র আহার্য্য ভেদে শারীরিক বা মানসিক উন্নতি হয় না। শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য বিবিধ উপাদান বিশিষ্ট খাদ্যের প্রয়োজন, তাহা প্রাণীজই হউক বা উদ্ভিজ্জই হউক। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ৪ প্রকার খাদ্য ও উপাদান দেহ রক্ষার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়:—

১। শ্বেতসার বা শর্করাজাতীয়—যথা, চাল, ময়দা, আলু, চিনি।

২। তৈলজাতীয়—যথা, মাখন, ঘি, চর্ব্বি এবং সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিজ্জ তৈল।

৩। ছানাজাতীয়—যথা, মাংস ও দুগ্ধ। ছোলা, মটর প্রভৃতি। ডালে এই জাতীয় উপাদান আরও অধিক পরিমাণে আছে।

৪। লবণজাতীয়—আমিষ খাদ্যে অল্প পরিমাণে আছে। শাক, ফলমূল প্রভৃতি তরকারীতে অধিক পরিমাণে আছে।

কয়েকটি প্রাণীজ পদার্থ সমজাতীয় উদ্ভিজ্জ পদার্থ

DOUBLE COLOUR PAGE
BLANK PAGE(S)

অপেক্ষা সহজে জীর্ণ হয়। দুগ্ধে ৪ প্রকার উপাদানই আছে এবং তাহা অধিক সুপাচ্য। মাখন ও ঘৃত উদ্ভিজ্জ তৈল অপেক্ষা সহজে জীর্ণ হয়। অনেক প্রকার মৎস্য ও মাংস ডাল অপেক্ষা লঘুপাক।

মোটামুটি খাদ্যের পরিপাককালের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

খাদ্য			পরিপাকের কাল
মাংস সিদ্ধ	...	...	৩ ঘণ্টা
ঐ ভাজা	...	...	৪ ,,
ডিম কাঁচা	...	...	২ ,,
ঐ সিদ্ধ	...	...	৩½ ,,
রুই ইলিশ মাছ ভাজা	...	...	৩½ ,,
কই মাগুর প্রভৃতি সিদ্ধ		...	২ ,,
দুগ্ধ ...	...	...	২ ,,
ভাত ...	...	...	১ ,,
ডাল ...	...	...	২-৩½ ,,
লুচি ...	...	...	৩ ,,
আলু ...	...	...	২½ ,,
সাধারণ তরকারী	...	...	৩-৩½ ,,

গুরুপাক খাদ্যও অভ্যাস বশতঃ সুপাচ্য হয়। একজন পশ্চিমা মজুর আধসের ছোলার ছাতু অক্লেশে অল্প সময়ে জীর্ণ করিবে, কিন্তু একজন বাঙ্গালী তাহার একছটাক খাইলে পরদিবস উদরাময়ে আক্রান্ত হইবে। অনভ্যস্ত বাঙ্গালী উপর্য্যুপরি কিছুদিন মাংস খাইলে কোষ্ঠবদ্ধতায় আক্রান্ত হইবে।

অতিরিক্ত মাংসাহার সকলের মতে বর্জ্জনীয়। কিন্তু পরিমিত মাংসাহারী ও বিশুদ্ধ নিরামিষভোজীর ক্ষমতা বা বুদ্ধির তারতম্য হইবার কোনও কারণ নাই।

উপরে যে চারি জাতীয় খাদ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে একমাত্র দুগ্ধ ব্যতীত অপর কোন খাদ্য দেখা যায় না যাহাতে এইগুলি একাধারে উপযুক্ত পরিমাণে আছে। সুতরাং দুগ্ধই জীবন ধারণের প্রধান খাদ্য। আজকাল উহা দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য বলিয়া সকলের ভাগ্যে জুটে না।

যে কোন প্রকার খাদ্যই হউক না কেন, অতিরিক্ত ভোজন কখনও সঙ্গত নয়। অনেকের ধারণা পুষ্টিকর খাদ্য অধিক পরিমাণে ভোজন করিলে উপকার হয়; কিন্তু উহা মহাভ্রম। আহার করিবামাত্রই যদি সমস্ত দ্রব্যই শরীরে কার্য্যোপযোগী হইত, তাহা হইলে অতি-ভোজনে দোষ ছিল না। ভুক্ত দ্রব্য পাকযন্ত্রের সাহায্যে শরীরের রক্ত ও মাংসে পরিণত হয়; এই পাকযন্ত্রেরও সীমা আছে। ইহার সীমা বহির্ভূত হইলেই পাকযন্ত্র দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে; এবং মাত্রাতিরিক্ত দ্রব্যের পরিপাকে সমর্থ হয় না। ফলে উদরাময় প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি করে। বিনাক্লেশে যাহা পরিপাক হইবে, তাহাই আহার করা উচিত। মুখরোচক বলিয়া কোন খাদ্য আকণ্ঠ ভোজন বিষবৎ পরিত্যজ্য। প্রত্যেকেরই নিজ পরিপাক যন্ত্রের সামর্থ্যানুযায়ী ভোজন বিধিসঙ্গত। বয়স ভেদে শারীরিক যন্ত্রাদি সবল বা দুর্ব্বল থাকে। এই হেতু সকলের আহারের পরিমাণ সমান নহে। বালকদিগকে অনেক সময় তাহাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেবল স্নেহপ্রসূত আহার করান হয় বা আদেশ করা হয়, ইহা মহা অনিষ্টজনক। আহারে অনিচ্ছা হইলে আহার করা উচিত নয়। আবার একেবারে অধিক আহার করাইয়া রাখিলে আর শীঘ্র ক্ষুধার উদ্রেক হইবে না, এই প্রকার অনিষ্টকর সিদ্ধান্ত কখনও শ্রেয় নয়।

খাদ্যের পরিমাণ, আহারের সময় এবং দিবসে কতবার আহার করা উচিত, তাহা কতকাংশে ব্যক্তি বিশেষের অভ্যাস ও অবস্থার উপর নির্ভর করে। ধনী দরিদ্র সকলেই প্রধানতঃ দুইবার আহার করেন।

পাচক অগ্নির বলানুসারে আহারের মাত্রা, এবং তাহা জীর্ণ করিবার ক্ষমতানুসারে সময় নির্দ্ধারিত হইবে। খাদ্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবার সময় উহার গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। লঘুপাক ও গুরুপাক দ্রব্য ঠিক এক সময়ে জীর্ণ হয় না; সুতরাং খাদ্যের মাত্রা অগ্নিবলানুসারে নিয়মিত না হইয়া, উহা খাদ্যের গুরুত্ব ও লঘুত্বের উপর অনেকটা নির্ভর করে।

"ভাবপ্রকাশে" কি পরিমাণ দ্রব্য একেবারে আহার করা উচিত, তৎসম্বন্ধে যে সংস্কৃত শ্লোকটি আছে, তাহার

অর্থ এই যে, "পাকাশয়ের দুই ভাগ ভুক্ত দ্রব্য ও এক ভাগ জল দ্বারা পূর্ণ করিবে। চতুর্থ ভাগ বায়ু সঞ্চারণের জন্য শূন্য রাখিবে।"

প্রাতেই হউক বা মধ্যাহ্নেই হউক আহারের একটি নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা উচিত। অনির্দ্দিষ্ট বা অসাময়িক আহার বড়ই অহিতকর। আমাদের দেশে আজকাল আহারের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। নিমন্ত্রণ ব্যাপারে অসময়ে সমধিক গুরুপাক আহারের ব্যবস্থা বড়ই অনিষ্টকর। রাত্রের আহার লঘুপাক হওয়াই হিতকর; কিন্তু ঐ নিমন্ত্রণ ব্যাপারটা অধিকাংশ রাত্রেই হইয়া থাকে এবং প্রায় গুরুপাকই হয়। রাত্রে ৯টার মধ্যে আহার করা উচিত, কারণ তাহা হইলে আহারের পর এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া নিদ্রা যাইলে বেশ সুনিদ্রা হয়; উপরন্তু খাদ্য দ্রব্য সহজে জীর্ণ হয়। ভুক্ত দ্রব্য যতক্ষণ না সম্যক পরিপাক হয়, ততক্ষণ পুনর্ব্বার আহার করা উচিত নয়। সুস্থ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে আহারের অন্যূন ৬ ঘণ্টা কাল পরে পুনর্ব্বার আহার করা উচিত। বালকদিগের ৪ ঘণ্টা পরে আহার করিলে অনিষ্টের কারণ নাই। ক্ষুধার দ্বারাই আহারের সময় নির্দ্ধারণ করা যায়। একেবারে অধিক না খাইয়া ৩।৪ বারে পরিমিতরূপে আহার করিলে, পরিপাক ক্রিয়ার কোন ব্যাঘাত হয় না। ক্ষুধা হইলেই কিছু আহার করা উচিত, নতুবা পাচকাগ্নির তেজ মন্দীভূত হইয়া পড়ে।

আহার কালীন একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় যে, ভোজ্য বস্তু উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া আহার করা। আহারের পর অল্পক্ষণ বিশ্রাম করা খুবই উচি । উক্ত দ্রষ্টব্য বা জ্ঞাতব্য বিষয় দুইটি পালন না করিলে পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মাইয়া অজীর্ণ রোগের উৎপত্তি হয়। ছাত্র এবং কেরাণীগণই প্রধানতঃ ইহা অবহেলা করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদের (অধিকাংশ) ডিসপেপ্‌সিয়া দেখা যায়। ভোজন সমাপ্তি মাত্রেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া সঙ্গত নয়। কোন গুরুতর কার্য্যভার স্কন্ধে থাকিলে তাহা অগ্রে সম্পাদন করিয়া তৎপর নিশ্চিন্ত চিত্তে আহার করাই শ্রেয় বা বৈদ্য শাস্ত্র সম্মত।

ভোজন সম্বন্ধে মহর্ষি সুশ্রুত যে বিধি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ প্রদত্ত হইল।

"কালে হিতমিত স্নিগ্ধমধুর প্রায়মাহারং বৈদ্য প্রবেক্ষিতমশ্নীয়াৎ"

অর্থাৎ যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরিমিতরূপ হিতকর বৈদ্য সম্মত দ্রব্য ভোজন করিবে।

"গ্রাম্যগণগণিকা পনিক শক্রশঠ পতিত ভোজনানি পরিহরেৎ"।

অর্থাৎ শূন্যস্থানে, জনতার মধ্যে এবং গণিকা, শক্র, শঠ ও পতিত ব্যক্তির প্রদত্ত কিংবা তাহাদিগের সংস্পৃষ্ট খাদ্য ভোজন করিবে না। মহর্ষি সুশ্রুত মতানুযায়ী ও এই শ্লোকানুযায়ী আহারের নিয়মগুলি যথাযথরূপে প্রতিপালিত হওয়া সম্ভব না হইলেও, ইহা যে সার্ব্বজনীন হিতকর, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের নিত্য আহার্য্য বস্তুর গুণাবলি যদি সকলেই অল্পবিস্তর জানিয়া রাখিয়া সেইরূপ ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে বৈদ্য বা ডাক্তারকে বেশী ডাকিতে হয় না।

আমাদের দেশের হোটেলগুলা এক একটি নানান্ রোগের আগার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সব স্থানে ভোজন করা কিছুমাত্র নিরাপদ নহে।

আহার্য্য বস্তু যত টাটকা ও ভেজাল শূন্য হয় ততই ভাল। যে সব খাবারের দোকান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, খাবারগুলা মাছির আক্রমণ হইতে রক্ষিত, তাহাই আহার করা উচিত; মাছি জানোয়ারটি যে কত ভয়ানক তাহা পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় গত শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত "মাছির আত্মজীবনীতে" জ্ঞাত হইয়াছেন।

সাধ্যমত অন্ততঃ একবেলা রুটি বা লুচি (অবস্থানুসারে) খাওয়া ভাল। দোকানের ভেজাল ও দূষিত খাবার খাওয়া অপেক্ষা, চাল কড়াই ভাজা, চিনেবাদাম ভাজা, মুগের ডাল ভিজান, অথবা কিসমিশ, পেস্তা, আখরোট, বাদাম, পেঁপে, কলা, ইত্যাদি খাওয়া হিতকর। ভবিষ্যতে এই সম্বন্ধে আরও কিছু লিখিবার থাকিল।

পল্লী-স্বাস্থ্য

এবার আমরা একটী সুসংবাদ লইয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করিলাম। এখন শেষ রক্ষা করিতে পারিলেই হয়। সহযোগিনী "সম্মিলনীতে" প্রকাশ,

দেশের উন্নতি সাধন—২৪ পরগণা বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শিয়াড়া গ্রাম নিবাসী জমিদার বাবু সীতানাথ দাস মহাশয় দেশের উন্নতিকল্পে নিজ ব্যয়ে ডিঃ বোর্ডের কর্তৃত্বে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহাতে দীন দুঃখীর মহোপকার সাধিত হইতেছে।

সহযোগী "বরিশাল হিতৈষী"র অভিযোগ যে খুব ন্যায় সঙ্গত, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে—

লেডি ডাক্তার—লেডি ফারণানডেজ অন্যত্র মেয়ে হাসপাতালের লেডি ডাক্তার ছিলেন। তিনি বিদায় নিলেন। তৎস্থলে আবার আর এক জন মেম সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা কতদূর জানি না। পূর্ব্বের লেডি ডাক্তারের প্রশংসা শুনি নাই। এবারে কি হয় বলা যায় না। আমরা আশা করিতেছিলাম এক-জন সুশিক্ষিতা দেশীয় মহিলা আসিবেন; কারণ, দেশীয় অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকগণ মেয়ে হাসপাতালে আসিয়া থাকেন। তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় মনের কথা ডাক্তারের নিকট বলিতে না পারিলে রোগের অবস্থা বুঝাও বুঝান কঠিন হয়। তাই একজন দেশীয় মহিলা ডাক্তারের আগমন দেখিলে সুখী হইতাম।

লেডী ডাক্তার মেম সাহেব হইলেই যে তাঁহাকে বর্জ্জন করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। তাঁহার সদভিপ্রায় সম্বন্ধেও সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই। বরং তাঁহাদিগকে এ দেশীয় নারীগণের প্রতি অধিকাংশ স্থলেই সহানুভূতি প্রকাশ করিতেই দেখা যায়। পক্ষান্তরে লেডী ডাক্তার দেশীয়া মহিলা হইলেই তাঁহার সাত খুন মাপ—ইহারও কোন ন্যায় সঙ্গত হেতু দেখা যায় না। বরং ক্ষেত্র বিশেষে তাঁহাদিগেরও যথেষ্ট উদ্ধত স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে দেশীয়া চিকিৎসার্থিনী মহিলা এবং নারীগণের দিক হইতে বিবেচনা করিলে লেডী ডাক্তার দেশীয়া মহিলা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সহরের শিক্ষিতা মহিলারা মেম সাহেব লেডী ডাক্তারের সঙ্গে কতকটা মেলামেশা করিতে পারেন, একটু মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা করিতে পারেন বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা দেশীয়া রমণীগণ মেম সাহেব লেডী ডাক্তারের সামনে স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন। এই কারণে পল্লী গ্রামের হাসপাতালে দেশীয়া লেডী ডাক্তারই আমরা বেশী পছন্দ করি।

মেদিনীপুর জেলার, বিশেষতঃ কাঁথি মহকুমার স্বাস্থ্যের অবস্থা কোন কালেই ভাল দেখিতেছি না। কাঁথির সহযোগী "নীহার" বড় দুঃখ করিয়া সংবাদ দিতেছেন—

ওলাউঠা ও বসন্ত—কাঁথি মহকুমার প্রায় সর্ব্বত্রই ওলাউঠার ভীষণ আক্রমণে বহু লোকক্ষয় হইতেছে। সকলেই শুনিয়া স্তম্ভিত হইবেন যে, এক রামনগর থানায় দেড় সহস্রাধিক ব্যক্তি এই ভীষণ ব্যাধিতে কাল কবলিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য থানায়ও বহু ব্যক্তি মারা গিয়াছে এবং এখনও মারা যাইতেছে। কেবল ওলাউঠা নহে, কাঁথি, খেজুরী, হেঁড়ুয়া প্রভৃতি থানার স্থানে স্থানে বসন্তের প্রাদুর্ভাবও হইয়াছে। অনেকে উহাতে আক্রান্ত হইতেছে। দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে।

মফস্বলে জলাভাবের কথা শুনিতে শুনিতে কাণ ঝালাপালা হইয়া গেল। সহযোগী "যশোহর" সংবাদ দিয়াছেন—

কামালপুর, সুতাঘাটা, পান্থাপাড়া, বলিয়ানপুর, ব্রাহ্মণডাঙ্গা, ভবানীপুর, ঢাকুরিয়া, ব্রহ্মপুর, বারপাড়া, বোয়ালীয়া, জামজনা, বাজুয়াডাঙ্গা, করেরাইল, তারুয়াপাড়া, প্রতাপকাটী, প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসীবৃন্দের একমাত্র উপায় নদী মুক্তিশ্বরীর জল। কিন্তু মুক্তিশ্বরীর অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় উঠিতেছে, দাম শেয়ালায় অনেক স্থান পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। জেলাবোর্ডের সহৃদয় চেয়ারম্যান মহাশয় ও সহৃদয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি সময়মত দৃষ্টিপাত না করেন তবে নদীটী ভরাট হইয়া যাইবে ও এই সমস্ত গ্রামের অধিবাসীবৃন্দের পানীয় জল পাইবার আর কোন উপায় থাকিবে না। এই সমস্ত গ্রামে জেলাবোর্ডের কোন পুষ্করিণী ও ইন্দারা নাই।

দেখা যাক, দেশীয় মন্ত্রীরা এই চিরন্তন অভাব মিটাইবার কি ব্যবস্থা করেন। আর যদি এক বৎসরের মধ্যে আমরা স্বরাজ পাই, তাহা হইলে

আমাদের জলাভাব মিটিবার আশা আছে কি? তা যদি হয়, তাহা হইলে আমরা স্বরাজ শিরোধার্য্য করিয়া লইব। কিন্তু আমাদের মনে হয়, কেবল দেশীয় মন্ত্রী বা কেবল স্বরাজে কুলাইবে না। দেশের লোকের মতিগতিরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক; অর্থাৎ, সেই সেকেলে ধরণ ধারণ ফিরিয়া না আসিলে আমাদের এই সকল অভাবের প্রতিকারের অন্য কোন উপায় নাই। লোকে আবার যদি সেই প্রাচীন কালের মত ধর্ম্মার্থ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করে, তবেই ইহার প্রতিকারের আশা করা যায়। কিন্তু তাহা হইবে কি? লোকে আবার সেই প্রাচীন কালের মতামতে ফিরিয়া যাইবে কি?

কেবল কি জলাভাব? "যশোহরে" চিকিৎসকেরও অভাব দেখিতেছি—

ঢাকুরিয়া, ব্রহ্মপুর, প্রতাপকাটী প্রভৃতি গ্রাম সমূহের অধিবাসী-বৃন্দ প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকুরিয়া বাজারে যাহাতে একজন Subsidised Doctor নিযুক্ত হন তজ্জন্য জেলা বোর্ডের সহৃদয় চেয়ারম্যান বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু জেলাবোর্ড এখনও তজ্জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নাই। পশ্চিমে যশোহর, পূর্ব্বে নোয়াপাড়া ও দক্ষিণে মণিরামপুর এই বিস্তীর্ণ স্থানে কোন উপযুক্ত (Qualified) ডাক্তার নাই। জেলাবোর্ড অনেক স্থানে বৃত্তিপ্রাপ্ত ডাক্তার বসাইবার ব্যবস্থা করিয়া সেই সেই স্থানের অধিবাসীবৃন্দের অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। ঢাকুরিয়া বাজারে যদি জেলাবোর্ড অনুগ্রহ করিয়া ঐরূপ একটী কেন্দ্র স্থাপিত করেন তবে উত্তরে শাঁখারীপাতি পশ্চিমে যশোহর পূর্ব্বে নোয়াপাড়া ও দক্ষিণে মণিরামপুর এই বিস্তীর্ণ স্থানের অর্থাৎ ১৫০ বর্গ মাইল স্থানের অধিবাসিবৃন্দের একটী বহুদিনের অসুবিধা দূর হইতে পারে। যশোহর সদর লোকাল বোর্ডের প্রতিনিধিগণ কেহ এ বিষয়ে অনুগ্রহ করিয়া চেষ্টা করিবেন কি?

এই সময়ে মফঃস্বলের অনেক স্থানে কলেরার প্রাদুর্ভাব। "ঢাকা প্রকাশে" প্রকাশ—

নোয়াখালী সহরে ও মফঃস্বলের অনেক স্থানে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কুমিল্লা সহরে এবং তন্নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থানেও না কি এই রোগ দেখা দিয়াছে।

মেদিনীপুর—কাঁথি অঞ্চলে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে আর এক সংখ্যায় "নীহার" লিখিয়াছেন—

ওলাউঠায় বোর্ডের কর্ত্তব্য—আমাদের এতদঞ্চলের সর্ব্বত্রই ওলাউঠা ভীষণ ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া বহু লোক ক্ষয় করিতেছে। অনেক স্থলে অবস্থা এমন ভীষণ হইয়াছে যে, শবদেহ টানিয়া ফেলিবারও লোক মিলিতেছে না। পল্লীবাসীরা অতি দরিদ্র ও অজ্ঞ, তারপর পল্লীগ্রামে চিকিৎসক আদৌ পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় এই ভীষণ সঙ্কটকালে রোগার্ত্ত দরিদ্র পল্লীবাসীদের চিকিৎসার্থ এতদঞ্চলে উপযুক্ত পরিমাণ ঔষধাদি সহ উপযুক্ত সংখ্যক সরকারী ডাক্তারকে অবিলম্বে প্রেরণ করিবার জন্য আমরা কর্ত্তৃ-পক্ষকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া আসিতেছি। এখন ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে কয়েক জন ডাক্তার আসিয়াছেন বটে, কিন্তু রোগের ব্যাপকতার তুলনায় তাহা নিতান্তই অল্প। ওলাউঠা এখন গ্রামকে গ্রাম উজাড় করিয়া দিতেছে। এ অবস্থায় যদি প্রকৃতই বিপন্ন ব্যক্তি-দের উপকার করিতে হয়, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষ আর মুহূর্ত্ত সময়ও বিলম্ব না করিয়া ওলাউঠা বিধ্বস্ত পল্লীগুলিতে প্রচুর ঔষধাদি সহ উপযুক্ত সংখ্যক ডাক্তার প্রেরণ করুন।

কলেরা অন্যত্রও আছে। যশোহর—বনগ্রামের "পল্লীবার্ত্তা" লিখিয়াছেন—

বনগ্রাম টাউনে ও পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী গ্রামে কলেরা রোগ হইতেছে। প্রায়ই দুই একটী লোক মারা যাইতেছে।

স্থির যৌবন।

পুরাণাদি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, পাণ্ডব-জননী কুন্তী দেবী স্থির-যৌবনা ছিলেন; অর্থাৎ তাঁহার যতই বয়স হউক, তাঁহাকে বরাবর যুবতীর মত দেখাইত। প্রবাদ এই যে, দেবতার বা ঋষির বরে তিনি এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক যুগে দেবতারা দেখা দেন না। অলৌকিক, অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন মুনিঋষির দর্শন লাভ ততোঽধিক দুর্লভ। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান এই চির-যৌবন-সমস্যার সমাধান করিয়াছে। বিজ্ঞানশাস্ত্র একাধিক এমন উপায় বাহির

করিয়া দিয়াছে, যদ্দ্বারা মানুষ ইচ্ছা করিলে চিরকাল যৌবন উপভোগ করিতে পারে। কবি গাহিয়াছেন,—

"এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া রে!"

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান যৌবন বাঁধিয়া রাখিবার উপায় বাহির করিয়া দিয়াছে। পুরাণে আরও লিখিত আছে যে, যযাতি রাজা যুবক পুত্রের যৌবনের সহিত নিজের অকাল-বার্দ্ধক্য বদলাবদলি করিয়া সহস্র বৎসর ধরিয়া পুত্রের যৌবন উপভোগ করিয়াছিলেন। নব্য বিজ্ঞানের অনুসরণ করিলে, পরের যৌবন ধার করিয়া বা পরকে ফাঁকি দিয়া যৌবন উপভোগ করিতে হইবে না; প্রত্যেক নরনারী নিজের চেষ্টায় নিজস্ব যৌবন অর্জ্জন করিতে এবং তাহা সম্যকরূপে উপভোগ করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ, আমাদের মনে হয়, যৌবন বাঁধিয়া রাখিবার যে বৈজ্ঞানিক উপায়ের কথা আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতে যাইতেছি, পৌরাণিক যুগের কুন্তী দেবী অথবা যযাতি রাজা স্থির যৌবন লাভের এই রহস্যটুকু অবগত ছিলেন। শুদ্ধ মাত্র কবি-কল্পনার মাহাত্ম্যে কিম্বা তৎকালীন জনসাধারণের নিকটে রহস্যটুকু গোপন রাখিবার জন্য দেবানুগ্রহের অবতারণা করা হইয়াছে। এই উপায়টি অতি সহজ—স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই আয়ত্তাধীন। এই স্থির যৌবন লাভের জন্য কাহাকেও কোনরূপ কঠোর তপস্যা করিতে হইবে না, কয়েকটি অতি সহজসাধ্য বিধি নিষেধ মানিয়া চলিলেই যে কেহ শত বর্ষ বয়সেও বিংশ বর্ষীয় যুবকের ন্যায় তরুণ, সবল ও কর্ম্মক্ষম থাকিতে পারিবেন।

আমাদের দেশের বয়স্ক ব্যক্তিরা অল্প বয়স্ক স্নেহভাজনদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় বলিয়া থাকেন, "তোমার এক শত বৎসর পরমায়ু হউক।" আমাদের বিবেচনায়, ইহা কৃপণের দান। প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে হইলে বলা উচিত, তুমি শত বৎসর যৌবন উপভোগ কর। কিন্তু যাঁহাদের পরমায়ুর দৌড় এক শত বৎসর পর্য্যন্ত, তাঁহারা এক শত বৎসর যৌবন উপভোগের কল্পনাও করিতে পারেন না। কিন্তু শত বৎসর বয়সেও যুবক থাকা একটুও অতিরঞ্জিত উপাখ্যান বলিয়া মনে করা উচিত নহে। ইহা সকলেরই আয়ত্তাধীন। আমরা মানব মাত্রকেই এই আশীর্ব্বাদ অন্তরের সহিত করিতে প্রস্তুত আছি; এবং কয়েকটি নিয়মের অনুসরণ করিয়া চলিলে, সকলেই শতবর্ষ বয়সেও যুবকের ন্যায় সামর্থ্যের অধিকারী থাকিতে পারিবেন। আপনি যদি শত বৎসর যুবক থাকিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার পরমায়ু কতখানি বাড়িয়া যাইতে পারে, ভাবিয়া দেখুন দেখি। এই বৈজ্ঞানিক যুগে নিজেকে সুস্থ, সবল, কর্ম্মক্ষম রাখা যখন আমাদের ইচ্ছাধীন ও আয়ত্তাধীন, তখন আশীর্ব্বাদে অমন কৃপণতা করিব কেন?

স্থির যৌবন লাভের নিয়মগুলি অতি সহজ। তবে সকলের পক্ষে সমান নহে। দেশ, কাল, পাত্র-ভেদে নিয়মগুলির সামান্য ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। যাহাকে যে পেশা অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তদনুসারেও দীর্ঘজীবন ও স্থির যৌবন লাভের উপায় নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। কুমার, কুমারী, বিবাহিত, বিপত্নীক অথবা বিধবা—ইঁহাদের সকলকে এক প্রকার নিয়ম পালন করিতে হইবে না। দেশের জল বায়ুর অবস্থা ভেদেও ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। তবে, সকল অবস্থায়, সকল পেশায়, সকল প্রকার জলবায়ুর মধ্যে অবস্থিত লোক সকলের জন্য মোটামুটি একটা সাধারণ গড়পড়তা নিয়মের আমরা উল্লেখ করিতেছি।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস (কেহ কেহ ইহার বিরোধীও আছেন) যে বিবাহিত লোকেরা অবিবাহিত লোকদের অপেক্ষা দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। এ কথাটা কতকটা ঠিক। কারণ, অবিবাহিত বয়স্ক লোকেরা প্রায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকে; এবং উচ্ছৃঙ্খলতা দীর্ঘ জীবন লাভের পক্ষে বিষম অন্তরায়। পক্ষান্তরে, বিবাহিত ব্যক্তিরা সংসারবন্ধনে বাঁধা থাকে বলিয়া, ইচ্ছা করিলেও ততটা উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে না—অনেকটা সংযত থাকিতে বাধ্য হয়। অসংযম যে

আয়ুক্ষয়ের এবং নানা রোগের কারণ, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

বিবাহিত জীবন সর্ব্বত্রই কিন্তু আয়ুর্ব্বৃদ্ধির কারণ হয় না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল হইলে, সদ্ভাব থাকিলে, তবেই তাহারা দীর্ঘজীবী হইয়া চিরদিন স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করিতে পারে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীতে সদ্ভাব না থাকিলে, পারিবারিক নিত্য কলহের দরুণ, বিবাহিত জীবন চিরকুমার জীবনের অপেক্ষা ভয়াবহ হইয়া উঠিতে পারে। এইরূপে, পূর্ব্বোক্ত সকলক্ষেত্রেই অবস্থাভেদে মানুষের জীবনকাল দীর্ঘ বা হ্রস্ব হইয়া থাকে। অতএব, দীর্ঘজীবন লাভের জন্য আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইবে, প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অনুসরণ করিতে হইবে, তবেই আমরা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে জয়ী হইয়া চিরযৌবন ও দীর্ঘজীবন লাভে সমর্থ হইব।

আরও একটা সার কথা এই যে, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি কেবল জানিয়া রাখাই যথেষ্ট নহে; সেই নিয়মগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা চাই। তবেই স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারা যাইবে।

নিম্নে চিরযৌবন লাভের কয়েকটি মোটামুটি নিয়মের উল্লেখ করা যাইতেছে। ইহা কোন কষ্টসাধ্য অস্ত্রচিকিৎসা নয়; ঔষধ বিক্রেতার দোকানে শিশির ভিতরে স্থির যৌবন কিনিতে পাওয়া যায় না। স্থির যৌবন লাভ করিতে হইলে চাই ধৈর্য্য, চাই অধ্যবসায়, চাই প্রবল ইচ্ছাশক্তি। বাকী সমস্ত কাজ জলের মত সহজ—কেবল অভ্যাস-সাপেক্ষ।

১) দিবারাত্রি দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করিতে অভ্যাস করিতে হইবে। বিশুদ্ধ বায়ু যতদূর সাধ্য শ্বাসরূপে টানিয়া লইতে হইবে; এবং তাহার সবটুকু নিঃশেষে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজের কতকগুলি নিয়ম আছে। আমরা স্বভাবতঃ যে ভাবে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করি, সে রকম নহে। সাধারণতঃ আমরা অল্প বায়ুই শ্বাসরূপে নাসিকাপথে গ্রহণ করি। তাহা যথেষ্ট নহে। যতখানি বায়ু এক একবারে টানিয়া লওয়া যাইতে পারে তাহাই লইতে হইবে। ইহা সহজে হইবে না। প্রথম প্রথম একটু চেষ্টা করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। একটু অন্যমনস্ক হইলেই আবার স্বাভাবিক অল্প বায়ুর শ্বাস-প্রশ্বাস আসিয়া পড়িবে। কোন কাজে গভীর ভাবে মনোযোগ দিলে শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে আর মন থাকিবে না—অমনি দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণে ভুল হইয়া যাইবে—স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস আরম্ভ হইবে। আবার যখনই মনে পড়িবে, তখনই দীর্ঘশ্বাস। এইরূপ করিতে করিতে ক্রমশঃ অভ্যাস হইয়া আসিলে দীর্ঘশ্বাসই স্বাভাবিক হইয়া আসিবে—habit is the second nature.

এই দীর্ঘশ্বাস কিরূপে লইতে হইবে? দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের নিয়ম এই—শ্বাস টানিতে টানিতে প্রথমে পেট ফুলিয়া উঠিবে। পরে আরও শ্বাস টানিলে ফুসফুসের নিম্নভাগ বায়ুপূর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠিবে। পরে পেট একটু সঙ্কুচিত করিয়া আরও শ্বাস টানিলে তবে ফুসফুসের উপরের অংশে বায়ু প্রবেশ করিবে এবং সমস্ত ফুসফুসটি বায়ুপূর্ণ হইয়া উঠিবে। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের ইহাই ঠিক নিয়ম। যেমন-তেমন ভাবে দীর্ঘশ্বাস টানিলেই হইবে না। ইহা এক প্রকার ব্যায়াম। আমাদের দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র অনুসারে ইহা যোগের একটা অঙ্গ—প্রায় প্রাণায়ামের মত। ইহার ফল অতি চমৎকার। কিছুদিন এইভাবে দীর্ঘশ্বাস টানিতে অভ্যাস করিলে ইহার উপকারিতা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন; দেখিবেন, আপনার শরীরের যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে। মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল, শরীর সর্ব্বদা হালকা, সকল কাজে উৎসাহ—ইহাই ঠিকরূপে দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের ফল। ইহাতে মাথা ঠাণ্ডা থাকিবে, দেহে বল সঞ্চার হইবে। বলা বাহুল্য, ঘরের ভিতর দরজা জানালা বন্ধ রাখিয়া বন্ধ হাওয়ায় যতই দীর্ঘশ্বাস টানুন না কেন, বিশেষ সুফল পাইবেন না। দিবানিশির মধ্যে যতক্ষণ পারেন ঘরের বাহিরে, খোলা জায়গায়, প্রবহমান বিশুদ্ধ বায়ুতে এই অভ্যাসটি করা চাই। এই অভ্যাসটি হইয়া গেলে

যক্ষ্মা রোগের কোন আশঙ্কা থাকিবে না। যক্ষ্মা রোগী রোগের প্রথম আক্রমণ হইতেই যদি ইহা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে প্রায় বিনা চিকিৎসায়—কোনরূপ ঔষধ সেবন না করিয়াই তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন। আর শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ কার্য্য কেবলমাত্র নাসিকার দ্বারা সাধন করিতে হইবে। মুখ দিয়া শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে। নচেৎ সমস্তই পণ্ডশ্রম হইবে।

(৮) বিশুদ্ধ জল যতটা পারেন পান করিবেন। এবং
(৯) যত পারেন, রসাল ফল ভক্ষণ করিবেন; যথা কমলা লেবু, আম প্রভৃতি। প্রচুর পরিমাণে জল পান করিলে ঘর্ম্মের আকারে ও প্রস্রাবের আকারে জলের সহিত শরীরের আবর্জ্জনা দূর হইয়া যায়। বাড়ীর নর্দ্দমা প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণে জল দিয়া ধৌত না করিলে যেমন বাড়ীতে টেঁকা যায় না, শরীরও সেইরূপ প্রত্যহ পরিষ্কার না রাখিলে নানা রোগের আধার হইয়া পড়ে। রক্তের এবং শরীরের অন্যান্য অংশস্থিত আবর্জ্জনা সকল কতক প্রশ্বাস বায়ুর সহিত এবং কতক জলের সহিত বাহির হইয়া যায়। প্রত্যহ স্নান (সহ্য হইলে দুই বেলা) করিলে গায়ের বহির্ভাগ—গাত্রচর্ম্ম পরিষ্কার থাকে। জাপানীরা সাধারণতঃ প্রচুর জল পান করে, দীর্ঘশ্বাস অভ্যাস করে, সাদাসিধা খাদ্য খায়, বহুবার স্নান করে। এই কারণে তাহারা সাধারণতঃ সুস্থ, কষ্টসহ। চীন দেশে বক্সার বিদ্রোহের সময়ে কষ্ট-সহিষ্ণুতা বিষয়ে জাপানীরা ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও মার্কিণ সেনাদের হারাইয়া দিয়াছিল। তাহারা একাদিক্রমে চৌদ্দ ঘণ্টা অতি দ্রুত চলিয়াও ক্লান্ত হয় না। অথচ জাপানীরা সাধারণতঃ ডাল ভাত খাইয়া থাকে,—তাহারা আমিষ ভোজনের ততটা পক্ষপাতী নহে। মাছ অল্পস্বল্প খাইলেও, মাংস আদৌ খায় না বলিলেই চলে।

(৭) কিছু কিছু শারীরিক ব্যায়াম করা আবশ্যক। সর্ব্বাঙ্গের নিয়মিত চালনার দ্বারা সর্ব্ব শরীরের রক্ত সঞ্চালন নিয়মিত ও অব্যাহত রাখা যায়। কিন্তু অতি কিছু ভাল নয়—অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যায়ামও দেহের পক্ষে অনিষ্টকর। (৬)

প্রত্যহ এমন কিছু কাজ করা উচিত যাহাতে মন প্রফুল্ল থাকে। যাহাতে উচ্চ হাস্য করিতে হয় এমন আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম হিতকর। নির্দ্দোষ ঠাট্টা তামাসা, ভাঁড়ামি, প্রচুর হাস্য রসের উদ্রেক করিতে পারে। অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্য স্বাস্থ্যনীতিসঙ্গত নহে। স্বাভাবিক ভাবে হাসি না আসিলে একটু চেষ্টা করিয়াও হাস্য করা উচিত। উচ্চ হাস্য করিবার ক্ষমতা স্বাস্থ্যের একটা নিশ্চিত লক্ষণ।

আহারাদির বিষয়ে যথেষ্ট সংযম অভ্যাস করিতে হইবে। খাদ্য সাদাসিধা, পুষ্টিকর, লঘুপাক এবং পরিমিত হওয়া আবশ্যক। আকণ্ঠ ভোজন আর দ্রুত-গতি আয়ুক্ষয় সমান কথা। আমাদের একটা চলিত কথায় আছে

বেশী খাস ত কম খা;
কম খাস ত বেশী খা।

ইহার অর্থ,—যদি দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে চাও, তবে কম করিয়া খাইবে; অর্থাৎ ক্ষুধার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইবার পূর্ব্বেই আহারে বিরত হইবে। তাহা হইলে দীর্ঘজীবী হইয়া দীর্ঘকাল খাওয়ার উপায় বজায় রাখিতে পারিবে; এবং মোটের উপর তাহাতে তোমার বেশী খাওয়া হইবে। আর গুরুভোজন করিতে অভ্যাস করিলে অল্প দিনের মধ্যে মৃত্যু হইবে; ফলে চিরকালের জন্য খাওয়ার সুযোগ ঘুচিয়া যাইবে। খাদ্য খুব উত্তম হইলেও তাহা বেশী খাইতে নাই, কারণ, যত বেশীই খাওয়া যাউক না কেন, পাকযন্ত্রের যতটুকু খাদ্য হজম করিবার শক্তি আছে, কেবল সেইটুকু মাত্র পরিপাক হইয়া শরীর মধ্যে গৃহীত হইবে। সুতরাং সেই পরিমাণ খাদ্যই আমাদের যথার্থ খাওয়া হয়। বাকীটা অজীর্ণ অবস্থায় বাহির হইয়া যায় এবং তাহাকে জীর্ণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে গিয়া পাকযন্ত্র ক্লান্ত হইয়া পরিপাকশক্তি হারাইয়া ফেলে। অথবা, ঐ অতিরিক্ত খাদ্য যদি বাহির হইতে না পারে, তবে অপরিপক্ক অবস্থায় থাকিয়া শরীরের মধ্যে বিষের ন্যায় কার্য্য করে।

সকলের শেষ কথা,—মাংস ভোজন দীর্ঘজীবনের পরিপন্থী। এ পর্য্যন্ত যত দীর্ঘজীবী লোকের কথা জানিতে পারা গিয়াছে, তাঁহারা সকলেই প্রায় নিরামিষাশী ছিলেন। আমিষভোজী দীর্ঘজীবী লোকের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

আলোচনা।

সরকারী স্বাস্থ্য-সমিতি।—

মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট একটী পাবলিক হেল্‌থ কমিটি গঠন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই কমিটি স্বাস্থ্য বিষয়ে সাধারণ ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সেতুর স্বরূপ থাকিয়া উভয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিবেন। এই কমিটির সাহায্যে মান্দ্রাজ-গবর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বেসরকারী মতামত সংগ্রহ করিবেন, এবং কমিটির সঙ্গে স্বাস্থ্য বিষয়ে পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবেন। দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে,—চিকিৎসা, রোগ-নিবারণের উপায় (preventive measure) ডাক্তারি শিক্ষা (medical education) চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধান ও গবেষণা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে কমিটি গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবেন। সাধারণের মতামত লইয়া কার্য্য করিলে, বলা বাহুল্য, দেশের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অভাব-অভিযোগের যথার্থই কিছু প্রতিকার হইতে পারে। এই জন্য আমাদের মনে হয়, কমিটি গঠনের ফল ভালই হইবে; তবে দেশের অবস্থাভিজ্ঞ যোগ্য লোক লইয়া কমিটি গঠিত হওয়া আবশ্যক।

যক্ষ্মা রোগের টিকা।—

চিকিৎসা-শাস্ত্রে রোগ-নিবারণের জন্য যত রকম প্রতিষেধক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে টিকাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ইহার দ্বারা জগতের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে—বহু অকাল-মৃত্যু নিবারিত হইয়াছে। বসন্ত রোগের টিকা সর্ব্ব দেশেই প্রায় সমাদৃত হইয়াছে; বসন্ত রোগে মৃত্যু-সংখ্যাও সকল দেশে যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। যক্ষ্মা অতি ভয়ানক রকম মারাত্মক ও সংক্রামক ব্যাধি। সম্প্রতি বিলাত হইতে তারের সংবাদ আসিয়াছে যে, ফরাসী ডাক্তার লিয়ো ক্যালমেটী যক্ষ্মা রোগের টিকা প্রস্তুত করিতে পারিয়াছেন। এই টিকা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হওয়ায়, উহার পরীক্ষাকাল এখনও অতীত হয় নাই; বস্তুতঃ উহা এখনও পরীক্ষাধীন রহিয়াছে। পরীক্ষার ফল যদি সন্তোষজনক হয়, এই টিকা দ্বারা সত্যসত্যই যদি যক্ষ্মা রোগ নিবারিত হয়—যক্ষ্মার দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে ইহার দ্বারা যে জগতের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আমরা ইহার পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

নন-কো-অপারেশনের জয় হউক।—

নন-কো-অপারেশনের প্রভাবে আর কিছু হউক আর নাই হউক, মদের দোকানগুলি খরিদ্দারের অভাবে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। কলিকাতার অনেক দোকানে একটা পয়সারও মদ বিক্রীত হইতেছে না। কলকারখানার সন্নিকটস্থ মদের দোকানগুলি শনিবারে শনিবারে এবং ছুটীর দিনে প্রায় গুলজার থাকিত—এখন সে গুলা খাঁ খাঁ করিতেছে—দোকান-

দারেরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। কলের কুলিমজুর শ্রেণীর লোক এক কথায় মদ খাওয়া ছাড়িয়া দিল—ইহা কি সোজা কথা! আমেরিকায় আইন করিয়া মদ্যপান বন্ধ করিতে হইয়াছিল; সে আইন আবার রহিত হইয়া মদ্যপান পুনঃ প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া শুনিতেছি। কানাডায় এবং অপর কোন কোন স্থানে আইনের সাহায্যে মদ্যপান বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইতেছে। এ দেশে আইনের সাহায্যে মদ্যপান রহিত করিবার কল্পনা করাও অসাধ্য। মদের শুল্ক হইতে সরকারের অনেক অর্থাগম হয়, এবং অর্থ-সচিব মহাশয় সেই কথা প্রকাশ্য ব্যবস্থাপক সভায় উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গৌরব অনুভব করেন। কিন্তু আইনের সাহায্যে যে পাপ দূর করিবার আশা করিতে পারি না—চরিত্র বলের কি সুমহৎ প্রভাব!—মহাত্মা গান্ধির এক কথায় তাহা বোধ হয় চিরদিনের জন্য সমাজ হইতে দূর হইতে চলিল। এই একটী মাত্র কারণে আমরা নন-কো-অপারেশনের পক্ষপাতী—মুক্তকণ্ঠে তাহার জয় ঘোষণা করিতেছি। নন-কো-অপারেশনের প্রভাবে যদি স্বাস্থ্যহানিকর অন্যান্য সামাজিক পাপগুলিও বিদূরিত হয়, তাহা হইলে আমরা কায়মনোবাক্যে নন-কো-অপারেটর। শ্রীভগবান মহাত্মাজীর কল্যাণ করুন।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ব্বিস।—

লণ্ডনে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামে একটী সভা আছে। সেই সভার একটী অধিবেশনে ডাক্তার সিসিল ওয়েব-জনসন ভারতে চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ব্বিসে ভারতবাসীর সংখ্যাধিক্য ঘটিতেছে। ইহা যে সুলক্ষণ, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? ডাক্তার সিসিল ওয়েব-জনসন দুঃখ করিয়াছেন যে, ভারতবাসী ডাক্তারেরা সিনিয়রিটীর খাতিরে এই সার্ব্বিসে উচ্চতম পদে উন্নীত হইলে, নবাগত ইংরেজ ডাক্তারদের সেই সকল ভারতবাসীর অধীন হইয়া কাজ করিতে হইবে—এই ভয়ে ইংরেজ ডাক্তাররা আর বেশী পরিমাণে এই সার্ব্বিসে চাকুরী লইতে সাহস করিতেছেন না। এরূপ সঙ্কীর্ণ-চিত্ততা বাস্তবিকই বড় দুঃখের বিষয়। সংস্কৃত শাসন ব্যবস্থা ত ইংরেজেরই দান। ইংরেজ ডাক্তাররা কি তাহা ব্যর্থ করিতে চান? নূতন শাসন ব্যবস্থায় ভারতবাসীদের পক্ষে প্রাদেশিক গবর্ণরের পদ লাভের পথ খুলিয়া গিয়াছে, এবং লর্ড সিংহ নিজের মনের মত সহযোগী কর্ম্মীদের বাছিয়া লইয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে ইয়োরোপীয়ানও আছেন। লর্ড সিংহ ভারতবাসী বলিয়া কি এই সকল ইয়োরোপীয়ান রাজকর্ম্মচারী সরবারী চাকুরী ত্যাগ করিয়াছেন? তবে ইয়োরোপীয়ান ডাক্তাররাই বা এমন সঙ্কীর্ণ-চিত্ততার পরিচয় দিবেন কেন? ইহাতে ক্ষতি তাঁহাদেরই। তাঁহারা সার্ব্বিসে না যোগ দেন, ভারতবাসীরা দিবেন; এবং আশা করা যায়, ভারতীয় ডাক্তাররা অযোগ্যতার পরিচয় দিবেন না। ডাক্তার সিসিল ওয়েব-জনসনের প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে, আলোচনার মুখে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ব্বিসের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী কর্ণেল ইলিয়ট বলিলেন, ভারতের চিকিৎসা-বিভাগ ইয়োরোপীয়ানদের হাতছাড়া হইতে দেওয়া উচিত নয়—সে সময় এখনও আসে নাই। কারণ, ইয়োরোপীয়ানরা ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ব্বিসে চাকুরী গ্রহণে বিরত হইলে, চিকিৎসা বিষয়ে ভারতের উন্নতি পিছাইয়া যাইবে। কর্ণেল সাহেবের এ কথাটা বুদ্ধিমানের মতই হইয়াছে,—যদিও তাহা বিবেচনার স্থল। তিনি আর একটী প্রয়োজনীয় কথা এই বলিয়াছেন যে, ভারতের গ্রামসমূহে ৬ লক্ষ অন্ধ আছে—ইহাদের প্রতি যথোচিত যত্ন লওয়া হয় না। এ বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কর্ত্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করিতেছেন না। কথাটা ঠিক। আমরা তাঁহার উক্তির সমর্থন করিতে প্রস্তুত আছি। অন্ধদের জন্য যে দুই একটী বিদ্যালয় আছে, তাহাতে কয়জন অন্ধই বা পড়ে? অধিকাংশ অন্ধের জীবনই সুযোগের অভাবে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। অথচ দেখা গিয়াছে—রীতিমত শিক্ষা দিলে তাহারাও সমাজের কাজে লাগিতে

পারে,—নিজেদের জীবিকা নিজেরাই অর্জ্জন করিতে পারে,—তাহাদিগকে পরের গলগ্রহ হইয়া সমাজের পক্ষে ভার স্বরূপ হইয়া থাকিতে হয় না।

পাটের চাষ।—

নব যুগের নূতন বার্ত্তার প্রচারকেরা কয়েকটি সদনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে ভাবের বন্যা এমনই প্রবল যে, কৃষক, শ্রমজীবী প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা পর্য্যন্ত ইহাতে মাতিয়া উঠিয়াছে। তাহারা নব ভাবের প্রবর্ত্তক জননায়কগণের কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতেছে, ভাবিতেছে এবং কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছে। কোন কোন নেতা কৃষকদিগকে পাটের চাষ বন্ধ করিবার পরামর্শ দিতেছেন। কৃষকদের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিয়া পাটের চাষ বন্ধ করিতে প্রতিশ্রুত হইতেছে। নারায়ণগঞ্জ একটী পাট-প্রধান স্থান। সেখানকার পাট-ব্যবসায়ীরাও মস্ত একটী সভা করিয়া পাটের চাষ বন্ধ করিয়া ধান্যের চাষ বাড়াইবার সঙ্কল্প করিতেছেন। আমরা বরাবরই পাটের চাষের বিরোধী। ইহাতে নানা রকমে দেশের অনিষ্ট হইতেছে। কোন দিক দিয়াই আর পাটের চাষের সমর্থন করা যায় না। ইহাতে আর্থিক ক্ষতি ত যথেষ্টই হইয়া থাকে। গোড়ায় পাটের চাষ করিয়া চাষীরা কিছু টাকা পাইত। ইদানীং তাহার পরিমাণ খুব কমিয়া গিয়াছে—পাটের চাহিদা আর নাই বলিলেই হয়। এখনও অনেক চাষার ঘরে গত বৎসরের পাট মজুত—খরিদ্দারের অভাবে তাহারা পাট বিক্রয় করিতে পারিতেছে না বলিয়া শুনা যাইতেছে। কেবল আর্থিক ক্ষতি নয়—পাটের চাষের ফলে অন্যান্য দিকেও যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। পাটের চাষে জমি এমন খারাপ হইয়া যায় যে, সে জমিতে অন্য ফসল ভাল হয় না। বিশেষতঃ পাটে জমি আটকাইয়া থাকায় ধান্যের চাষের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। ধান্যের চাষ কমিয়া যাওয়ার অর্থ—দেশের লোকের জীবনী শক্তি কমিয়া যাওয়া। ফলে হইতেছেও তাই—দেশে দুর্ভিক্ষ চিরস্থায়ী হইয়া পড়িয়াছে—গরীব লোক না খাইতে পাইয়া মারা পড়িতেছে। তা' ছাড়া, পাটে সর্ব্বপ্রধান অনিষ্ট—দেশের স্বাস্থ্যহানি। পাট পচানোর দরুণ জল ও বায়ু দুইই খারাপ হইয়া গ্রামগুলি ম্যালেরিয়ার দুর্গে পরিণত হইতেছে। ও পাপ যত শীঘ্র দেশ হইতে দূর হয়, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। আশা করি, চাষাদের এই সুবুদ্ধি স্থায়ী হইবে—তাহারা পাটের চাষ একেবারে বন্ধ করিয়া দিবে।

জীব সেবা সমিতি।—

কলিকাতায় একটী জীবসেবা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। তাহার কার্য্য প্রণালীর যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহা সুন্দর বলিয়া বোধ হইতেছে। সে দিন ইটিলীর আনন্দ পালিত লেনে একটী বাড়ীতে এই সমিতির একটী অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় কলিকাতা কর্পোরেশনের অনেক মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, কর্পোরেশনের নিয়োজিত ধাত্রী, এবং বহু সংখ্যক চিকিৎসক ও স্থানীয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় ডাক্তার কে, সি, লাহিড়ী মহাশয় ল্যাণ্টার্ণ স্লাইডের সাহায্যে মাতৃত্ব ও শিশু-মঙ্গল সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সাধারণ স্বাস্থ্য কেমন করিয়া রক্ষা করিতে হয়, সংক্রামক রোগের হাত হইতে কিরূপ নিষ্কৃতি লাভ করিতে হয়, এ সকল বিষয়ও তিনি ল্যাণ্টার্ন স্লাইডের সাহায্যে বুঝাইয়া দেন। মদ খাওয়া এবং অন্যান্য নেশা করার কুফলও প্রদর্শিত হইয়াছিল। মদ্যপায়ী এবং নেশা-খোররা কেবল যে নিজেদের অনিষ্ট করে তাহা নহে—তাহারা তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণের এবং দেশেরও সর্ব্বনাশ করিতেছে—এই সমস্ত কথাও বক্তা তাঁহার বক্তৃতায় সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়া বলেন। সভাপতি ব্যারিষ্টার মিঃ এ, সি, ব্যানার্জ্জি বলেন, কলিকাতা কর্পোরেশনের অর্থাভাব নাই—কর্পোরেশন এই লোকশিক্ষার উপায়টির বিস্তৃতি সাধন করুন।

আমরাও তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছি, কেবল কলিকাতায় নহে—বাঙ্গলার সর্ব্বত্র এইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা শুনিয়াছিলাম, ত্রিপুরা অঞ্চলের কোন চিকিৎসক ভদ্রলোক এই উপায়ে সেখানে লোকশিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সে সংবাদ শুনিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলাম। তাঁহার সৎ দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র অনুসৃত হয়, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। তবে মফস্বলে এরূপ ব্যবস্থা করা সহজ নহে। কলিকাতা হইতে ল্যাণ্টার্ণ স্লাইড প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া তৎসহ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে মধ্যে মধ্যে মফস্বলে প্রেরণ করিতে পারিলে সুফল ফলিতে পারে। আমরা বিবেচনা করি, লোকশিক্ষার এই প্রণালী রীতিমত organised ভাবে সম্পাদিত হওয়া উচিত। এতদর্থে কলিকাতায় এবং প্রতি জেলার প্রধান প্রধান নগরে একটী করিয়া স্থায়ী central সমিতি স্থাপিত হইলে বেশ উত্তম হয়। অবশ্য ইহা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, এবং জনসাধারণের এ ব্যাপারে আনন্দের সহিত মুক্ত হস্তে অর্থ-সাহায্য করা উচিত।

কুষ্ঠরোগের নূতন চিকিৎসা প্রণালী।

সার লিওনার্ড রজার্স এদেশবাসীর নিকটে অপরিচিত নহেন—তিনি ভারতবর্ষে ২৭ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি বিলাতে ফিরিয়া গিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি কুষ্ঠরোগের একটা নূতন চিকিৎসা প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছেন—তাঁহার পূর্ব্বে অপর কোন বৃটিশ বৈজ্ঞানিক কুষ্ঠ রোগের ব্যাসিলি ধ্বংস করিবার পক্ষে এতটা অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তিনি আরও প্রকাশ করিয়াছেন যে, কতকগুলি কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসা করিয়া তিনি সফলতা লাভ করিয়াছেন। একজন কুষ্ঠ রোগী অন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে তাঁহার চিকিৎসাগুণে চক্ষুরত্নের পুনরুদ্ধার করিতে পারিয়াছে। আর একজনের স্পর্শ-শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সে তাহা ফিরাইয়া পাইয়াছে। আর একজন রোগী—যে পূর্ব্বে তিনশো গজও চলিতে পারিত না—এখন ১০ মাইল হাঁটিয়া বেড়াইতে পারে। সার রজার্স এমনি কত আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটাইয়াছেন। তাঁহার নবাবিষ্কৃত চিকিৎসা প্রণালী আর কিছুই নয়—চালমুগরা তৈলের পিচকারীর সাহায্যে চর্ম্ম ভেদ করিয়া প্রয়োগ। ইহাও আবার আমেরিকার ডাক্তার হেইসেস তাঁহার পূর্ব্বে ফিলিপাইন দ্বীপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। সার লিওনার্ড রজার্স উক্ত ডাক্তার হেইসেসের চিকিৎসা প্রণালীর অনুসরণ করিয়া (followed) তাঁহার নূতন চিকিৎসা প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছেন। চালমুগরা তৈলে যথেষ্ট unsaturated fatty acid আছে; সোডা সহযোগে তাহা হইতে জলে দ্রবনীয় সোডিয়াম সল্ট প্রস্তুত করিয়া তাহাই inject করিয়া সার লিওনার্ড কুষ্ঠ রোগের ব্যাসিলি ধ্বংসে সমর্থ হইয়াছেন। তবে, তাঁহার প্রণালীতে চিকিৎসিত যে সকল কুষ্ঠরোগী এখন আরোগ্য লাভ করিতেছে, তাহাদের এই আরোগ্য লাভ স্থায়ী হইবে কি না, তাহা তিনি এখনও বলিতে পারেন না। সেই জন্য আমরা তাঁহার এই নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে এখন কোন মতামতও প্রকাশ করিতে পারিলাম না। এখন আমরা পাঠকগণকে কেবল এই আবিষ্কারের সংবাদটা দিয়া রাখিলাম।

স্বাস্থ্য-সমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৯ম বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩২৭ সাল { ১১শ সংখ্যা

শিক্ষারম্ভের কাল।

মানুষের শিক্ষা কখন আরম্ভ হওয়া উচিত? এ সম্বন্ধে অবশ্য নানা মুনির নানা মত। কেহ বলিবেন ৪ বৎসর, কেহ বলিবেন পাঁচ বৎসর, কেহ বা বলিবেন ছয় বৎসর বয়সে। কিন্তু না,—শিশুর শিক্ষা তাহার সেই জন্মের দিন হইতে আরম্ভ হওয়া উচিত। হিসাব মত, ধরিতে গেলে, জননীর গর্ভ ধারণের বহু কাল পূর্ব্ব হইতেই, অর্থাৎ, শিশুর পিতা মাতার উপর দিয়াই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত। তা অতটা না করিতে পারিলেও, শিশুর জন্মের দিন হইতেই তাহার শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত। এ কথা শুনিয়া অনেকে বিস্মিত হইবেন; কিন্তু বিবেচক লোকে ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইবেন না।

আপনারা হয় ত মনে করিতেছেন,—জন্মের দিন হইতে শিশুর শিক্ষারম্ভ! সদ্যোজাত শিশু কি বুঝিবে, যে, তাহাকে শিক্ষা দিতে পারা যাইবে? কিন্তু এটী আপনাদের বিষম ভ্রম। সদ্যোজাত শিশু তাহার জন্মকালীন "ওয়া!" ধ্বনির সহিত মানবের সহজাত সংস্কার এবং পিতা মাতার বুদ্ধি বিবেচনার কিয়দংশের অধিকারী হয়। অতএব তাহার সেই জন্ম দিবস হইতে শিক্ষারম্ভ না হইলে, অর্থাৎ তাহাকে সুশিক্ষা দিতে আরম্ভ না করিলে, অথবা তাহাকে কুশিক্ষা দিতে থাকিলে, তাহার ভবিষ্যৎ জীবনও সেই ভাবে গঠিত হইবে—আঁতুড় ঘরের সুশিক্ষা বা কুশিক্ষার ফল তাহাকে পরিণত জীবনে ভোগ করিতে হইবে।

শিশুর সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা তাহার অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে। যদি কোন দম্পতির খুব বেশী বয়সে ছেলে হয়, তবে সাধারণ শিশুর অপেক্ষা এই বেশী বয়সের সন্তানের আদর একটু বেশী মাত্রায় হইয়া থাকে। কাজেই তাহাকে সুশিক্ষা দিবার দিকে পিতা-মাতা বা তাহার অন্য আত্মীয় স্বজনের তেমন লক্ষ্য থাকে না। অত্যধিক আদরে ছেলে কিরূপ খারাপ হইয়া যায়, তাহা কে না দেখিয়াছেন? কিন্তু স্নেহান্ধ পিতা-মাতা বা আত্মীয় স্বজন বুঝিতে পারেন না যে, তাঁহারা ছেলেকে আদর করিতেছেন না ত!—তাহার পরকালের মাথাটি খাইতেছেন।

অনেক স্থলে দেখা যায়, শিশুর পিতামাতা শিশুকে সুশিক্ষা দিতে চাহিলেও, শিশুর ঠাকুর দাদা বা ঠাকুর মার কাছে নাতির এত বেশী আদর লাভ হয় যে, তাহার পিতা মাতার তাহাকে সুশিক্ষিত করিবার প্রয়াস একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায়।

পিতা-মাতাই বলুন, আর ঠাকুরদাদা ঠাকুর-মাই বলুন,—শিশুর অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা কাহারও থাকে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। কিন্তু, শিশু অবোধ,—সে অত্যধিক আদরের ফলে বিগড়াইয়া যাইতে পারে না—এই ভ্রান্ত ধারণাই শিশুর সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া থাকে। একজন সুবিজ্ঞ ইয়োরোপীয়ান চিকিৎসক Popular Science Shiftings নামক সাময়িক পত্রে লিখিয়াছেন যে, শিশু অতি ছোট এবং অসহায় বলিয়াই, তাহার প্রথম তিন মাস, এমন কি প্রথম তিন সপ্তাহের মধ্যেই সে বিগড়াইয়া যাইতে পারে। শিশুর জন্মের দিন হইতে তাহার সুশিক্ষা আরম্ভ হইলে তবে সেই শিশু যথার্থ মানুষ হইতে পারিবে।

সদ্যোজাত শিশুর সম্বন্ধে কেবল এইটুকু নিশ্চিত-রূপে বলা যাইতে পারে যে, সু বা কু—কোন রকম শিক্ষারই সে অধীন নহে। কিন্তু সেই দিন হইতে তাহার লালন পালন যে ভাবে আরম্ভ হইবে, তাহাই পরিণত বয়সে তাহার জীবনে বদ্ধমূল হইয়া যাইবে। অর্থাৎ, শিশু যেন নরম মাটী—তাহাকে লইয়া শিবও গড়িতে পারা যায়, বানরও গড়িতে পারা যায়। সদ্যোজাত শিশুর লালন পালন কার্য্য যদি সদাচারমূলক হয়, তবে সে শিশু পরিণত বয়সে ধার্ম্মিক, চরিত্রবান, মনস্বী হইতে পারিবে। আর যদি লালন-পালনের ছলে তাহাকে কদাচারে অভ্যস্ত করা হয় তাহা হইলে সে শিশু পরিণত বয়সে যে কি হইয়া দাঁড়াইবে তাহা না বলিলেও চলে।

অতএব জন্মের দিন হইতে শিশুর লালন পালন বিষয়ে সতর্ক না হইলে, শিশুর পরিণাম খারাপ হইতে পারে, এবং সে জন্য তাহার পিতামাতা অথবা লালন পালনের কর্ত্তা বা কর্ত্রীই দায়ী। যে কয় বৎসর ধরিয়া মানব-শিশুকে সর্ব্বতোভাবে পরের উপর নির্ভর করিতে হয়, সেই কয় বৎসর তাহার পিতা, মাতা, পালক বা অভিভাবক তাহাকে সৎপথে চালিত করিতে না পারিলে, তাহাকে সদাচার শিক্ষা না দিলে, শিশুর লালনপালনকারীরা পাপের ভাগী হইয়া থাকেন। এই জন্য শিশু পালন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ; এবং ইহার জন্য পিতামাতাকে পূর্ব্বাহ্নে যথোচিত ভাবে প্রস্তুত হইতে হয়; অর্থাৎ শিশু পালন কার্য্য রীতিমত শিক্ষা করিতে হয়। সন্তান পালন কার্য্য শিক্ষা না করিয়া সন্তানের জনক জননী হইবার অধিকার কাহারও নাই। জনকের পক্ষে সন্তানের জন্মদান, এবং জননীর পক্ষে সন্তান গর্ভে ধারণই যথেষ্ট নয়—সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই পিতা মাতার কর্ত্তব্য শেষ হয় না। তাহাকে মানুষ না গড়িয়া তোলা পর্য্যন্ত পিতা মাতার স্কন্ধে গুরু কর্ত্তব্য ভার চাপিয়া থাকে। আর শিশুর জন্মের দিন হইতে সে যাহাতে সুশিক্ষা পাইয়া 'মানুষ' হইতে পারে সে দিকে অবহিত না হইলে, শিশু কখনই মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে না—তাহার মনুষ্য জন্ম বিফল হইয়া যাইবে।

শিশুর বয়স যেমন এক এক দিন করিয়া বাড়ে, তাহার চিত্তবৃত্তিগুলিরও তেমনি একটু একটু করিয়া উন্মেষ ঘটিয়া থাকে। শিশুর জননী বা ধাত্রীকে এইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে; তাহার কোন কোন চিত্তবৃত্তির সম্যক স্ফুরণে সাহায্য করিতে হইবে, কোন কোন বৃত্তি অগ্রাহ্য করিতে হইবে; তাহা হইলে সেটী সহানুভূতির অভাবে ক্রমে ক্রমে আপনা আপনি সংযত হইয়া যাইবে। আবার, কোন কোন দুষ্ট প্রবৃত্তি দমন বা সংশোধন করিতে হইবে।

শিশুর প্রথম তিন মাসের কাজ কেবল আহার ও নিদ্রা। এই সময়টিতে তাহাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে খাওয়াইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘুমাইতে শিক্ষা দিলে, পরিণত জীবনে সকল কাজ নিয়মিত সময়ে করার

অভ্যাসটি সহজেই জন্মিয়া যাইবে। কিন্তু এই সময়ে তাহার খাওয়া এবং শোয়ার ব্যাপারে অনিয়ম ঘটিতে দিলে, তাহার ফলে সে কোন কালেই নিয়মিত সময়ে কোন কাজ করিতে অভ্যস্ত হইতে পারিবে না। কিন্তু এই কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, শিশু জীবনে প্রত্যেক কাজ শিখাইবার উপযুক্ত সময় আছে। সেই সময় অর্থাৎ বয়স উপস্থিত হইলে, সেই কাজটি শিখিবার জন্য শিশু স্বভাবতঃই প্রস্তুত হইবে। তখন তাহাকে সেই কাজটি শিক্ষা দিলেই তবে সে প্রকৃত পক্ষে তাহা শিখিতে পারিবে। নচেৎ অসময়ে কোন কিছু শিখাইবার চেষ্টা করিলে কোন ফল পাওয়া যাইবে না—কেবল পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র। আবার উপযুক্ত হইয়া উঠিলে সে সময় যদি তাহাকে সেটি শিক্ষা না দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার যে ক্ষতি হইবে—তাহার জীবনে কখনও সে ক্ষতির পূরণ হইবে না—এবং সে ক্ষতির জন্য শিশুর পিতা, মাতা বা ধাত্রী দায়ী। পক্ষান্তরে, কোনরূপ কুশিক্ষা দিলে তাহার ফল যে কেবল শিশুকেই ভোগ করিতে হয় তাহা নয়—তাহার অভিভাবকদিগকেও তাহার অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয়।

ঠিক সময়ে তিনমাসের শিশুর খাওয়া শোয়ার অভ্যাস করাইয়া দিলে, তাহার জীবনব্যাপী বহু সুফল দেখা যায়। ইহাতে তাহার হজমী শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে; সে আত্মসংযমে অভ্যস্ত হয়, নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা করে, আইন মানিয়া চলিতে অভ্যাস করে; তাহার সন্নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষাও হইয়া থাকে। শিশুর বয়স দুই সপ্তাহের মধ্যে থাকিতে থাকিতেই তাহার আহার, নিদ্রা, স্নান, তৈলমর্দ্দন, খেলা এ সমস্তই ঠিক সময়ে অভ্যাস করানো চাই। নিয়মিত সময়ে এইগুলি অভ্যাস করাইয়া না দিলে শিশু দেহের স্নায়ু মণ্ডলীর কাজ এমন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবে যে, পরে চেষ্টা করিয়াও আর তাহা শোধরাইতে পারা যাইবে না।

পল্লীপ্রাণ কৃষকের বর্ত্তমান অবস্থা।

লেখক—শ্রীঅমলচন্দ্র সেন।

কৃষকই পল্লীর প্রাণ; কারণ, বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য অন্ন। পল্লীর অর্দ্ধশিক্ষিত যুবকগণ লেখাপড়া শিখিবার জন্য, শিক্ষিত সম্প্রদায় চাকরীর জন্য এবং ধনী সম্প্রদায় বাণিজ্যের সুবিধার জন্য পল্লীজননীর মায়া কাটাইয়া সহরে আসিয়া বসবাস করেন। বাঙ্গালীর অন্ন সংস্থানের জন্য বঙ্গদেশে যদি কোন উর্ব্বরা ভূমি থাকে, তাহা হইলে তাহা সেই দুঃখিনী পল্লীজননীর ক্রোড়ভূমি। সেখানকার কৃষকদিগের দুরবস্থা স্বচক্ষে না দেখিলে পল্লী-জননীর যে কিরূপ দুঃখ তাহা বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু যখন পল্লী-জননীর মুখোজ্জ্বলকারী স্বদেশসেবক এবং কৃষকের নেতা স্বরূপ ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় পল্লীতে বাস করিতেন, তখন পল্লী-জননীর আর আনন্দের সীমা থাকিত না, এবং তাঁহারাও পল্লী-জননীর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া দেশের জন্য নানা প্রকার লোকহিতকর কার্য্য করিতেন।

এক সময়ে "ছনহরা" পল্লীর জমিদারগণ কৃষক এবং চাষবাসের সুবিধার জন্য এত পুকুর খনন করাইয়াছিলেন যে, তাহা গণনা করা অসম্ভব। কারণ এই সময়ে ছনহরা পল্লীতে অনেক জমিদার বাস করিতেন। পল্লীর কৃষকগণ ৺শারদীয়া পূজার সময়

জমিদারগণের বাড়ীতে আসিয়া মহোল্লাসে কাজ করিত; এবং তিন চার দিন অনবরত রাত্রি জাগিয়াও কোন অসুখ বোধ করিত না; কারণ, তাহারা খুব বলিষ্ঠ এবং উদ্যোগী ছিল। আবার দেশের কবিরাজগণ গরীব দুঃখীদের বিনামূল্যে ঔষধ দিতেন; তাই তাহারা স্বাস্থ্যের দিকেও নজর রাখিত; এমন কি একটু মাথাধরা হইলেও ঔষধ ব্যবহার করিত এবং কিরূপে রোগের উৎপত্তি হয় তাহাও জানিয়া আসিত। এবং তাঁহারা যে সমস্ত কারণে রোগের উৎপত্তি নির্দ্ধারণ করিতেন, তাহারাও সেই সমস্ত কারণ বর্জ্জন করিত; সুতরাং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি উৎকট ব্যাধি হইতে তাহারা রক্ষা পাইত। এই সময় চাষবাসেরও অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

কিন্তু সহরে বিদেশীয় বণিকদিগের উন্নতি দেখিয়া পল্লীগ্রামের ধনী সম্প্রদায়ের চক্ষু ঝলসিয়া গেল। তাঁহারা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ধন বৃদ্ধির জন্য পল্লী ছাড়িয়া সহরে আসিতে লাগিলেন; এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় উচ্চপদে নিযুক্ত হইতেছেন দেখিয়া তাঁহাদের সন্তানগণ অর্থ ও সম্মান-পিপাসু হইয়া সহরে আসিয়া লেখাপড়ায় আত্মনিয়োগ করিলেন। চিকিৎসকেরাও অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ বুঝিয়া পল্লী ত্যাগ করিয়া সহরে আসিতে লাগিলেন। এরূপে সমস্ত বড় বড় সম্প্রদায় পল্লী ত্যাগ করিয়া সহরে আসিলে পর দেখা গিয়াছিল যে, কয়েক ঘর মধ্যবিত্ত ও কৃষক সম্প্রদায় ভিন্ন পল্লীতে আর কেহই নাই। কিন্তু পল্লীত্যাগী সম্প্রদায় পল্লী-জননীকে একেবারে ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে সকলেই বৎসরান্তে একবার বাড়ী যাইতেন এবং পরম ভক্তিভরে পল্লী-জননীর পায়ে পূজা দিতেন; কিন্তু পল্লীর অবস্থার দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করিতেন না। এই কারণে চাষ বাসের অবস্থা দিন দিন অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। কারণ, কৃষকগণ পূর্ব্বে ধনী সম্প্রদায়ের নিকট মজুরি করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিত। কিন্তু পল্লীতে এখন ধনী সম্প্রদায়ের বাস না থাকায়, অর্থাভাবে তাহারা মৃত-প্রায় হইয়াছে। পুকুরে নানা প্রকার আবর্জ্জনা পচিয়া জল বায়ু দূষিত হইয়াছে, দূষিত জলে স্নান করিয়া ও সেই জল পান করিয়া পল্লীবাসীদের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া পড়িতেছে, এবং চিকিৎসকের অভাবে রোগের প্রতিকার করিতে না পারিয়া লোকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। দিন দিন লোক সংখ্যাও কমিতে লাগিল দেখিয়া পল্লী জননী আকুল হইয়া পড়িয়াছেন।

এদিকে আবার পল্লীত্যাগী সম্প্রদায় সহরের প্রতিযোগিতায় যতই পরাজিত হইতেছেন, ততই পল্লীর দিকে দৃষ্টি পাত করিতেছেন, কিন্তু পল্লীতে আসিয়া দেখেন যে পুকুর, রাস্তাঘাট সব অপরিষ্কার। তাঁহাদের সুন্দর সুন্দর দালান ঝড়ের প্রকোপে জীর্ণ শীর্ণ। তখন তাঁহারা তাঁহাদের উপায় চিন্তা করিতে করিতে নিরাশ হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের আগমনে সরল স্বভাব কৃষকের প্রাণে আনন্দ আসিল, বাহুতে শক্তি সঞ্চার হইতে লাগিল, এবং তাহারা নব বলে বলীয়ান হইয়া সানন্দে পল্লী-প্রত্যাগত সম্প্রদায়কে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহাদের ঘর বাড়ী মেরামত করিতে লাগিল; পুকুরগুলি নানা আবর্জ্জনা হইতে উদ্ধার করিতে লাগিল; রাস্তাঘাট জঙ্গলশূন্য করিয়া আরও সুন্দর সুন্দর রাস্তায় পরিণত করিতে লাগিল; এবং তাঁহারাও পল্লীতে আবার বসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু প্রথম প্রথম পল্লীর জল বায়ু তাঁহারা সহ্য করিতে না পারিয়া নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হইতে লাগিলেন। এই সমস্ত রোগ নিবারণের জন্য সহর হইতে ভাল ভাল ডাক্তার কবিরাজ সব পল্লীর দিকে যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই জন্য দেশে এখন কোনও ডাক্তার কবিরাজের অভাব নাই। ইহাতে ধনী সম্প্রদায়ের প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা অর্থের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সেই বৎসরেই একটী "উচ্চ প্রাইমারী বালক বিদ্যালয়" এবং আর একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এইরূপে অতি অল্প দিনের মধ্যে ঐ পল্লীতে আবার পূর্ব্ব শ্রী ফিরিয়া আসিল।

ছনহরা চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত পটীয়া থানার অধীনস্থ একটি পল্লীগ্রাম। এই পল্লীতে যতই শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই দেশের জমিদারগণ দেশে শিক্ষা-বিস্তারের উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। এমন কি উচ্চ প্রাইমারী স্কুলটি জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সতীশ চন্দ্র দত্তের চেষ্টায় ৫।৬ বৎসর মধ্যে "মধ্য ইংরেজী স্কুলে পরিণত হইল। আমাদের পল্লীর প্রাঃতস্মরণীয় লোক হিতকর জমিদার স্বর্গীয় চন্দ্রমোহন সেন মহাশয় তাঁহার বহির্বাটিতে "অখিল লাইব্রেরী" নামক একটী লাইব্রেরী এবং লাইব্রেরীর বহি পাঠ করিবার জন্য একটী Public Reading room খুলিয়াছিলেন। পরে ইহা স্থানান্তরিত করিবার জন্য তিনি একটি ঘর তুলিতেছিলেন; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ ঘরটি তোলা হইবার পূর্ব্বেই তিনি আমাদিগকে দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া ১৯১৮ সালে পল্লী-জননীর নিকট হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের পল্লীর উদ্যোগী মহাপুরুষ শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনী মোহন সেন মহাশয়ের চেষ্টায় গত বৎসর ইঁহার স্মৃতি সভা হইয়াছিল। লাইব্রেরীর কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে। প্রতি সপ্তাহে সকল সম্প্রদায় এমন কি কৃষক পর্য্যন্ত লাইব্রেরীর বহি পড়িতে আসে। আমাদের বহির্বাটিতে সাধারণকে কাপড় বুনা শিখাইবার জন্য একটি কাপড় বুনা তাঁত রাখা হইয়াছে। আমাদের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী কয়েক জন উন্নতিশীল যুবক কাপড় বুনা শিখিয়াছেন। পল্লী-জননীর মুখোজ্জ্বলকারী স্বদেশ-সেবক শ্রীযুক্ত বাবু হেমাঙ্গ ভূষণ গুহ ও অন্যান্য কয়েক জন উদ্যোগী পুরুষের চেষ্টায় গত বৎসর আমাদের পল্লীতে "ছনহরা যৌথ ব্যাঙ্ক" নামক একটি ব্যাঙ্ক খোলা হইয়াছে। ব্যাঙ্ক হইতে সকলে বিশেষতঃ কৃষকগণ অতি অল্প সুদে টাকা পাইয়া থাকেন। কয়েক জন কৃষকও এই ব্যাঙ্কের অংশ ক্রয় করিয়াছেন। সুযোগ্য চেয়ারম্যান, কেসিয়ার প্রভৃতির যত্নে ব্যাঙ্কের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে। এইরূপে নানাদিকে সুবিধা পাওয়ায় তাহারা স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছে, এবং চাষবাসের উন্নতির জন্য যত্নবান হইতেছে। পল্লীতে এখন চিকিৎসকের কোন অভাব নাই। শরৎকালে আমাদের পল্লী সুজলা-সুফলা, শস্য শ্যামলা হয় এবং পল্লী-জননীর মন আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠে। ছনহরা পল্লীর উদ্যোগী যুবকগণ কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য একটি নৈশ-বিদ্যালয় (Night-School) খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। ৺ভগবানের কৃপায় যদি ছনহরায় একটি নৈশ-বিদ্যালয় হয় তাহা হইলে আমাদের পল্লী-জননী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবেন সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালার পল্লীসমূহের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা এখন কাহারও অবিদিত নাই! কিন্তু সে জন্য আমরা নিজেরাই দোষী। পল্লীজননীর এই দুরবস্থা দূর করিবার উপায় আমাদেরই হাতে রহিয়াছে। সে উপায়টি কি, তাহাই দেখাইবার জন্য আমরা ছনহরা গ্রামের তিনটি সময়ের তিনটি অবস্থার বর্ণনা করিলাম। সকল পল্লীগ্রামেরই এক সময়ে খুব ভাল অবস্থা ছিল। এখন সকলেরই প্রায় দ্বিতীয় দশা যাইতেছে। তৃতীয় দশা আনয়ন করা আমাদের সাধ্যাতীত নহে। সকলে এখন পল্লীজননীর পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

একটী নূতন ধরণের রোগ।

আমাদের একজন পত্র প্রেরক একটী নূতন ধরণের রোগের কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

রোগের উৎপত্তি।

প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে আমার দক্ষিণ অঙ্গে এই রোগের উৎপত্তি হয়। একদা আমি parallel barএ উঠিবার সময় ইচ্ছাপূর্ব্বক disfigure করিয়া barএ উঠিতেছিলাম; অর্থাৎ বামহস্ত ঠিক যায়গায় রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত বামহস্ত হইতে ২।৩ ইঞ্চি সামনে রাখিয়াছিলাম। সেই অবস্থাতেই আমি সজোরে মুষ্টি বদ্ধ করিয়া barএ উঠিতেছিলাম। বারে উঠিবার সময় অত্যন্ত জোর লাগিয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে অনুভব করিলাম, যেন হাতের ভিতরের কিছু একটা ছিড়িয়া গেল, অথবা কিছু একটা সরিয়া গেল, এবং ইহাও অনুভব করিলাম, যেন সেই সঙ্গে সঙ্গে back-bone ও মাথায় একটা Shock লাগিল। সেই মুহূর্ত্তেই আমি bar হইতে নামিয়া পড়িলাম। Bar হইতে নামিয়াই বুঝিলাম, আমার দক্ষিণ হস্ত স্বাভাবিক অবস্থা হইতে কিছু ঝুলিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ পার্শ্বের মাংসপেশী সকল আস্তে আস্তে পিছনের দিকে বক্র হইয়া যাইতে লাগিল; হাত পায়ের মাংসপেশী সকল ক্রমে ক্রমে উপরের দিকে খিচিয়া উঠিতে লাগিল এবং সেই সময় বুকের, পৃষ্ঠের মাথার খুলির, দক্ষিণ গালের এবং দক্ষিণ চক্ষুর, এমন কি, দক্ষিণ পার্শ্বের সমস্ত মাংসপেশী বসিয়া যাইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে মাথা ঘুরিতে ও শ্বাস বন্ধ হইতে লাগিল। ফলে উঠিতে, চলিতে ও কথা বলিতে, এমন কি বাহ্যে ও প্রস্রাব করিতেও ভয়ানক একটা অসুবিধা বোধ করিতে লাগিলাম এবং বাহ্য ও প্রস্রাবের দ্বার ক্রমে ক্রমে সরু হইতে লাগিল। যে সময় আমার হস্তে আঘাত লাগিয়াছিল সেই সময় আমি বিশেষ কোন বেদনা অনুভব করি নাই। কিন্তু যখন আঘাত লাগিয়াছিল, তখন আমি ঠিক অনুভব করিয়াছিলাম যে, আঘাতটি deep muscleএর নীচে লাগিয়াছিল। পরে আমার uneasiness ও বক্রভাব দূর করিবার জন্য কখন কখন dumble exercise করিতাম; কিন্তু কিছুতেই কোন উপকার বোধ করিতে পারি নাই। এই প্রকার অবস্থায় প্রায় ২ বৎসর কি ২৷৷০ বৎসর কাল অতীত হইয়াছিল।

কিন্তু এরূপ হওয়ার পর হইতে আমার অন্য কোনরূপ অসুখ হয় নাই। নিয়মিত ভাবে স্নান ও আহার করিতাম। ২।৩ মাস কাল exercise বন্ধ করিয়াছিলাম। এইরূপভাবে অর্থাৎ বক্রভাবে থাকা অসুবিধা বিধায় ২।৩ মাস পরে আবার ১৩২৩ সনের পৌষ মাসে bar exercise করিতে আরম্ভ করিলাম। তখন barএ উঠিয়া দেখিতাম আমার দক্ষিণ হস্ত বাম হস্ত হইতে ২।৩ ইঞ্চি সামনে এগিয়ে রহিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই দক্ষিণ হস্ত বাম হস্তের paralled হয় না। তখন exercise করা কষ্টকর মনে করিয়া বাম হস্ত দক্ষিণ হস্তের paralled করিয়া exercise করিতে আরম্ভ করায় বামহস্তে ঐরূপ দক্ষিণ হস্তের ন্যায় আঘাত লাগিয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তেই ভয়ানক মাথা ঘোরা ও শ্বাসবন্ধ হওয়া এবং চক্ষুতে ঝাপসা দেখিতে লাগিলাম। সেই অবস্থাতেই আমি কলিকাতায় আসিয়া ডাক্তার দেখাইতে লাগিলাম।

রোগের বর্ত্তমান অবস্থা।

সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারি না। দাঁড়াইতে গেলে বসিবার সময় পায়ের গোড়ালি হইতে মেরুদণ্ড হইয়া ঘাড় পর্য্যন্ত টান পড়ে; কিন্তু তাহাতে কোন বেদনা অনুভব করি না। পার্শ্বদেশের মাংসপেশী যেন কেহ পিছন হইতে টানিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে এরূপ একটা ভাব অনুভব করি। মেরুদণ্ড যেন বক্রভাবে আছে বলিয়া বোধ হয়। মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বের মাংসপেশী এত জোরে আকর্ষিত হইতেছে যে, তাহাতে বুকে, পেটে, এমন কি, সমস্ত শরীরে যেন একটা টান পড়িয়াছে। মাথার centre হইতে rectum পর্য্যন্ত একটা অস্বস্তি যেন সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। শরীরের সমস্ত organs যেন উপরের দিকে উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়; বিশেষতঃ, upper part, অর্থাৎ বুক হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত যেন কেহ উপরের দিকে ঠেলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে; আর স্কন্ধদ্বয় যেন কোন রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ঘাড়ের নীচে দুই পার্শ্বে হাতের সঙ্গে যে দুইটি চাপ আছে, সেই দুইটিতে আদৌ জোর পাই না; আর বোধ হয় সেই দুইটি চাপ স্থানচ্যুত হইয়া উপরের দিকে ঠেলিয়া আছে। ঘাড়ের কাছে ভয়ানক একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছি। বুক আর পিঠ যেন কেহ বাঁধিয়া রাখিয়াছে। বুক, পিঠ বেশী চওড়া বলিয়া বোধ হয়। সেই জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের বিশেষ কষ্ট অনুভব করি। সর্ব্বদাই মাথা ঘোরে ও নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে; এবং স্বাভাবিক অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাস লইবার সময় যে প্রকার বুকে, পিঠে জোর লাগে এবং স্ফীত হইয়া উঠে, আজকাল সেরূপ হয় না। নিশ্বাস বুক ও পেট ভরিয়া লইতে পারি না। বাহ্যের ও প্রস্রাবের দ্বার অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে। বাহ্যের দ্বার যেন ভিতরে ঢুকিয়া যাইতেছে। বাহ্য-প্রস্রাব করিতে কষ্ট হয়; সরল ভাবে বাহির হয় না; যেন ঠেকিয়া ঠেকিয়া বাহির হয়। বাহ্যে করিবার সময় কোঁথ দিলে কোঁথ লাগে না। কোঁথ দিবার শক্তিও যেন নাই। কোন আহার্য্য বস্তু আহার করিবার সময় বুকে ও গলায় বাধিয়া যায়; অর্থাৎ সরলভাবে পেটের ভিতর যায় না। চক্ষু স্বাভাবিক অবস্থায় যেরূপ কাজ করে সেইরূপ করিতেছে না। চক্ষু বিস্ফারিত করিতে পারি না; আর করিলে strain করিতে হয়। দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি প্রত্যেকটি হইতে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। যেন একটি অপেক্ষাকৃত উপরে এবং অপরটি নীচে অবস্থিত আছে। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বাম স্কন্ধ হইতে দক্ষিণ স্কন্ধ কিঞ্চিৎ নিম্ন। সরলভাবে উপুড় কিম্বা চাত হইতে পারি না এবং এপাশ ওপাশ করিতে পারি না। ফিরিতে গেলে অপেক্ষাকৃত বক্র হইয়া যাই। ভাল করিয়া কথা কহিতে পারি না। দাঁতের উপর দাঁত যে প্রকার থাকা উচিত সেই প্রকার না থাকিয়া যেন একটু সরিয়া গিয়াছে। কোন দ্রব্য সমান ভাবে চিবাইতে পারি না। ঘাড়, গলা ও স্কন্ধ যেন সর্ব্বদাই শক্ত হইয়া আছে। ঘাড় ভিতরের দিকে বসিয়া যাইতেছে ও ছোট বলিয়া বোধ হইতেছে। গলা ও ঘাড় সরল ভাবে নাড়িতে চাড়িতে পারি না। মাথার খুলি যেন সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত শরীরের ভিতরেই যেন একটা disorder feel করিতেছি। যেন back-boneএর দুই side দিয়া deep muscleএর নীচে কোন একটা জিনিষ এপাশ ওপাশ সরিয়া রহিয়াছে। দুই এক পা হাঁটিলেই হাঁপাইয়া পড়ি, মাথা ঘোরে, এবং কেহ যেন পিছন হইতে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেয়। হাত পা শুকাইয়া আসিতেছে। হাত ও পায়ের পাতা সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। সমানভাবে পা পাতিয়া হাঁটিতে পারি না। পায়ের তলা শূন্য বলিয়া বোধ হয়। জোড়াসন করিয়া বসিতে পারি না। বসিতে গেলে জোর লাগে এবং পা ফাঁক হইয়া থাকে। শরীরের মধ্যে সর্ব্বদাই যেন গরম বলিয়া বোধ হয়। ডাক্তারগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন Gout, Rheumatism, Paralysis অথবা কেসিয়া Muscle ছিঁড়িয়া গিয়াছে। আমার শরীরের Ben-sation আছে। মশা মাছি কিম্বা অন্য কোন ক্ষুদ্র কীট দংশন করিলেও বেশ অনুভব করিতে পারি; এমন কি, মাথার চুলের উপর কোন কিছু বসিলেও তাহা বেশ বুঝিতে পারি।

দুগ্ধ ও ডিম্ব।

লেখক—ডাক্তার শ্রীরাজেন্দ্রকুমার ঘোষ।

সকল প্রকার খাদ্য অপেক্ষা দুগ্ধই শ্রেষ্ঠ। কারণ কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করা যাইতে পারে; দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন একটী খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারা যায় না। দশ আউন্স দুগ্ধ দুইটী ডিম্বের সমতুল্য। একজন যুবা ব্যক্তির পক্ষে নয় পাইন্ট (প্রায় ৵৬ সের) দুগ্ধের আবশ্যক হয়। এই নয় পাইন্ট দুগ্ধে কেজিন, চর্ব্বি, চিনি ও জল যথেষ্ট পরিমাণ থাকে। তদ্দ্বারা অনায়াসে প্রাণ ধারণ করিতে পারা যায়।

দুগ্ধের তুল্য উত্তম খাদ্য আজকাল গোয়ালার দোষে এমন বিকৃত হইয়াছে যে, পান করিলেই অসুখ করে। বিশেষতঃ শিশুগণ ঐ প্রকার বিকৃত দুগ্ধ পান করিয়া যকৃতের পীড়ায় (Infantile Liver) ভুগিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করে। এজন্য শিশুর মৃত্যু-সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

বাজারে খাঁটি দুগ্ধ পাওয়া দুষ্কর। এ সম্বন্ধে স্বাস্থ্য-পরিদর্শকগণের প্রখর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যতদিন পর্য্যন্ত শিশুদিগের দন্তোদ্গম না হয় ততদিন পর্য্যন্ত বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া উত্তম দুগ্ধ নির্ব্বাচন করা উচিত। উত্তম দুগ্ধের অভাবে অনেকেই শিশুদিগকে বার্লি মিশ্রিত দুগ্ধ অথবা বিলাতি দুগ্ধ পান করিতে দেন বলিয়া নবীন বয়সে শিশুগণ চিররুগ্ন হইয়া থাকে। দন্তোদ্গম হইবার পর দুগ্ধের সহিত বার্লি জল মিশ্রিত করিতে পারা যায়। তদ্দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছানা প্রস্তুত হইয়া সহজে পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

দুগ্ধে উত্তাপ দিয়া ঘনীভূত করতঃ তাহাতে ১৵ ভাগ চিনি মিশ্রিত করিলে বিলাতি দুগ্ধ (condensed milk) প্রস্তুত হয়। ইহার একভাগ তিনভাগ টাট্‌কা দুগ্ধের সমতুল্য এবং ব্যবহার করিলে শরীর অধিক স্থূল হয়। কারণ উহাতে চিনি মিশ্রিত থাকায় স্থূলতা উৎপাদনে সাহায্য করে। অধিকাংশ বিলাতি দুগ্ধ মন্থন-করা দুগ্ধে প্রস্তুত হয়; এবং সকল সময়ে এক প্রকার দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না বলিয়া, নানাপ্রকার দুগ্ধের সংমিশ্রণে উহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এজন্য উহার গুণের তারতম্য হয় এবং উহা শিশুদিগের পক্ষে দুষ্পাচ্য। শিশুদিগকে উৎকৃষ্ট দুগ্ধ দিতে পারিলে শীঘ্র শীঘ্র তাহাদের নূতন তন্তু নির্ম্মিত হইয়া দেহের পুষ্টিসাধন হয়। দুগ্ধ ক্ষয়-প্রাপ্ত তন্তুকে মেরামত করে; অবশেষে শরীরের উত্তাপ রক্ষা করিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জীবন আনন্দময় করিয়া তুলে। পরিমাণ মত উত্তম দুগ্ধ নির্ব্বাচন করিয়া দিলে সহজে সুচারুরূপে পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং নীরোগ অবস্থায় শিশুগণ জীবন অতিবাহিত করে। একেবারে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতে না দিয়া ক্রমে ক্রমে অল্প পরিমাণে দুগ্ধ পান করান কর্ত্তব্য। শিশুগণ কাঁদিলেই প্রসূতিরা দুগ্ধ দিয়া সান্ত্বনা করেন; কিন্তু তদ্দ্বারা অজীর্ণ ও উদরাময় রোগ আনয়ন করিতে পারে। শিশুদিগের কান্নার কারণ কি তাহা অগ্রে অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

শিশুদিগের জন্য দুগ্ধই প্রধান খাদ্য। তদ্দ্বারা তাহাদের শারীরিক সকল অভাব পূর্ণ হয়। যুবা ব্যক্তির খাদ্য নির্ণয় করিতে হইলে, দুগ্ধে যে যে উপাদান যে যে পরিমাণে আছে, যুবা ব্যক্তির খাদ্যে সেই উপাদান ও সেরূপ পরিমাণে হিসাব করিয়া দিলে উহা কতক পরিমাণে দুগ্ধের সমতুল্য হয়। এজন্য প্রথমে দুগ্ধের রাসায়নিক উপাদান জানা আবশ্যক। কিন্তু বয়স, অবস্থা ও স্থান বিশেষে খাদ্যের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে—ইহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা উচিত।

দুগ্ধ মন্থন পূর্ব্বক সামান্য নবনী করিয়া মূত্রযন্ত্রের ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তিকে পান করিতে দিলে যথেষ্ট উপকার দর্শায়। যাহাদিগের পরিপাক শক্তি অল্প তাহাদিগকে দুগ্ধের সহিত সামান্য এ্যাসিটিক্ এ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দেওয়া আবশ্যক। যাহারা চর্ব্বি পরিপাক করিতে পারে না এবং যে সকল বালক বালিকা দুগ্ধ পরিপাক করিতে অক্ষম তাহাদিগের পক্ষে মাখন তোলা দুগ্ধ বিশেষ উপকারী। অজীর্ণ রোগীর পক্ষে টাট্‌কা ঘোল অথবা দধি সুপথ্য; কারণ তদ্দ্বারা পাচক রস অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে এবং অন্ত্রস্থ কীটাণুর বৃদ্ধি নষ্ট করিয়া অন্ত্রপথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। এজন্য চিকিৎসা কার্য্যে দধি, ঘোল ও অম্লরস যুক্ত ফলের যথেষ্ট প্রচলন হইয়াছে।

দুগ্ধের রাসায়নিক উপাদান।

দুগ্ধের উপাদান।	স্ত্রী-দুগ্ধ।	গাভীর দুগ্ধ।	মহিষীর দুগ্ধ।	ছাগীর দুগ্ধ।	গর্দ্দভীর দুগ্ধ।
কেজিন	৩·৩৫	৪·১	৪·৪	৩·৬২	১·৭৯
চর্ব্বি	৩·৩৪	৩·৯	৯·০	৪·২০	১·০২
চিনি	৩·৭৭	৫·২	৪·৮	৪·০৪	৫·৫
লবণ	·১৪	০·৮	০·৮	·৫৬	·৪২
জল	৮৯·৪	৮৬·০	৮১·০	৮৭·৫৮	৯১·২৭
মোট রাসায়নিক পরিমাণ	১০০·০০	১০০·০	১০০·০	১০০·০০	১০০·০০

স্ত্রীলোকদিগের দুগ্ধ অপেক্ষা গাভীদুগ্ধে নবনীত, লবণ ও চর্ব্বি অধিক থাকে। সেজন্য শিশুদিগকে গাভী-দুগ্ধ দিবার সময় উহাতে চিনি ও জল মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। নারী-দুগ্ধ অপেক্ষা ছাগী দুগ্ধে অধিক প্রোটিড ও চর্ব্বি থাকে। গর্দ্দভী ও ঘোটকীর দুগ্ধ নারী-দুগ্ধের প্রায় সমান, কিন্তু স্ত্রী-দুগ্ধ অপেক্ষা গর্দ্দভীর দুগ্ধে চর্ব্বি ও কেজিন কম থাকে। এজন্য গর্দ্দভী দুগ্ধ, মহিলা-দুগ্ধ অপেক্ষা সহজে পরিপাক হয়; কিন্তু উহা অল্প পুষ্টিকর। স্ত্রী-দুগ্ধ পাকাশয়ে গিয়া ছোট ছোট ছানাখণ্ডে পরিণত হয়; এজন্য উহা সহজে পরিপাক হইয়া যায়। গাভী-দুগ্ধে বড় বড় ছানাখণ্ড নির্ম্মিত হয়, সেজন্য উহা শিশুদিগের পক্ষে দুষ্পাচ্য। কিন্তু গর্দ্দভী ও ছাগী-দুগ্ধে নারী দুগ্ধের ন্যায় ছোট ছোট ছানা প্রস্তুত হয় বলিয়া এখনও সদ্য-প্রসূত শিশুদিগকে ও মাতৃহীন শিশুকে ঐ প্রকার দুগ্ধ ব্যবহার করাইবার বিধি আছে।

যে সকল শিশু মাতৃ-দুগ্ধ, গর্দ্দভী দুগ্ধ ও ছাগী-দুগ্ধের অভাবে গাভী-দুগ্ধ দ্বারা জীবন ধারণ করে, তাহাদিগকে গাভী-দুগ্ধের সহিত জল ও চিনি মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। বার্লির জল দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে ছোট ছোট ছানা নির্ম্মাণ হয় বটে, কিন্তু দন্তোদ্গমের পূর্ব্বে শিশুদিগকে বার্লি দেওয়া অন্যায়। মহিষীর দুগ্ধে অত্যধিক চর্ব্বি থাকে (সেরে এক ছটাক বা ততোধিক); তাহা সহজে শিশুগণ পরিপাক করিতে

পারে না। এ কারণ উহা শিশুদিগের পক্ষে অব্যবহার্য্য। ঐ দুগ্ধে বড় বড় ছানখণ্ড প্রস্তুত হয়; এজন্য অনেক সময়ে সুস্থকায় যুবা ব্যক্তিও মহিষী-দুগ্ধ পান করিয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন। তবে অভ্যাস ও পরিপাক শক্তি ভাল থাকিলে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিগণ পান করিতে পারেন। গ্রীষ্মকালে দুগ্ধ শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। ঐ প্রকার দুগ্ধ শিশুদিগকে পান করাইলে তাহারা উদরাময় রোগে ভুগিতে থাকে।

অন্ধকার গৃহ ও যে গৃহে বায়ু পরিচালনের পথ রুদ্ধ থাকে তথায় দুগ্ধ রাখা অতীব অন্যায়। দুগ্ধে মাছি অথবা অন্য কীটাণু পড়িয়া যাহাতে নষ্ট না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। যে স্থলে ড্রেনের দূষিত বাষ্প উত্থিত হয় সেখানে কদাচ দুগ্ধ রাখিবে না। শিশা অথবা দস্তার পাত্রে দুগ্ধ রাখিলে উহা বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা; এজন্য ঐ প্রকার পাত্র ব্যবহার করা দোষাবহ। শিশুদিগকে দুগ্ধ পান করাইবার সময় প্রত্যেকবার দুগ্ধ গরম করিয়া পান করান উচিত। যে সকল শিশু শিশিতে দুগ্ধ পান করিয়া থাকে, সেই শিশি ও তাহার মুখের নল প্রত্যেকবার গরম জলে ব্রুস দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পুনরায় ব্যবহার করিবে। যে গাভীর পদে, মুখে ও দুগ্ধের বাঁটে ঘা থাকে তাহার দুগ্ধ পান করা অনুচিত; কারণ সেই দুগ্ধ পান করিলে শিশুদিগের জিহ্বা অথবা মুখে ঘা হয় এবং যক্ষ্মা (Tuberculosis) ব্যাধি হইবার আশঙ্কা থাকে। দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিলে জলের দোষে নানাপ্রকার মারাত্মক পীড়া হইতে পারে। দূষিত জলে পাত্র ধৌত করিয়া তাহাতে খাঁটি দুগ্ধ রাখিলে তদ্দ্বারা কলেরা, টাইফায়েড ও আমাশয় প্রভৃতি ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া কাঁচা দুগ্ধ পান করা সর্ব্বতোভাবে অন্যায়। দুগ্ধ হইতে নানা প্রকার খাদ্য যথা মাখন, পনীর, ক্ষীর ও সরভাজা ইত্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে, তন্মধ্যে মাখন ও পনীর উৎকৃষ্ট এবং বলকারক। গাভীদুগ্ধে শতকরা ৩৷৷০ হইতে ৪ ভাগ মাখন পাওয়া যায়। ঐ মাখন বাহির করিয়া ব্যবহার করিতে হইলে, যে জলে মাখন রাখা যায় তাহা দিবসে দুইবার পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক; নচেৎ মাখন নষ্ট হইয়া যাইবে। মাখনের সহিত সামান্য লবণ মিশ্রিত করিলে অথবা লবণ মিশ্রিত জলে মাখন রাখিলে অনেক দিন টাট্‌কা থাকে। মাখন হইতে দুগ্ধের ভাগ সম্পূর্ণরূপে বাহির না হইলে কিম্বা উহাতে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত থাকিলে উহা শীঘ্র নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। বাজারের মাখনে অনেক সময় ময়দা অথবা বালি মিশ্রিত থাকে। এজন্য তাহা পরীক্ষা করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

পনীর অতি মুখরোচক ও পুষ্টিকর খাদ্য। ইহা কেজিন, কতক চর্ব্বি, দুগ্ধের লবণ ও সামান্য পরিমাণে জল দ্বারা নির্ম্মিত। ঐ লবণের মধ্যে অধিক পরিমাণে ফস্‌ফেট্ অফ্ লাইম থাকে। এজন্য উহা সুপাচ্য এবং পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তা করে। ক্ষীর ও সরভাজা অতি সুস্বাদু এবং বলকারক। কিন্তু উহা গুরুপাক; এজন্য অজীর্ণ রোগীর উহা ব্যবহার করা নিষেধ।

নিম্নলিখিত প্রণালী মত পরীক্ষা করিলে সহজে ভেজাল দুগ্ধের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। উত্তম দুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০২৮ হইতে ১০৩৪ হইবে। প্রতিক্রিয়া সমক্ষারা যথা ক্ষার কিম্বা সামান্য অম্ল হইতে পারে। উত্তম দুগ্ধ দেখিতে শ্বেতবর্ণ, অস্বচ্ছ কোন স্বাদ বা গন্ধহীন এবং শতকরা ১০ হইতে ১২ ভাগ সার পদার্থ (cream) থাকিবে। কিন্তু এদেশে ইহাপেক্ষা কম থাকে। কেবল ল্যাকটোমিটার যন্ত্র দ্বারা আপেক্ষিক গুরুত্ব দেখিলে খাঁটি দুগ্ধ চেনা যায় না। গোয়ালারা সচরাচর দুগ্ধে জল দিয়া মাখন বাহির করিয়া লয়। দুগ্ধ মন্থন করিলেই আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক হইবে; কিন্তু ঐ দুগ্ধ পাতলা হয় এবং জল দিলে ভাল সর পড়ে না। গাভী দুগ্ধে চর্ব্বি ব্যতীত কঠিন পদার্থ শতকরা ৮·৫ ভাগ থাকা উচিত এবং চর্ব্বি শতকরা ৩৷৷০ ভাগ থাকিবে। বিশেষরূপে দুগ্ধ পরীক্ষা করিতে হইলে কতকটা দুগ্ধ মাপ করিয়া সরু কাঁচের নল (Test Tube) দ্বারা জল মধ্যে

পাত্রে গরম করিতে হইবে। পরে উহা সম্পূর্ণ শুষ্ক হইলে পর অবশিষ্ট দ্রব্যকে ওজন করিয়া প্রথমকার মাপ করা দুগ্ধের সহিত হিসাব করিয়া লইতে হয়। তারপর দুগ্ধস্থিত চর্ব্বি নির্দ্ধারণ করিতে হইলে উক্ত অবশিষ্ট পদার্থে ইথার সংযোগ করিবে। (কারণ ইথার দ্বারা চর্ব্বি দ্রবীভূত হয়) উহা দ্রবীভূত হইলে পর একটী পৃথক পাত্রে রাখিয়া দিবে। ক্রমশঃ ইথার বাষ্পাকারে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইলে চর্ব্বি নিম্নে পতিত থাকে। পরে ঐ চর্ব্বি ওজন করিয়া লইলে উহার অনুপাত জানা যায়। চর্ব্বি নির্দ্ধারণের পর যে কঠিন পদার্থ থাকে তাহা ওজন করিয়া যদি শতকরা ৮·৫ ভাগ না হয়, তাহা হইলে উহা খাঁটী দুগ্ধ নহে বুঝিতে হইবে। যদি ঐ কঠিন পদার্থ ৭·৯ ভাগ হয় তাহা হইলে $\frac{১০০ \times ৭·৯}{৮·৫} = ৯২·৯$ ভাগ খাঁটী দুগ্ধ, বাকি ৭·১ ভাগ জল মিশ্রিত আছে জানিবে। দুগ্ধে ·৮ ভাগ জল থাকে, চর্ব্বি নির্দ্ধারণের পর যে অবশিষ্ট কঠিন পদার্থ থাকে, তাহা দগ্ধ করিলে অগ্নি দ্বারা সমস্ত ভস্মীভূত হইয়া কেবল লবণাক্ত পদার্থ রহিয়া যায়। যদিও ·৮ ভাগের অধিক লবণাক্ত পদার্থ থাকে, তাহা চা-খড়ি এবং কারবনেট্ অফ্ সোডা মিশ্রিত বলিয়া জানা যায়। কোনরূপ পালো, এরারুট, ময়দা অথবা বালি মিশ্রিত করিলে অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা শ্বেত সার পূর্ণ ছোট ছোট স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। লভার প্রলোভনে ভেজাল দুগ্ধ গ্রহণ না করিয়া অধিক মূল্য দিয়া বাঁটের মুখ হইতে খাঁটি দুগ্ধ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

শিক্ষিত ব্যক্তিগণ dairy farm করিলে সর্ব্ব সাধারণের বিশেষ উপকার হয় এবং ঐ ব্যবসা দ্বারা প্রচুর অর্থাগমও হইতে পারে।

ডিম্ব ঃ—মাংস ও মৎস্য সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে "স্বাস্থ্য-সমাচারে" আলোচনা করা হইয়াছে। এখন ডিম্ব সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করা আবশ্যক। ডিম্ব অতি উপাদেয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য। দুইটী ডিম্ব দশ আউন্স দুগ্ধের সমতুল্য। প্রত্যেক হংস-ডিম্ব ওজনে প্রায় এক ছটাক হয়, কিন্তু মুরগীর ডিম্ব ছোট ও ওজনে কিঞ্চিৎ কম। হংস ডিম্বে শতকরা ৩০ ভাগ কঠিন পদার্থ এবং ৭০ ভাগ জল থাকে; কিন্তু মুরগীর ডিম্বে ২৬ ভাগ কঠিন পদার্থ এবং ৭৪ ভাগ জল পাওয়া যায়। ডিম্বের হলদে অংশ সহজে পরিপাক হয় বলিয়া রোগীর পথ্য রূপে ব্যবহৃত হয়। উহার প্রত্যেকাংশ সুপাচ্য এবং তৈলাক্ত পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত। প্রত্যেক তৈল বিন্দু অণ্ডলালের (albumen) আচ্ছাদন দ্বারা আবৃত থাকে। ঐ হলদে অংশে অধিক পরিমাণে ফস্ফারিক এ্যাসিড্ ও লৌহ থাকে; এ কারণ উহা বিশেষ উপকারী। ডিম্বের শ্বেতাংশ কেবল অণ্ডলাল দ্বারা নির্ম্মিত। উহা পুষ্টিকর কিন্তু অধিক সিদ্ধ করিলে গুরুপাক হইয়া উঠে। ডিমের মধ্যে কাঁচা ডিম্ব এবং "এগ্ :ফিলিপ্" শীঘ্র পরিপাক হয়। কিন্তু কাঁচা ডিম্ব আহার করিতে অধিকাংশ ব্যক্তির শ্রদ্ধা হয় না; এজন্য অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম্ব ব্যবহার করা উচিত। ডিম্ব শক্ত করিয়া সিদ্ধ করিলে বিলম্বে পরিপাক হয় এবং দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে দুষ্পাচ্য। অনেকে ডিম্বকে অধিক সিদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত মসলা ও ঘৃত সহযোগে রন্ধন করেন বলিয়া তদ্দ্বারা পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটায়।

ডিম্বের রাসায়নিক উপাদান।

	শ্বেতাংশের উপাদান।	ডিম্ব-কুসুমের উপাদান।	সমস্ত ডিম্বের উপাদান।
প্রটিড (Albumen)	২০·৪	১৬·০	১৪·০
চর্ব্বি	...	৩০·৭	১০·৫
লবণ	১·৬	১·৩	১·৫
জল	৭৮·০	৫২·০	৭৪·০
মোট	১০০·০	১০০·০	১০০·০

ডিমে শর্করা থাকে না। এজন্য "এগ্ ফিলিপ্" প্রস্তুত সময়ে ডিম্ব কুসুমের সহিত চিনি ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। উহা অতিশয় পুষ্টিকর ও বলকারক খাদ্য এবং অল্প সময় মধ্যে পরিপাক হইয়া পোষণ ক্রিয়ার সাহায্য করে। ডিমের খোলা যদিও শক্ত বটে কিন্তু সচ্ছিদ্র। অধিক দিন রাখিলে উহার গুরুত্বের হ্রাস হয় এবং বাহির হইতে ডিমের ভিতরে বাতাস প্রবেশ করিলে পচিয়া যায়। ডিম অধিক দিন রাখিতে হইলে লবণ জল (১০ আঃ জল ১ আঃ লবণ) অথবা চুণের জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। ডিমে চর্ব্বি মাখন অথবা বার্ণিশ লাগাইয়া রাখিলে উহা অনেক দিন পর্য্যন্ত টাট্‌কা থাকে। টাট্‌কা ডিম্ব জলে রাখিলে ডুবিয়া যায়, বাসি কিংবা পচা ডিম্ব জলে ভাসিয়া উঠে। খাঁটি দুগ্ধ আবশ্যক মত পাওয়া না যাইলে তৎপরিবর্ত্তে আমরা ডিম্ব ব্যবহার করিলে শরীরের সকল অভাব মোচন হইতে পারে।

ইয়োরোপীয় মহোদয়গণ শরীর রক্ষার্থ প্রত্যহ ডিম্ব ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, এবং নিজ নিজ শরীরের প্রতি লক্ষ্য করি না বলিয়া সামান্য কারণে নানা প্রকার পীড়ায় জর্জ্জরিত হইয়া জীবন্মৃতাবস্থায় জীবন ধারণ করিতে হয়।

স্বাস্থ্যবিধি-পঞ্চাশৎ।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কোন রকম ভয়ানক কাণ্ড করিতে হয় না; কোনরূপ বিরাট উদ্যোগ আয়োজনও করিবার দরকার নাই। কেবল কতকগুলি অতি সরল ও সহজসাধ্য নিয়ম পালন করিয়া গেলেই শরীর চিরকাল সুস্থ থাকিতে পারে। এই সকল নিয়ম পালনে কিছু মাত্র ব্যয় নাই, কোন কষ্টও নাই। কিরূপ সামান্য চেষ্টায় আপনি চিরসুস্থ থাকিতে পারেন তা' দেখুন।

১। আপনার নিত্য অভ্যাসগুলি স্বাস্থ্য-সাধনোপযোগী ভাবে সংশোধন ও সংযত করিতে হইবে। সে কাজ এখনই আরম্ভ করিয়া দিন।

২। সকল বিষয়ে মিতচারী হইতে হইবে।

৩। সর্ব্বদা সুস্থকায় লোকের সঙ্গ করিবেন। পীড়া যেমন সংক্রামক, স্বাস্থ্যও সেইরূপ সংক্রামক।

৪। প্রত্যহ ভোর বেলা শয্যাত্যাগ করিয়া শীত কালে ঈষদুষ্ণ জলে এবং অন্যান্য ঋতুতে শীতল জলে গামছা ভিজাইয়া গা মুছিয়া ফেলিবেন। প্রতি সপ্তাহে দুই তিন দিন রাত্রে ঈষদুষ্ণ জলে গামছা ভিজাইয়া গা মুছিয়া ফেলিয়া শয়ন করিতে যাইবেন। গাত্রচর্ম্মের অদৃশ্য সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলি পরিষ্কার রাখা দরকার, যাহাতে ঐ সকল সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে বায়ু দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে; এবং চামড়ার নিম্নে যে সকল ময়লা ও আবর্জ্জনা আসিয়া জমে সেগুলি বাহির হইয়া যাইতে পারে। নচেৎ, চর্ম্মের ছিদ্রগুলি বুজিয়া গিয়া দেহের মধ্যে ক্লেদ জমিয়া নানা পীড়ার সৃষ্টি করিতে পারিবে।

৫। আপনার স্নায়ু মণ্ডলী যদি অত্যধিক তেজস্বী ও চঞ্চল হয়, যদি সহজেই উত্তেজিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বশে রাখিতে অভ্যাস করুন; আত্ম-সংযম অভ্যাস করুন।

৬। ঠিক সোজা এবং খাড়া ভাবে বসিয়া থাকিবার অভ্যাস করিবেন। চেয়ারে বা ফরাসে বসিয়া থাকিবার সময় কদাচ সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বা চেয়ারের পিছনে অথবা দেওয়ালে হেলান দিয়া বসিবেন না। তাকিয়া হেলান দিয়া বসা কেবল অলসতার লক্ষণ নয়,—উহাতে

আয়ু ক্ষয় হয়। ঠিক খাড়া ভাবে বসিলে মেরুদণ্ড সোজা থাকে;, পেটেও চাপ পড়ে না।

৭। সর্ব্বদা, অর্থাৎ যখনই মনে পড়িবে,—দীর্ঘ-নিশ্বাস লইতে অভ্যাস করিবেন। এক একবারে ধীরে ধীরে যতখানি পারেন, শ্বাস বায়ু টানিয়া লইয়া ফুসফুসকে পূর্ণ করিবেন। সাধারণতঃ লোকের অতি সামান্য মাত্র বায়ু শ্বাসরূপে লওয়া অভ্যাস। এ অভ্যাস যতদূর সম্ভব ত্যাগ করিতে হইবে। প্রত্যহ শয্যা হইতে উঠিয়া গাত্র মার্জ্জনার পর অন্ততঃ দশ মিনিট একটু চেষ্টা করিয়া, ব্যায়ামের হিসাবে দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতে হইবে। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বেও একবার এই ব্যায়ামটি করা চাই। তারপর দিনের মধ্যে যখনই মনে পড়িবে, তখনই দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিলে ভাল হয়। এই শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ যতটা ধীরে ধীরে করিতে পারা যায় ততই ভাল। এ সময়ে যদি ঘরের ভিতরে থাকেন, তাহা হইলে জানালা-গুলি যেন খোলা থাকে। অন্য সময়ে সম্ভব হইলে ঘরের বাহিরে মুক্ত বায়ুতে এই ব্যায়াম করা সঙ্গত। দিনের মধ্যে যতক্ষণ পারেন, ঘরের বাহিরে কাটাইবেন। রাত্রে সমস্ত রাতই যেন শয়ন গৃহের অন্ততঃ একটা জানালা, যতটা সুবিধা হয়, খোলা রাখিতে হইবে।

৮। প্রত্যহ একটু একটু করিয়া শারীরিক ব্যায়াম করা চাইই চাই। যদি কাহারও পেশা এমন হয় যে, সমস্ত দিন এক জায়গায় বসিয়া কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যহ নিয়ম করিয়া অবসর সময়ে অন্ততঃ এক ঘণ্টা ঘরের বাহিরে মুক্ত বায়ুতে অবস্থান করিতে হইবে। এই সময়টা বেড়াইতে পারিলেই ভাল। ঘরের ভিতর বদ্ধ বায়ুতে সমস্ত দিন কাজ করিতে হইলে বিলক্ষণ ক্লান্তি বোধ হয়। অবসর কালে প্রবহমান খোলা হাওয়ায় এক আধ ঘণ্টা দ্রুত ভ্রমণ করিলে, সমস্ত ক্লান্তি ও শারীরিক গ্লানি দূর হইয়া বেশ প্রফুল্ল বোধ হয়। মানসিক শ্রমের পর শারীরিক পরিশ্রম বেশ বিশ্রামের কাজ করে। ঘরের ভিতর তাকিয়া হেলান দিয়া তামাক খাওয়া কিংবা শয্যায় গা-হাত-পা এলাইয়া দেওয়া অপেক্ষা দ্রুত ভ্রমণ বহুগুণে উৎকৃষ্ট বিশ্রাম।

৯। আহারের পূর্ব্বে হাত-পা ধুইয়া লইতে কখনও ভুলিবেন না। আমাদের আচমন প্রথা খুব স্বাস্থ্য-সঙ্গত বিধি। উহা কেবল ধর্ম্ম সংক্রান্ত কুসংস্কার নহে। হাত না ধুইয়া খাইতে বসিলে, হাতের ময়লার সঙ্গে নানা রোগের বীজাণু খাদ্য দ্রব্যে মিশ্রিত হইয়া উদরস্থ হইয়া পীড়া জন্মাইতে পারে। হাতে বিশেষতঃ নখে অনেক রকম বিষাক্ত পদার্থও লাগিয়া থাকিতে পারে। তদ্দ্বারা শরীরের মধ্যে বিষক্রিয়া উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে।

১০। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে খাওয়ার অভ্যাস থাকা খুব দরকার। দুইবার খাওয়ার নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কখনও কিছু খাওয়া উচিত নহে। আহারের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে ক্ষুধার উদ্রেক হইলেও, তাহা সহ্য করিয়া থাকা ভাল। তাহাতে কোন অনিষ্ট নাই; পক্ষান্তরে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

১১। প্রত্যহ দেড় সের হইতে দুই সের পরিমাণ জল পান করা কর্ত্তব্য।

১২। পেট ঠাসিয়া খাওয়া ভাল নয়। বরং ক্ষুধার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইবার পূর্ব্বে আহারে বিরত হওয়া ভাল। তা' বলিয়া যতটুকু খাওয়া আবশ্যক, তদপেক্ষা কম খাওয়া উচিত নহে। আহার শেষ করিয়া উঠিবার সময়, "উঃ! বড় খাওয়া হয়েছে" এ রকম মনের ভাব হওয়ার অপেক্ষা, মনের ভাব "এখনও একটু ক্ষিদে আছে, আরও কিছু খেতে পার্ত্তুম" এ রকম হওয়া আরও ভাল।

১৩। খাদ্য দ্রব্যে অতিরিক্ত লবণ ব্যবহার করিবেন না। নূনখর তরকারী খাইতে মুখরোচক হইলেও শরীরের পক্ষে অহিতকর।

১৪। সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্য সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

১৫। চা, কফি প্রভৃতি পানীয় শরীরের কোন উপকার করে না, বরং যথেষ্ট অপকার করে। উহা মাদকতা আনয়ন না করিলেও নেশার প্রায় কাছা-কাছি। এই শ্রেণীর পানীয় সেবনের অভ্যাসের অধীন না হওয়াই শ্রেয়ঃ।

১৬। খাদ্য যত সাদাসিধা অথচ পুষ্টিকর হইবে ততই ভাল। খুব ঝালমসলা দেওয়া অম্ল ব্যঞ্জন তৃপ্তিকর হইলেও তাহাতে শরীরের বিশেষ উপকার হয় না। আমাদের গরম দেশে মাংস স্বাভাবিক খাদ্য নয়। উহা না খাইলেই ভাল। যাঁহাদের মাংস না হইলে চলে না, তাঁহারা যথা সম্ভব অল্প পরিমাণে খাইবেন। উহা খাইলেও শরীরের বিশেষ কোন উপকার হয় না, না খাইলেও কোন অনিষ্ট হয় না। সে জন্য, মাংস ভিন্ন যাঁহাদের মুখে অন্ন রুচে না, তাঁহারা উহা যত কম পারেন খাইবেন।

১৭। ধীরে ধীরে উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইবেন। খাদ্য জীর্ণ হওয়ার কার্য্য মুখ হইতে আরম্ভ হয়। প্রত্যেক গ্রাস অন্ন উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিবার পর তবে তাহা গলাধঃ করণ করিবেন। চর্ব্বণের ফলে খাদ্য সহজে জীর্ণ হয় এবং চর্ব্বণে খাদ্যের সম্পূর্ণ স্বাদ পাওয়া যায়।

১৮। অতিরিক্ত লবণের ন্যায় অতিরিক্ত মিষ্ট দ্রব্যও শরীরের পক্ষে অহিতকর। তরকারীতে বেশী নূন দিলে যেমন তাহা "নূনে পোড়া" তরকারী হইয়া যায়—তাহা যেমন মুখে করিতে পারা যায় না, অতিরিক্ত মিষ্ট দ্রব্যও সেইরূপ মুখরোচক হয় না। সন্দেশ রসগোল্লা এবং অন্যান্য মিষ্ট দ্রব্যে চিনির আধিক্য হইলে তাহা খাইতে ভাল লাগে না। অথচ পরিমিত মিষ্ট ব্যবহার করিলে খাদ্য কেমন সুস্বাদু হইয়া থাকে।

১৯। এক দিনে একই সময়ে অনেক রকম খাদ্য একসঙ্গে খাওয়া ভাল নয়। শরীর পোষণার্থই খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়; পঞ্চাশ ব্যঞ্জন একসঙ্গে না খাইলে শরীর পোষণের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। ৪।৫ রকম ব্যঞ্জন হইলেই বৈচিত্র্যের পক্ষে যথেষ্ট হয়, মুখ রোচকও কম হয় না। তবে প্রত্যেক দিন একই রকম খাদ্য খাইতে হইলে অরুচি হইতে পারে; সেই জন্য মধ্যে মধ্যে খাদ্যের উপকরণ বদলানো উচিত।

২০। মাথা ঠাণ্ডা, পা গরম ও উদর পরিষ্কার রাখা চাই। প্রত্যহ সকালে ও বিকালে এই দুইবার কোষ্ঠ সাফ করিবার অভ্যাস থাকা ভাল।

"হয় না হয় দু'বার যায়;
খায় না খায় সকালে নায়—
তার কড়ি কি বৈদ্যে পায়?"

২১। প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া একবার, এবং প্রত্যেকবার আহারের পর একবার করিয়া দাঁত মাজিয়া ফেলা আবশ্যক। রন্ধন ও আহারাদির পর সক্‌ড়ি এবং এঁটো বাসন না মাজিয়া লইলে তাহাতে গৃহস্থের কোন কাজই হয় না। দাঁতও সেইরূপ সক্‌ড়ি হয়। আহার ও আচমনের পর উহাতে যে সব খাদ্য কণা লাগিয়া থাকে তাহা মাজিয়া পরিষ্কার না করিলে উহা পচিয়া দাঁত নষ্ট হয়, শরীর বিষাক্ত হইতে পারে, খাদ্য হজম হয় না, এবং দেহ পুষ্টি লাভ করিতে পারে না। দাঁতন করা, খড়কে লওয়া ভাল অভ্যাস। তবে খড়কে লওয়ার সময়ে প্রায় মাত্রাধিক্য ঘটে; তাহাতে দুইটী দন্তের মধ্যস্থ ফাঁকগুলি বড় হইয়া যায় ও বিশ্রী দেখায় এবং অন্য অসুবিধাও হয়। খড়কে লওয়ার সময় একটু সাবধান হওয়া উচিত—দাঁতের গোড়ায় খোঁচা দিয়া দিয়া রক্তপাত করা কর্ত্তব্য নয়।

২২। ঘরের দরজা জানালা দিবা রাত্রি এমন ভাবে খুলিয়া রাখিতে হইবে যেন দিনের বেলা ঘরে রোদ আসিতে পারে এবং রাত্রে বায়ু প্রবাহিত হয়।

২৩। হাওয়াকে কখনও ভয় করিবেন না। ঋতু ভেদে উপযুক্ত গাত্র বস্ত্র ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট;—ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া অসুখ করিবার কোন ভয় নাই। সহরে দিনের হাওয়া অপেক্ষা রাত্রের হাওয়া অধিকতর বিশুদ্ধ।

২৪। সকালে শয্যাত্যাগ করিয়া গায়ে একবার কিছুক্ষণ হাওয়া লাগিতে দিলে বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয়। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে একবার গা হাত পা ঘর্ষণ করিলে রক্ত চলাচল অব্যাহত থাকে।

২৫। গাত্রবস্ত্র ঋতু অনুযায়ী পরিমিত হওয়া আবশ্যক। শীত কালে অতিরিক্ত গরম বস্ত্র ব্যবহার

নিষ্ফল; বরং তাহাতে রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে আর অনাবশ্যক ভার বহনের ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। আর গ্রীষ্ম বা বর্ষা কালেও চব্বিশ ঘণ্টা আদুড় গায়ে থাকাও কর্ত্তব্য নয়। একটা হালকা কিছু—চাদর বা জামা গায়ে থাকা ভাল।

২৬। যাহাদিগকে কেবল মাত্র মানসিক পরিশ্রম করিতে হয় তাহাদের পক্ষে যেমন নিত্য নিয়মিত ভাবে একটু শারীরিক পরিশ্রম অত্যাবশ্যক,—যাহাদিগকে কেবল কায়িক শ্রম করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে তেমনি প্রত্যহ ১০।১৫ মিনিট বা আধ ঘণ্টা কিম্বা এক ঘণ্টা মানসিক পরিশ্রম হিতকর। গল্পের বই কি অন্য কোন লঘু সাহিত্য পাঠ করিলে মন প্রফুল্ল থাকে। লেখাপড়া না জানিলে অপরের কাছে রামায়ণ মহাভারত পাঠ শোনাও মন্দ নয়। এই শ্রম-বৈচিত্র্য শরীর ও মন উভয়ের পক্ষে ক্রমান্বয়ে শ্রম ও বিশ্রামের কাজ করে।

২৭। একাধিক যোড়া জুতা ব্যবহার করা আবশ্যক। একই যোড়া জুতা রোজই পরা অপেক্ষা, আজ এক যোড়া, কাল অপর যোড়া এমনই ভাবে বদলাইয়া পরিতে পারিলেই ভাল। ভিজা জুতা পরিয়া থাকা অত্যন্ত অনিষ্টকর। বরং খালি পায়ে থাকা অনেক ভাল।

২৮। স্নায়ু ঘটিত মাথাধরা ধীরে ধীরে খানিকক্ষণ চুল আঁচড়াইলে ভাল হইয়া যায়।

২৯। বাতব্যাধিগ্রস্ত রোগীরা কিছুক্ষণ রৌদ্র উপভোগ করিলে অনেকটা আরাম পায়; এমন কি, সূর্য্য কিরণ লাগাইলে বাত ভাল হইয়া যাইতেও পারে।

৩০। শরীরে বেদনা বা যন্ত্রণা বোধ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকার করা উচিত; কারণ, ইহা রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ। আলস্য বশতঃ অবহেলা করিলে রোগে ভুগিতে হইবে।

৩১। সর্ব্বদা নিজেকে সুস্থ মনে করিবার চেষ্টা করিবেন। পাছে অসুখ করে—এই ভয়ে কখনও ভীত থাকা কর্ত্তব্য নয়। ইচ্ছাশক্তির ক্ষমতার সীমা নাই। প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা অনেক রোগের আক্রমণ নিবারণ করিয়া আত্মরক্ষা করা যায়। ইহা খুব শক্তিশালী রোগ-প্রতিষেধক। যে সর্ব্বদা নিজেকে অসুস্থ মনে করে, রোগও তাহাকে সর্ব্বদা পাইয়া বসে।

৩২। বিদ্যা উপার্জ্জন করিবার জন্য যদি স্বাস্থ্যকে বিসর্জ্জন দিতে হয়, তা' হইলে সে বিদ্যা নিষ্ফল। আগে স্বাস্থ্য তারপর বিদ্যা।

৩৩। শিক্ষকেরা এই কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিবেন যে, ছাত্রদের মানসিক উন্নতি সাধনই তাঁহাদের একমাত্র কাজ নহে—ছাত্রগণের শরীর সুস্থ রাখা এবং বলবীর্য্য বৃদ্ধির জন্যও তাঁহারা দায়ী।

৩৪। অনেকে চলিবার সময় সামনের দিকে ঝুঁকিয়া চলেন; তাহাতে তাঁহাদের পিঠ কুব্জাকার, এবং স্কন্ধদ্বয় গোল হইয়া আসে। ইহা অস্বাস্থ্যের লক্ষণ, অথবা ইহার পরিণাম অস্বাস্থ্য। এই কদভ্যাস পরিত্যাগ করিবার জন্য সামনের দিকে চক্ষুর সমতল অপেক্ষা উচ্চ জিনিসের প্রতি নজর রাখিয়া চলিতে পারিলে কুব্জ ভাব দূর হয়। যদি কোন রাস্তার ধারে ঘড়িওয়ালা গির্জা কিম্বা উচ্চ মন্দির থাকে, তবে ঐ ঘড়ি কিম্বা মন্দিরের চূড়ার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। গির্জা বা মন্দির না থাকিলে, ঐ রকম কোন উঁচু জিনিসের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তবে অবশ্য, গাড়ী ঘোড়া মোটর প্রভৃতি হইতেও নিজেকে সাবধান রাখিতে হইবে, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

৩৫। দিবসের শেষ আহার অর্থাৎ নৈশ আহারের পর কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম—কি মানসিক, কি শারীরিক—করা উচিত নহে। আহারের পর এবং নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে কোন লঘু সাহিত্য পাঠ বা একটু আধটু আমোদ প্রমোদ করিতে পারিলে ভাল হয়।

৩৬। একই সময়ে একসঙ্গে ফল ও শাকশব্জি আনাজ তরকারি না খাইলেই ভাল।

৩৭। প্রত্যহ প্রাতরাশের খাদ্য তালিকায় ফল-মূলের সংখ্যাধিক্য হিতকর।

৩৮। সপ্তাহের মধ্যে একদিন কেবল ফল খাইয়া কাটাইয়া দিতে পারিলে উত্তম হয়। এই অভ্যাসের সুফল অতি শীঘ্র প্রত্যক্ষ করা যায়।

৩৯। যে টুকু খাদ্য সহজে হজম করিতে পারিবেন বলিয়া বুঝিবেন, সেই পর্য্যন্ত খাইয়াই নিরস্ত হইবেন,—তাহার অধিক আর কিছুই খাইবেন না।

৪০। যে ব্যক্তি নিজের স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নপর তাহাকে কখনও অপরের গলগ্রহ হইতে হয় না।

৪১। খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া, গুরু ভোজন, উত্তমরূপে খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণ না করিয়া খাওয়া—এইগুলির ফলে অধিকাংশ পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

৪২। চক্ষের চারিদিকে কৃষ্ণ বর্ণ রেখা দেখা গেলে বুঝিতে হইবে, স্বাস্থ্য খারাপ হইবার উপক্রম হইয়াছে; তখনই ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪৩। যেখানে বায়ু চলাচল করিতে পারে না, সেরকম কক্ষে থাকা উচিত নয়। বাধ্য হইয়া থাকিতে হইলে, যত অল্প সময় সে ঘরে থাকিতে হয় ততই ভাল। জনতাপূর্ণ স্থানের বায়ুও স্বাস্থ্যকর নহে।

৪৪। ছেলে যদি কাঁদে, তবে তাহাকে শাসন না করিয়া, কান্নার কারণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহা দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত। ছেলে কাঁদিলেই তাহাকে মাই দেওয়া, কি মিছরী দেওয়া কি লজেঞ্জুস দিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করা সঙ্গত নহে। ইহাতে ছেলে তখনকার মত ঠাণ্ডা হইলেও, কান্নার প্রকৃত কারণ দূর না হওয়ায় তাহার ফল ভাল হয় না।

৪৫। যাহাতে আপনার শরীরের অনিষ্ট হইবে বলিয়া বুঝিবেন, তাহা যতই সুখাদ্য হউক না কেন, তাহা কখনই খাইবেন না,—লোভ সংবরণ করিতেই হইবে।

৪৬। মধ্যে মধ্যে এক এক দিন উপবাস দিলে শরীর খুব ভাল থাকে; এমন কি, অনেক পীড়ার আক্রমণ হইতেও রক্ষা পাওয়া যায়।

৪৭। কাজ করিতে যদি ক্লান্তি বোধ হয় তবে কাজ বন্ধ রাখিয়া বিশ্রাম করিবেন। ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ করিতে যাওয়া বিবেচনাসঙ্গতও নয়, নিরাপদও নয়। কাজ না করিলে যতটা ক্ষতির সম্ভাবনা—ক্লান্ত শরীরে কাজ করিলে তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতি হইয়া থাকে।

৪৮। শয়ন গৃহের মেঝে অনাবৃত থাকা ভাল; কিন্তু বিলাসিতার খাতিরে তাহা সর্ব্বদা কার্পেট ইত্যাদি মণ্ডিত করিয়া রাখায় অনিষ্ট হয়; উহাতে অনেক রোগের বীজ আশ্রয় লইতে পারে।

৪৯। পীড়িত ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করা উচিত। তবে অবশ্য তাহার কোন ক্ষতি না হয়, সে দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৫০। চুরি, ডাকাতি খুন, জখম, মিথ্যা-ভাষণের ন্যায় শরীর অসুস্থ থাকা একটা পাপ বলিয়া মনে করা উচিত। যাহাতে সে পাপের ভাগী না হইতে হয়, সে দিকে সকলকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সমাজেরও এ দিকে লক্ষ্য থাকা কর্ত্তব্য।

যক্ষ্মারোগীদের প্রতি ডাক্তার চার্লস মাইনরের উপদেশ।

ব্যায়াম।

১। ডাক্তারের অনুমতি না লইয়া কখনও ব্যায়াম করিবে না।

২। যাহাতে শ্রান্ত হইয়া পড় এমন কোন ব্যায়াম করিবে না।

৩। যদি পূর্ব্বের দিনে সন্ধ্যায় দেহের তাপ ৯৯·৪° ডিগ্রির বেশী থাকে বা সেই দিন সকালে দেহের তাপ ৯৮·৮° ডিগ্রি হয় তবে কোন প্রকার ব্যায়াম করিবে না।

৪। যদি মাঝে মাঝে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট

হয় বা যদি নাড়ীর গতি মিনিটে একশতের উপর হয়, তবে কোন প্রকার ব্যায়াম করিবে না।

৫। খাইবার এক ঘণ্টা পর পর্য্যন্ত কোন প্রকার ব্যায়াম করিবে না।

৬। যদি কফে রক্ত পাওয়া যায় বা কফ লালচে হয় তবে কোন প্রকার ব্যায়াম করিবে না।

৭। যদি দিন দিন দেহের ওজন কমিতে থাকে তবে চলাফেরা করিবে না।

৮। ডাক্তারে উপদেশ না দিলে কখনও পাহাড়ে বা উঁচু জায়গায় হাটিয়া উঠিবে না।

৯। ডাক্তারের উপদেশ ব্যতীত দীর্ঘ নিশ্বাস-প্রশ্বাস লওয়া বা ফুস্‌ফুসের অন্য কোন প্রকার ব্যায়াম করিবে না।

১০। ডাক্তারের পরামর্শ না লইয়া ঘোড়ায় চড়া বা গাড়ী চালানো উচিত নয়।

১১। বাহিরে বেড়াইতে বাহির হইয়া যদি কোন দিন বৃষ্টি আসে তাহাতে ভয় পাইবে না; যতক্ষণ চলিতে চলিতে ভিজিবে ততক্ষণ বিশেষ কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা অল্প; বাড়ীতে পৌঁছিয়াই ভিজে কাপড় ছাড়িয়া সমস্ত দেহ ঘষিয়া গরম করিয়া লইয়া শুক্‌নো কাপড় পরিবে।

১২। ঠাণ্ডা লাগাইবে না; ভিজে পায় থাকিবে না। জুতা বা মোজা জলে ভিজিয়া গেলে তখনই বদলাইয়া লইবে।

১৩। ব্যায়ামের মাত্রা বাড়াইতে হইলে ধীরে ধীরে বাড়াইবে; হঠাৎ একদিন বাড়াইয়া ফেলিও না।

বিশ্রাম।

১। সর্ব্বদা মনে রাখিবে ব্যায়ামের চেয়ে বিশ্রাম বেশী দরকারী। প্রতিদিনে নানা কার্য্যে দেহের যে শক্তি খরচ হয় তাহাই প্রথমে বিশ্রাম করিয়া সঞ্চয় করিতে হইবে; তাহার পর মাহিনার ওপর উপরির মত দেহের প্রয়োজনের অধিক যে শক্তিটুকু বিশ্রাম করিয়া জমিবে তাহাই ব্যায়াম করিয়া খরচ করিতে পারো।

সুতরাং যতদিন না শরীরে প্রতিদিনের সাধারণ প্রয়োজন মত শক্তি সঞ্চিত হইতেছে, ততদিন কোন প্রকার ব্যায়াম করিলে অত্যন্ত ক্ষতি হইবে। ততদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন।

২। দেহের তাপ যদি ৯৯·৫° ডিগ্রির ওপর হয় তবে এক আরামজনক হেলান-দেওয়া চেয়ারে শুইয়া বিশ্রাম করিবে।

৩। যদি দেহের তাপ ১০০·৫° ডিগ্রির ওপর হয়, তবে কোন বাহিরের ঘরে বা বিছানায় হেলান দিয়া শুইয়া বিশ্রাম করিবে।

৪। যদি তোমার দেহের তাপ ১০১° ডিগ্রির ওপর হয়, তবে তৎক্ষণাৎ বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িবে ও ডাক্তারকে খবর পাঠাইবে।

৫। কয়েক দিন ধরিয়া যদি দেহের তাপ সামান্য বাড়ে, তবে তাহা অগ্রাহ্য করিবে না; ডাক্তারকে জানাইবে।

ঘরের বাহিরে।

১। প্রতিদিন আট কি দশ ঘণ্টা ঘরের বাহিরে খোলা মাঠে মুক্ত বাতাসে উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে থাকিতে চেষ্টা করিবে। সকালে ৯টা হইতে বেলা ১টা; দুপুরে ২টা হইতে ৬টা। সন্ধ্যেবেলা ৭টা হইতে ৯টা। যদি আরও বাহিরে থাকিতে পারো ত আরও ভালো। যদি সত্যই রোগমুক্ত হইতে চাও, তবে আলস্য করিয়া বদ্ধ ঘরে বসিয়া থাকিবে না; জানিও, যতক্ষণ বাহিরে থাকিয়া মুক্ত বাতাস সেবন করিতে পারিবে ততক্ষণই লাভ।

২। স্যানাটোরিয়াম বা স্বাস্থ্যনিবাস হইতে সারিয়া ফিরিয়া আসিলেও প্রায় অনেকক্ষণই বদ্ধ গৃহে থাকিতে হইবে। সমস্ত দিন আফিসে বা ঘরের কাজে কাটাইতে হইতে পারে; তাহা হইলে রাত্রে মুক্ত বাতাসে খোলা ছাদে শয়ন করা দরকার। তবে সমস্ত দিন যদি খোলা জায়গায় মুক্ত নির্ম্মল বাতাসে কাটে তবে রাত্রে কেবল ঘরের জানালা খুলিয়া শুইলেই হইবে।

৩। শীতের সময় যদি বাহিরে ঠাণ্ডা বোধ হয়, ভালো করিয়া গরম কাপড় জড়াইয়া বসিবে বা গরম জলের ব্যাগ ব্যবহার করিবে। সামান্য শীত বোধ হইলে একটু বেড়াইয়া লইয়া অথবা ঘরে গিয়া দেহকে গরম করিয়া লইবে। শীত করিলে কখনও বাহিরে থাকিবে না; যাহাতে ঠাণ্ডা বোধ না হয় তাহার চেষ্টা করিবে।

৪। ক্যান্‌ভাসের আরাম-চেয়ারে বসিতে গেলে ঘাড় গুঁজিয়া যায়, তাহাতে কখনও বসিবে না; সর্ব্বদা ঘাড় সোজা রাখিবে। যে চেয়ারের পেছনে ঠেস দেবার অংশ বেশ চওড়া ও সমান তাহাতে বসিবে।

৫। সর্ব্বদা বাহিরে থাকিবে; রোদ, ঝড়, জল, হাওয়া হইতে দেহকে রক্ষা করিবার জন্য যথোচিত বেশ ভূষা সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিবে। তবে খুব জল ঝড়ের সময় বাহির হইবে না। যদি গলা ভারী হয় বা গলার অসুখ হয় তবে ঠাণ্ডার দিনে ঘরে থাকাই ভালো।

৬। রোদ লাগাইবে না, মাথায় যেন রোদ না লাগে, তাহা হইলে দেহের তাপ বাড়িবে। বাহিরে যদি খুব গরম হয় তবে ঠাণ্ডা ঘরে থাকাই ভালো।

খাদ্য।

১। আদর্শ খাদ্যদ্রব্য রুচিকর, ক্ষুধাবর্দ্ধক, পুষ্টিকর ও পরিমাণে কম হইবে। খাদ্য যদি কেবল রুচিকর হয়, পুষ্টিকর না হয়, তবে তাহাতে দেহের শক্তি বাড়িবে না। যদি কেবল পুষ্টিকর হয় কিন্তু রুচিকর না হয় তা হইলে খাইতে মোটেই ভালো লাগিবে না। আহার্য্য দ্রব্য যদি পরিমাণে বেশী হয় তবে দেহের ক্ষতি হইবে।

২। হজমশক্তি যদি ভালো হয় তবে আপন রুচিমত নানা জিনিষ খাইতে পারো—মাংস, শাকসবজী, ডিম, দুধ, ঘি ইত্যাদি। বেলা ১১টায় ও বিকেল চারটায় একটি কাঁচা ডিম ও এক গেলাস দুধ খাওয়া ভালো। তবে দেখিতে হইবে এই খাইয়া যেন পরে খাইবার সময় ক্ষুধার বেগ কম না হয়। যদি কিছু খাইয়া পেট ভার বোধ হয় তবে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিবে। যদি রাতে বার বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় তবে, খাবার সময় পর্য্যন্ত বুভুক্ষিত থাকিবে না, সামান্য কিছু খাইবে।

৩। হজমশক্তির তেজ যদি না থাকে তবে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়া খাবার ঠিক করিয়া লইবে।

৪। খাবার পর যদি পেট ভারী লাগে বা কোন ব্যথা বোধ হয়, যদি প্রভাতে উঠিয়া প্রস্রাব করিলে ঘোলা প্রস্রাব হয়, তবে নিশ্চয় তুমি অতিরিক্ত খাইতেছ।

৫। ঠিক যতখানি খাওয়া উচিত ততখানি খাইবে। মনে রাখিও, ইঞ্জিনে খুব কম কয়লা পোড়াইলে, তাহাতে বাষ্প শক্তিমান্ হইবে না, ইঞ্জিন চলিবে না। আর খুব বেশী কয়লা পোড়াইলে, অপর্য্যাপ্ত ধূম হইবে, ইঞ্জিনের কল তাহাতে ময়লায় ভরিয়া যাইবে।

৬। প্রতি দিন ঠিক সময় খাইবে। খাইবার সময় কথাবার্ত্তা কহিবে,—অবশ্য নিজের রোগের কথা নয়। কোন মজার কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে খাইলে, হজমের সুবিধা হয়।

৭। কখনও অনিয়ম করিয়া যখন তখন খাইবে না। আর কখনও চিনি খাইবে না। যদি খাও ত ঠিক খাইবার পর খাইবে।

৮। যখন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছ তখন খাইবে না; ভরা পেটে কখনও ব্যায়াম করিবে না। যদি পরিশ্রান্ত হইয়া পড় ত আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া খাইবে। মধ্যাহ্নের আহারের পর এক ঘণ্টা অর্দ্ধশয়ান ভাবে চুপ করিয়া বাহিরে বিশ্রাম করিবে।

৯। বেলা এগারোটা ও বিকেল চারটের সময় আর একবার ডিম ও দুধ খাইতে পারিলে ভালো। অবশ্য যদি হজম করিবার শক্তি থাকে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ৪টা থেকে ৬টা কাঁচা মুরগীর ডিম এবং চারি হইতে ছয় গ্লাস দুধ খাইতে পারিলে ভালো হয়। দুগ্ধ খুবই উপকারী। তবে কাহারও কাহারও দুধ খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না বা পেটে ঠোস হয়। যদি দুধ খাইয়া তাহাই হয় তবে দুধ বন্ধ করিবে। দুধের পরিবর্ত্তে অন্য জিনিষও খাওয়া যাইতে পারে।

১০। আস্তে আস্তে খাইবে, ভালো করিয়া চিবাইবে; সর্ব্বদা ধীরে অল্প অল্প করিয়া দুগ্ধ পান করিবে।

১১। সর্ব্বদা কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে সযত্ন থাকিবে।

বেশভূষা।

১। শীতের সময় সুতার কোন গেঞ্জি বা জামার উপর হাল্কা পশমের জামা পরিবে। গরমের সময় পশম ও সুতা মেশানো জামা পরিবে। বক্ষঃস্থল সর্ব্বদা আবৃত রাখা দরকার—হঠাৎ যেন কোন প্রকারে ঠাণ্ডা না লাগে।

২। কখনও খুব ভারী বা খুব গরম জামা পরিবে না; যাহাতে খুব ঘাম হয় এমন জামা পরিবে না। রাত্রিতে শুইবার সময় গায়ে ফ্লানেলের জামা থাকিলে ভালো।

৩। জুতো যেন বেশ আরামদায়ক হয়; পা যেন সর্ব্বদা গরম থাকে।

৪। শীতের সময় হাতের কাছে একটি বেশী কাপড় রাখিবে; দরকার হইলেই লইতে পারিবে।

৫। যদি বেশী গরম হয় বা ঘাম হয়, কাপড় জামা ছাড়িয়া গা মুছিয়া নতুন কাপড় জামা পরিবে।

৬। ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় সাবধান থাকিবে; হঠাৎ গরম জামা ছাড়িয়া ঠাণ্ডা জামা পরিবে না।

১। সপ্তাহে অন্ততঃ দুইবার গরমজলে স্নান দরকার।

২। দেহের চর্ম্ম ঠাণ্ডা সহিতে পারে এমন করিতে হইবে। সকালে উঠিবার পর একবার ঠাণ্ডা স্পঞ্জ দিয়া সমস্ত দেহ ঘষিয়া লইতে পারিলে ভালো হয়।

৩। যদি শীত বোধ হয়, ঠাণ্ডা লাগে বা কফে ঠক থাকে বা সকালে উঠিয়া দেহের তাপ ৯৭° ডিগ্রির নীচে হয় তবে ঠাণ্ডা স্পঞ্জে গা মোছা উচিত নয়।

৪। যখন ঠাণ্ডা জলে স্নান করিবে, ঘরের উত্তাপ ৬০° ডিগ্রির নীচে না হয়। ৬০° ডিগ্রি হইলে ভালো।

গৃহ।

১। শীতের সময় পূর্ব্ব ও পশ্চিম যেন খোলা থাকে। উত্তর দিকটা বন্ধ রাখাই ভালো।

২। ঘরে যত জানলা থাকে ততই ভালো।

৩। ডাক্তারের অনুমতি ভিন্ন রোগীর ঘরে আর কেহ যেন না শোয়; এক বিছানায় দুইজন কখনও শুইবে না।

৪। যখন বিছানায় না থাকিয়া ঘরে বসিয়া থাকিবে তখন ঘরের উত্তাপ ৬৫° হইতে ৭০° ডিগ্রি হইলেই ভালো।

বিছানা।

১। গ্রীষ্মকালে রাত্রি দশটার সময় ও শীতকালে নয়টার সময় শুইতে যাইবে। আট ঘণ্টার কম ও দশ ঘণ্টার বেশী ঘুমাইবে না।

২। শুইবার আগে যেন ঘরের সব দরজা জানলা খুলিয়া দেওয়া হয়। আর ভোরবেলা ঘুম হইতে উঠিবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যেন সব বন্ধ করা হয়।

৩। প্রথম প্রথম সব জানলা খুলিয়া শুইলে যদি ঠাণ্ডা লাগে, ধীরে ধীরে অভ্যাস করিবে। যদি রাত্রে ঘুমাইয়া মুখ দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ কর, তবে ডাক্তারকে জানাইবে। মুখ দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

৪। জানলার নিকট মাথা রাখিয়া শুইবে; তবে যেন মাথার উপর দিয়া ঠাণ্ডা বাতাস না বহে।

৫। গরম কাপড়ে আবৃত হইয়া শুইবে, যেন রাতে কোন প্রকার ঠাণ্ডা না লাগে। তবে খুব বেশী কম্বল দিয়া বিছানা খুব গরম করিবে না। আবার বিছানা যেন ঠাণ্ডাও না হয়। সর্ব্বদা একটা হাল্কা সার্ট দেহের চামড়ার উপর পরিবে।

আমোদ।

১। প্রতি ব্যক্তির জন্য আমোদ প্রমোদ দরকার। তবে যে আমোদে স্বাস্থ্যের উপকার না হইয়া অপকার হয় তাহা যতই লোভনীয় হোক না কেন, তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে।

২। যে খেলায় ধুলো খাইতে হয় বা শরীর গরম হয় এমন খেলা উচিত নয়। যেমন টেনিস খেলা অপকারী।

৩। যে খেলায় মনের উত্তেজনা হয় বা মানসিক শক্তির অপচয় হয়, এমন খেলা উচিত নয়। যেমন, তাস, পাশা।

৪। যদি তুমি গায়ক হও বা বাদক হও, তবে মনে রাখিও, যে গান বা সুর বাজাইলে চিত্তের উত্তেজনা হয়, তাহাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইবে। অল্প সময়ের জন্য হাল্কা সুরে হাল্কা গান গাইতে পারো। মনের শ্রান্তি বা চাঞ্চল্য হওয়া উচিত নয়।

৫। বন্ধু বা আত্মীয়দের সহিত ঘন ঘন দীর্ঘ চিঠি লেখা ঠিক নয়। দেহের তাপ যদি ১০০·৫° ডিগ্রির নীচে হয়, তবে দিনে একখানি করিয়া চিঠি লিখিতে পারো; তার চেয়ে বেশী লিখিতে চাহিলে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিবে। তোমাকে যাহারা চিঠি লিখিবে তাহাদের জানা উচিত, তাহারা যেন কখনও পরিবারের দুর্ঘটনা বা দুঃখের কথা না লেখে। তাহারা যদি আনন্দের সহিত আশার বাণী বলিয়া চিঠি না লিখিতে পারে, তবে তাহাদের চিঠি লেখা বন্ধ করা উচিত।

৬। যে খেলায় দীর্ঘকাল ঘরে বসিয়া থাকিতে হয় বা যাহাতে মনে ক্রোধ বা বিরক্তি বা হতাশ হইতে পারে এমন খেলা উচিত নয়।

৭। কখনও থিয়াটারে বা রাত্রিকালীন কোন আমোদে যাওয়া উচিত নয়। বায়স্কোপে যাওয়া একেবারেই উচিত নয়।

৮। বাজারে ঘোরা, জিনিষ পত্র কেনা বা সহরের পথে ঘোরা উচিত নয়।

৯। যদি দেহের তাপ ১০০° ডিগ্রির উপর হয় তবে বাহিরের বন্ধুবান্ধবদের সহিত দেখা করা বন্ধ করা উচিত।

১০। ডাক্তারের অনুমতি ভিন্ন কাহারও বাড়ী বেড়াতে যাইবে না।

গলার যত্ন।

১। গলা যদি ভাঙ্গিয়া যায় বা যদি কোন প্রকার গলার অসুখ হয়, তবে যত সম্ভব কম কথা কহিবে। একেবারে চুপ করিয়া থাকিতে পারিলে ভালো।

২। গরম ঘরে, ধুলোভরা বা শুক্‌নো ঘরে থাকিবে না।

৩। অনেকক্ষণ চেঁচাইয়া কথা বলিয়া বা লোক-জনকে চেঁচাইয়া ডাকিয়া গলাকে শ্রান্ত করিবে না।

৪। ধূমপান একেবারে নিষিদ্ধ।

৫। ডাক্তারের অনুমতি না লইয়া গান করিবে না।

কাশি।

১। যে কাশিতে ফুস্‌ফুস্ হইতে কফ উঠিয়া আসে তাহাই ভালো। অন্য শুক্‌নো কাশিতে বুক শ্রান্ত হইয়া পড়ে। সহজে যদি কফ না উঠে তবে কষ্ট করিয়া কাশিয়া ওঠাইতে চেষ্টা করিও না। চেষ্টা করিলে এম্নি শুক্‌নো কাশি দমন করা যাইতে পারে। সুতরাং কাশি পাইলেই কাশিবে না, কাশি বন্ধ করিতে চেষ্টা করিবে।

২। যখন কাশিবে, সর্ব্বদা রুমাল দিয়া মুখ ঢাকিয়া রাখিবে, হাত দিয়া মুখ কখনও ঢাকিবে না। রুমাল দিয়া মুখ কেন আবৃত রাখিতে বলিতেছি? আচ্ছা, একবার কাশিবার সময় খোলা মুখের সামনে একটা চক্‌চকে পরিষ্কার কাচ ধরিয়া রাখিও,—দেখিবে, কাশিবার পর কাচখানি কিসে ভরিয়া গিয়াছে।

৩। যদি কথা কহিয়া কাশি বাড়ে ত কথা কম কহিবে।

৪। কখনও ঘরের মেজেতে কাশিয়া কফ ফেলিবে না। যখন বাহিরে বেড়াইতেছ তখনও পথে বা জঙ্গলে কোথাও কাশিয়া কফ ফেলিবে না। সর্ব্বদা কফাধারে বা পকেট-পিক্‌দানে কফ ফেলিবে। যখন তাহা না পাইবে, তখন কোন নেকড়ায় কফ পুরিয়া রাখিবে, পরে পুড়াইয়া ফেলিবে।

৫। কফ কখনও গিলিয়া ফেলিবে না; যে কোন অবস্থায় হোক কফ যেন খাইয়া ফেলিও না।

৬। ঠোঁটে হাত ঘসিয়া হাত ময়লা করিও না। সদা সর্ব্বদা হাত ধুইবে; দিনে তিনবার দাঁত মাজিবে।

৭। চুমো খাওয়া খুবই আনন্দের জিনিষ; কিন্তু যতদিন না একেবারে সারিয়া উঠিয়াছ ততদিন কাহাকেও চুমো খাইবে না। যখন কফ উঠা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে তখন চুমো খাইতে পারো। ছোট ছেলেদের চুমো খাওয়া একেবারে উচিত নয়,—তাদের খুব ক্ষতি হইতে পারে।

৮। ঘটনাক্রমে বা অসাবধানে যদি ঘরের মেঝেতে কফ পড়িয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহা মুছিয়া ফেলিতে হইবে। জলে কার্‌বোলিক অ্যাসিড মিশাইয়া সেই স্থান ধুইয়া দিবে।

৯। যক্ষ্মারোগ সংক্রামক বটে কিন্তু বসন্ত বা কলেরার মত নয়; চেষ্টা করিলে, যত্ন লইলে যক্ষ্মারোগ কখনও সংক্রামক হইবে না।

ঔষধ।

১। ডাক্তারের উপদেশ ভিন্ন কোন ঔষধ খাইবে না।

২। যে ঔষধ খাইলে ক্ষিধে কমিয়া যায় বা পাকস্থলী স্বাভাবিক রূপে কাজ করিতে পারে না, তাহা খাইবে না।

৩। মদ স্পর্শ করিবে না। ডাক্তার বলিলে খাইতে পারো।

অন্যান্য কথা।

১। মনে রাখিও যাহা তোমায় করিতে বলা হইয়াছে তাহা ভিন্ন যাহা করিবে তাহা করিতে আদেশ নাই।

২। যদি কিছু করিতে চাও, ইহা করা ঠিক কি না বলিয়া যদি সন্দেহ জাগে, তবে ডাক্তারকে ডাকিয়া পরামর্শ লইবে।

৩। প্রথম প্রথম উন্মুক্ত স্থানে বাস বা সব জানলা খুলিয়া শোওয়া সহ্য না হইলে, ধীরে ধীরে অভ্যাস করিবে।

৪। অনেক হিতৈষী বন্ধু অনেক উপদেশ দিবেন। সব উপদেশ ডাক্তারের কাছে যাচাই করিয়া লইবে।

৫। যখন তুমি সম্পূর্ণ সারিয়া ওঠ নাই অথচ বোধ করিতেছ যে বেশ সারিয়া গিয়াছি, এই সময় হইতেছে ভয়ের সময়। এই সময় রোগীরা অসাবধান হয়। তখন অতি বুদ্ধিমান রোগীও নিয়ম পালনের কথা ভুলিয়া যায়। তখন রোগের লক্ষণ হয় ত কিছুই নাই; তবু রোগ সম্পূর্ণ সারে নাই। রোগ সম্পূর্ণ না সারিলে কোন প্রকার অত্যাচার করা উচিত নয়।

৬। ডাক্তারকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবে। তাঁহার কাছে সব সময়ে সব খুলিয়া বলিবে। মনে রাখিও মাঝি যেমন ঝড়ের সময় নৌকা চালাইয়া লইয়া যায়, তিনিও তেম্নি তোমার দেহকে স্বাস্থ্যঘাটের দিকে চালাইয়া লইয়া যাইতেছেন।

মনের অবস্থা।

১। ডাক্তার ভিন্ন আর কাহারও সহিত কখনও তোমার রোগের কথা বা রোগের লক্ষণ, ব্যথা, আরামের উপায়ের কথা কহিবে না।

২। সর্ব্বদা মন প্রফুল্ল রাখিবে। কাহারও উপর রাগ করিবে না, খুঁতখুঁত করিবে না। বিষণ্ণ হইয়া, আশা হীন হইয়া ত কোন লাভ নাই। যাহা ঘটিয়াছে হাস্যমুখে প্রফুল্ল অন্তরে তাহা স্বীকার করিয়া লইতে পারিলেই রোগের অনেক দুঃখ কমিয়া যাইবে,—অন্ধকার রাত্রিতেও উষার আলোকের পূর্ব্বাভাস পাইবে।

৩। ভাবিয়া যদি মনে বিষাদ আসে, আপন ইচ্ছাশক্তি বর্দ্ধিত কর। আপন দুঃখের ব্যথার ভাবনা একেবারে ভাবিও না। সর্ব্বদা ভাবিবে আমি বেশ আছি, আমি সারিতেছি, আমি ঠিক রোগমুক্ত হইব।

৪। শীঘ্র সারিয়া উঠিতেছ না বলিয়া অধীর হইবে না। অধীর হইলে রোগ সারিতে বিলম্বই হইবে। রোগমুক্তি তোমারই উপর নির্ভর করিতেছে। রোগ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সাধনা দরকার। জগতের কোন বড় কাজ সহজে সহসা হয় নাই।

৫। সর্ব্বদা ভাবিবে,—বিশ্ব মঙ্গলময়, আনন্দময়। আমি সারিব।

পল্লী-স্বাস্থ্য।

মেদিনীপুর অঞ্চলে যে বন্যা হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে স্থানে স্থানে ওলাউঠা, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানাবিধ জ্বর ও সংক্রামক বসন্ত রোগে মৃত্যুর সংখ্যা অল্প নহে।—নীহার।

"হিন্দু রঞ্জিকা"র সংবাদদাতা উদ্যোগী পুরুষ; নিজেদের অভাব কিরূপে নিজেদেরই দূর করিবার চেষ্টা করিতে হয় তাহা তিনি ভাল রূপই জানেন—

আমাদিগের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সুযোগ্য সদাশয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুগ্রহে মাদারীপুরে অল্পদিন হইল একটী দাতব্য ডাক্তারখানা স্থাপিত হওয়ায় আমাদের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। আমরা তজ্জন্য তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু ডাক্তারখানার ঘরের অভাবে অসুবিধা হইতেছে। আমরা দরিদ্র পল্লিবাসী সামান্য কিছু চান্দা সংগ্রহ করিয়া আমাদের রাজ পিতৃব্য "ডিউক অব কনট্ মেমোরিয়াল মেডিক্যাল হল" নাম দিয়া উক্ত শুভদিনে ডাক্তারখানা ঘরের ভিত্তি স্থাপন করিলাম। আশাকরি চেয়ারম্যান মহোদয় বাহাদুরের অনুগ্রহে সত্বরেই ঐ ভিত্তি দৃঢ়ীভূত হইবে।

শ্রীশশিপ্রসাদ চৌধুরী।
ডিঃ বিঃ এডেড ডিস্পেন্সারী।

"হিন্দু রঞ্জিকা"র অপর একজন সংবাদদাতা যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের কৃপা দৃষ্টিপাত প্রার্থনীয়। তিনি লিখিয়াছেন—

থানা নওহাটা ও বাগমারা থানার নীচে বারানই নদী নামে যে একটী ছোট নদী আছে ঐ নদীতে জেলেরা বাঁশগাছ ও জঙ্গল দিয়া প্রতিমাইলে ২।৩টী করিয়া কাঠা দিয়া মাছ ধরার বন্দোবস্ত করিয়াছে।, নওহাটার উজান হইতে নাগায়েদ নলডাঙ্গার ব্রিজ পর্য্যন্ত নদী সংকীর্ণ হইয়া স্রোত শূন্য হইয়াছে। উক্ত নওহাটা ঘাট হইতে নলডাঙ্গা ব্রিজ পর্য্যন্ত ৯২টী কাঠা জেলেরা দিয়া নদীর জল বিষাক্ত বা দুর্গন্ধময় করিয়া ফেলিয়াছে। গত কয়েক বৎসর ভূতপূর্ব্ব শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাচরণ গুপ্ত সবডিভিশন অফিসার মহাশয় জেলেদের দুর্ব্ব্যবহারে নদীতে কাঠা দেওয়ার জন্য সমস্ত জেলেকে ফৌজদারীতে দেন। সেই হইতে কাঠা দেওয়া নদীতে বন্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে আবার জেলেরা নদীতে কাঠা দিয়া নদীর জল খারাপ করিয়াছে। এই দূষিত জলের জন্য রামরামা, মথুরাপুর, তাহিরপুর ও কামারখালী গ্রামে কলেরা, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি ব্যারামের সৃষ্টি হইয়া বিস্তর লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এমন দিনও নাই যে প্রতিদিন ৪।৫ জন লোক না মরিতেছে। আমরা এ বিষয়ে রাজসাহীর সবডিভিশন অফিসার শ্রীযুক্ত মজিদ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তিনি আমাদের এই দুঃখ মোচন করিবেন আমাদের এই বিনীত অনুরোধ।

শ্রীওয়াহেদ বক্স মিঞা।
পোঃ তাহিরপুর। রামরামা, রাজসাহী।

আলোচনা।

সায়েন্স কংগ্রেস।—

গত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতায় সায়েন্স কংগ্রেস অর্থাৎ বিজ্ঞান-সম্মেলন উপলক্ষে চিকিৎসা বিভাগে নবাবিষ্কৃত তত্ত্বসমূহের আলোচনা হইয়াছিল। লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল জে, ডবলিউ, ডি, মেগ (Lt. Col. J. W. D. Megaw, I.M.S.) সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি চিকিৎসা-সংক্রান্ত মৌলিক অনুসন্ধান ও গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। অনেকগুলি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। Dr. (Miss) D. F. Curiel ভারতীয় শিশুদিগের ওজন সংক্রান্ত একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, জন্মের সময়ে ভারতীয় শিশুরা ভাল অবস্থাতেই জন্ম গ্রহণ করে; কিন্তু শিশুর জন্মের পরবর্ত্তী অবস্থার দরুণই ভারতে এত বেশী শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে। বাঙ্গলা দেশের জলসংস্থান ও জলের কল, কুষ্ঠ চিকিৎসা, কালা-আ-জ্বর, জননেন্দ্রিয়-ঘটিত পীড়া, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় ছিল। শেষোক্ত

তিনটি বিষয় লইয়া কিছু বাদানুবাদও হইয়াছিল। জননেন্দ্রিয়-ঘটিত পীড়া সম্বন্ধে অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শৈশব কাল হইতেই ইন্দ্রিয়-সেবনের ফলাফল সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কথা এই,—ম্যাও ধরিবে কে? কে এই শিক্ষা দানের ভার গ্রহণ করিবে? এ বিষয়ে বিলাতী ও মার্কিণ চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িক পত্রে চিকিৎসকেরা অনেক দিন ধরিয়া আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু আলোচনা চিকিৎসকগণের মধ্যেই নিবদ্ধ আছে; জনসাধারণ এখনও এই আলোচনায় যোগ দান করেন নাই। এ দেশের অবস্থা আবার বিলাত প্রভৃতি দেশের অপেক্ষা আরও বেশী delicate; কোন শিশুর অভিভাবকই এই শিক্ষা দানের ভার গ্রহণ করিতে চাহিবেন না; এমন কি চিকিৎসকেরা এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সাহস করিলেও, অভিভাবকেরা নিশ্চয়ই আপত্তি করিয়া বসিবেন—কুরুচি ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ করিবেন। এমন কি, আমরা চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্র স্বাস্থ্য সমাচারেও ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে সাহস করি নাই। অথচ, শিক্ষা দেওয়া যে খুবই আবশ্যক তাহাও বিলক্ষণ বুঝিতেছি। কিন্তু উপায় কি?

বিহারে পল্লীস্বাস্থ্য।—

বিহার ও ওড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভার বাবু রঘুনন্দন প্রসাদ সিংহ প্রস্তাব করেন যে, আগামী বাজেটে বিহারের পল্লী অঞ্চলে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিবার জন্য অনেক টাকা মঞ্জুর করা হউক এবং জেলা বোর্ড সমূহকে নূতন নূতন চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য পীড়াপীড়ি করা হউক। তা' ছাড়া, আগামী বর্ষের জন্য এমন ব্যবস্থা করা হউক যে, প্রত্যেক থানার এলাকায় যেন অন্ততঃ একটা করিয়াও ডিস্পেন্সারী প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে গ্রামবাসীরা খুব জোরের সহিত দাবী করিতে পারে; কেন না, রাজকোষের অধিকাংশ টাকাই তাহারাই প্রদান করিয়া থাকে। আমরা আনন্দের সহিত সিংহ মহাশয়ের এই প্রস্তাবের সমর্থন করিতেছি। আশা করি, সরকার এই ন্যায্য দাবী পূরণে উদাসীন থাকিবেন না। কেবল বিহার ও উড়িষ্যার নহে, ভারতের প্রত্যেক প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাতেই এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হওয়া উচিত, এবং প্রত্যেক প্রাদেশিক গবরমেণ্টেরই এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা কর্ত্তব্য। মানবজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এই ব্যাপারে অর্থাভাবের ওজর করা চলিবে না।

মদ্য বর্জ্জন।—

একে একে অনেক স্থলেই লোকে মদ্য বর্জ্জন করিতেছে। নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যেই এ বিষয়ে বেশী আগ্রহ দেখা যাইতেছে। কিন্তু ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকেরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার। এ বিষয়ে তাঁহাদের দিক হইতে একটুও সাড়া পাওয়া যাইতেছে না—যেন তাঁহাদের প্রাণের স্পন্দনটুকু পর্য্যন্ত নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মহাত্মা গান্ধির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই হউক, বা স্বতঃ প্রণোদিত হইয়াই হউক কিম্বা গতানুগতিক ন্যায়ের অনুসরণেই হউক, অথবা মদ্য পানের কুফল হৃদয়ঙ্গম করিয়াই হউক, এই যে মহদনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, এ ভাবটি স্থায়ী হইলেই দেশের পক্ষে মঙ্গল। ইহাতে সফলতা লাভের পক্ষে অবশ্য বিঘ্ন বিস্তর; কিন্তু বিনা বাধায় কবে কোন্ মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে? এখন এই মদ্য বর্জ্জনের আন্দোলনটিকে সুপরিচালিত করিবার জন্য ভদ্র, পদস্থ, সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকেরা যদি নিজেরা মদ্য বর্জ্জন করিয়া নিম্নশ্রেণীর লোকদের যথার্থ নেতার কাজটি করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বড়ই সুখের বিষয় হইত, এবং ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারা যাইত। তাহা হইলেও আপাততঃ নিরাশ হইবার কারণ নাই।

বিলাতী massage বা গাত্রমর্দ্দনাগার।—

Massage বা গাত্রমর্দ্দন ও Turkish Bath (তুরস্ক দেশের স্নানাগার) কেবল যে নিরবচ্ছিন্ন আরামের জিনিস, তাহা নহে,—রোগ বিশেষে উহারা চিকিৎসা-প্রকরণের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু চরিত্রহীন লোকদের প্রবৃত্তি কি হীন! তাহারা এমন ভাল জিনিস দুইটীকে এরূপ দুর্নীতিমূলক করিয়া তুলিয়াছে যে, যে সকল চরিত্রবান লোকে ইহাদের আভ্যন্তরীন ব্যাপার অবগত আছেন, তাঁহারা ইহাদের নাম শুনিলেই ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া থাকেন, এবং প্রাণান্তেও এই সকল স্থানের ছায়া মাড়াইতে চাহেন না। সম্প্রতি বিলাতের একটী নারী লণ্ডনের জার্ম্মীন ষ্ট্রীটে (লণ্ডনের পশ্চিমাংশে) এইরূপ একটী গাত্র-মর্দ্দনাগার খুলিতে চাহে; কিন্তু লণ্ডন কাউন্টী কাউন্সিল তাহাকে গাত্রমর্দ্দনাগার খুলিবার লাইসেন্স দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। স্ত্রীলোকটি—(ইনি আবার কুমারী—মিস মেরী ফ্রান্সেস নোলান) লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের বিরুদ্ধে বো ষ্ট্রীটের পুলিশ আদালতে আপীল রুজু করে। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ চেষ্টার জোন্স মোকদ্দমার বিবরণ শুনিয়া বিলক্ষণ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, আইন যে এরূপ গাত্রমর্দ্দনাগার খোলার অনুমোদন করে ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যুবকেরা এরূপ স্থানে গাত্রমর্দ্দনের আরাম উপভোগ করিতে যাইবে এবং যুবতীরা তাহাদের গা দলিয়া মলিয়া দিবে, ইহা অতি আপত্তিকর বিসদৃশ দৃশ্য। ম্যাজিষ্ট্রেট বিবেচনা করেন, আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন কোন লোকই এখানে স্ত্রীলোকদের সেবা লইতে যাইতে পারে না, এবং কোন ভদ্র যুবতীই কোন পুরুষের গা দলিয়া মলিয়া দিতে পারে না। মামলাটি বিবেচনাধীন। ম্যাজিষ্ট্রেট এখন ভাবিতেছেন, ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইয়া না আসিলে কেহই এখানে গা মলাইতে পারিবে না, এবং কোন স্ত্রীলোক কোন পুরুষের অথবা কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোকের গা মলিয়া দিতে পারিবে না—এইরূপ সর্ত্তে লাইসেন্স দিবার তাঁহার ক্ষমতা আছে কি না। সে যাহাই হউক, আমাদের বিবেচনায় লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল গাত্রমর্দ্দনাগার খুলিবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করিয়া ঠিক কাজই করিয়াছেন। Massage যতই ভাল জিনিস হউক, উহা যতই চিকিৎসা-শাস্ত্রসম্মত হউক, massageএর নামে দুর্নীতির—পাপাচারের প্রশ্রয় কোন ক্রমেই দেওয়া যাইতে পারে না। টার্কিস বাথও চিকিৎসা-বিজ্ঞানানুমোদিত স্বাস্থ্যকর স্নানের প্রণালী। ইহাতেও শরীরের খুবই উপকার হয়। কিন্তু দুরাচার লোকেরা ইহারও সদুদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। এই সকল হামামে অনুষ্ঠিত হয় না, এমন পাপই নাই। কেহ Massage বা Turkish Bathএর সুবিধা উপভোগ করিতে চাহিলে, নিজ নিজ বাড়ীতে বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া ভাল। ইহাতে কিছু ব্যয় থাকিলেও তাহা করা যাইতে পারে।

দোকানের খাবার।—

আমরা বহু কাল ধরিয়া বলিয়া আসিতেছি যে, বাজারের খাবার খাওয়া নিরাপদ নহে। বাজারের দোকানদাররা খাবার বিক্রীর ব্যবসা করে—খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত ও সংরক্ষা কল্পে যেরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা আবশ্যক, পেশাদার খাবারওয়ালারা সে দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখে না। যাহা মানুষের অখাদ্য তাহাও তাহারা ফেলিয়া দেয় না, বিক্রয় করিবার চেষ্টা করে—নহিলে তাহাদের লোকসান হয়, ব্যবসা চলে না। তার উপর, ভ্যাজালের উৎপাত ত আছেই। এই সকল কারণে বাজারের তৈয়ারী খাবার নানা প্রকারে দূষিত হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। সে দোষের পরিমাণ সময়ে সময়ে এত বেশী হইতে পারে যে, সেই দূষিত খাদ্য খাইয়া লোকের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। এরূপ ঘটনার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে এরূপ একটী ঘটনার সংবাদ পাওয়া গেল। একটী দুই বৎসরের শিশুকে লইয়া তাহার পিতা বাজারে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি কিছু মিষ্টান্ন কিনিয়া ছেলেকে খাইতে দেন। সেই ছেলে বাড়ীতে আসিয়া অত্যন্ত পীড়িত হয় এবং মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হয়। সকলে মনে করিতেছেন, ঐ মিষ্টান্ন ভক্ষণেই ছেলেটী পীড়িত হইয়াছিল। এরূপ সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নয়। মৃত শিশুর পাকস্থলীর রাসায়নিক পরীক্ষা হইতেছে—ফলাফল পরে জানিতে পারা যাইবে।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৯ম বর্ষ | চৈত্র, ১৩২৭ সাল | ১২শ সংখ্যা

পল্লী-স্বাস্থ্যের কথা।

গ্রামে ফিরিয়া চল।

গ্রামে ফিরিয়া চল। সমস্ত দেশ জুড়িয়া যে ডাক আসিয়াছে—গ্রামের দিকে তাকাও! বস্তুতঃ পল্লীর উন্নতির উপর সমস্ত জাতির উন্নতি নির্ভর করিতেছে। দেশকে নূতন শক্তিতে বলীয়ান করিতে হইলে, জাতিকে নূতন রূপে গড়িতে হইলে, আবার গ্রামে ফিরিয়া যাইতে হইবে। গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইবে, গ্রামে গ্রামে কৃষককুলের নিকট স্বাস্থ্য বাণী প্রচার করিতে হইবে।

নগরের মোহ

নগরের মোহে ভুলিয়া ধনী দরিদ্র সকলে গ্রাম শূন্য করিয়া আসিতেছে। রাক্ষসীর মত স্বাস্থ্যহীন গ্রামনগরগুলি দেশের জনগণকে মায়ায় ভুলাইয়া দিন দিন ক্ষীণ করিয়া আয়ুহীন করিতেছে। তাহা ছাড়া কোন ব্যবসাকে কেন্দ্র করিয়া কুলী মজুরদের নগর নানা স্থানে গড়িয়া উঠিতেছে। এই কুলী মজুরদের বাসস্থানগুলি প্রায়ই অস্বাস্থ্যকর। সেখানে নগর জীবনের সব মলিনতা, পঙ্কিলতা, পাপ জমা হইতেছে। মদের দোকান ও গণিকালয়ে ভরিয়া যাইতেছে। পল্লীগ্রামের নির্ম্মল বায়ু, নীল আকাশ, পল্লীগ্রামের সরল শান্ত পারিবারিক জীবন সেখানে নাই।

গ্রামে ফিরিবার বাধা

কিন্তু, গ্রামে ফিরিয়া চল, বলিলেই ত লোকে আর গ্রামে ফিরিয়া যাইতে চায় না। গ্রামে আর সুখ নাই, শ্রী নাই, শান্তি নাই। লক্ষ্মী গ্রাম ছাড়িয়া নগরের পাষাণমন্দিরে আসিয়া প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। বাংলার যে গ্রাম আগে সুখ শান্তির নীড় ছিল, যে গ্রাম আগে শক্তি স্বাস্থ্যের নিকেতন ছিল, তাহা আজ দুঃখ মৃত্যুর শ্মশানভূমি। জীর্ণ ভগ্ন গ্রামগুলিতে শীর্ণ শক্তিহীন নরনারী—বুভুক্ষিত, রোগাক্রান্ত, ও দুঃখাকুল। বাংলার গ্রাম বলিতে যে ছবি চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে, তাহা মোটেই সুখের শান্তির নয়। সেখানে দুঃখ দারিদ্র্য কোনমতই দূর হইতেছে না,—ম্যালেরিয়া কলেরা রোগগুলি তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। তার পরে জমিদারের অত্যাচার, গ্রামের দলাদলি, সঙ্কীর্ণতা, অনাচার অবিচার! সেখানে মন কিছুতেই যাইতে চায় না।

কিন্তু চিরদিন বাংলার এ দুরবস্থা ছিল না। সে সত্যই সুজলা সুফলা সোণার বাংলা ছিল। তাহার গ্রামে গোলাভরা ধান থাকিত। গোঠে গোঠে সুস্থ ধেনুর দল ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহাদের ক্ষীর সর দুগ্ধে গ্রামের বালক বালিকা বৃদ্ধ বৃদ্ধা পুষ্ট হইত। তখন তাহার পুকুরের জল সুধার মত মিষ্ট ছিল, বাগানের শাক সবজী ফলে কি অমৃতময় স্বাদ। সেই ম্যালেরিয়াশূন্য, ব্যাধিশূন্য বাংলা,—সেই স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধি-বলসম্পন্ন, শ্রী-শান্তি-আনন্দভরা বাংলা কি স্বপ্নের থাকিবে? তাহা কি সত্য হইবে না? আজ যদি বাংলার শিক্ষিত ধনী সমাজ সত্যই ইচ্ছা করেন, আজ যদি বাংলার যুবক ও নেতৃগণ সত্যই প্রতিজ্ঞা করেন, তবে এই কান্নার বাংলা আবার হাসিবে,—এ নির্জ্জীব দেশে আনন্দের বন্যা আসিবে। বাংলাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে, প্রথমে বাংলার পল্লী-সংস্কার করিতে হইবে। পল্লীস্বাস্থ্য প্রধান সমস্যা।

সোণার বাংলা

বাংলার অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। শতকরা প্রায় ৮০ জনের কাজ চাষ। সমস্ত বঙ্গদেশে ৩ কোটি চাষা আছে। এই কৃষককুলই সমস্ত জাতির মেরুদণ্ড। পল্লীগ্রামে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে জ্বরে প্রতি মিলিমিটারে গড়ে ২০.৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আর ঐ বৎসর পাঞ্চবার্ষিক মৃত্যুর গড় বার্ষিক হার ছিল ২২.৮। যেখানে এক একজন করিয়া লোক মরে, সেখানে অন্ততঃ পাঁচজন সেই রোগে ভোগে। ম্যালেরিয়া জ্বরের পক্ষে এ কথাটি খুব সত্য। কত লোকে যে জ্বরে কষ্ট পায়, তাহার কোন খবর পাওয়া যায় না। বাংলার গ্রামে অক্টোবর হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মৃত্যুর হার বেশী থাকে। সেই সময় গ্রামের প্রায় সকলেই একবার না একবার জ্বরে ভোগে। কয়েক বৎসর ধরিয়া ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া লোকে যদিই বা বাঁচিয়া যায় তথাপি ম্যালেরিয়া তাহার দেহটি চির-

কৃষকের অবস্থা

দিনের জন্য ভাঙ্গিয়া দিয়া যায়। তাহার প্লীহা বড় হইয়া উঠে, অজীর্ণ রোগ হয়। ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া রোগী টিকিয়া থাকে বটে, কিন্তু পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন বা কোন কর্ম্মক্ষম হয় না। আজ সমস্ত বাংলার পল্লীসমাজ কোনরূপে টিকিয়া আছে, সমস্ত বাংলার কৃষকসম্প্রদায় কোনরূপে বাঁচিয়া ঘানির বলদের মত দিনের পর দিন দুঃসহ জীবনের ভার টানিয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কর্ম্মক্ষমতা দিন দিন কমিয়া আসিতেছে,—তাহাদের মনের তেজ চলিয়া যাইতেছে, তাহাদের পুত্রকন্যাগণও শক্তি-আনন্দহীন হইতেছে। বাংলার কৃষকেরা সমস্ত বৎসরে যাহা উপার্জ্জন করে, বাংলা যদি ম্যালেরিয়া-শূন্য হইত, তবে তাহারা তাহার দ্বিগুণ উপার্জ্জন করিতে পারিত।

আর একটি কথা ভাবিতে হইবে। বাংলার প্রতি এক লক্ষ পুরুষের মধ্যে ৭১,৫০০ জন লোকের ৩০ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যু হয়; ৮৫,০০০ লোক ৪০ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই মারা যায়; আর ৯৩,০০০ লোক ৫০ বৎসর পরে হইবার পূর্ব্বেই মরে। আর শিশু-মৃত্যুর কথা অতি ভীষণ।

দেশ যত দিন এইরূপ ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত ও ব্যাধিসঙ্কুল থাকিবে, তত দিন তাহার উন্নতি কিরূপে সম্ভব। জাতি গঠন করিতে হইলে প্রথমে জাতির স্বাস্থ্যের কথা ভাবা দরকার।

এই দুর্গতির মূল কারণ প্রধানতঃ তিনটি,—অজ্ঞতা, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস ও দারিদ্র্য। এই অজ্ঞতা দূর করিতে হইবে; প্রতি গ্রামবাসীকে আত্মনির্ভরশীল, আত্মশক্তিতে বলীয়ান করিতে হইবে। আর দারিদ্র্য দূর না হইলে কখনও জাতীয় স্বাস্থ্য গঠিত হইবে না।

দুর্গতির কারণ

যে নবীন যুবকেরা দেশহিতৈষিতায় প্রণোদিত হইয়া পল্লীসেবা, পল্লীসংস্কার করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহারাই যথার্থ জাতীয় জীবনের

পল্লী-সেবকের পথে বাধা

পুনরুত্থানের ঠিক পথ ধরিয়াছেন। কিন্তু এ পথ সঙ্কট-সঙ্কুল, বহু দুঃখবিঘ্নময়। পল্লীতে কাজ করিতে যাইবার পূর্ব্বে কতকগুলি জিনিষ ভালো করিয়া বুঝিয়া যাইতে হইবে। পল্লীর সংস্কার করিতে বহু বিপত্তি, বহু কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। তাঁহারা আশায় মাতিয়া হয় ত ভাবিতেছেন, আমরা পল্লীতে যাইলেই সকলে আমাদের আদর করিয়া গ্রহণ করিবে, আমাদের কার্য্যে যোগ দিবে। আমরা যা বুঝাইতে চাহিব, তাহা আগ্রহের সহিত শুনিতে আসিবে। কিন্তু বাংলার পল্লীতে কেবল ধনের অন্নের দুর্ভিক্ষ হয় নাই,—সেখানে প্রাণেরও দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। সেখানে একদিকে অজ্ঞতার অন্ধকার, অপরদিকে স্বার্থান্বেষী দরিদ্র গ্রামবাসীদের নীচ সঙ্কীর্ণতা ও দলাদলি। গ্রামের অর্দ্ধশিক্ষিত সমাজ গ্রামের উন্নতিতে যোগ না দিয়া বাধাই দিবে। যাহারা যোগ দিবে, তাহারা, নিজের স্বার্থ কিরূপে পূরণ হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে। আর কৃষকগণ এই ইংরাজী-শিক্ষিত সহরের বাবু যুবকগণকে বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে না। প্রথমেই তাহাদের মনে সন্দেহ ও শঙ্কা জন্মিবে। এতদিন যে শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের দিকে চাহিয়াও দেখে নাই, কেবল তাহাদের অর্থ শোষণ করিয়াছে, আজ তাহারা হঠাৎ কেন তাহাদের দ্বারে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতেছে? নিশ্চয় তাহাদের কোন মৎলব আছে। তার পর নানাবিধ সামাজিক কুসংস্কারের বাধা আছে। মেয়েলী শাস্ত্রের, মনগড়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কত অস্বাস্থ্যকর আচার, কত অন্যায় প্রথা চলিতেছে। তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিলেই শুধু গ্রামের বৃদ্ধেরা নয়, নারীরাও যুবকদের কথায় কর্ণপাতও করিবেন না। কিন্তু গ্রামের নারীদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব বুঝাইতে না পারিলে সবই পণ্ডশ্রম। তাঁহারাই গৃহের কর্ত্রী,—পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ভালো রাখা তাঁহাদের উপরই নির্ভর করে। কিন্তু, যে পুকুরে বাসন মাজা হয়, স্নান করা হয়, সে পুকুর হইতে যে রাঁধিবার, খাবার জল লওয়া উচিত নয়, এ সহজ কথা একটি গ্রাম্য নারীকে বুঝাইতে কম বেগ পাইতে হইবে না। পুকুরে ছোট ছেলেমেয়েদের মল-দূষিত কাপড় কাচা অন্যায়; কলেরা বসন্ত হইলে রোগীর কাপড়-জামা পুকুরের ঘাটে গিয়া কাচিলে সমস্ত গ্রামের স্বাস্থ্যের হানি হইবে,—এ সব বোঝাইতে বহু কষ্ট পাইতে হইবে। আবার অনেক পল্লীরমণী এ সকল কথা সহজেই বুঝিবেন; অস্বাস্থ্যকর কাজ করা যে অন্যায় তাহা শতবার মানিয়া লইবেন; পরের ঘরে গিয়া বক্তৃতাও দিয়া আসিবেন, কিন্তু চিরজন্মগত অভ্যাস ছাড়িবেন না। এই কদাচার দূর করা মহা সমস্যার ব্যাপার।

গ্রামে গিয়া প্রথম কাজ করিতে হইবে, স্বাস্থ্যের বাণী প্রচার। দেহের সচেতনতা, জাগরণ না হইলে মনের জাগরণ হইবে না। দেহ পুষ্ট, বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যসম্পন্ন না হইলে, প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যাইবে না। এই স্বাস্থ্যের কথার প্রচার নানা উপায়ে করিতে হইবে। প্রথমতঃ বক্তৃতা দিয়া, শরীরতত্ত্ব বোঝাইয়া, যে পরিবারে শিক্ষিতা রমণী আছেন, তাঁদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পুস্তিকা বিবরণ করিতে হইবে। হাটের দিন গ্রামের অনেক লোক হাটে জমা হয়; কোন পার্ব্বণে বা উৎসবের সময় মেলায় অনেক শ্রোতা মিলিতে পারে। এই হাটের জায়গায় বা মেলায় বক্তৃতার আয়োজন করিতে হইবে। বক্তৃতা যাহাতে মনোরম ও মন-ভুলানো হয়, তাহার জন্য ছবি দেখানো, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সঙ্গীতও হইতে পারে। তার পর কোন পূজা উপলক্ষে গ্রামবাসীর ছুটি থাকিলে, সন্ধ্যার সময় ম্যাজিক লণ্ঠন দিয়া ছবি দেখানো,—কথকতার মত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গল্প বলা,—সরল শরীরতত্ত্ব বায়স্কোপের ফিলিম তুলিয়া দেখানো—ইত্যাদি নানা উপায়ে স্বাস্থ্যের কথা বলা যাইতে পারে। একই কথা দিনের পর দিন বার বার বলিলে ধীরে ধীরে সকলের মনে লাগিবে। গ্রামে যাহারা স্বাস্থ্যের নিয়ম না মানিয়া মরিতেছে, তাহাদের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সকলকে সচেতন করিতে হইবে। কেহ যদি না

স্বাস্থ্য-বাণী প্রচার

শোনে, নিরাশ হইলে চলিবে না। বিদ্রূপ করে, ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে হইবে।

কেবল স্বাস্থ্যের কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। সকলে যাহাতে স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নিয়ম পালন করা না করার উপর জোর চলে না,—রাজা আইন করিয়াও বিশেষ ফললাভ করিতে পারেন না। উপদেশ রূপে বলিলে কিছু হইবে না, অনুরোধ করিতে হইবে। বলিতে হইবে, আচ্ছা, একবার এই প্রকারে জীবনটাকে একটু বদলাইয়া, এই আচারগুলি ছাড়িয়া কিছুদিন দেখুন না, কোন ফল পান কি না। তার পর যাঁহারা স্বাস্থ্যের নিয়ম কিছুদিন পালন করিয়া ফল পাইবেন, তাঁহাদের সৎ দৃষ্টান্ত সমস্ত গ্রামবাসীর সম্মুখে ধরিয়া দিতে হইবে। আমাদের দেশের চাষারা লেখাপড়া না জানিলেও বোকা নয়। মানুষের স্বভাবই—যা প্রথা, যা বংশের পর বংশ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহা সহজে বদলাইতে চায় না। কিন্তু যদি একবার সে বোঝে এই প্রথা ছাড়িলে তাহার মঙ্গল, তাহা হইলে, সেই প্রথা ছাড়িতে সে একটু দ্বিধা করিলেও, একটু জোর করিলেই ছাড়ে। কৃষকেরা যদি একবার বোঝে, এই নিয়মগুলি পালন করিলে তাহাদের ভালো হইবে, তাহারা সেগুলি পালন করিতে কখনও দ্বিধা বোধ করিবে না। কিন্তু এই বোঝানই কঠিন কাজ।

কথার চেয়ে কাজ করিয়া বোঝানই সহজ ও ফলপ্রদ। সুতরাং পল্লীসংস্কারকগণের মধ্যে কেবল বক্তা বা প্রচারক থাকিলে চলিবে না, ডাক্তার বা সেবকও দরকার। কোন গৃহস্থের বা কৃষকের গৃহে রোগ হইলে, সেখানে গিয়া চিকিৎসা করা,—সেবা করিয়া, কিরূপে রোগীর সেবা করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দেওয়া; যখন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইবে, তখন প্রতি গৃহে গিয়া, কিরূপে সংক্রামক রোগের হাত এড়ানো যায়, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া; যে বাড়ীতে সংক্রামক রোগ হইয়াছে, সেখান হইতে যাহাতে রোগ আর ছড়াইয়া পড়িতে না পারে, তাহার রীতিমত চেষ্টা করা,—ইত্যাদি নানা উপায়ে, গ্রামের লোকদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া, তাহাদের সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া, তাহাদের অন্তরের প্রীতি ও বিশ্বাস লাভ করিতে হইবে।

কেবল বক্তৃতা দিয়া বা সেবা করিয়া পল্লীর স্বাস্থ্যের উন্নতি অসম্ভব। বাহির হইতে কেহ মুক্তি দিতে পারে না, নিজে স্বরাট্ না হইলে স্বরাজ লাভ করিয়াও মানুষের দাসত্ব-শৃঙ্খল ঘুচিবে না। পথ দেখাইয়া দেওয়া যায়; কিন্তু পথিক নিজে না চলিলে, গম্য স্থানে কে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিতে পারে? পল্লীর সংস্কারকের কাজ কেবল প্রচারের কাজ বা শিক্ষাদানের কাজ নয়, তাহা পল্লীবাসীদিগকে জাগাইয়া দেওয়া। তাহারা যে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া দীন মূঢ়ের মত বসিয়া আছে; নিজের পায়ে না দাঁড়াইলে এ ধ্বংসের মুখ হইতে কেহ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আপন দুর্গতি হইতে রক্ষা করা আপনাদের হাতে। সমস্ত পল্লীবাসীকে এই ভাবে উদ্বোধিত করিয়া দিতে হইবে।

স্বরাট্ হইতে হইবে

পল্লীবাসিগণকে লইয়া কয়েকটি সমিতি বা দল গঠিত করিতে হইবে।

প্রথমতঃ গ্রামের ছেলেদের লইয়া একটি দল গড়া যাইতে পারে। পাঠশালার গুরু মহাশয় সে দলের কর্ত্তা হইতে পারেন। বয়-স্কাউটদের মত তাহাদিগকে লইয়া কতকগুলি নিয়ম অনুসারে দল গড়িয়া আপন আপন দেহ ও মনের উন্নতি এবং গ্রামের হিতকর কার্য্য করিতে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। তাহারা মাঝে মাঝে দল বাধিয়া গ্রামের পথে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গান গাহিতে পারে, বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া চাঁদা তুলিতে পারে। দলের প্রত্যেক বালক যদি নিজে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান হয়, ও নিজ গৃহে যাহাতে স্বাস্থ্যের নিয়ম পালা হয় তাহার চেষ্টা করে, তাহা হইলে যথেষ্ট।

ছেলেদের দল

বয়স্ক যুবকদের লইয়া একটি সঙ্ঘ তৈরী করিতে হইবে। তাহাদের কাজ—গ্রামবাসীগণকে সর্ব্বদা গ্রামের মঙ্গল সম্বন্ধে সচেতন রাখা। এই যুবক-সঙ্ঘ নিজ নিজ জীবনের উন্নতি ত করিবেই; তা ছাড়া নৈশ বিদ্যালয় বা কৃষক ছেলেদের অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করা ও পরিচালনা করা,—গ্রামের দলপতি বা বৃদ্ধগণকে বুঝাইয়া, সামাজিক বাধা দূর করিয়া, যাহাতে গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করা,—কৃষকদের সমবায়-সমিতি (Co-operative Society) সম্বন্ধে বোঝানো ও প্রতিষ্ঠিত করা—ইত্যাদি নানা কাজ করিতে হইবে। দেশকে নাড়া দেওয়া, ঠেলিয়া জাগাইয়া তোলার ভার চিরকাল দেশের যুবকদের উপরই আছে। বিশ্ববিধাতা যে যৌবনকে প্রাণযুক্ত, স্বপ্নমুগ্ধ ও শক্তিমান করিয়াছেন, তাহা যেন ব্যর্থ না হয়। দেহের উৎকর্ষ সাধনের জন্য ব্যায়ামাগার বা আকড়া স্থাপন করাও চাই।

যুবক-সঙ্ঘ

তার পর নারীদের লইয়া একটি সমিতি গড়িতে হইবে। এ কাজ অতি সুকঠিন। লেখাপড়া না জানায়, ও অবরোধ প্রথার জন্য, গ্রামের সকল নারীশক্তিকে সম্মিলিত করা শক্ত। হাসিলে চলিবে না। সমিতি বলিলেই আমরা যেন ইয়োরোপের সোসাইটি না বুঝি। সেরূপ সমিতি আমরা চাই না। অথবা দেশের কাজের নাম করিয়া আপনার নামের ডঙ্কা বাজাইতে যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যেরূপ সমিতি আছে, সে সমিতিরও আমাদের দরকার নাই। কেবল বড় বড় সভা হইবে, ও লম্বা লম্বা রিপোর্ট পাঠ হইবে, খবরের কাগজে সেক্রেটারী ও সভ্যদের বহু প্রশংসা বাহির হইবে—এরূপ সমিতিতে কাজ নাই। সমিতি মানে সকলে মিলিয়া কাজ করিবার দল। প্রতি গ্রামের কয়েকজন দেশহিতাকাঙ্ক্ষিণী স্বার্থশূন্য নারী পাওয়া যাইবে, যাঁহারা পরের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এইরূপ নারীই সমিতির প্রাণস্বরূপ হইবেন। তাঁহারা প্রতি গৃহে গিয়া বা মাঝে মাঝে কোন বড় বাড়ীতে নারীদের সভা করিয়া আপন ভগিনীদিগকে স্বাস্থ্যের কথা বুঝাইবেন। প্রতি গ্রামে যদি একটি ধাত্রী বা মেয়ে-ডাক্তার রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে, ত খুবই ভাল হয়। গ্রামের সকলে মিলিয়া সামান্য চাঁদা দিয়া তাহাকে রাখিয়া দিতে পারেন। ভাল একটি ধাত্রী গ্রামে থাকিলে শিশু মৃত্যু অনেক কমিয়া যাইবে। আঁতুড় ঘর কিরূপ হওয়া উচিত, অন্তঃস্বত্বাকে কিরূপ যত্নে, পথ্যে রাখা দরকার, শিশু জন্মিবার পরে তাহার আহার, পালন ইত্যাদি গ্রামের মেয়েদের বুঝাইয়া দিতে পারিলে, বাংলা দেশে এই বৎসরের পর বৎসর শিশুহত্যা কমিয়া যায়। বাঙ্গালী মায়ের মত কোন্ দেশের মাতা শিশুদের এমন প্রাণ ভরিয়া ভালবাসেন? কিন্তু বাঙ্গালী মাতাদের অজ্ঞতা বশতঃ শিশু-মৃত্যুর হার বাড়িয়া যাইতেছে।

নারী-সমিতি

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পল্লীর উন্নতি বাহিরের লোক যাইয়া করিতে পারিবে না। গ্রামের লোকেরাই নিজেদের উন্নতি করিতে সক্ষম। তাঁহারা নিজের ভার নিজে না লইলে এ কার্য্য অসম্ভব। এই পল্লীর স্বাস্থ্য-উন্নতির প্রশস্ত উপায় সমবায়-সমিতি গঠন। প্রতি গ্রামে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত গৃহস্থগণ প্রথমে সমবায় সমিতি গঠন করিয়া কার্য্য করিয়া তাহার উপকারিতা সকলকে সাক্ষাৎ দেখাইবেন। তার পর ধীরে ধীরে গ্রামের অপর সকলেও সে সমিতিতে যোগ দিবে। কৃষককুলকে বাদ দিলে চলিবে না। ভদ্র গ্রামবাসীরা যদি কৃষক-দিগকে আপন সমিতিতে লইতে পারেন ত ভালই। যদি না পারেন, তবে তাঁহাদের অন্য সমিতি গড়িয়া দিবেন। গ্রামের দলপতিরা মিলিয়া মিশিয়া এই সমিতি গুলি চালাইলে, শীঘ্রই গ্রামের শ্রীসমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিবে। বস্তুতঃ গ্রামের উন্নতির পথে প্রধান বাধাগুলি কেবল অজ্ঞানতা ও চেষ্টাহীনতা নয়;—তাহা অর্থের অভাব। এই অর্থাভাব সমবায় সমিতি গঠন করিলে অনেক পরিমাণে দূর হইবে। তার পর গ্রামের যে বাসিন্দারা সহরে গিয়া অর্থশালী হইয়াছে, পৈত্রিক

সমবায় সমিতি

ভিটার দোহাই দিয়া তাহাদের নিকট হইতেও কিছু কিছু অর্থ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু গ্রামবাসীগণ নিজেরা প্রথমে অর্থসংগ্রহ না করিলে কেহ এক কপর্দ্দকও দিতে চাহিবে না।

শ্রীপ্রভাস চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের মত

এই সমবায় সমিতি সম্বন্ধে কিছুকাল পূর্ব্বে মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র, সি আই-ই মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

জনসাধারণ যদি সমবেত ভাবে কাজ করে, এবং পরস্পরের চেষ্টায় সহায়তা করে, তাহারা সকলেই যদি চাকা চালাইয়া দিবার জন্য কাঁধ দেয়, সকলেই যদি নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে, যত অল্পই হউক, অর্থ সাহায্য করে, সকলেই যদি সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া উৎসাহের সহিত কাজ করে, তাহা হইলে এই মহা সমস্যারও সমাধান হইতে পারে। সমবায় প্রণালীতে কার্য্য করিতে হইলে অবশ্য কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে; কিন্তু এই ত্যাগ স্বীকারের ফলে অসীম উপকার পাওয়া যাইবে; তবে এই শুভ ফল লাভের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে, এবং গোড়ায় কেবল কাজ করিয়া যাইতে হইবে। তার পর যখন সুসময় আসিবে, এবং সে সময় যে আসিবেই তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, তখন তাহাদের সমবেত চেষ্টার অপরিসীম সুফল দর্শনে লোকে বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইবে। সমবায় প্রণালীকে ভিত্তি স্বরূপ অবলম্বন করিয়া কাজ করিলে, তাহার শক্তি কতখানি তাহা তোমরা দেখিতে পাইবে। তবে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকলকে পরস্পরের মঙ্গল সাধনোদ্দেশ্যে সদ্ভাব-প্রণোদিত হইয়া কাজ করিতে হইবে, এবং ভবিষ্যতের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বর্ত্তমানে কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। কেমন করিয়া তাহা হইবে, সে কথা এইবার আমি একটু বিস্তৃত ভাবে বলিতেছি।

বাঙ্গালা দেশে, যে সকল গ্রামের লোক-সংখ্যা ২ হইতে ৫ হাজার, এমন ১৭৮৫ খানি গ্রাম আছে। এই ১৭৮৫ খানি গ্রামে মোট ৪৮৫৮২৯৯ জন লোক বাস করে। ইহারা ছাড়া, ১৬২টি নগর ও গ্রাম আছে যাহাদের মোট লোক সংখ্যা ১০৮৪৪২২। এই শেষোক্ত গ্রাম-নগরগুলির অনেকগুলিতে মিউনিসিপ্যালিটী আছে, আবার, কতকগুলিতে নাই-ও। শেষোক্ত শ্রেণীর কিঞ্চিৎ অধিক দশ লক্ষ লোক যে সকল গ্রামে বাস করে, সেই সকল গ্রামে মিউনিসিপ্যালিটী নাই। যে সকল গ্রামে ৫০০ হইতে ১০০০, কিম্বা ৫০০র কম লোক বাস করে, সেই সকল গ্রামের অপেক্ষা, যে সকল গ্রামের লোক-সংখ্যা ২ হইতে ১০ হাজার, সেই সকল গ্রামে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ভাল কাজ করা যাইতে পারে। ভাল কাজ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, এ কথা এই জন্য বলিতেছি যে, এরূপ গ্রামে বেশী পরিমাণে বুদ্ধিমান ও সাধারণ কার্য্যে উৎসাহশীল লোক পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু যে সকল গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা কম, সেরূপ গ্রামে ঐ ধরণের লোক স্বভাবতঃই বেশী পাওয়া যাইবে না। অতএব আমার প্রস্তাব এই যে, প্রথমে বড় বড় গ্রাম লইয়া কাজ আরম্ভ করাই সঙ্গত। আমার ইচ্ছা, এইরূপ বেশী লোকের বাস-গ্রামগুলির কয়েকটি বাছিয়া লইয়া চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করি এবং ম্যালেরিয়া নিবারণ কল্পে কো-অপারেটিভ সোসাইটী স্থাপন করি। ধরুন, একখানি গ্রামে ৫০০০ লোকের বাস। আমাদের উদ্দেশ্য রীতিমত প্রচার করিতে পারিলে, দুই এক বৎসরের মধ্যে এমন আন্দাজ দুই শত লোক পাওয়া যাইতে পারে, যাহারা চিকিৎসা কার্য্য এবং ম্যালেরিয়া নিবারণ-মূলক কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে যোগদান করিতে সম্মত হইতে পারে। গোড়ায় সম্ভবতঃ এরূপ লোকের সংখ্যা খুব কমই হইবে। আমি বলি, এইরূপ প্রস্তাবিত কো অপারেটিভ সোসাইটীগুলির সদস্যগণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া লইলে ভাল হয়। মনে করুন, প্রথম শ্রেণীর সদস্যগণ মাসে বার আনা হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা দিতে থাকিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাসিক চাঁদার পরিমাণ হইবে ছয় আনা হইতে আট

আনা; আর তৃতীয় শ্রেণীর চাঁদার হার মাসিক তিন চারি আনার অধিক হইবে না। সদস্যগণের নিকট হইতে মাসে কি পরিমাণে চাঁদা আদায় হইতে পারে, তাহা স্থানীয় অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করিবে। অর্থাৎ, স্থানীয় অবস্থার তারতম্য অনুসারে চাঁদার পরিমাণেরও কম বেশী হইতে পারে। তবে আমি ঐ যে তিন শ্রেণীর চাঁদার পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিলাম, উহা কেবল আলোচনার সুবিধার জন্য। তার পর আমার প্রস্তাব এই যে, প্রথম শ্রেণীর সদস্যগণের বাড়ীতে গিয়া সোসাইটীর ডাক্তারেরা বিনা ভিজিটে চিকিৎসা করিবেন এবং ইঁহারা ঔষধ কেনা দামে পাইবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর সদস্যরা ডাক্তারের বাড়ীতে বিনামূল্যে ব্যবস্থা পাইবেন। তবে তাঁহাদের কাহারও বাড়ীতে কঠিন পীড়া উপস্থিত হইলে কিম্বা বাড়ীর পর্দ্দানশীন মহিলারা পীড়িত হইলে ডাক্তার তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়াই চিকিৎসা করিবেন। তবে এই সুযোগের যাহাতে অপব্যবহার না হয় সেই উদ্দেশ্যে আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, পূর্ব্বোক্তরূপ কারণে ডাক্তার দ্বিতীয় শ্রেণীর সদস্যগণের বাড়ীতে চিকিৎসার্থ গমন করিলে তাঁহারা ডাক্তারকে প্রতি ভিজিটে ৩ কি ৪ আনা হিসাবে নামমাত্র ফী দিবেন। ঔষধ তাঁহারাও কেনা-দামে পাইবেন। তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যগণের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর সদস্যগণের সকল সুবিধাই পাইবেন; তবে তাহা কেবল বৎসরের মধ্যে দুই-তিন মাস মাত্র, —সারা বৎসর নহে। তৃতীয় শ্রেণীর সদস্য পদ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়,—যে সকল লোক গ্রামে বাস করিতে পারেন না, বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে দূরে বাস করেন, অথচ, গ্রামের বাড়ীর সহিত সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্নও করেন নাই, প্রধানতঃ তাঁহাদের জন্যই তৃতীয় শ্রেণীর পদের সৃষ্টি হইল। মাসিক চাঁদা ছাড়া, আমি বলি, সদস্যরা দুই কিস্তীতে ৩ কি ৪ টাকা প্রবেশিকা ফী প্রদান করিবেন। এই প্রবেশিকা ফী-টা সোসাইটীর মূলধন স্বরূপ গণ্য হইবে। তাহা হইলে, ভবিষ্যতে খরচ-খরচা বাদ সোসাইটির যদি লাভ দাঁড়ায়, তবে সদস্যগণ ঐ লাভের অংশ পাইবেন। কিন্তু যদি সদস্যগণ তাঁহাদের দেয় মাসিক চাঁদা দিতে অপারগ হ'ন, তাহা হইলে, তাঁহাদের প্রবেশিকা ফী-টা ডিপজিটের কাজ করিবে, এবং উহা বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে ও তাঁহারা সদস্যপদের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবেন। উপরি উক্ত হিসাব হইতে আমার মনে হয়, দুই এক বৎসর নিয়মিত ভাবে আগ্রহের সহিত কাজ করিলে, মাসে ১৫০ কি ২০০ টাকা আয় নিশ্চয়ই হইতে পারিবে। গোড়ায় হয় ত আয় খুব কমই হইতে পারে, —মাসে ৫০ হইতে ৭৫ টাকার বেশী না হইতে পারে। আমার প্রস্তাব এই যে, মোট আয়ের শতকরা একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ একজন ডাক্তার, তাঁহার কম্পাউণ্ডার প্রভৃতির বেতন বাবদ ব্যয় করা উচিত; এবং শতকরা অপর একটা অংশ ম্যালেরিয়া প্রতিষেধ এবং স্বাস্থ্যরক্ষা কল্পে ব্যয় করিয়া বাকী ১০।১৫ টাকা অসময়ের জন্য সঞ্চয় করা, কিম্বা দৈবাৎ কোন অতিরিক্ত খরচ আসিয়া উপস্থিত হইলে সেই ব্যয় নির্ব্বাহ করা, অথবা গৃহ-নির্ম্মাণার্থ জমাইয়া রাখা যাইতে পারিবে। যাঁহারা সোসাইটীর সদস্য নহেন, এমন লোকদিগের মধ্যে ডাক্তারকে চিকিৎসা-ব্যবসায় চালাইবার অধিকার দিতে হইবে; এবং যাঁহারা সদস্য নহেন, তাঁহারা ঔষধ কিনিতে চাহিলে তাঁহাদিগকে বাজার দরে ঔষধ সরবরাহ করা যাইতে পারে। এই শেষোক্ত উপায়ে সোসাইটীর নিশ্চয়ই কিছু লাভ হইতে পারিবে। ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ এবং স্বাস্থ্যরক্ষা কল্পে যে শতকরা অংশটা স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইবে সেটার দ্বারা (ক) বাড়ীর, বাগানের বা পতিত ভূমির জঙ্গল আগাছা প্রভৃতি পরিষ্কার করা যাইতে পারিবে, এবং জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজটা যাহাতে আর্থিক হিসাবে সফল হয়, অর্থাৎ তদ্দ্বারা যাহাতে কিছু অর্থাগমের সুবিধা হয়, তদুদ্দেশ্যে ঐ সকল পরিষ্কার-করা ভূমিতে উপযুক্তরূপ কোন শস্যের চাষের বন্দোবস্ত করিতে হইবে; (খ) গ্রামের জল নিকাশের ব্যবস্থা করা এবং [illegible] প্রণালী কার্য্যক্ষম

অবস্থায় রক্ষা করা হইবে। (গ) অস্বাস্থ্যকর খানা, ডোবা প্রভৃতি ভরাট করাইতে হইবে; (ঘ) যতদিন না ঐ সকল ছোট পুকুর বা ডোবা ভরাট করিবার উপযুক্ত অর্থ সঞ্চিত হয়, ততদিন কেবল যে সকল ছোট পুকুর, বা নিম্নভূমি (যাহাতে জল সঞ্চিত হইয়া থাকে) প্রভৃতিতে পাট পচানো হয়, সেগুলির জল, পাট পচানোর কাজ শেষ হইয়া যাইবার পর, ছেঁচিয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে কিম্বা রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করিয়া উহাদের অনিষ্টকারিতা নিবারণ করিতে হইবে। (ঙ) চিকিৎসকগণ উপদেশ দিলে অব্যবহার্য্য পুকুরের জল রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে শোধন করিয়া লইয়া উহা ব্যবহার-যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে। (চ) লোকের ব্যবহারের জন্য গরম জলের ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হইবে, এবং কোন কেন্দ্রীয় স্থানে, যথা, ডিস্পেন্সারীতে, অথবা ডাক্তারের বাড়ীতে অপেক্ষাকৃত কম দামের ফিলটার বসাইতে হইবে। (ছ) স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রচার কার্য্য চালাইতে হইবে,—কিরূপে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হয় তাহা লোককে শিক্ষা দিতে হইবে, লোকে যাহাতে স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া চলিতে অভ্যাস করে, এমন ভাবে তাহাদিগকে উপদেশ দিতে হইবে। উপরে আমি যে সকল হিসাবের কথা বলিলাম, তাহাতে, কো-অপারেটিভ সোসাইটীসমূহের কি কি কাজের জন্য শতকরা ঠিক কত টাকা করিয়া ব্যয় করিতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলাম না; কারণ, উহা স্থানীয় অবস্থা, স্থানীয় লোকদের কল্পনা এবং মনের গতিকের উপর নির্ভর করে; যেখানে যেরূপ অবস্থা তাহা বুঝিয়া ব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিতে হইবে; সকল স্থলেই একই নির্দ্দিষ্ট হারে খরচ করিলে চলিবে না। কোন গ্রামে যদি আদৌ কোন উপযুক্ত চিকিৎসক না থাকেন, তবে বাহির হইতে চিকিৎসক আনয়ন করিতে হইবে। সেই গ্রামের জন্য (সেখানকার কো-অপারেটিভ সোসাইটীর মাসিক আয় আন্দাজ ১০০ টাকা ধরিয়া লইয়া) আমি প্রস্তাব করি যে, ডাক্তারের বেতন বাবদ শতকরা ৪৫ টাকা আলাদা করিয়া রাখা যাইতে পারে। এই ডাক্তার চিকিৎসা কার্য্য ছাড়া আরও একটী কার্য্য করিতে পারিবেন,—সোসাইটীর সেক্রেটারীর কাজও চালাইতে পারিবেন। তার পর ঐ গ্রামের কম্পাউণ্ডারের বেতন শতকরা ১০ টাকা ধরা যাইতে পারে। তিনি কম্পাউণ্ডারী ছাড়া, সোসাইটীর মোহরের কাজও চালাইয়া লইতে পারিবেন। সদস্যগণের নিকট হইতে ঔষধের যে দাম পাওয়া যাইবে, তাহাতে যদি ডিস্পেন্সারীর খরচ না কুলাইতে পারা যায়, তবে অতিরিক্ত খরচটার জন্য শতকরা ৫ টাকা রাখা যাইতে পারিবে। অবশিষ্ট ৪০ টাকার ভিতর হইতে, ম্যালেরিয়া নিবারণ এবং স্বাস্থ্যরক্ষা কল্পে ২৫ টাকা রাখিয়া বাকী ১৫ টাকা অসময়ের জন্য সঞ্চয়, সিংকিং ফাণ্ড ও বিল্‌ডিং ফাণ্ড বাবদে রাখা যাইতে পারে। আমি এরূপ ব্যবস্থা করারও পক্ষপাতী যে, কো-অপারেটিভ সোসাইটী দানশীল ভদ্রলোকগণের নিকট হইতে এককালীন দান, অথবা মাসিক নিয়মিত চাঁদা, কিম্বা গবর্ণমেণ্ট অথবা লোক্যাল বোর্ড প্রভৃতি হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণের অধিকার পাইবেন। সদস্যগণের নিকট হইতে প্রবেশিকা ফী বাবদ হয় ত ৪০০ কি ৫০০ টাকা আদায়ের আশা করা যাইতে পারে। ঐ ৪।৫ শত টাকায় ছোট-খাট একটী ডিস্পেন্সারী স্থাপন করা যাইতে পারিবে। কোন সোসাইটী যদি গোড়াতেই যথেষ্ট সংখ্যক সদস্য না পায়, তবে সেই সোসাইটী ২।৩ শত টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে; পরে সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঋণের টাকা ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করা যাইতে পারিবে। যতদিন না ঋণ পরিশোধ হইয়া উঠে, ততদিন শেষোক্ত শতকরা ১৫ টাকার ভিতর হইতে ঐ ঋণের টাকার সুদ দেওয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু যদি সদস্য সংখ্যা আশানুরূপ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া না যায়, তাহা হইলে ঋণের কতক অংশ সিংকিং ফাণ্ডের টাকা হইতে ধীরে ধীরে পরিশোধ করিতে পারা যাইবে। এরূপ স্থলে হয় ত স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যয় এবং ডাক্তারের বেতন কিছু কমাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে।

যে সকল গ্রামে উপযুক্ত ডাক্তার আছেন, সেই সকল গ্রামের সম্বন্ধে আমার প্রস্তাব এই যে, স্থানীয় ডাক্তারকেই সোসাইটীর কার্য্যে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, মোট আয়ের শতকরা ২৫ টাকা ডাক্তারকে বেতন বলিয়া দিলেই চলিবে; কারণ, তথায় তাঁহার প্রাইভেট প্র্যাকটিসও বজায় থাকিবে। অবশ্য সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ ডাক্তারের প্রাইভেট প্র্যাকটিস কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাহাতে ডাক্তারের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। তিনি আয়ের একটা শতকরা অংশ পাইবেন; সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে সোসাইটীর আয় বৃদ্ধি হইবে; কাজেই ডাক্তারের বেতনও বাড়িয়া যাইবে। এই সকল সোসাইটীর জন্য আমি কতকগুলি নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তুত করিয়াছি। যদি কেহ সোসাইটী স্থাপনে উৎসাহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে আনন্দের সহিত ঐ সকল খসড়া নিয়মাবলীর নকল দিতে প্রস্তুত আছি। এই নিয়মাবলীর আলোচনা করিয়া, স্থানীয় অবস্থা বিবেচনায়, উহাদের সংশোধন করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

* * * *

বর্ত্তমান কালে বঙ্গদেশে মোটে ৩০০০ রেজিষ্ট্রীভুক্ত চিকিৎসক আছেন। এ সকল চিকিৎসকের অধিকাংশই মিউনিসিপ্যাল সহরে বাস করেন। আর, ঐ সকল মিউনিসিপ্যাল নগরের লোক সংখ্যা (সমগ্র পল্লীভূমির ৪৫০০০০০০ লোকের মধ্যে) ৩০০০০০০০। আমি যদি অনুমান করি যে, ঐ ৩০০০ চিকিৎসকের মধ্যে ২০০০ লোক মিউনিসিপ্যাল সীমার মধ্যে থাকিয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় চালাইয়া থাকেন, তাহা হইলে, প্রকৃত অবস্থা হইতে আমার অনুমান বোধ হয় বেশী দূরে গিয়া পড়িবে না। অতএব আমরা দেখিতেছি, মফঃস্বলের ৪২০০০০০০ লোকের চিকিৎসা কার্য্যের জন্য মাত্র ১০০০ পাশ-করা ডাক্তার আছেন। ইয়োরোপীয় দেশসমূহে প্রতি হাজার কি ১২০০ লোকের জন্য এক একজন চিকিৎসক আছেন। অবশ্য ইয়োরোপীয় দেশগুলি বাঙ্গালা দেশের অপেক্ষা অনেক বেশী ধনী তাহা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু বঙ্গদেশ ইয়োরোপের যে কোন দেশের অপেক্ষা বহুগুণে অস্বাস্থ্যকর। উপরে উল্লিখিত অঙ্কগুলি হইতে আপনারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন, বঙ্গদেশের মফস্বলগুলিতে পাশ-করা ডাক্তারের অভাব কত বেশী। আমাদের দেশের লোকের আপেক্ষিক দারিদ্র্য, এবং ইয়োরোপীয় দেশসমূহের তুলনায় আমাদের দেশের অধিকতর অস্বাস্থ্যকর অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া, আমরা যদি প্রতি তিন হাজার অধিবাসীর জন্য একজন মাত্র ডাক্তারের ব্যবস্থা করিতে চাই, তাহা হইলেও কেবল বঙ্গের পল্লীসমূহের জন্যই ১৪০০০ ডাক্তার চাই। তন্মধ্যে উপরের হিসাব অনুসারে মফঃস্বলে এখন ১০০০ ডাক্তার আছেন; সুতরাং এখনও আমাদের আরও ১৩০০০ হাজার ডাক্তারের অভাব রহিয়াছে।

অপর একটা পরোক্ষ উপকার এই হইবে যে, মফস্বলে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকের কিছু কিছু আমদানী হইবে। আপাততঃ বাঙ্গালার পল্লীগ্রামসমূহে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক নাই বলিলেই চলে। বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রদেশে গ্র্যাজুয়েট সংখ্যা ১৩০০০ এবং ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তির সংখ্যা ৮০ কি ৯০ হাজার। গ্র্যাজুয়েটরা এবং ম্যাট্রিকুলেশন পাশ-করা যুবকেরা প্রায়ই কোন মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকায় বাস করিয়া কোন না কোন রকমে জীবিকা অর্জ্জনের পন্থানুসন্ধান করেন। এবং প্রায়ই কোনরূপ লেখাপড়ার কাজ বা কেরাণীগিরি জুটাইয়া লইয়া থাকেন। ইহার ফলে স্বভাবতঃ তাঁহাদের অবলম্বিত জীবিকার্জ্জনের ক্ষেত্রে লোক-বাহুল্য ঘটিয়া থাকে; এই জন্য অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মধ্যম শ্রেণীর লোকের পক্ষে জীবিকা অর্জ্জন করা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিতেছে। ইহার আর একটা অর্থ এই যে, যে পল্লীগ্রাম জাতীয় ধন উৎপাদনের মূল ক্ষেত্র, যেখানে জাতির মেরুদণ্ড বাস করে, যেখানে জাতীয় উন্নতির সকল মূল উপাদান পাওয়া যাইতে পারে, সেই পল্লীভূমিই

সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকশূন্য হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালার পল্লীভূমিতে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী লোকদিগের জন্য জীবিকা অর্জ্জনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই এখন বাঙ্গালার প্রধান প্রয়োজন। গ্রামে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়াইতে না পরিলে লোকসমূহের স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন, কৃষির উন্নতি সাধন, শিক্ষার বিস্তৃতি সাধন, লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন—এইরূপ কোন কাজই সম্ভবপর হইবে না। বহু পরিমাণে ডাক্তার আনিয়া গ্রামসমূহে বাস করাইতে পারিলে, কেবল যে সমাজের একটা প্রয়োজন সাধিত হইবে তাহা নহে; এই উপায়ে গ্রাম অঞ্চলে অনেক চলনসই গোছের শিক্ষিত ও চতুর লোকের অন্নসংস্থানও করা হইবে। এই শ্রেণীর লোক গ্রামে গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করিলে, বাঙ্গালার অনেক সমস্যার সমাধানে প্রচুর পরিমাণে সহায়তা করিবে। আবার এ কথাও সকলে জানেন যে, বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালা দেশের অল্পবিত্ত মধ্যম শ্রেণীর লোকদের অন্ন-সমস্যা একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্য সকল উপকারের কথা ছাড়িয়া দিলেও কেবল এই উপকারটিও বড় সামান্য নহে।

দেশের গ্রামগুলি যত দিন না সুখ-স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইতেছে, তত দিন নগরে নগরে আমরা যতই সভা করি ও যতই বক্তৃতা দিই, কাগজে কাগজে আমরা রাগিয়া যতই লিখি ও সহযোগিতা বর্জ্জনের ভয় দেখাই, ফল বিশেষ কিছু হইবে না। বাংলার পল্লীর জাগরণ না হইলে বাংলার জাগরণ হইবে না। এই পল্লীই বাংলার সত্যিকার রূপ। এই পল্লীমা-ই বাংলার সত্যিকার মা। সহরগুলি যেন রূপকথার রাক্ষসী রাণী সমুদ্র পার হইতে রূপসী সাজিয়া আসিয়াছে,—সমস্ত দেশের রক্ত শোষণ করিয়া আপন দেশে পাঠাইতেছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের নরহত্যার কথা শুনিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি, কিন্তু আমরা ভাবি না, বাংলার গ্রামে গ্রামে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ নরনারী অর্দ্ধাশনে রহিয়াছে। এই দারিদ্র্য আমাদের সহিয়া গিয়াছে। এই প্রতিদিন আধপেটা খাইয়া থাকা আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা এই দুর্গতি এই নির্জ্জীবতার বোধও হারাইয়াছি। বাংলার কত লোক যে কেবল শরীরের যথোচিত পুষ্টির অভাবে রোগাক্রান্ত হইয়া মরে, তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। আর যাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায়, তাহারা এমন সব ভেজাল বা বাজে খাবার খায় যে, তাহাদের উদরের গহ্বর ভরে বটে—কিন্তু দেহের পুষ্টি কিছু হয় না, মনের তেজ বাড়ে না। যাঁহারা দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তাহাদের বাসগৃহ, অশন-বসনের অবস্থা কিরূপ, তাহা ভাবিয়াই লওয়া যায়। যাহারা আপন ছেলেদের রোগ হইলে টাকার অভাবে ডাক্তার ডাকিতে বা ঔষধ কিনিতে পারে না, তাহাদের দিন কিরূপে কাটে! আজ বাংলার গ্রামে গ্রামে এইরূপ অবস্থার লোকের সংখ্যা বড় কম নয়। ইহাদের কাছে স্বাস্থ্যের, শক্তির, আশার বাণী বলিলে, তাহারা হাসিয়া বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিবে, অথবা চোখের জলে ভাসিবে। আজ বাংলার যে তরুণ যুবকেরা গ্রামের কাজে যাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আপন জীবনী-শক্তি দিয়া এই নির্জ্জীবদের সঞ্জীবিত করিতে হইবে। তবে লোকের মনে আশার সঞ্চার হইবে।

পল্লীমা-ই সত্যিকার দেশমাতা

পল্লীতে পল্লীতে স্বরাজ না হইলে, দেশে কোন কালে সত্যিকার স্বরাজ আসিবে না। এই পল্লী-স্বরাজ স্বপ্নের কথা নয়। চিরকাল ভারতবর্ষে ইহা ছিল। আমাদের দেশে ইয়োরোপের ডিমক্রেসি বা পার্লামেণ্ট ছিল না বটে, কিন্তু আমাদের পল্লীতে পল্লীতে চিরকাল স্বাধীনতা ছিল। হিন্দু, পাঠান, মোগল,—কত রাজা-সম্রাজ্য স্বপ্নের মত মিলাইয়া গেল; কিন্তু ভারতে পল্লীজীবনে স্বাধীনতার ধারা চির-অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রতি পল্লীসমাজ আপন নিয়ম গড়িত,—আপন অনুশাসনে আপনাকে নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত করিত।

পল্লী-স্বরাজ চাই

রাজার দূত কেবল বৎসরের কর লইয়া চলিয়া যাইত। পল্লীর শান্তিরক্ষা, বিচারভার, স্বাস্থ্য উন্নতি—সব পল্লীর লোকেরাই গ্রামপতি নিযুক্ত করিয়া তাহার হাতে ন্যস্ত করিত। প্রতি পল্লীতে মণ্ডলী ছিল, তাহার মোড়োল ছিল, দলপতি ছিল, পঞ্চায়তে বিচার হইত, চৌকিদার পাহারা দিত। আবার সেই পল্লী-স্বরাজ পুনর্গঠন করিতে হইবে। সমবায় সমিতি সাহায্যে সেই কার্য্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে পারে।

অবশ্য আমাদের সমস্ত সমস্যা এমনই অঙ্গাঙ্গি ভাবে বিজড়িত রহিয়াছে যে, এক সঙ্গে সবগুলির মীমাংসা করিতে না পারিলে, বিচ্ছিন্ন ভাবে কোনটার সমাধান মিলিবে না। স্বাস্থ্য, অর্থ, শিল্প, শিক্ষা, সামাজিক আচার, রাজনৈতিক অধিকার প্রভৃতির মধ্যে একটি বিচ্ছেদহীন যোগ রহিয়াছে। জাতীয় জীবনকে সার্থক করিতে হইলে প্রতি ব্যক্তির জীবনকে সুস্থ, সবল এবং আনন্দময় করিয়া তুলিতে হইবে—ইহা ভিন্ন আর দ্বিতীয় পথ নাই। যে দিন প্রতি পল্লীর পর্ণকুটীর বাস্তবিকই শক্তি, শান্তি, আনন্দের নিকেতন হইবে, সেই দিনই বাংলার জাতীয় নবজাগরণ সত্য ও সার্থক হইবে। রবীন্দ্রনাথের সহিত আমরাও প্রার্থনা করি

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান!

বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ,
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক, হে ভগবান!

বাসগৃহ।

কি সহরে, কি মফস্বলে, আমাদের দেশে বাসগৃহ নির্ম্মাণের প্রণালী বা ব্যবস্থা স্বাস্থ্য-নীতিসম্মত নহে। সহরে স্থানাভাব বশতঃ না হয় বাড়ীগুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট,—সূর্য্যালোক ও বায়ু প্রবেশের পথ রহিত; কিন্তু পল্লীগ্রামেও গৃহ নির্ম্মাণে কোনরূপ শৃঙ্খলা বা নিয়মের অনুসরণ করিতে দেখা যায় না; যত্র, তত্র যেমন তেমন ভাবে গৃহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে, গ্রাম্য প্রবচনে, গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কার্য্যক্ষেত্রে গৃহ নির্ম্মাণকালে সে সকল উপদেশের অনুসরণ করা হয় না।

এরূপ অবস্থা হইবার কারণ কতকটা আমাদের সামাজিক রীতিনীতি। প্রাচীন কালের সাহিত্যে 'সূর্য্যস্পশ্যরূপা' বলিয়া একটী বিশেষণ শব্দ পাওয়া যায়। কথাটি আমাদের সে কালের—এবং এ কালেরও বটে—সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাগণের পক্ষে বিশেষ গৌরবাত্মক। ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা এমন ভাবে জীবন যাপন করেন যে, সূর্য্যও তাঁহাদিগকে দেখিতে পান না! এই শব্দটি যতই সম্ভ্রমসূচক হউক না কেন, আধুনিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের মতে ইহা অতি দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। এই সকল অসূর্য্যম্পশ্যরূপা মহিলারা যে গৃহে বাস করেন, সে বাসগৃহও এমন ভাবে নির্ম্মিত হয় যে তাহাতে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিবার উপায় থাকে না।

আমাদের অবরোধ প্রথাও বাস গৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। মহিলাগণের আব্রু রক্ষার্থ—যাহাতে বাহির হইতে কেহ দেখিতে না পায়,

এমন ভাবে অন্তঃপুরের গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। বাটীর চারিদিকে ঘনসন্নিবিষ্ট গাছ পালার আবরণ; তাহাতেও নিস্তার নাই। আব্রু রক্ষার পক্ষে তাহাও যথেষ্ট বিবেচনা না করিয়া, জানালাগুলি মেঝে হইতে অনেক উচ্চে নির্ম্মিত হয়; এবং তাদের সংখ্যাও যথেষ্ট কম রাখা হয়।

সম্ভ্রান্ত ঘরের ব্যবস্থা এইরূপ। দরিদ্রের ব্যবস্থা আবার আরও মন্দ। মাটীর ঘরই দরিদ্রের ও মধ্য-বিত্ত গৃহস্থের প্রধান সম্বল। গৃহ নির্ম্মাণের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচনের কোন যত্ন না করিয়া, যেখানে হউক, ঘর তুলিতে আরম্ভ করা হয়; আর সেই ঘরের ঠিক পাশেই গর্ত্ত খনন করিয়া তাহা হইতে গৃহ নির্ম্মাণের জন্য মাটী সংগ্রহ করা হয়। যে কয়-খানি ঘর তৈয়ার করা হইবে—সাধারণতঃ দুই এক-খানির বেশী নহে—তাহার উপযুক্ত মাটী ঐ গর্ত্ত হইতেই লওয়া হয়। সুতরাং ঘরের সংখ্যা ও আয়তন অনুসারে গর্ত্ত ছোট, বড় বা মাঝারি রকমের হইয়া থাকে। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল, এবং সকল সময়ে গৃহস্থের নর্দ্দমার জল ঐ গর্ত্তে সঞ্চিত হয়। রন্ধন ও পানার্থ জল অন্য বড় পুষ্করিণী হইতে সংগৃহীত হইলেও গৃহস্থের অপর সকল কার্য্য—যথা, বাসন মাজা, স্নান, শৌচ, এমন কি প্রস্রাব ত্যাগ পর্য্যন্ত ঐ জলে হইয়া থাকে। এই গর্ত্ত কেহ বুজাইয়া ফেলিবার পরামর্শ দিলে গৃহস্থ অপমান বোধ করেন; কারণ উহারই চারি দিকে সামান্য একটু ঘেরিয়া লইয়া গৃহস্থের আব্রু রক্ষা হইয়া থাকে। বাড়ীর পাশেই যদি ভাল পুষ্করিণী থাকে, ঐ ডোবা যদি গৃহস্থের পক্ষে নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহা বুজাইয়া ফেলা হয় বটে, কিন্তু সে বুজাইবার প্রণালীও আবার অতি বিচিত্র। প্রত্যহ গৃহের আবর্জ্জনা, উনুনের ছাই প্রভৃতি ঐ ডোবায় নিক্ষিপ্ত হয়; এবং বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া ঐ ডোবায় আবর্জ্জনাদি সঞ্চিত হইতে হইতে ক্রমে উহা ভরাট হইয়া আসে। এই দীর্ঘ কালে ঐ সকল আব-র্জ্জনা পচিয়া গৃহস্থের কত যে সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে, তাহা গৃহস্থ বুঝিতে না পারুন, বিবেচক লোক মাত্রেই বুঝিতে পারেন।

যে সকল কারণে আমরা দিন দিন স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছি, বাসগৃহ নির্ম্মাণের অব্যবস্থা ও কুব্যবস্থা তাহাদের অন্যতম। ইহার সংশোধন হওয়া অতীব আবশ্যক।

নূতন বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে প্রথমেই উপযুক্ত ভূমি নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। সহরে অবশ্য যেরূপ ভূমি জুটে, বাধ্য হইয়া তাহাতেই বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়। কিন্তু পল্লীগ্রামে ভূমি তত দুর্লভ নয়। ইচ্ছা থাকিলে সেখানে স্বাস্থ্যসঙ্গত ভূমি নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া কঠিন নয় টিলা (উচ্চ) ভূমি,—যেখানে বর্ষার জল দাঁড়ায় না—এমন ভূমি বাসগৃহের পক্ষে উত্তম। সেই ভূমি আবার একটু ঢালু হইলে আরও ভাল হয়। তাহা হইলে প্রবল বর্ষাতেও সে ভূমিতে বৃষ্টির জল সঞ্চিত হইয়া মাটী আর্দ্র রাখিবে না,—বৃষ্টির অল্প সময় পরেই সমস্ত জল বাহির হইয়া যাইবে, এবং ভূমিও শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া উঠিবে। এঁটেল মাটী অপেক্ষা বেলেমাটীযুক্ত ভূমিই গৃহ নির্ম্মাণের পক্ষে প্রশস্ত। নিম্ন ভূমি, জলাভূমি বা যে ভূমি বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময় আর্দ্র থাকে, এমন ভূমিতে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করা ত কখনই উচিত নয়—এই সকল ভূমি হইতে বাসগৃহ যত দূরে নির্ম্মিত হয় ততই ভাল। বাসগৃহের কাছে যেন শ্মশান বা গোরস্থান না থাকে। সকল প্রকার সুবিধা সত্ত্বেও কোন ভূমি যদি অস্বাস্থ্যকর বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে ভূমি নির্ব্বাচন করাই শ্রেয়।

বাসগৃহ নির্ম্মাণের উপযোগী ভূমি নির্ব্বাচিত হইলে সেখানে যদি গাছপালা, আগাছা বা জঙ্গল থাকে তবে তাহা কাটাইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। বাসগৃহের চারিদিকেই যেন কিছু কিছু খোলা জমি থাকে, যাহাতে বাসগৃহে অবাধ রৌদ্র ও বায়ু সঞ্চালনের কোন ব্যাঘাত না হয়। ছোট ছোট খানা

বা ডোবা থাকিলে সেগুলি বুজাইয়া ফেলিতে হইবে। বরং একটী মাঝারি গোছের পুষ্করিণী খনন করাইয়া সেই মাটীর দ্বারা বা বাটীর ভিত্তি খনন করিবার সময় যে মাটী উঠিবে তদ্দ্বারা খানা ডোবা ভরাট করাইয়া ফেলা যাইতে পারে।

আমাদের একটী গ্রাম্য প্রবচনে বাটী নির্ম্মাণের ইঙ্গিত করা হইয়াছে; তদনুসারে বাটী নির্ম্মাণ করিলে বাসগৃহ বেশ স্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। প্রবচনটি এই—

দক্ষিণ ছেড়ে উত্তরে বেড়ে
ঘর করগে যা ভেড়ের ভেড়ে।

আর বাস গৃহের

পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ

অর্থাৎ, পূর্ব্বদিকে হংস বিচরণের উপযোগী পুষ্করিণী এবং পশ্চিম দিকে বাঁশ ঝাড় থাকিলে ভাল হয়। অপর একটী প্রবচন—

দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা;
পূর্ব্বদ্বারী তার প্রজা।
পশ্চিমদ্বারীর মুখে ছাই;
উত্তরদ্বারীর টেক্স নাই।

অর্থাৎ দক্ষিণদ্বারী ঘর সর্ব্বোৎকৃষ্ট; পূর্ব্বদ্বারী ঘর দক্ষিণদ্বারীর মত অতটা উৎকৃষ্ট না হইলেও নেহাৎ মন্দ নহে। পশ্চিমদ্বারী ঘর নিকৃষ্ট। আর উত্তরদ্বারী ঘর এতই নিকৃষ্ট যে নবাবী আমলে সে ঘরের খাজনা পর্য্যন্ত দিতে হইত না।

মোট কথা, দক্ষিণ দিকে খোলা জমি থাকিলে স্বাস্থ্যকর বায়ু প্রবাহিত হইয়া বাসগৃহ স্বাস্থ্যকর থাকে। আর উত্তুরে হাওয়া তেমন স্বাস্থ্যকর নহে বলিয়া বাটীর উত্তর দিকে বাগান করিবার প্রথা আছে; বাগানের গাছপালার বাধা পাইয়া উত্তুরে হাওয়া বেশী পরিমাণে ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না। পূর্ব্বদিকে পুষ্করিণী থাকায় গৃহ বেশী গরম হইতে পারে না। পশ্চিম দিকে বাঁশ ঝাড় রাখার উদ্দেশ্য কতকটা তাই—প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণের উত্তাপ হইতে গৃহগুলিকে ঠাণ্ডা রাখা।

আমাদের বঙ্গদেশে সাধারণতঃ পাকা বাড়ী ও মৃৎকুটীর—এই দুই প্রকারের বাসগৃহ প্রস্তুত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য ইষ্টক নির্ম্মিত দালানই সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট বাসগৃহ। তবে চকমিলান বাড়ী অপেক্ষা এক সারিতে গৃহগুলি নির্ম্মিত হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাস্থ্যকর হয়। তবে উঠান যদি খুব বড় রাখা হয়, যাহাতে অবাধে বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে, তাহা হইলে ততটা অস্বাস্থ্যকর না হইতেও পারে।

কুটীরগুলির দেওয়াল হয় মাটীর, না হয় বাঁশের বা ছিটে বেড়ার, দরমার কিম্বা গরাণের হইয়া থাকে।

বাঁশের বা দরমার কিম্বা গরাণের দেওয়াল হইলে উহার উভয় পার্শ্বে পাতলা করিয়া মাটী লাগাইয়া লওয়া উচিত।

পাকা বাড়ীই হউক, আর কুটীরই হউক—বাস গৃহের দেওয়ালে যথেষ্ট সংখ্যক দরজা জানালা রাখা অতীব আবশ্যক—যেন সেগুলি প্রয়োজনানুসারে খোলা বা বন্ধ করা যাইতে পারে। সকল বাড়ীরই ঘরের মেঝে ভূমি হইতে অন্ততঃ দুইহাত উঁচু করিয়া নির্ম্মাণ করা উচিত। ইহাতে অনেক সুবিধা আছে। মেঝে উঁচু রাখিলে ঘর ও মেঝে শুষ্ক থাকে। বিশেষতঃ বর্ষা কালে বাঙ্গলার অনেক স্থানের ভূমি কয়েক দিন ধরিয়া জলে ডুবিয়া থাকে। ঘরের পোতা উঁচু হইলে প্লাবনের সময়েও ঘর তত ভিজা ও স্যাঁতসেঁতে হইতে পারে না; মেঝেয় যে সকল দ্রব্য ও আসবাব রাখা হয় সেগুলিও ভিজিয়া নষ্ট হইতে পারে না।

ঘরের দেওয়ালে কেবল দরজা জানালা রাখাই যথেষ্ট নহে। অনেক সময়ে দরজা বা জানালার ধারে হাঁড়ি কুড়ি, বাক্স পেঁটরা রাখিয়া এমন ভাবে দরজা জানালাগুলিকে বন্ধ রাখা হয় যে সেগুলি থাকা না থাকা সমান কথা। এরূপ করা উচিত নহে। দরজা জানালা দরকার হইলেই যাহাতে খুলিতে পারা যায় এমন ব্যবস্থা করিয়া রাখা আবশ্যক।

আসল কথা, ঘরের ভিতর নিরবাধে রৌদ্র বা

বায়ু সঞ্চালনের যে কি উপকার সে জ্ঞানই সাধারণতঃ আমাদের দেশের লোকের নাই। সেই জন্য প্রায় দরজা জানালা খুব কম রাখা হয়; আর রাখিলেও তাহা প্রায় বন্ধ থাকে। দরজা জানালা রাখার উদ্দেশ্য ঘরের মধ্যে বায়ু, রৌদ্র, আলো আসিতে পারিবে। এই জ্ঞানটি জন্মিলেই লোকে যথেষ্ট সংখ্যক দরজা জানালা রাখিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিতে শিখিবে।

কি পাকা দালান, কি মেটে বাড়ী—সকল বাস গৃহের ঘরের মেঝে পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করা উচিত। খোয়া, রাবিশ, কাঁকর, চুনসুরকী প্রভৃতি দিয়া উত্তম রূপে পিটিয়া শক্ত করিয়া মেঝে সিমেণ্ট দিয়া লইলে অন্ততঃ টালি বিছাইয়া লইলে উত্তম হয়।

মেটে ঘরের চাল প্রায় খড়ের, গোলপাতার অথবা খোলার হইয়া থাকে। আজকাল করগেটেড টীন দিয়াও চাল নির্ম্মিত হয়। এই সকল প্রকার চালেরই কতকগুলি করিয়া সুবিধা ও অসুবিধা আছে। খড়ের বা পাতার ছাওয়া চাল দিয়া বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে, এবং তাহা বেশী গরম হয় না। খোলার বা টীনের চাল সূর্য্যোত্তাপে গরম হইয়া উঠিতে পারে। এইজন্য চালের নীচে দরমার চন্দ্রাতপ থাকিলে ততটা গরম হয় না।

সকল প্রকার ঘরের দেওয়ালে যে দরজা জানালা থাকিবে, সেগুলি রুজু রুজু করিয়া বসানো কর্ত্তব্য। এরূপ করিলেই তবে বায়ু সঞ্চালনের সুবিধা হয়। মেটে ঘরে দেওয়াল ও চালার মধ্যে যথেষ্ট অবকাশ থাকায় ঘরের দূষিত উত্তপ্ত বায়ু বাহির হইয়া যায়। পাকা বাড়ীর দেওয়ালের উপরেই ছাদ নির্ম্মিত হয়; সুতরাং পাকা বাড়ীতে এই সুবিধা নাই। এজন্য ছাদের ঠিক নিম্নে দেওয়ালের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত রাখিয়া তাহা তারের জাল বা জাফরী দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে ঘরের মধ্যস্থ উত্তপ্ত বায়ু বাহির হইয়া যাইবার পথ খোলা থাকে।

বাটী নির্ম্মাণকালে পয়ঃ প্রণালীর সুব্যবস্থা করা অতীব প্রয়োজনীয় ব্যাপার। বৃষ্টির জল, গৃহস্থের ব্যবহৃত ময়লা জল নিকাশের সুব্যবস্থা না করিলে, যতই উত্তম গৃহ হউক না কেন, তাহা অচিরে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। ঘরের মেঝে সিমেণ্ট দিয়া পাকা করিয়া এবং উঠান কাঁকর দিয়া অথবা টালি বা পাথর বসাইয়া পাকা করিয়া লইবার পর নর্দ্দমাও পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হইবে; এবং সমস্ত জল যাহাতে নর্দ্দমা দিয়া গৃহ হইতে দূরবর্ত্তী কোন পুষ্করিণী, জলাশয় খাল বা নদীতে গিয়া পড়িতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

বাটীর মধ্যে শয়ন কক্ষগুলিই সর্ব্বপ্রধান হওয়া উচিত। কিন্তু স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাবে, রুচির গুণে, শয়ন গৃহ অন্দর মহলে নির্ম্মিত হওয়ায় এবং অন্দর মহলটি প্রধানতঃ বাটীর মহিলাগণের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকায়, অনেক ধনী ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাহিরের বৈঠকখানা নির্ম্মাণে যেরূপ যত্ন করেন, তাহার সৌন্দর্য্য ও সৌষ্টব বিধানে যেরূপ ব্যয় স্বীকার করেন, শয়ন কক্ষ নির্ম্মাণে তাহার শতাংশেরও একাংশ করেন কি না সন্দেহ। বৈঠকখানা ঘরে বায়ু, রৌদ্র ও আলো প্রবেশের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক বড় বড় দরজা জানালা নির্ম্মাণ করা হয়। ছবি, ঘড়ি, আলমারি, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি দ্বারা বৈঠকখানা সজ্জিত হইয়া থাকে। ইহাতে অর্থব্যয়ও যথেষ্টই হইয়া থাকে। আর শয়ন কক্ষে দরজা জানালা আকারেও ক্ষুদ্র, সংখ্যাতেও কম। এরূপ ব্যবস্থা কোন ক্রমেই স্বাস্থ্যনীতিসম্মত নহে। শয়ন-কক্ষ সাধারণের চক্ষের অন্তরালে অবস্থিত বলিয়া তাহার সাজসজ্জার তত প্রয়োজন যদিই না থাকে, তথাপি, স্বাস্থ্য নীতির খাতিরে, শয়ন কক্ষে যাহাতে রৌদ্র, আলোক ও বায়ু অবাধে আসিতে পারে সেজন্য যথেষ্ট সংখ্যক দরজা জানালা রাখিয়া, যদি আব্রু রক্ষার্থ নিতান্তই আবশ্যক হয় তবে পাতলা কাপড়ের অর্দ্ধপর্দ্দার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

শয়ন গৃহের দক্ষিণ দিকে গোয়াল ঘর, অশ্বশালা বা আস্তাবল কিম্বা পায়খানা যেন না থাকে। জল নিকাশের প্রণালীও শয়ন গৃহের দক্ষিণ দিকে না থাকাই

ভাল। রাখা নিতান্ত আবশ্যক হইলে শয়ন কক্ষ হইতে যতটা দূরে হয় ততই ভাল, এবং তাহা প্রত্যহ উত্তম রূপে ধৌত করা উচিত। শয়ন গৃহের দক্ষিণে গোয়াল, পশুপালা, নর্দ্দমা থাকিলে দক্ষিণা বায়ুর দ্বারা বাহিত হইয়া যাবতীয় দুর্গন্ধ শয়ন গৃহে প্রবেশ করিতে পারে।

শয়ন কালে এক একটী মানবের জন্য ১০০০ ঘন ফিট স্থান আবশ্যক। এই নিয়মটি মনে রাখিয়া গৃহস্থের লোকসংখ্যা বুঝিয়া শয়ন গৃহের আয়তন স্থির করা উচিত। বরং কিছু অধিক স্থান রাখা ভাল; এবং শয়ন কক্ষে আসবার পত্র বেশী রাখিয়া জায়গা কমাইয়া ফেলা উচিত নয়। শয়ন কক্ষে কেবল খাট, এবং রাত্রে আবশ্যক হইতে পারে এমন দুই একটী আসবাব থাকিলেই যথেষ্ট। পাকা ঘরের দ্বিতলের মেঝেয় শয়ন করিতে পারা যায়, তাহাতে ততটা ক্ষতি হয় না। কিন্তু একতল পাকা বাড়ী, বা মেটে বাড়ীর মেঝেয় শয়ন করা উচিত নহে। খাটের সুবিধা না হইলে খাটিয়া, তক্তাপোস, ক্যাম্পখাট, অন্ততঃ মাচা বাঁধিয়া তদুপরি শয়ন করিতে হইবে। এবং কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র সকলেরই মশারি ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

শয়ন কক্ষ হইতে একটু তফাতে রন্ধনশালা নির্ম্মাণ করা উচিত। রন্ধনশালার ধূম নির্গমনের জন্য, সামর্থ্য থাকিলে, উঁচু চিমনী নির্ম্মাণ করা উচিত। অন্যথা, ছাদের নিম্নে দেওয়ালের গায়ে খুবরী রাখা কর্ত্তব্য। অথবা, ছাদের মাঝখানে sky light বা ঘোঁয়াঘর রাখিলেও চলিতে পারে। বলা বাহুল্য, খাদ্য দ্রব্যাদি উত্তম অবস্থায় রক্ষা করিবার জন্য রন্ধনশালাতেও যথেষ্ট সংখ্যক দরজা জানালা রাখিয়া আলো ও বায়ু প্রবেশের পথ অব্যাহত রাখা উচিত। অন্ধকার ও রুদ্ধ বায়ু—এই দুইই খাদ্য বিকৃত করিয়া ফেলিতে পারে। শয়ন কক্ষের ন্যায় রন্ধনশালার নিকটও যেন পায়খানা বা গোশালা অথবা নর্দ্দমা থাকে। কারণ, এই সকল স্থানের দুর্গন্ধে খাদ্য দ্রব্য দূষিত হইয়া থাকে। রন্ধন শালায় যে খাদ্য রক্ষিত হয় তাহা দুর্গন্ধ হইতে রক্ষা করিতে হইবে বটে, কিন্তু যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু না লাগে এমন ভাবে আবৃত রাখাও উচিত নয়। আবার, ইঁদুর, সর্প, ভেক প্রভৃতিও যাহাতে খাবারে মুখ দিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। দুধ আদুড় থাকিলে সাপ আসিয়া সেই দুধ খাইয়া যায়, এবং সর্প-মুখ-নিঃসৃত বিষে দুগ্ধ বিষাক্ত হইতে পারে; সেই বিষাক্ত দুগ্ধ পান করিয়া মানুষ মারা গিয়াছে এমন ঘটনার কথাও শোনা যায়। এজন্য দুগ্ধ-প্রভৃতি তারের জালের ঢাকা, অথবা সচ্ছিদ্র লৌহের ঢাকার দ্বারা আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। সাহেবেরা তারের জালের বা বেতের জাফরির আলমারির মধ্যে খাদ্য রক্ষা করিয়া থাকেন। তাহাতে খাদ্যে বায়ু লাগিবার ব্যাঘাত ঘটে না, অথচ তাহা দূষিত হইবার সম্ভাবনা কম। অবস্থাপন্ন লোকেরা এই পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

যে কারণে রন্ধনশালায় বায়ু সঞ্চালনের পথ খোলা রাখিতে হইবে, ঠিক সেই কারণে অর্থাৎ ভাণ্ডারজাত দ্রব্যাদি উত্তম অবস্থায় রাখিবার জন্য ভাণ্ডার গৃহেও যথেষ্ট দরজা জানালা রাখিতে হইবে—যেন ঘরে রীতিমত বায়ু চলাচল করিতে পারে; নচেৎ, ভাণ্ডারের জিনিসপত্রও পচিয়া খারাপ হইয়া যাইবে। ভাণ্ডার গৃহে যাহাতে ইন্দুরের উপদ্রব না হয় সেজন্য মেঝে উত্তম রূপে পিটিয়া বিলাতী মাটী দিয়া পাকা করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। ইন্দুর অনেক রোগের, বিশেষতঃ প্লেগের বাহন। ইন্দুর-দষ্ট খাদ্যাদি বিষাক্ত হইয়া প্লেগ বিস্তারে সহায়তা করিয়া থাকে।

বাড়ীর অপরাপর কক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে স্বতন্ত্র ভাবে অথচ যাতায়াতের অসুবিধা না হয় এমন স্থানে পাকা করিয়া পায়খানা নির্ম্মাণ করা উচিত। কি পাকা ইমারত, কি মেটে ঘর—পায়খানা সর্ব্বত্রই পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এবং পায়খানার ভিতর-বাহিরে দেওয়ালের গায়ে যতদূর পর্য্যন্ত

জল লাগিবার সম্ভাবনা ততদূর পর্য্যন্ত এবং পায়খানার মেঝে বিলাতী মাটি দিয়া সিমেণ্ট করাইয়া লইতে হইবে। মেথর খাটা পাইখানা ফ্লোরের উপর নির্ম্মাণ করিতে হইবে; ফ্লোরের নীচে যেখানে মেথর খাটিতে আসিবে, সেখানে বায়ু সঞ্চালনের সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে পায়খানা শুষ্ক থাকিবে, এবং দুর্গন্ধও কম হইবে। সেকালের কুয়া পায়খানা এই বৈজ্ঞানিক যুগে একেবারেই অচল। খুব গরীব গৃহস্থের পক্ষে পাকা পায়খানা নির্ম্মাণের সামর্থ্য না থাকিলে লোকালয় হইতে দূরে মাঠে অগভীর গর্ত্ত করিয়া পায়খানার কাজ সারা কর্ত্তব্য; এবং,—গর্ত্ত হইতে যে মাটী উঠিবে তাহা শুকাইয়া চূর্ণ অবস্থায় থাকিবে—প্রত্যেকবার মলত্যাগের পর সেই শুষ্ক চূর্ণ মৃত্তিকা চাপা দিতে হইবে। গর্ত্ত পূর্ণ হইয়া গেলে অন্যত্র আবার ঐরূপ গর্ত্ত করিয়া তাহাতে মলত্যাগ করিতে হইবে। এবং ঐ ভাবে মাটী চাপা দিতে হইবে। মল আবৃত করা এতই আবশ্যক যে ইতর প্রাণীরাও সহজাত সংস্কার বশে তাহা করিয়া থাকে। কুকুর বিড়ালাদি জীবজন্তুর আচার ব্যবহার একটু লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। সেই জন্য বিড়াল কুকুরাদি নরম মাটীতেই মলত্যাগ করিয়া থাকে—তাহাতে মল মাটী চাপা দিবার সুবিধা হয়।

গোয়াল ঘর, আস্তাবল, অশ্বশালা—এসকল বাস গৃহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে দূরে নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এবং পালিত পশুদিগের স্বাস্থ্যের খাতিরেও বটে, আর গৃহস্থের নিজের স্বাস্থ্যের খাতিরেও বটে—গোশালা অশ্বশালা প্রভৃতি নিত্য নিয়মিত ভাবে ধৌত করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখিতে হইবে। প্রত্যহ, অন্ততঃ একদিন অন্তর কিম্বা সপ্তাহে দুই দিন ফেনাইল ইত্যাদির দ্বারা গোশালা, অশ্বশালা ও নর্দ্দমা ধৌত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে আরও ভাল। পালিত পশুদিগের মলমূত্রাদি প্রত্যহ স্থানান্তরিত করা উচিত।

বাসগৃহের আর একটী অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ সূতিকা গৃহ। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের গৃহস্থ ঘরে সূতিকা গৃহ গৃহস্থের কলঙ্ক স্বরূপ। প্রসূতি ও গর্ভস্থ শিশুর অবস্থা বিবেচনায় ও কল্যাণ কামনায় বাটীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কক্ষই সূতিকাগৃহ রূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে হয় ঠিক ইহার উল্টা; অর্থাৎ বাটীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কক্ষ, পশুদিগের পক্ষেও যাহা অব্যবহার্য্য এমন কক্ষ, সূতিকাগৃহ রূপে ব্যবহৃত হয়, এবং সেই কক্ষে নব প্রসূতি স্বীয় সন্তান সহ বাস করিতে বাধ্য হন। এমন সুযোগ পাইয়াও যদি শিশুকে পেঁচোয় (ধনুষ্টঙ্কার রোগে) না পায়, তবে আর পাইবে কিসে? বাঙ্গলা দেশে জন্মের এক সপ্তাহের মধ্যে যে সকল শিশুর মৃত্যু হয়, তাহাদের অকাল মৃত্যুর কারণ সূতিকা গৃহে অনুসন্ধান করিলেই পাওয়া যাইতে পারে। সেইজন্য, স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে বাস গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে বাটীর মধ্যে একটী কক্ষ সূতিকা গৃহের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিতে হইবে। এই কক্ষটি, অন্যান্য কক্ষ সংলগ্ন না হইলেও হানি নাই; অপরাপর কক্ষ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে স্পর্শ দোষ বাঁচাইয়া সূতিকাগার নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। কিন্তু কক্ষটি বাসের পক্ষে (তা তাহা মোটে এক মাস হইলেও) সর্ব্বপ্রকারে যোগ্য,—এমন কি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। রোদ আলো হাওয়া এই ঘরে প্রচুর পরিমাণে থাকা চাই। ঘরটি শুকনো খটখটে দুর্গন্ধশূন্য হওয়া উচিত।

বাসগৃহ তথা বাস-গ্রামখানি পর্য্যন্ত যে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা কর্ত্তব্য, এ কথা বিশেষ করিয়া কাহাকেও বলিবার প্রয়োজন হয় না—ইহা সকলেই অবগত আছেন। নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এবং বাস গৃহ পরিষ্কার রাখা শুচিতার অন্যতম লক্ষণ। এ বিষয়ে কেহ যে ইচ্ছা করিয়া অবহেলা করিয়া থাকেন, এ কথা আমরা বলিতে চাহি না। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে, অবস্থা বৈগুণ্যে এ দিকে বিস্তর ত্রুটি ঘটিতেছে। ইহার প্রধান কারণ, গ্রামগুলি ক্রমশঃ

জন-বিরল হইয়া আসিতেছে। যথেষ্ট লোকের অভাবে গৃহস্থদের বাটীর সকল অংশ সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা সম্ভব হয় না; এবং এই কারণেই বাসগৃহের সন্নিকটে জঙ্গলের উৎপত্তি হইতেছে। অনেক গ্রামে দেখা যায়—এক সময়ে গ্রামখানি সমৃদ্ধ ছিল—গ্রামের সমৃদ্ধির পরিচায়ক অনেক বড় বড় অট্টালিকাও দেখা যায়। কিন্তু অধুনা তাহাদের ভগ্ন দশা। হয় গৃহস্থের অবস্থা এখন খারাপ হইয়াছে, নচেৎ বহু সরিকে বিভক্ত হওয়ায় সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছে; কিম্বা চাকুরী বা বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে কর্ত্তৃস্থানীয় লোকেরা প্রবাসী হওয়ায় বাস গৃহের যত্ন লইবার কেহ নাই। হয় ত দুই একটি বৃদ্ধা বিধবা উপায়ান্তরের অভাবে কিম্বা সাত পুরুষের ভিটার মায়া কাটাইতে না পারিয়া তুলসী তলার সন্ধ্যাদীপ দিবার জন্যই বোধ হয় সেখানকার মাটী কামড়াইয়া কোন রকমে পড়িয়া আছেন। প্রকাণ্ড বাড়ী সংস্কারাভাবে জীর্ণ, পরিষ্কার রাখিবার লোকাভাবে জঙ্গল ও আগাছায় পূর্ণ। ব্যষ্টিভাবে এক একটী গৃহের অবস্থা যেমন, সমষ্টি ভাবে সমস্ত গ্রামখানির অবস্থাও প্রায় সেইরূপ। ইহার প্রতিকারের উপায়—যাঁহারা প্রবাসে আছেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য গ্রামে ফিরিয়া যাওয়া। তাঁহারা আবার গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করিলে গ্রামগুলির পূর্ব্ব শ্রী সম্পদ ফিরিয়া আসিতে পারে; জঙ্গল পরিষ্কার হইতে পারে; পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হইতে পারে; গ্রামের বাসগৃহগুলি এবং সমস্ত গ্রামখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারে।

কিন্তু তাই বলিয়া এখন যাঁহারা গ্রামে বাস করিতেছেন, তাঁহারা যে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিবেন তাহাও নয়। বাসগৃহ পরিষ্কার না রাখিলে তাঁহারাই বা কত দিন সেখানে বাস করিতে পারিবেন? অতএব গৃহের আবর্জ্জনা প্রত্যহ গ্রামের বাহিরে নিক্ষেপ করিতে হইবে; গোয়াল ও অশ্বশালার আবর্জ্জনা প্রত্যহ একটা চৌবাচ্ছায় সংগ্রহ করিয়া তথা হইতে গ্রামের বাহিরে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। পায়খানা মেথর দিয়া প্রত্যহ পরিষ্কার করাইতে হইবে। নর্দ্দমা দিনে দুই তিনবার ধৌত করিতে এবং সুবিধা হইলে প্রত্যহ একবার ফেনাইল প্রভৃতি দ্বারা শোধিত করিতে হইবে। বাড়ীর কাছে এমন কি গ্রামের মধ্যে ও গ্রামের বাহিরে কিছু দূর পর্য্যন্ত জঙ্গল ও আগাছা কাটাইয়া জল নিকাশের পথ খোলা রাখিতে হইবে।

পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্যোন্নতি।

লেখক—শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, বি-এল।

কে না জানে যে আজকাল প্রত্যেক গ্রামেই ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব এত অধিক যে, গ্রামে বাস করা মনুষ্যমাত্রেরই অসম্ভব ও ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে? পশ্চিমবঙ্গেই বলুন, আর পূর্ব্ববঙ্গেই বলুন, প্রায় সকল জেলাতেই বহু সংখ্যক পল্লীবাসী মধ্যে মধ্যে কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করে। সম্বৎসর ধরিয়া ম্যালেরিয়া জ্বরে পীড়িত থাকিয়া, উদরে প্লীহা ও যকৃতের ভার বহন করিতে করিতে, অকালে কালের করাল কবলে অনেকেই পতিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট বহুকাল যাবৎ, এইরূপ ভাবে পাড়াগাঁ সকল উজাড় হইতেছে দেখিয়াও, আজ পর্য্যন্ত পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে কোন বিধান ব্যবস্থা করেন নাই। কিন্তু এক্ষণে নূতন স্বায়ত্ত-শাসন প্রণালীতে স্বাস্থ্যোন্নতির ভার জনৈক মিনিষ্টারের উপর অর্পিত হইয়াছে।

মিনিষ্টার যিনিই হউন না কেন, তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য এই যে, স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যে পাড়াগাঁয়ে কোন্ কোন্ সম্ভাবনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে পারে, এবং স্বল্প ব্যয়ে তাহা কিরূপে সাধিত হইতে পারে, এই দুইটি বিষয় বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা এবং পশ্চাৎ কার্য্যে অবতরণ করা। ঐ জন্য সম্ভাবনীয় কার্য্য কি কি, এবং সম্ভবপর অল্প ব্যয়ই বা কিরূপে হইতে পারে, এই বিষয় জানিতে গেলে পল্লীগ্রামস্থ সুবিজ্ঞ, শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সহিত পরামর্শ করাই একান্ত যুক্তিযুক্ত। বর্ত্তমান মিনিষ্টার মহোদয় হয় ত পাড়াগাঁ কখনও দেখার মত দেখেন নাই; অথবা পাড়াগাঁয়ে কোন্ ঋতুতে কিরূপ অবস্থা ঘটে তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞতা বশতঃ একটা কার্য্যকরী লোকানুমোদিত উপায় ঠিক করিতে হয় ত তিনি অপারগ। এমতাবস্থায় হঠাৎ তাঁহার কোনরূপ কার্য্যে ব্রতী হওয়া অকর্ত্তব্য। আমার মনে হয় যে, এসকল কাজের ভার দারোগা বা সবডিপুটি বা তৎপ্রমুখ লোকদিগের উপর ন্যস্ত না করিয়া, মিনিষ্টার মহোদয়ের মনোনীত কয়েকটি মেম্বর দ্বারা একটি কমিটি গঠন করা উচিত; উক্ত কমিটি গ্রামে গ্রামে যাইয়া ১০।১২টি গ্রাম লইয়া একটি সভা আহ্বান করাইলে এবং সভায় উপস্থিত বিজ্ঞ ও শিক্ষিতব্যক্তিগণের পরামর্শ লইয়া তদনুযায়ী কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেই খুব ভাল হয়।

হুগলী জেলার আরামবাগ সবডিভিজনের মধ্যে আমার বাস। সুতরাং আমি নিজেকে সহরবাসী বলিতে পারি না। আমার পঠদ্দশায় (বোধ হয় তখন আমি বি-এ পড়ি) হুগলীর তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কেরী সাহেব শ্যামবাজার নামক গ্রামে একটি সভা আহ্বান করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তখন আমার মনে হইয়াছিল যে ওসব কিছু নয়; ওসব কেবল একটা টেক্স বসাইবার ও দারিদ্র্য-পীড়িত লোকদিগকে আরও কষ্টে ফেলিবার উপায় করা হইবে মাত্র। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, সকল গ্রামেই [illegible] সংখ্যা ম্যালেরিয়ার নৃ[illegible] আক্রমণে যেরূপ কমিয়া যাইতেছে, তাহাতে ঐ রাক্ষসীর সহিত রীতিমত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে মানুষের আর রক্ষা নাই। এই কথাটা আমার মাথায় ৫।৭ বৎসর হইল ঢুকিয়াছে; এবং আমি ঐ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়া ও অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির অভিমত পাঠ করিয়া ও শুনিয়া কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। তাহা নিম্নে বর্ণনা করিতেছি। বলা বাহুল্য যে অল্পব্যয়ে যতটুকু স্বাস্থ্যোন্নতি করা সম্ভব তদ্বিষয়েই আমার লক্ষ্য; কারণ "লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন"—এ মন্ত্রের পক্ষপাতী আমি নহি। আমার যাহা বক্তব্য, তাহা বঙ্গ, বেহার, উড়িষ্যা—সকল স্থানেরই পল্লীর পক্ষে সম্ভবপর বলিয়াই আমি মনে করি।

১। পানীয় জল; অন্য কারণে ব্যবহার্য্য জল।

এই পানীয় জলের উপর লক্ষ্য রাখাই আমার মতে কলেরা বা ম্যালেরিয়ার কবল হইতে রক্ষা পাইবার বিষয়ে একটি নিতান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য। এক রকম অদ্ভুত মশার কামড়ে ম্যালেরিয়ার বীজ মনুষ্য-শরীরে সঞ্চারিত হয় এ কথাটায় বিশ্বাস হওয়া বড়ই কঠিন;—অন্ততঃ, আমার নিজের ওটা সঠিক বলিয়া ধারণা হয় না। যাই হোক সে সম্বন্ধে তর্ক করা এস্থলে আবশ্যক মনে করি না। আমার মতে দূষিত পানীয় জলটাই ম্যালেরিয়ার বা কলেরার মুখ্য কারণ। পাড়াগাঁয়ে পুষ্করিণীর জলই প্রায় সকল স্থানে পানীয় জল স্বরূপ, ও অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধনে ও স্নানে ব্যবহৃত হয়। যে পুষ্করিণীর জল ঐ কারণে ব্যবহৃত হয়, তাহার পাড়ে নানারকমের গাছ-গাছড়া জন্মিয়া থাকেই। ঐ সকল গাছের পাতা হাওয়াতে উড়িয়া আসিয়া জলে পড়িয়া জলমধ্যে পচিয়া যায়। তার পর পল্লীগ্রাম মাত্রেই, কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই মলত্যাগের স্থান—ঐ পুকুরের পাড়;—ঐ সকল বিষ্ঠা ও অন্যান্য আবর্জ্জনা আসিয়া বর্ষাকালে পুকুরের জলে পতিত হয়। এতদ্ভিন্ন, ঐ পুষ্করিণীর জলে জলশৌচ ও মূত্রত্যাগ করা এবং ময়লা কাপড় চোপড় কাচা হইয়া থাকে। উক্ত কারণ সকলের দ্বারা পুষ্করিণীর জল নিতান্ত [illegible]

হইয়া নানা রোগের আকর হইয়া থাকে। চেষ্টা করিলে, ইহার প্রতিকার অতি সহজেই হইতে পারে। কিন্তু সংস্কারবদ্ধ লোকদিগকে ঐ সকল কার্য্য হইতে বিরত করাই কঠিন; কারণ, তাহারা উত্তরে বলিয়া থাকে, "নিন মশায়, বাপ ঠাকুরদাদা থেকে উপরের কত পুরুষ ঐ রকম কোরে ঐ পুকুরের জল খেয়ে কাটিয়ে গেল,—আর আজ আপনি বলচেন যে, ঐ পুকুরের জলের দরুণই ম্যালেরিয়া কলেরা!" কিন্তু তারা যাই বলুক, গ্রামস্থ শিক্ষিত ভদ্রলোকের সাহায্যে তাহাদিগের ঐরূপ বদ্ধমূল ধারণা দূর করাইয়া দিতে হইবে। ধারণা দূর হৌক বা না হোক্, আইন জারির দ্বারা (১) প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ একটি বা দুইটি পুষ্করিণী পানীয় জলের নিমিত্ত পৃথক ভাবে (reserved) রাখিতে হইবে। তাহার পাহাড়স্থ গাছপালা একেবারে নিঃশেষ করিয়া কাটিয়া দিতে হইবে; তাহার পাড়ে কেহ মল মূত্র ত্যাগ করিতে পারিবে না; তাহার জলে কেহ স্নান করিতে বা কাপড় চোপড় কাচিতে বা জল শৌচ করিতে পাইবে না।

(২) যে জল রন্ধন কার্য্যে লাগে বা স্নানার্থ ব্যবহৃত হয়, সেই জল প্রায়ই গৃহসংলগ্ন খিড়কি হইতেই লওয়া হয়। ঐ খিড়কি পুষ্করিণীর জল মধ্যস্থ লতা বা জলাস বা পাতাড়ি বৎসরে অন্ততঃ দুইবার পরিষ্কার করিতেই হইবে। পাহাড়ে জলের দিকের ঢালের উপর যাহাতে কোন গাছ না থাকিতে পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে। বিপরীত দিকের ঢালেও গাছ না থাকিলেই ভাল হয়; তবে নিতান্ত পক্ষে সে দিকে গাছ থাকিলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না; কারণ সে সব গাছের পাতা অধিকাংশ সেই দিকের ঢালের উপর পড়িবার সম্ভাবনা। অবশ্য উড়িয়া কতক কতক জলে পড়িবেই; কিন্তু পল্লীবাসীগণ খিড়কীর পাড়ে আম, জাম, তাল, খেজুর, বঁইচাল গাছ ইত্যাদি না লাগাইয়া বাঁচিবে না।

(৩) ঐ খিড়কীতে অন্ততঃ দুইটি পৃথক্ ঘাট থাকা চাই; একটি শুদ্ধ রন্ধনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইবে। যে [illegible] বাহুল্য রন্ধনের জলটা গরম হইয়া Boiling pointএ উঠিবে বলিয়া ততটা অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হইবে না।

(৪) খিড়কী পুষ্করিণীর দুইটি মোহান থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য—এক দিক দিয়া বর্ষার সময় মাঠের জল প্রবেশ করাইয়া, অন্য দিক দিয়া উদ্বৃত্ত জলটা বাহির করাইয়া দেওয়া খুব ভাল। অবশ্য সকল ক্ষেত্রে ইহা সম্ভবপর হইবে না। এখন পানীয় জল সম্বন্ধে আর একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি বা দুইটি পুষ্করিণী পূর্ব্বোক্ত ভাবে রক্ষিত হইলেও, জলটুকু কলসী শুদ্ধ আনিয়া তাহা গরম করিয়া ফুটাইয়া লইতে হইবে; এবং তাহা শীতল হইলে (বা ঈষদুষ্ণ থাকিতে) খাইতে হইবে। ইহা ম্যালেরিয়া বা কলেরার হাত এড়াইবার শ্রেষ্ঠতম উপায়।

হয় ত লোকে বলিবে যে "একে জ্বালানি কাষ্ঠের অভাব, তার উপর আবার খাবার জল গরমের ব্যবস্থা!" তাহার উত্তর এই যে, জলটা গরম করিতে কাষ্ঠের আবশ্যক ততদূর হইবে না—যদি প্রত্যেক সন্ধ্যাতে রন্ধনকার্য্য শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই সেই গন্‌গনে আগুনের উপর জলের কলসীটা বসাইয়া রাখা যায় (বড় জোর দু'খানা ঘুঁটে তার সঙ্গে উনুনের মধ্যে ফেলিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়)। অথচ, আর এক কাজও করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে যে পুকুর-পাড়ের আগাছা ও জঙ্গল কাটাইয়া ফেলিবার কথা বলিয়াছি, সেই আগাছা এবং গ্রামের সর্ব্বত্রই প্রায় যে আগাছা জন্মে তাহা মধ্যে মধ্যে কাটাইয়া শুকাইয়া রাখিলে, তাহার দ্বারাও জল গরম করা চলিবে। ইহাতে গৃহস্থদের বাড়ী, বাগান ও গ্রামও অনেকটা পরিষ্কার থাকিবে।

২। খোলা বাতাস।

খোলা বাতাস অর্থে আমি, 'হাওয়া আসিবার প্রতিবন্ধক না থাকা, এবং দুর্গন্ধযুক্ত হাওয়া না আসিবার উপায় করা'—এই দুইটি বিষয় বুঝিয়া থাকি।

(১) যে ঘরে বসবাস করিতে হইবে, সেই ঘরের চারিদিকেই গাছ পালা যাহাতে বেশী না থাকে, এবং অন্ততঃ দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকটাতে একটু খোলা স্থান থাকে, তাহা দেখা বিশেষ কর্ত্তব্য।

ঘরের আশে পাশে বা অনতিদূরে "সারডোবা" বা খৎকুড় (অর্থাৎ যে গর্ত্তে গোময় ও গোমূত্র ও অন্যান্য আবর্জ্জনা নিক্ষিপ্ত হয়) কোন মতেই রাখা উচিত নহে। যেখানে ঐরূপ ডোবা আছে তাহা ভরাট করিয়া দিয়া, অন্ততঃ ১৫০ হাত দূরে ঐরূপ গোবরাদি নিক্ষেপের স্থান করিয়া রাখা উচিত। অবশ্য দূরে যাইতে একটু কষ্ট হইবে বটে, কিন্তু অকাল-মৃত্যু বা ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া অপেক্ষা একটু কষ্ট স্বীকার করা নিশ্চয়ই ভাল।

অনেকেই বোধ হয় বলিবেন যে, "মুখে বলা খুব সহজ; কিন্তু কাজে করাই সুকঠিন।" কথাটি অবশ্য এ দারিদ্র দেশে অনেকটা সত্য বটে; কিন্তু তথাপি ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য, যাহার যতটুকু সাধ্য তাহার ততটুকু চেষ্টা করিয়া, উক্ত পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনাদিপূর্ণ ডোবাগুলি ঘরের কাছে রাখিবার বিষয়ে নিবৃত্ত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

(৩) ঘরের ভিতর যাহাতে হাওয়া খেলে, সেজন্য ঘরের জানালা বেশ বড় করিয়া তৈয়ার করা দরকার—এবং এক জানালার সোজাসুজি অন্য দিকে আর একটি জানালা রাখা কর্ত্তব্য।

৩। আলোকের ও সূর্য্য-তাপের সুবিধা।

যাহাতে ঘরের ভিতর অন্ধকার না হয় এবং সূর্য্যের কিরণ ঘরের ছাদে ও প্রাঙ্গণে উত্তমরূপে আসিতে পারে, সেজন্য গাছের ডাল পালা কাটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সূর্য্যের তাপে বহুবিধ বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

৪। জল নিকাশের বন্দোবস্ত।

জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত প্রথমতঃ নিজ নিজ বসতবাটীর সম্বন্ধে করা চাই; এবং পশ্চাৎ যাহাতে সমুদায় গ্রামের গড়েনি জল স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া না থাকে, ও সম্পূর্ণভাবে বহিয়া গিয়া গ্রামের বাহিরে পড়ে, তাহার কোন উপায় বিধান করা চাই।

আকাশের জল নিজ নিজ বসতবাটির প্রাঙ্গণে যাহাতে দাঁড়াইয়া না থাকে, তদ্বিষয়ে সকলেই লক্ষ্য রাখে ও তাহার বিহিত উপায় সকলেই করিয়া থাকে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং সে বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু গ্রামের ভিতর স্থানে স্থানে বর্ষার জল দাঁড়াইয়া থাকিয়া, তাহাতে বহুবিধ আবর্জ্জনা পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হইলে, তাহার গ্যাসে ম্যালেরিয়া ইত্যাদি পীড়া জন্মিতে পারে,—ইহা গ্রামবাসীগণের ধারণা থাকা উচিত। কিরূপে ঐরূপ জল জমিয়া থাকা বন্ধ করা যাইতে পারে, তাহার উপায় নিম্নে দুই একটি মাত্র দেওয়া গেল :—

(১) গ্রামের মধ্যে সুবিধামত স্থানে একটি গ্রাম্য নালা প্রস্তুত করিয়া রাখা—ঐ নালা সমস্ত গ্রামের অধিবাসীগণ চাঁদা করিয়া কাটাইবে ও ঝাড়াইবে। ঐ নালা গ্রামের এমন যায়গায় অবস্থিত হইবে যে, যেন গ্রামের অধিকাংশ স্থানের জল অবশেষে সেই নালায় গিয়া পড়িতে পারে। ঐ নালার জল গ্রামের শেষ সীমানায় অথবা ধান্য ক্ষেতে গিয়া যাহাতে পড়ে, সেই ভাবে ঐ নালা প্রস্তুত করিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, গ্রাম-গড়েনি জল পল্লীবাসী প্রজাগণ আদরের সহিত নিজ নিজ ক্ষেতে লইয়া গিয়া থাকে।

(২) গ্রামের মধ্যস্থিত যে স্থানের জল ঐ গ্রাম্য নালায় গিয়া পড়া সম্ভব নহে, সেই স্থানের জল কোন মেঠো পুকুরে (অর্থাৎ যে পুকুর ঘর দোর ছাড়াইয়া মাঠের মাঝে অবস্থিত তাহাতে) গিয়া যাহাতে পড়িতে পারে, তাঁহার ব্যবস্থা করা উচিত। এই ব্যবস্থা করাটা যে বড় কষ্টকর, তাহা মনে হয় না; কারণ, ঐজল নিকট জমির উপর দিয়া ভাসিয়া গিয়া পুকুরে পড়িতে পারে, এমন পুকুর অধিকাংশ পল্লীতেই দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং যাহাতে সুশৃঙ্খল

ঐ ভাসা জলটা পুকুরে পড়িতে পারে, তাহারই একটা ব্যবস্থা পাঁচজনে মিলিয়া করিয়া রাখিলেই হইল।

উপরি লিখিত উপায়াবলম্বন বাদে বসতবাটী ও উঠান পরিষ্কার রাখা বা পরিমার্জ্জনা করার কথা লেখাটা বাহুল্য মাত্র। কারণ, গ্রামস্থ কুলকামিনীগণ সে বিষয়ে খুবই দৃষ্টি রাখিয়া থাকে; এবং তাহা প্রাতঃকালের একটি কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। গোবরকে জনৈক খ্যাতনামা চিকিৎসক Indian Phenyle বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; এবং ঐ গোবরের দ্বারাই গ্রামের ঘর, উঠান ইত্যাদি অনুলিপ্ত হইয়া থাকে।

উল্লিখিত বিষয় কয়েকটীর মধ্যে ১ দফা, ২ দফা ও ৪ দফায় বর্ণিত উপায়গুলির ভিতর কতকগুলি সরকার বাহাদুরের সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলি দ্বারা স্থিরীকৃত করতঃ প্রচলিত করিবার ব্যবস্থা করিলেই ভাল —এ ভীষণ ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত দেশে তাহাই বাঞ্ছনীয় মনে হয়। তবে বলা বাহুল্য যে, সরকার বাহাদুর যেন এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন যে, অধুনা প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসীগণই নিতান্ত দারিদ্র্য প্রপীড়িত এবং নূতন ট্যাক্স দ্বারা নিপীড়িত হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

* * *

বায়ু।

জীবের প্রাণ ধারণের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, শ্রীভগবান তাহা প্রচুর পরিমাণেই দিয়াছেন। খাদ্য, জল ও বায়ু, জীবের পক্ষে এই তিনটী না হইলে চলে না; এই তিনটি দ্রব্যই পৃথিবীতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। খাদ্য, জল ও বায়ুর মধ্যে বায়ুই সর্ব্ব প্রধান। কারণ, খাদ্য বিনা আমরা তিন সপ্তাহ জীবিত থাকিতে পারি; জল পান না করিয়াও তিন দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারি। কিন্তু বায়ু ব্যতীত পাঁচ মিনিট কালও আমরা জীবিত থাকিতে পারি না। আমাদের জীবন ধারণের জন্য এমন প্রয়োজনীয় যে বায়ু, তাহা পৃথিবীতে এত বেশী পরিমাণে আছে যে, তাহার ঠিক মত নির্দ্ধারণ করা কঠিন। আমাদের পৃথিবী গোলাকার। এই পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে ২৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত একটী বায়ু মণ্ডল পৃথিবীর চারি দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মৎস্যাদি জলীয় জীব যেমন জলের মধ্যে থাকে, আমরা সেইরূপ বায়ু সাগরে বাস করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় নিজেদের অজ্ঞতা বশতঃ এই বায়ু মধ্যে মধ্যে বিকৃত হইয়া জীবদেহে রোগ উৎপাদন করে; এমন কি, সময়ে সময়ে মৃত্যুও ঘটাইয়া থাকে।

প্রাচীন কালে লোকের বিশ্বাস ছিল, বায়ু একটী মূল পদার্থ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আমরা যাহাকে বায়ু মণ্ডল বলি, তাহা কয়েকটি বায়বীয় পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত। তন্মধ্যে অম্লজান ও যবক্ষারজান প্রধান। বায়ুর মোটামুটি চারি ভাগ যবক্ষারজান (নাইট্রোজেন), আর এক ভাগ অম্লজান (অক্সিজেন)। ইহা ছাড়া, বায়ুতে জলীয় বাষ্প বা জলকণা, ওজোন, কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস, এমোনিয়া প্রভৃতি আরও কয়েকটি বায়বীয় পদার্থ সামান্য পরিমাণে আছে।

এই সকল পদার্থের মধ্যে অম্লজানের সহিতই আমাদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। যবক্ষারজান নিরপেক্ষ বায়ু; উহা আমাদের দেহে কোন ক্রিয়া করে না। কিন্তু উহা না থাকিলেও আমরা বাঁচিতে পারিতাম না। কারণ, অম্লজান না হইলে আমরা বাঁচিতে পারি বলিয়া উহাকে প্রাণবায়ু বটে, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন

অম্লজানের মধ্যেও আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। অক্সিজেনের কাজ দহন করা। অক্সিজেন ব্যতীত অগ্নির অস্তিত্ব অসম্ভব। বায়ুতে অক্সিজেনের অভাব থাকিলে অগ্নি জ্বলিবে না। আর নিরবচ্ছিন্ন অক্সিজেনের মধ্যে এত প্রবল ভাবে অগ্নি জ্বলিবে যে, সমস্ত পৃথিবী পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। জীব দেহের মধ্যেও অক্সিজেন এই কাজ করে—খাদ্যাদির মধ্যে যে কার্ব্বন বা কয়লা জাতীয় পদার্থ থাকে, অক্সিজেন তাহাকে দগ্ধ করিয়া দেহের তাপ রক্ষা করে। নাইট্রোজেনের অপর কোন কাজ নাই—কেবল অক্সিজেনের এই প্রচণ্ড শক্তিকে সংযত রাখিয়া জগৎকে রক্ষা করে।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, বায়ুতে কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস নামক একপ্রকার বায়বীয় পদার্থ আছে। এই বায়ু প্রত্যক্ষ বিষ—জীবদেহে ইহা বিষের কাজ করিয়া থাকে। সাধারণ বায়ুতে ইহার পরিমাণ শতকরা ·০৪ অংশ। কোন কারণে এই পরিমাণ একটু বেশী হইলেই আমাদের শরীরে পীড়া উৎপন্ন হয়। ইহার পরিমাণ খুব বেশী হইলে মানুষের মৃত্যুও হইয়া থাকে। আমরা শ্বাস গ্রহণ কালে যে বায়ু দেহ মধ্যে টানিয়া লই, তাহার অম্লজান ভাগ দেহ মধ্যস্থ খাদ্যাংশের কার্ব্বনকে দগ্ধ করিয়া নিয়ত আমাদের দেহের অভ্যন্তরে কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস উৎপাদন করিতেছে। প্রশ্বাস বায়ুর সহিত আমরা সেই বিষাক্ত বায়ু শরীর হইতে বাহির করিয়া দিতেছি। সেই কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস তৎক্ষণাৎ প্রবহমান বায়ু স্রোতে মিশিয়া যাওয়ায় তাহার অনিষ্টকারিতা শক্তির হ্রাস হইতেছে। এইখানে মনে হইতে পারে, পৃথিবীতে যখন কোটী কোটী জীব বাস করিতেছে, এবং নিয়ত তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য চলিতেছে; প্রয়োজনানুসারে লোকে অগ্নিও প্রজ্জ্বালিত করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে স্বতঃই দাবাগ্নি রূপে অগ্নি উৎপন্ন হইতেছে। এই সকল কারণে পৃথিবীর অক্সিজেনের ভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়া কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসে পূর্ণ হইয়া যাইবার কথা। কিন্তু শ্রীভগবানের আশ্চর্য্য কৌশলে প্রকৃতি দেবী জীবরাজ্যকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বায়ু মণ্ডলে কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস ও অক্সিজেনের অনুপাত স্থির ভাবে রক্ষা করিতেছেন। গতিশীল জীবরা যেমন নিশ্বাসের সহিত অক্সিজেন গ্রহণ করে ও প্রশ্বাসের সহিত কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস পরিত্যাগ করে, উদ্ভিদ জগতের শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া ঠিক ইহার উল্টা; অর্থাৎ উদ্ভিদরা বায়ু হইতে তাহাদের পত্রত্বক সাহায্যে কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস হইতে কার্ব্বনাংশ গ্রহণ করিয়া নিজদেহের পুষ্টিসাধন করে এবং অক্সিজেন বিশ্লেষণ করিয়া তাহা প্রশ্বাসরূপে পরিত্যাগ করে।

সাধারণ বায়ুতে কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসের পরিমাণ ·০৪ এর বেশী নহে বটে, কিন্তু প্রশ্বাস বায়ুতে ইহা যে কত বেশী পরিমাণে থাকে, একটী অতি সহজ উপায়ে তাহা পরীক্ষা করা যায়। চূণের সহিত জল মিশাইয়া দুই এক দিন স্থির ভাবে রাখিয়া দিলে চূণ তলায় থিতাইয়া গিয়া উপরে দিব্য স্বচ্ছ পরিষ্কার জল থাকে, এবং জলের উপর অল্প সাদা একটি সর পড়ে। ঐ সরটি সাবধানে তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া, পরিষ্কার জলের খানিকটা একটা কাচের গ্লাসে সাবধানে ঢালিয়া লউন, যেন তলার চূণ জলের সহিত আর না মিশিয়া যায়। এইবার ঐ জলের ভিতর একটি কাচের পিচকারীর সাহায্যে সাধারণ বায়ু কিছুক্ষণ প্রয়োগ করুন—বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবেন না। এইবার একটী কাচের নলের ভিতর দিয়া জলের মধ্যে আপনার প্রশ্বাস বায়ু চালান—দেখিবেন, পরিষ্কার জলের রং ক্রমশঃ ঘোলাটে হইয়া আসিতেছে। জলটি দেখিতে পরিষ্কার ছিল বটে, কিন্তু বাস্তবিক উহার সহিত কিছু চূণ দ্রবীভূত থাকায় আমাদের চক্ষুর অগোচর ভাবে ছিল। এক্ষণে প্রশ্বাস বায়ুর কার্ব্বনের সহিত মিলিত হইয়া উহা চা খড়িতে পরিণত হইয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল।

DOUBLE COLOUR PAGE
BLANK PAGE(S)